একটি জীবন
একটি ইতিহাস

আব্বাস আলী খান

মাওলানা মওদূদী

মাওলানা মওদূদী(র.)

একটি জীবন একটি ইতিহাস

আব্বাস আলী খান

মাওলানা মওদূদী(র.)

একটি জীবন একটি ইতিহাস

আব্বাস আলী খান

প্রকাশনা বিভাগ
জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ

মাওলানা মওদূদী একটি জীবন একটি ইতিহাস

আব্বাস আলী খান

প্রকাশক ঃ
অধ্যাপক তাসনীম আলম, চেয়ারম্যান
প্রকাশনা বিভাগ
জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ
৫০৪, এলিফ্যান্ট রোড, বড় মগবাজার, ঢাকা - ১২১৭
ফোন - ৯৩৩১২৩৯, ৯৩৩১২৩৫

প্রথম সংস্করণ - ১৯৬৭
ষষ্ঠ সংস্করণ - এপ্রিল ২০০৫

প্রচ্ছদ ঃ হামিদুল ইসলাম

মুদ্রণেঃ আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস

নির্ধারিত মূল্য ঃ ১০০.০০ টাকা মাত্র

Maulana Maudoodi by Abbas Ali Khan
Published by Jamaat-e-Islami Bangladesh Publications. 6th Edition 2005
Price : Tk. 100.00 Only

প্রকাশকের কথা

বিংশ শতাব্দীতে এ উপমহাদেশে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র.) ছিলেন একজন প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ ও দার্শনিক। তাঁর ইসলামী দর্শনভিত্তিক সাহিত্য ও তাফসীর সারা বিশ্বে বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়ে ব্যাপকহারে প্রশংসিত ও সমাদৃত হয়ে আসছে। তাঁর ব্যক্তিগত জীবন ও কর্মময় জীবন সম্পর্কে জানার আগ্রহ বিপুলভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। মাওলানা মওদূদীর জীবনীগ্রন্থ -এর পঞ্চম সংস্করণ ইতোমধ্যে শেষ হয়েছে। এখন ষষ্ঠ সংস্করণ প্রকাশিত হতে যাচ্ছে বলে আমরা মহান রাব্বুল আলামীনের অযুত শোকর আদায় করছি এবং সেই সাথে এ গ্রন্থের সম্মানিত লেখক মুহতারাম আব্বাস আলী খান- যিনি এখন আর আমাদের মাঝে নেই, আমরা তাঁর রূহের মাগফেরাত কামনা করছি।

এছাড়া পূর্বের সংস্করণগুলোর প্রকাশক অধ্যাপক ইউসুফ আলীও দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। আল্লাহ তাঁর সকল নেক আমল কবুল করে জান্নাতবাসী করুন– এই দোয়াই করছি।

অতীতের মতো এ সংস্করণটিও পাঠকের কাছে সমাদৃত হবে বলে আশা পোষণ করছি। মহান রাব্বুল আলামীন আমাদেরকে তাঁর দ্বীনের প্রচারের ক্ষেত্রে সার্বিক কোরবানী পেশ করার তৌফিক দান করুন। আমীন।

ঢাকা
১৬ এপ্রিল ২০০৫

বিনীত
মোঃ তাসনীম আলম

চতুর্থ সংস্করণের ভূমিকা

মাওলানা মওদূদী (র.) জীবনীগ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণ শেষ হয়ে গেছে বৎসরাধিক কাল পূর্বে। এখন চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হতে যাচ্ছে বলে আল্লাহ তায়ালার অশেষ শুকরিয়া আদায় করছি। তৃতীয় সংস্করণে অসাবধানতার কারণে যে সব ভুল-ত্রুটি রয়ে গিয়েছিল তা সংশোধন করা হয়েছে এবং কিছু নতুন তথ্য সংযোজন করা হয়েছে। এর পরেও কিছু মুদ্রণ ত্রুটি রয়ে যাওয়া স্বাভাবিক। আশা করি সহৃদয় পাঠক তা ক্ষমার চোখে দেখবেন। জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় প্রকাশনা বিভাগ বইখানা প্রকাশনার দায়িত্ব নিয়েছেন বলে তাঁদের কাছেও কৃতজ্ঞ রইলাম।

আশা করি পাঠক সমাজে এ গ্রন্থখানি আগের মতই সমাদৃত হবে। আল্লাহতায়ালা আমার এ নগণ্য খিদমত কবুল করুন। আমীন।

বিনীত গ্রন্থকার

জুলাই - ১৯৯৬

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

আজ থেকে প্রায় পনেরো বছর আগে মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর (র.) জীবনী ও কর্মসাধনার উপরে সংক্ষিপ্ত আলোকপাতসহ গ্রন্থখানির প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। বাংলা ভাষায় এটাই ছিল এ ধরনের প্রথম গ্রন্থ। গ্রন্থখানির প্রকাশকালে মাওলানা মরহুম জীবিত ছিলেন বলে সেটাকে তাঁর পূর্ণ জীবনী বলা চলে না। যা হোক বাংলাদেশ হওয়ার পূর্বেই তা নিঃশেষ হয়ে যায় এবং বিভিন্ন স্থান থেকে পুনঃপ্রকাশের দাবি ও অনুরোধ আসতে থাকে। অতঃপর সম্প্রতি মাওলানা দুনিয়া ত্যাগ করে তাঁর আপন প্রভুর সন্নিধানে চলে যান।

মাওলানার জীবনী ও কর্মসাধনা সম্পর্কে নতুন করে কলম ধরতে এবার নিজের অক্ষমতা অযোগ্যতা আমাকে বারবার নিরুৎসাহিত করেছে। মুসলিম বিশ্বের সুধীমহলে মাওলানার স্থান এত উচ্চে, মুসলিম মিল্লাতের জন্যে ও তাঁর ভবিষ্যত বংশধরদের জন্যে রেখে যাওয়া অবদান এতো বিরাট ও বিশাল যে তার পূর্ণ চিত্র অংকন আমার সাধ্যের অতীত। মুসলিম মিল্লাত ও তার বংশধরদের জন্যে যা কিছু করার এবং বলার তার কোন কিছুই তিনি ফেলে রেখে যাননি। তাঁর সাহিত্য ও চিন্তাধারা, বিশেষ করে তাঁর বিপ্লবী তাফসীর তাফহীমুল কোরআন ও সীরাতে সরওয়ারে আলম কয়েক শতাব্দীর জন্যে মুসলিম মিল্লাতের দিগদর্শনের কাজ করতে থাকবে। জীবন ও সমাজের বিভিন্ন দিক ও বিভাগের জন্যে তিনি পুরোপুরি রাহনুমায়ী (পথ প্রদর্শক) করে গেছেন। যার জন্যে ইসলামী জগত এক বাক্যে তাঁকে ইসলামী জগতের নেতা ও শতাব্দীর সংস্কারক ও ইতিহাস-স্রষ্টা বলে স্মরণ করছে ও করবে।

মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর (র.) দাওয়াত, বাণী ও আদর্শ ছিল যেহেতু আন্তর্জাতিক, বিশ্বব্যাপী ও বিশ্বমানবতার কল্যাণের জন্যে, তাই তাঁর ব্যক্তিত্ব ছিল না কোন ভৌগোলিক দেশভিত্তিক, বরঞ্চ আন্তর্জাতিক এবং সেজন্যে তিনি ছিলেন সকল আঞ্চলিকতা,স্বজনপ্রীতি ও একদেশদর্শিতার বহু উর্ধ্বে। তাই সারাবিশ্বের মুসলমানদের কাছে সাইয়েদ মওদূদী একটা অতি প্রিয় নাম, সকলের আকর্ষণ ও শ্রদ্ধার পাত্র। এ গ্রন্থখানি এক ব্যক্তির শুধু জীবনচরিত্রই নয়, বরঞ্চ একটি জীবন, একটি ইতিহাস ও একটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী আন্দোলন।

মাওলানার পূর্বপুরুষের আবাসভূমি ছিল দিল্লী। তিনি জন্মগ্রহণ করেন ও লালিত-পালিত হন দাক্ষিণাত্যের হায়দারাবাদে। ইসলামের মহান আদর্শ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে জন্মভূমি চিরকালের জন্যে পরিত্যাগ করে কর্মস্থল হিসেবে বেছে নেন পূর্ব পাঞ্জাবের পাঠানকোটকে। ভারত বিভাগের পর হিজরত করেন লাহোরে। কোন আঞ্চলিক ভূখণ্ডের মায়া তাঁকে আদর্শ পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। জীবনের শেষ তেত্রিশ বছর লাহোরে কাটিয়ে তিনি লাহোরী বা পাঞ্জাবী হয়ে যাননি। তিনি ছিলেন সারা জাহানের। তিনি ছিলেন বিশ্বমানবতার।

তিনি হর-হামেশা সত্যের প্রচার করেছেন। মিথ্যা, অবিচার, দুর্নীতি ও যুলুম নিষ্পেষণের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলেছেন। তাঁর সত্য ভাষণ কখনও অপ্রিয় করেছে আপনজনকে, অপ্রিয় করেছে বন্ধু-বান্ধবকে, অপ্রিয় করেছে অনেক বুযুর্গানে কওমকে।

তাঁর মাতৃভাষা ছিল উর্দূ , যার আজীবন তিনি সেবা করেছেন। সে ভাষাকে নতুন রূপ দিয়েছেন, নতুন অলংকারে ভূষিত করেছেন। কিন্তু তিনি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন সকল ভাষার প্রতি এবং মাতৃভাষার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। উর্দূ তাঁর মাতৃভাষা হওয়া সত্ত্বেও তিনি বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হওয়ার সপক্ষে স্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

অখণ্ড পাকিস্তান আমলে পূর্ব-পাকিস্তানের উপরে পশ্চিম-পাকিস্তানী শাসকদের যে অবিচার ও পক্ষপাতমূলক আচরণ ছিল, তার তিনি তীব্র সমালোচনা করে সমাধান পেশ করেছেন।

তিনি পূর্ব পাকিস্তানে বহিরাগত মুসলমানদের আচরণ সম্পর্কে, ভাষা সমস্যা, চাকরি সমস্যা ও দেশরক্ষা সমস্যা সম্পর্কে ন্যায়নীতিভিত্তিক সুস্পষ্ট মন্তব্য করেছেন। তিনি পূর্ব-পকিস্তানকে তাঁর দেহের একটি অংশের সাথে তুলনা করেছেন। তিনি বলেছেন, "পাকিস্তান আমার দেহ ও প্রাণের তুল্য। আমার দুটি হাতের মধ্যে যেমন আমি পার্থক্য করতে পারি না, তদ্রূপ পাকিস্তানের উভয় অংশের মধ্যে পার্থক্য করতে পারি না। আমার দুই হাতের মধ্যে যেটি অসুস্থ হোক, তা পুরো শরীরের একটা রোগ। এর কারণ অনুসন্ধান করা ও সঠিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা আমার কর্তব্য। আর তা না করার অর্থ হচ্ছে নিজের সাথে শত্রুতা করা।"

তিনি মধ্যপ্রাচ্য ভ্রমণকালে সেখানকার জনসাধারণ ও সুধীবৃন্দের সামনে আরব জাতীয়তাবাদের নির্ভীক সমালোচনা করেন। অপরদিকে বিদেশে অবস্থানরত পাকিস্তান দূতাবাসের কর্মচারীদের কর্মতৎপরতারও সমালোচনা করেন।

তাঁর চরিত্রের আর একটি মধুর বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, তিনি নিজেকে কখনও ভুলের উর্ধ্বে মনে করতেন না। তাই তিনি সর্বদাই জামায়াতের কর্মী-সম্মেলনে, কাউন্সিল অধিবেশনে (মজলিশে শূরা) নিজেকে সমালোচনা করার জন্যে পেশ করতেন। যাঁরা তাঁর জন্যে সদা প্রাণ দিতে প্রস্তুত থাকতেন,তাঁদেরকে তিনি পূর্ণ সুযোগ দিতেন, যদি তাঁর কোন ভুলত্রুটি তাঁদের চোখে ধরা পড়ে থাকে, তা দ্বিধাহীন চিত্তে যেন বলে ফেলতে পারেন। এভাবে তিনি বহুদিনের বদ্ধমূল কুসংস্কারকে (খাতায়ে বুযুর্গান গেরেফতান খাতাস্ত-বুযুর্গদের ভুল ধরাও ভুল) ভেঙে চুরমার করেছেন।

তিনি দিবারাত্র দ্বীনের খেদমতে এমনভাবে নিমগ্ন থাকতেন যে, ঘর-সংসারের,সন্তানাদির এবং আপন স্বাস্থ্যের দিকে নজর দেয়ার ফুরসতই ছিল না তাঁর। মিল্লাত ও বিশ্বমানবতার খেদমতের জন্যে তিনি নিজেকে করে রেখেছিলেন উৎসর্গীকৃত।

অতএব এ কথা দ্বিধাহীন চিত্তে বলা যেতে পারে যে সাইয়েদ ও মুরশিদ মওদূদীর ব্যক্তিত্ব কোন একটি দেশের মধ্যে সীমিত ছিল না। তিনি ছিলেন না হিন্দুস্তানী, না পাকিস্তানী, ছিলেন না আরবী অথবা আজমী। বরঞ্চ তিনি ছিলেন মুসলিম বিশ্বের, বিশ্বমানবতার।

তাই বলছিলাম, মুসলিম মিল্লাতের শ্রদ্ধেয় মনীষী সাইয়েদ মওদূদীর ব্যক্তিত্বের উপর কলম ধরতে বার বার যেন নিজের অযোগ্যতাই অনুভব করেছি। তথাপি চারিদিকের ক্রমবর্ধমান দাবি ও অনুরোধের চাপে বর্ধিত সংস্করণ প্রকাশের চেষ্টা করছি। তবে এর জন্যে যে সময় ও শান্ত পরিবেশের প্রয়োজন ছিল তা না থাকায় এ বিষয়ে কলম ধরার হক যে আদায় করতে পারিনি তা বিনা দ্বিধায় বলতে পারি। মাওলানার চিন্তাধারার বিভিন্ন দিকের উপর বিরাট গ্রন্থ রচিত হতে পারে এবং আলবৎ তার প্রয়োজনও রয়েছে। আমার বিশ্বাস যুগের দাবির প্রেক্ষিতে সুধীমহল এ কাজেও অবশ্যি হাত দেবেন এবং দিয়েছেনও অনেকেই।

বাংলাভাষী পাঠক সমাজের কাছে আবেদন, নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গিসহ মাওলানার সত্যিকার পরিচয় জানবার চেষ্টা করুন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস তাঁর সাহিত্য এত বেগবান, সাবলীল ও হৃদয়গ্রাহী যে, মনোযোগী পাঠকের হৃদয় মন আলোড়িত না হয়ে পারে না। পাঠকের কাছে আরও অনুরোধ, মাওলানার অন্যান্য সাহিত্য একবার খোলা মন নিয়ে পাঠ করে দেখুন। তাঁর সাহিত্য পাঠের মাধ্যমেই তাঁর সত্যিকার পরিচয় হৃদয়-মনের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে।

আমার একান্ত বাসনা ছিল, ছাপার দিক দিয়ে বইখানিকে যথাসম্ভব অতি উন্নতমানের করা। কিন্তু কাজের ব্যস্ততা এবং ঘন ঘন ঢাকা ও দেশের বাইরে গমনাগমনের দরুন ছাপার কাজে পুরোপুরি মনোযোগ দেয়া সম্ভব হয়নি। তাই ছাপার ত্রুটি-বিচ্যুতি রয়ে যাওয়া স্বাভাবিক। সহৃদয় পাঠক আশা করি তা ক্ষমার চোখে দেখবেন।

নানাবিধ অসুবিধার মধ্যেও যে বইখানি প্রকাশ লাভ করতে পারল, তার জন্যে আল্লাহ তায়ালার অসংখ্য শুকরিয়া জানাই।

শেষ কথা এই যে, বইখানি যদি পাঠক মহলে কিঞ্চিৎ মর্যাদা লাভ করতে সক্ষম হয়, তাহলে আমার শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করব। অবশ্য পারিশ্রমিকের আসল প্রাপ্য আখেরাতেই কামনা করি। হিজরী পঞ্চদশ শতাব্দীর সূচনালগ্নে বইখানি প্রকাশ লাভ করছে। তাই বিশ্বস্রষ্টার দরবারে আরয, বিশ্বব্যাপী ইসলামী পুনর্জাগরণের জলতরঙ্গে এ ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি কিছু অবদান রাখতে সক্ষম হোক- আমীন।

ঢাকা

বিনীত গ্রন্থকার

মুহররম - হিঃ ১৪০০

ডিসেম্বর - ১৯৭৯

উৎসর্গ

যাঁর এ জীবন-আলেখ্য তাঁর জন্য এবং আমার মরহুম আম্মা, আব্বা, চাচার জন্যে উৎসর্গিত হলো এ গ্রন্থখানি। উপরন্তু তাঁদের জন্য, যাঁরা আল্লাহর পথে তাঁদের খুনে রক্ত-রাঙা করেছেন আল্লাহর এ যমীনকে।

গ্রন্থকার

ফাঁসীর কুঠরিতে জীবনের জয়গান

উনিশ শ' তিপ্পান্ন সালের ৮ই মে পাকিস্তানের সামরিক আদালত মাওলানা মওদূদীকে মৃত্যুদন্ডাদেশ প্রদান করে। এ আদেশ শ্রবণের পর নির্ভীক প্রশান্ত মর্দে মুজাহিদ এ ঐতিহাসিক উক্তি করেন :

"আপনারা মনে রাখবেন যে, আমি কোন অপরাধ করিনি। আমি তাদের কাছে কিছুতেই প্রাণভিক্ষা চাইব না। এমনকি আমার পক্ষ থেকে অন্য কেউ যেন প্রাণ ভিক্ষা না চায়– না আমার মা, না আমার ভাই, না আমার স্ত্রী-পুত্র-পরিজন। জামায়াতের লোকদের কাছেও আমার এই অনুরোধ। কারণ জীবন ও মরণের সিদ্ধান্ত হয় আসমানে–যমীনে নয়।"

ফাঁসীর মঞ্চে আরোহন যাঁর সুনিশ্চিত সেই বিপ্লবী যাত্রীর কাছে তাঁর আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও শুভানুধ্যায়ীগণ আবেদন জানালেন – " প্রাণ ভিক্ষা না চাওয়ার সিদ্ধান্ত তো আপনার নিজস্ব। এ সিদ্ধান্ত যে জামায়াতকে মেনে নিতে হবে তার কোন মানে নেই। জামায়াত বাইরের পরিস্থিতির আলোকে বৃহত্তর স্বার্থে যা সিদ্ধান্ত করবে তা আপনাকে মানতেই হবে।"

"আমি জামায়াতের দৃষ্টিতেও আমার সিদ্ধান্ত সঠিক মনে করি। আমার এ সুস্পষ্ট ও সুনিশ্চিত সিদ্ধান্ত জামায়াত নেতৃবৃন্দকেও আপনাদের জানিয়ে দেয়া কর্তব্য।"

"আমি যদি বসে পড়ি, তাহলে দাঁড়িয়ে থাকবে কে?"

১৯৬৩ সালের অক্টোবর মাসে নিখিল পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর একটি সম্মেলন লাহোরে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলন যাতে না হতে পারে সেজন্য সরকার অনুমতি দিতে অস্বীকার করে। পরে সারা পাকিস্তানে মাইক ব্যবহার নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। এরপরও বিনা মাইকে দশ বারো হাজার লোকের সম্মেলন শুরু হয়। পনেরো বিশ হাত পরপর একটি টেবিলে দাড়িয়ে মঞ্চ থেকে বক্তৃতার সাথে সাথে একই সময়ে ছাপানো বক্তৃতা উচ্চস্বরে পড়ে শোনানো হয়।

সভার কাজ শুরু হওয়ার মিনিট দশ পর সভার প্যান্ডেলে হঠাৎ কিছু গুন্ডার অনুপ্রবেশ দেখা গেল। মদের নেশায় তারা ছিল উন্মত্ত প্রায়। তারা সভার শৃঙ্খলা ভঙ্গ করা শুরু করল। হঠাৎ শামিয়ানায় আগুন জ্বলে উঠলো, শামিয়ানার বাইরে হৈ হল্লা ও পিস্তলের গুলির শব্দ শুনা গেল। মাওলানাকে লক্ষ্য করেও কয়েকবার গুলি বর্ষিত হল। কিন্তু প্রত্যেকটি গুলিই লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। এসময়ে চারিদিক থেকে একথা বলতে শুনা যায়– "মাওলানা বসে পড়ুন; মাওলানা বসে পড়ুন।" বক্তৃতারত মাওলানা দাঁড়িয়ে থেকেই শান্ত কণ্ঠে বল্লেন, "আমি যদি বসে পড়ি, তাহলে দাঁড়িয়ে থাকবে কে?"..... এভাবে তিনি তাঁর উদ্বোধনী বক্তৃতা শেষ করলেন।

জামায়াত কর্মীগণ অসীম ধৈর্য ও হিকমতের মাধ্যমে গোটা পরিস্থিতি সম্পূর্ণ আয়ত্বে রাখলেন ও পূর্ণ শৃঙ্খলা বজায় রাখলেন।

এ ভাষণ চলাকালেই ভাড়াটে দুর্বৃত্তদের গুলিতে জামায়াত কর্মী আল্লাহ বখ্‌শ্‌ শহীদ হন।

সূচীপত্র

দ্বিতীয় ভাগ

মাওলানা মওদূদী (র.)

মাওলানা মওদূদী(র.)

বংশ পরিচয়

বিগত তের-চৌদ্দ শত বছর যাবত দুনিয়ায় ইসলামী তাবলীগ, দ্বীনী-শিক্ষা-দীক্ষা এবং পীরী-মুরশিদির কাজ জারী রেখেছে এমন এক অতি সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করেন মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী। হিজরী তৃতীয় শতাব্দীতে হযরত আলী-ফাতেমীয় বংশের একটি শাখা আফগানিস্তানের হিরাট শহরের সন্নিকটে যে স্থানটিতে বসতি স্থাপন করেন, সে স্থানটি পরবর্তীকালে 'চিশত' নামে জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করে। এই বংশেরই খ্যাতনামা ওলীয়ে বুযুর্গ হযরত শাহ সুফী আবদাল চিশ্‌তী (র.) হযরত ইমাম হাসানের (রাঃ) বংশধর ছিলেন। হযরত আবদাল চিশ্‌তী থেকেই প্রচলিত হয় প্রখ্যাত তরীকায়ে চিশ্‌তীয়া। ইনি ইন্তেকাল করেন ৩৫৫ হিজরীতে। তাঁর দৌহিত্র এবং স্থলাভিষিক্ত (গদ্দীনশীন্) হযরত নাসিরুদ্দিন আবু ইউসুফ চিশ্‌তী (র.) হযরত আলী-ফাতেমীয় বংশের দ্বিতীয় শাখা সম্ভূত ছিলেন। তাঁর উর্ধ্বমুখী বংশ পরম্পরা (নসবনামা) হযরত ইমাম আলী নকীর (র.) মাধ্যমে হযরত ইমাম হুসাইন শহীদ (রাঃ) পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছে। হযরত নাসিরুদ্দীন আবু ইউসুফ চিশ্‌তীর (র.) জ্যেষ্ঠ পুত্র হযরত খাজা কুতুবুদ্দীন মওদূদ চিশ্‌তী (র.) ভারতীয় চিশতীয়া তরীকার পীরগণের আদি পীর ছিলেন। মওদূদী খান্দানের উদ্ভব তাঁরই নামানুসারে হয়েছে। খাজা কুতুবুদ্দীন ৫৭২ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

পাক-ভারতের বিখ্যাত সুফী ও দরবেশ হযরত খাজা মুঈনুদ্দীন চিশ্‌তীর (র.) সাথে মওদূদী খান্দানের সম্পর্ক নিম্নরূপ ঃ

নিম্নমুখী পীর পরম্পরা

(১) হযরত কুতুবুদ্দীন চিশ্‌তী (র.)

(২) হযরত জামী শরীফ যিন্দানী (র.)

(৩) হযরত উসমান হারুনী (র.)

(৪) হযরত খাজা মুঈনুদ্দীন চিশ্‌তী সিঞ্জরী (র.)

অর্থাৎ হযরত কুতুবুদ্দীন মওদূদ চিশতী (র.) ছিলেন খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতীর (র.) পর-দাদা পীর।

মওদূদী খান্দানের পূর্ব-পুরুষদের মধ্যে যিনি সর্বপ্রথম ভারতে পদার্পণ করেন, তাঁর নাম ছিল হযরত আবুল আ'লা চিশতী (র.)। ইনি হিজরী নবম শতাব্দীর শেষ ভাগে দিল্লীর বাদশাহ সেকেন্দার লোদীর আমলে ভারত আসেন এবং কর্ণাটের উপকণ্ঠে বরাস নামক একটি ক্ষুদ্র শহরে বসবাস করতে থাকেন। ইনি ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ ওলীয়ে বুযুর্গ। ৯৩৫ হিজরীতে ইনি জান্নাতবাসী হন।

বাদশাহ শাহ আলমের সময়ে উক্ত পরিবার দিল্লীতে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন। তখন থেকে উক্ত বংশের পঞ্চম পুরুষ পর্যন্ত সকলেই দিল্লীতে বাস করতে থাকেন। বর্তমান কালের মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র.) উক্ত বংশের ষষ্ঠ পুরুষ।

মাতৃকুলের মাধ্যমে মাওলানা মওদূদীর (র.) মধ্যে প্রবাহিত রয়েছে তুর্কী বীরের শোণিতধারা। তাঁর প্রমাতামহ মিরযা কোরবান আলী বেগ খান সালেক একজন তুর্কী কবি ও সাহিত্যিক ছিলেন। কিন্তু সৈনিক বৃত্তিই তাঁর পূর্ব-পুরুষগণের পেশা ছিল। মিরযা তোলক বে নামক তাদের জনৈক পূর্ব পুরুষ বাদশাহ আওরংযেব আলমগীরের আমলে ভারতে আগমন করে সেনা বিভাগে যোগদান করেন। বাদশাহ শাহ আলমের রাজত্বকাল পর্যন্ত উক্ত পরিবারের লোক কোন না কোন শাহী মসনদ অধিকার করেছিলেন। মোগল সাম্রাজ্য ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাবার পর তারাও বিভিন্ন দিকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। মরহুম কোরবান আলী বেগ খান সালেকের পিতা মরহুম নওয়াব আলম বেগ খান এবং চাচা মরহুম নওয়াব নিয়াজ বাহাদুর খান হায়দারাবাদের তৎকালীন নিযাম নওয়াব মীর নিযাম আলী খানের আমলের শেষভাগে হায়দারাবাদে আগমন করেন। নওয়াব নিয়াজ বাহাদুর বিয়ে করেন নওয়াব মুস্তাকিল জঙ ইয্যতুদ্দৌলা আশুর বেগ খানের কন্যাকে। আশুর বেগ খান নিয়াজ বাহাদুর খানের চাচা ছিলেন। মোগল সম্রাটগণ তাঁদেরকে যে সব উপাধিতে ভূষিত করেন, হায়দারাবাদের নিযামগণও তাদেরকে অনুরূপ উপাধিতে ভূষিত করেন। মুস্তাকিল জঙের পর নওয়াব নিয়াজ বাহাদুর খান জমাদার জায়গীরদার হিসাবে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন।

নওয়াব আলম বেগ খান গোলকুণ্ডার কেল্লাদার আব্দুর রহীম খানের পরিবারে বিয়ে করেন। তাঁরই ঔরসে কোরবান আলী বেগ খান সালেক জন্মগ্রহণ

করেন। ১৮২২ খ্রিষ্টাব্দে নওয়াব নিয়াজ বাহাদুর খান দাক্ষিণাত্যের চঞ্চল গড়ের হাঙ্গামায় শহীদ হন। এই ঘটনার পর নওয়াব আলম বেগ শিশুপুত্রসহ দিল্লী চলে যান। এর প্রায় চল্লিশ বছর পর মিরযা কোরবান আলী বেগ হায়দারাবাদ গমন করেন এবং সালারে জঙ আযম তাঁকে প্রধান শিক্ষা উপদেষ্টা নিযুক্ত করেন। তথায় তিনি নওয়াব ইমাদ-উল-মুলক্ বিলগেরামীর সহায়তায় "মাখযানুল ফাওয়ায়েদ" নামে একখানি অমূল্য গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। গ্রন্থখানি হায়দারাবাদের সর্বপ্রথম না হলেও অন্যতম প্রসিদ্ধ প্রাচীন গ্রন্থ সন্দেহ নেই। ১৮৫৫ খ্রিষ্টাব্দে মিরযা কোরবান আলী বেগ খান সালেক পরলোক গমন করেন।

মাওলানা মওদূদীর(র.) বংশ পরম্পরা

নিম্নমুখী

ইমামুল মুত্তাকীন সাইয়েদুনা হযরত আলী ইবনে আবি তালিব (রা.)
হযরত ইমাম হুসাইন শহীদ (রা.)
হযরত ইমাম জয়নুল আবেদীন (রা.)
হযরত ইমাম মুহাম্মদ আল্‌বাক্ (রা.)
হযরত ইমাম মুহাম্মদ জা'ফর সাদেক (রা.)
হযরত ইমাম মূসা আল কাযেমী (রা.)
হযরত ইমাম মুহাম্মদ তকী (রা.)
হযরত ইমাম মুহাম্মদ নকী (রা.)
সাইয়েদুস্ সা'দাত আব্দুল্লাহ-আলী-আকবর (র.)
সাইয়েদুস্ সা'দাত হুসাইন (র.)
সাইয়েদুস্ সা'দাত মুহাম্মদ (র.)
সাইয়েদুস সা'দাত ইবরাহীমী (র.)
মুহাম্মদ শাময়ান চিশ্‌তি (র.)
খাজা নাসিরুদ্দীন আবু ইউসুফ চিশ্‌তী (র.)
খাজায়ে খাজগান কুতুবুদ্দীন মওদূদ চিশ্‌তী (র.)
খাজা আবু আহমদ মওদূদী চিশ্‌তী (র.)
খাজা রুকনুদ্দীন মওদূদী চিশ্‌তী (র.)

খাজা নিযামুদ্দীন মওদূদী চিশ্‌তী (র.)
খাজা কুতুবুদ্দীন মুহাম্মদ মওদূদী চিশ্‌তী (র.)
খাজা আলী আবু আহমদ সানী মওদূদী চিশ্‌তী (র.)
খাজা আহমদ আবু ইউসুফ সানী মওদূদী চিশ্‌তী (র.)
খাজা মুহাম্মদ যাহেদ মওদূদী চিশ্‌তী (র.)
খাজা কুতুবুদ্দীন মওদূদ সানী চিশ্‌তী (র.)
খাজা নিযামুদ্দীন আলী মওদূদী চিশ্‌তী (র.)
খাজা মুহাম্মদ মুহীউদ্দীন শাহ খাজ্‌গী মওদূদী চিশ্‌তী (র.)
শাহ আবুল আ'লা মওদূদী চিশ্‌তী (র.)
শাহ আবদুল আলী মওদূদী (র.)
খাজা আবদুল গনি মওদূদী (র.)
খাজা আবদুস সামাদ মওদূদী (র.)
খাজা আবদুস শাকুর (ওরফে খোশহাল মুহাম্মদ) মওদূদী (র.)
খাজা আবদুল্লাহ (ওরফে গুল মুহাম্মদ) মওদূদী (র.)
খাজা আব্দুল বারী (ওরফে মীর ভিখারী) মওদূদী (র.)
খাজা আবদুল ওয়ালী (ওরফে মীর ফযল ইলাহী) মওদূদী (র.)
শাহ আবদুল আযীয (ওরফে মীর করম ইলাহী) মওদূদী (র.)
শাহ ওয়রেস আলী মওদূদী (র.)
সাইয়েদ হাসান মওদূদী (র.)
সাইয়েদ আহমদ হাসান মওদূদী (র.)
সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র.)

সাইয়েদ আহমদ হাসান মওদূদী

মাওলানা মওদূদীর (র.) পিতা সাইয়েদ আহমদ হাসান মওদূদী (র.) বিগত ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহের দুই বছর পূর্বে ১৮৫৫ খ্রিষ্টাব্দে দিল্লী নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন আলীগড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রাথমিক যুগের ছাত্র। একথা সকলের জানা আছে যে, আলীগড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৎকালীন ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের সমর্থন-সহানুভূতি লাভ করতে পারেনি। কারণ তাঁরা ইংরেজী শিক্ষা তথা পাশ্চাত্য তাহ্‌যীব তামাদ্দুনের প্রতি চরম অবজ্ঞা ও বিরক্তি পোষণ করতেন। পক্ষান্তরে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা স্যার সাইয়েদ আহমদ ছিলেন এর প্রতি পরম আগ্রহশীল। তিনি তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের ভেতর থেকে প্রজ্ঞাসম্পন্ন ও মেধাবী বালক সংগ্রহ করে আলীগড়ে ভর্তি করতে থাকেন। সাইয়েদ আহমদ হাসান মওদূদীকে তিনি এক প্রকার বলপূর্বক আলীগড়ে ভর্তি করে দেন।

মওদূদী পরিবার যে ইংরেজী ও পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি অত্যন্ত নারাজ ও বীতশ্রদ্ধ ছিলেন, তা সহজেই অনুমান করা যায়। কারণ তাঁরা শুধু ইসলামী শিক্ষা-দীক্ষার দিক দিয়েই শীর্ষস্থানীয় ছিলেন না, বরং পীরানে তরিকতের বা আধ্যাত্মিক দীক্ষাগুরুর শীর্ষস্থানও অধিকার করেছিলেন তাঁরা। কিন্তু সাইয়েদ আহমদ আত্মীয়তার দাবিতে পীরযাদা আহমদ হাসানকে আলীগড়ে নিয়ে গেলেন বলে পীর সাইয়েদ হাসান মওদূদী (র.) অতীব বিষণ্ন মনে নীরব রইলেন।

একবার পীর সাইয়েদ হাসান মওদূদীর (র.) জনৈক বন্ধু কোন কার্যোপলক্ষে আলীগড় যান। তিনি সেখানে দেখতে পান যে বালক আহমদ হাসান ইংরেজী পোশাক পরে অন্যান্য ছাত্রদের সাথে ক্রিকেট খেলছেন। একজন প্রসিদ্ধ পীরানে-পীরে তরীকতের পুত্রের এহেন আচরণে তিনি মর্মাহত হলেন এবং দিল্লী ফিরে গিয়ে বললেন,"আহমদ হাসানকে অবিলম্বে আলীগড় থেকে বাড়ী নিয়ে আসুন, নতুবা তার সংস্রব ত্যাগ করুন। সে গোল্লায় গেছে।"

আহমদ হাসানের আলীগড়ের ছাত্রজীবন শেষ হলো। কারণ পিতা সাইয়েদ হাসান অবিলম্বে পুত্রকে আলীগড় কলেজ থেকে বদলী সার্টিফিকেট

(T.C.) নিয়ে বাড়ী ফিরিয়ে আনেন। তৎকালীন প্রিন্সিপাল নিম্নরূপ প্রশংসাপত্র দেন ঃ-

This is to certify that Ahmad Hasan was Reading in the third school class of this college during a part of last year and that he was then holding a scholarship of Rs 5/- a month.

His conduct was satisfactory and the moulvi with whom he read his second language states that he was fairly up in both Arabic & Persian.

Sd/-S.D.T.Siddons

17th Feb, 1877 Principal

Muhammedan Anglo-Oriental College Aligarh

পরবর্তীকালে অবশ্য আহমদ হাসান মওদূদী এলাহাবাদ থেকে ওকালতি পাস করেন। ওকালতি পাস করার পর দেওগড় দেশীয় রাজ্যের রাজপরিবারে গৃহ শিক্ষকের কাজের জন্যে তাঁকে আহবান করা হয়। তিনি দেওগড় পৌঁছে জানতে পারলেন যে, তাঁর জনৈক শিক্ষককেও উক্ত চাকরির জন্যে আহবান করা হয়েছে। তিনি রাজা সাহেবকে সবিনয়ে জানিয়ে দিলেন যে, আপন ওস্তাদের সাথে চাকরির জন্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে তিনি অনিচ্ছুক। অতএব তাঁর পরিবর্তে তাঁর শিক্ষককে নিযুক্ত করলেই তিনি খুশী হবেন। এদিকে রাজা সাহেব আহমদ হাসান মওদূদীর শিক্ষক অন্য প্রার্থীকে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। তিনি বললেন, "সেতো আমারই ছাত্র এবং আমার কাছে বালক মাত্র। শিক্ষকতার যোগ্যতা তার কতটুকুই বা আছে?"

প্রার্থীদ্বয়ের চরিত্রের এই বিপরীতমুখী বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করে রাজা সাহেব মন্তব্য করলেন. "শিক্ষক অপেক্ষা ছাত্রের মধ্যেই আমি অধিকতর যোগ্যতা দেখতে পাচ্ছি।" অবশেষে আহমদ হাসান মওদূদীই গৃহ শিক্ষক নিযুক্ত হলেন।

উকিল আহমদ হাসান মওদূদী

দেওগড়ে কিছুকাল গৃহ-শিক্ষকের কাজ করার পর সাইয়েদ আহমদ হাসান মওদূদী মীরাট, গাযিয়াবাদ, বুলন্দ শহর প্রভৃতি স্থানে ওকালতি করেন। ১৮৯৬ খ্রিষ্টাব্দে একটি মামলার ওকালতির জন্যে তিনি হায়দারাবাদের আওরংগাবাদ শহরে গমন করেন। জনাব মহীউদ্দিন খান ছিলেন সেখানকার মীর বা প্রধান বিচারপতি। তিনি ছিলেন দূর সম্পর্কে আহমদ হাসান মওদূদীর চাচা। মামলা পরিচালনায় আহমদ হাসান যথেষ্ট পাণ্ডিত্যের পরিচয় দেন। প্রাদেশিক মীরের পরামর্শে তিনি আওরঙ্গাবাদেই স্থায়ীভাবে আইন ব্যবসা শুরু করেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই আইনজ্ঞ হিসেবে তাঁর সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে।

এ যাবত কিন্তু পাশ্চাত্য ভাবধারা ও চালচলনের বিশেষ প্রভাব ছিল উকিল মওদূদীর মধ্যে। অন্তরে যে বংশানুক্রমিক ধর্মীয় অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিদ্যমান ছিল, তা ছিল তমসাচ্ছাদিত। কিন্তু মহীউদ্দীন খান সাহেবের সাহচর্য ও সংস্পর্শ লাভ করার ফলে তাঁর মধ্যকার পাশ্চাত্য ভাবধারাগুলো ক্রমশ পূর্ণ ইসলামী ভাবধারায় রূপান্তরিত হতে লাগলো। মহীউদ্দীন খান শুধুমাত্র একজন প্রধান বিচারপতিই ছিলেন না, বরঞ্চ ছিলেন একজন উচ্চাঙ্গের ওলীয়ে বুযুর্গ। আহমদ হাসান ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর হাতে বাইয়াত করে যিকির-আযকার, মুরাকাবা-মুশাহাদা ও ইবাদত বন্দেগীতে মশগুল হলেন। এভাবে কেটে গেল পূর্ণ চারটি বছর।

খ্রিষ্টীয় ১৯০৪ সালে, যে সময় সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী (র.) এক বছরের শিশু, উকিল মওদূদী ভাবলেন যে, তাঁর আধ্যাত্মিক জ্ঞানচর্চায় ওকালতি পেশা এক বিরাট অন্তরায় হয়ে পড়েছে। অতএব তিনি ওকালতি পরিত্যাগ করে নির্লিপ্তভাবে খোদা-প্রেমে ধ্যানমগ্ন হওয়ার সুযোগ গ্রহণ করলেন। আইন ব্যবসালব্ধ সমুদয় অর্থ, পোশাক-পরিচ্ছদ, গৃহের আসবাবপত্র ও সাজ-সরঞ্জাম অকাতরে বিলিয়ে দিয়ে নিঃসম্বল অবস্থায় পরিবার-পরিজন নিয়ে তিনি দিল্লী গমন করেন এবং হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া মাহবুবে এলাহীর (র.) মাযার শরীফের সন্নিকট 'আরব সরাই' নামক এক অতি প্রাচীন বস্তিতে আশ্রয় গ্রহণ

করেন। স্ত্রী-পুত্র পরিজনের সংস্রব এক প্রকার ত্যাগ করে দিবারাত্র হুজরানশীন হয়ে আল্লাহর ধ্যানে মশগুল হলেন তিনি। এভাবে তিন-তিনটি বছর কেটে গেল।

এদিকে আওরঙ্গাবাদের প্রধান বিচারপতি জনাব মহীউদ্দীন খান উকিল মওদূদীর এহেন দুরবস্থার কথা জানতে পেরে তাঁকে আওরঙ্গাবাদে নিজের কাছে ডেকে পাঠান। আহমদ হাসান মওদূদী পিতৃব্য পীর-মুর্শিদের আহবানে আওরঙ্গাবাদে পুনরাগমন করেন। মহীউদ্দীন খান তাঁকে এই বলে উপদেশ দেন যে, খোদা প্রাপ্তির পথে দুনিয়ার সংস্রব ত্যাগ করা অপরিহার্য নয়। বরঞ্চ বৈরাগ্য ইসলাম বিগর্হিত। জীবন যাপন ও সংসার পালনের জন্যে অর্থ উপার্জন একান্ত আবশ্যক। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন প্রতিটি কপর্দক হালাল উপায়ে অর্জিত হয়। পীর-মুরশিদের নির্দেশে সাইয়েদ আহমদ হাসান মওদূদী পুনরায় সপরিবারে আওরংগাবাদ গিয়ে আইন ব্যবসা শুরু করেন। কিন্তু এখন থেকে তাঁর ওকালতি পেশার এক নতুন অধ্যায় সূচিত হলো।

এখন থেকে কোন মামলা মোকদ্দমা গ্রহণ করতে হ'লে তার পূর্বে তার সত্যতা সম্পর্কে বহু জিজ্ঞাসাবাদ করে নিতে হবে। এর ফলে তাঁকে দারিদ্র্য বরণ করতে হলো। কিন্তু একদিকে যেমন তাঁর ইসলামী ভাবধারা ও গভীর খোদাপ্রেম বাড়তে লাগল, অপরদিকে তেমনি বাড়তে লাগলো পার্থিব ভোগ লালসার প্রতি তাঁর বিরাগ বিতৃষ্ণা। তাঁর চিন্তাধারা, জীবন-যাপন প্রণালী এবং প্রতিটি কার্যকলাপ এমন এক রূপান্তর গ্রহণ করলো যে, পাশ্চাত্য ভাবধারার পুলক প্রবাহ তাঁর অন্তর প্রদেশে একদা প্রবাহিত হয়েছিল বলে বিশ্বাস করাই সুকঠিন ছিল।

যা হোক, তিনি ১৯১৫ সাল পর্যন্ত আওরঙ্গাবাদে ওকালতি করেন। তারপর তিনি হায়দারাবাদ যান। কিন্তু স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ার কারণে তাঁকে ভূপাল যেতে হয়। দুঃখের বিষয় সেখানে অর্ধাঙ্গ রোগে আক্রান্ত হয়ে চার বছর পর ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দে তিনি জান্নাতবাসী হন।

প্রকাশ থাকে যে, আহমদ হাসান মওদূদী মাদরাসা ইসলামিয়া আওরংগাবাদ-এর শিক্ষক মুহাদ্দিস মাওলানা হাবীবুর রহমান সাহেবের নিকট সহীহ মুসলিম কামেল এবং নাসায়ী কামেল এর পূর্ণ শিক্ষা লাভ করে সনদ লাভ করেন এবং হাদীস শিক্ষাদানের অনুমতি লাভ করেন।

মাওলানা মওদূদীর জন্ম ও শিক্ষালাভ

হিজরী সন ১৩২১ সালের ৩রা রজব (ইং ১৯০৩ সালে) আওরংগাবাদ শহরের প্রসিদ্ধ আইন ব্যবসায়ী সাইয়েদ আহমদ হাসান মওদূদীর গৃহে এক অপরূপ শিশু জন্মগ্রহণ করে। পিতা আকুল আগ্রহে শিশু পুত্রের নাম সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রেখে আল্লাহ তায়ালার অশেষ শুকরিয়া আদায় করলেন। শিশুর জন্মগ্রহণের তিন বছর পূর্বে এক ওলীয়ে বুযুর্গ তাঁর পিতাকে বলেছিলেন, "দেখ, আল্লাহর ফযলে তোমার একটি পুত্র সন্তান হবে। তার নাম রাখবে আবুল আ'লা মওদূদী। কারণ এই নামে একজন প্রসিদ্ধ কামেল পীর তোমাদের পূর্ব পুরুষ হিসাবে সর্বপ্রথম ভারতে আগমন করেছিলেন।"

এই উপদেশবাণী পিতৃ-হৃদয়ে জাগরূক ছিল। সত্য সত্যই খোদার মহিমায় তিন বছর পর তাঁর একটি পুত্র সন্তান লাভ হলো এবং অপার আনন্দ ও খোদার প্রতি কৃতজ্ঞতায় তাঁর হৃদয় মন বিগলিত হলো।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর জন্মের পূর্ব থেকেই পিতার মধ্যে এক বিপ্লবী পরিবর্তন এসেছিল এবং পুত্রের জন্মের মাত্র এক বছর পরে খোদা প্রেমে পাগল হয়ে তিনি সংসার ত্যাগী হয়েছিলেন। পুনরায় যদিও তিনি সংসারী সেজেছিলেন, কিন্তু পূর্ব পরিত্যাক্ত সংসারের প্রতি পুনঃপ্রবৃত্ত না হয়ে এক পরিপূর্ণ ইসলামী ও নৈতিক পরিবেশপূর্ণ সংসার রচনা করেছিলেন। তার সুফল হলো এই যে, শিশু মওদূদীর যখন জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হলো-- যখন তিনি দুনিয়ার আলো-বাতাস উপভোগ করতে শিখলেন, তখন তিনি নিজের চারদিকে এক স্বর্গীয় মধুর ইসলামী নৈতিকতাপূর্ণ পরিবেশের মৃদু গুঞ্জরণই শুনতে পেলেন। পিতা ও মাতা উভয়ের জীবন যাপন প্রণালী পূর্ণ ইসলামী রঙে রঞ্জিত ছিল। অতএব, শিশুকাল থেকেই মওদূদীর কচি হৃদয়ে ইসলামী ভাবধারার পূর্ণ চিত্র অঙ্কিত হলো।

মওদূদীর বাল্য শিক্ষা

পিতার একান্ত বাসনা পুত্রকে একজন আলেমে দ্বীন বানাবেন। সে ভাবেই তাঁর শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা হলো। প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই আরবী, ফারসী ও উর্দূর মাধ্যমে কোরআন, হাদীস, ফেকাহ প্রভৃতি বিষয়ে তাঁকে শিক্ষা দেয়া হলো। ইংরেজী শিক্ষা ও পাশ্চাত্য চিন্তাধারার স্পর্শ থেকে তাকে সতর্কতার সাথে দূরে রাখা হলো। তাঁকে শৈশবে কোন বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দেয়া হয়নি। সুদক্ষ ও চরিত্রবান গৃহ-শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে তাঁর বাল্য শিক্ষা চলতে থাকে। অবসর সময়ে পিতা তাকে সঙ্গে করে সুধী-সমাজে গমন করতেন। জ্ঞানগর্ভ দার্শনিক আলোচনা বিন্দু-বিসর্গও বালক মওদূদীর মস্তিষ্কে প্রবেশ করতো না। কিন্তু তবু তাঁর মনের উপর এর একটা নৈতিক প্রভাব ছাপ ফেলতো। রাত্রিকালে পিতা আম্বিয়ায়ে কেরাম (আঃ), সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) ও বুযুর্গানে-দ্বীনের জীবনী এবং ইসলামী ইতিহাস গল্পচ্ছলে পুত্রকে শুনাতেন। চিত্তাকর্ষক বোধগম্য ভাষালংকারের মধ্য দিয়ে ইসলামী আকীদাহ্-বিশ্বাস, মতবাদ ও ভাবধারা শিশু-পুত্রের হৃদয়ে অঙ্কিত করে দিতেন।

অন্য লোকের সঙ্গে সাধারণ মেলামেশা ও গল্প-গুজবে নৈতিকতা ও ভদ্রতা রক্ষা করে চলবার ব্যাপারে পিতার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। মাতৃভাষা উর্দূর প্রতিও তার ছিল বিশেষ লক্ষ্য। সুদীর্ঘ বিশ বছর দাক্ষিণাত্যে কাটিয়ে দেওয়ার পরও তিনি ভাষার শ্লীলতা ও লালিত্য অক্ষুণ্ন রেখেছেন। তাঁর কথাবার্তায় কোনদিনই প্রবেশ করতে পারেনি অন্য কোন প্রতিশব্দ অথবা বাক-পদ্ধতি। হর হামেশা বিশুদ্ধ প্রাঞ্জল উর্দূ ভাষা তিনি বলতেন। পুত্রের ভাষারও বিশুদ্ধতা ঠিক রাখবার জন্য তাকে বাইরের কোন সংস্রবে যেতে দেননি কোন সময়ের জন্যে। কোন কারণে পুত্রের কথায় অন্য ভাষার কোন প্রতিশব্দ শুনতে পেলে তিনি তা তৎক্ষণাৎ সংশোধন করে দিতেন।

শৈশব কাল থেকে পিতা তাঁর উন্নত চরিত্র গঠনের জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করেছিলেন। যাতে দুষ্ট ও অসৎ সংসর্গে মিশে তাঁর চরিত্র কলুষিত না হয়, তার প্রতি তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন।

একবার বালক মওদূদী বাড়ীর চাকরানীর ছোট ছেলেকে মেরেছিলেন। পিতা একথা শোনামাত্রই চাকরানীর পুত্রকে ডেকে এনে আপন পুত্র মওদূদীকে ঠিক সেইরূপ মার দিতে আদেশ করলেন। এ শিক্ষা বালক মওদূদীর কচি হৃদয়ে এমন ভাবে জাগরূক হয়ে রইলো যে, পরবর্তী জীবনে তিনি কোন দিন তার অধীন ব্যক্তির উপরে অপরাধ করা সত্ত্বেও হস্ত উত্তোলন করেননি অথবা কোন কটুকথা বলেননি।

ন'বছর বয়স পর্যন্ত বাড়ীতেই বালক মওদূদীর বিদ্যাচর্চা চলতে থাকে। এ সময়ের মধ্যে তিনি আরবী ব্যাকরণ, সাহিত্য এবং ফেকাহ শাস্ত্রের বিভিন্ন প্রাথমিক পুস্তকাদি শেষ করেন। তারপর তাঁর ওস্তাদ মরহুম মৌলভী নাদীমুল্লাহ হুসাইনীর পরামর্শে তাঁকে আওরংগাবাদের ফওকানিয়া (উচ্চ) মাদরাসায় রুশদিয়া মানের শেষ বর্ষ শ্রেণীতে (৮ম শ্রেণী) ভর্তি করে দেয়া হয়। ভর্তি হওয়ার ছ'মাস পরেই তিনি রুশদিয়া পরীক্ষা দিয়ে অকৃতকার্য হন। অবশ্য একমাত্র অংক ব্যতীত অন্যান্য সকল বিষয়েই তিনি ভালভাবে পাস করেন। অংকে পাস না করার কারণ এই যে, মাত্র ছ'মাস পূর্বে সর্বপ্রথম তাঁর অংকে হাতে খড়ি দেয়া হয়। মাদরাসার প্রধান শিক্ষক মোল্লা দাউদ সাহেব তাঁকে উপরের মৌলভী শ্রেণীতে ভর্তি করে নেন।

এবার তিনি বিভিন্ন বিষয়ে নবনব জ্ঞানলাভের সুযোগ পান। শিক্ষার মাধ্যম উর্দূ হলেও রসায়ন শাস্ত্র, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান, অংক, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর জ্ঞান লাভের গভীর অনুরাগ জন্মে। তাছাড়া বিভিন্ন শিক্ষকের সাহচর্য ও সংস্পর্শ লাভ করার ফলে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাধারা প্রসারিত হয়। এযাবত বহির্জগত ও বাইরের সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার কারণে তাঁর মধ্যে যে বেরসিকতা ও উদাসীনতার সঞ্চার হয়েছিল, সহাধ্যায়ী বন্ধুদের সাহচর্য তা দূর করে দিল।

উল্লেখ্য যে, সে সময়ে আল্লামা শিবলী নো'মানী, নওয়াব নিযামুল মুল্‌ক বিলগেরামী ও মাওলানা হামীদুদ্দীন ফারাহীর পরিকল্পনা অনুযায়ী হায়দারাবাদ ও আওরংগাবাদে এক নতুন ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা কায়েম করা হয়। শিক্ষার মাধ্যম ছিল উর্দূ। ইতিহাস, ভূগোল, অংক ও আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে আরবী সাহিত্য, ব্যাকরণ, কোরআন-হাদীস, ফেকাহ্‌, মানতেক (তর্কশাস্ত্র) প্রভৃতি পড়ানো হতো। এ মানের মেট্রিকুলেশনকে মৌলভী, ইন্টারমিডিয়েটকে মৌলভী আলেম এবং ডিগ্রী কলেজকে দারুল উলুম বলা হতো।

উনিশ শ' চৌদ্দ খ্রিষ্টাব্দে বালক মওদূদী মৌলভী পরীক্ষা দেন এবং অংকে কাঁচা থাকার কারণে উত্তীর্ণ ছাত্রদের মধ্যে ষষ্ঠ স্থান লাভ করেন। এই সময় পিতার স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙ্গে পড়ে। তিনি ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দে আওরংগাবাদ থেকে হায়দারাবাদ গমন করেন এবং সেখানে দারুল উলুমে উচ্চ শিক্ষার জন্যে পুত্র মওদূদীকে ভর্তি করে দেন। তখন দারুল উলুমের অধ্যক্ষ ছিলেন মরহুম মাওলানা হামীদুদ্দীন। পুত্রকে হায়দারাবাদ রেখে অসুস্থ পিতার চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য পরিবর্তনের জন্যে ভূপাল চলে যান।

বালক মওদূদী হায়দারাবাদ দারুল উলুমে পাঠাভ্যাস করতে থাকেন। কিন্তু ছ'মাস অতীত না হতেই ভূপাল থেকে দুঃসংবাদ এলো যে, পিতা মৃত্যু শয্যায় শায়িত। সংবাদ পাওয়া মাত্র বালক মওদূদী মাতাকে নিয়ে ভূপাল চলে যান এবং মুমূর্ষু পিতার শুশ্রুষায় আত্মনিয়োগ করেন। এ সময় থেকেই বালক মওদূদীকে জীবিকা অন্বেষণের উপায় অবলম্বন করতে হয়। কারণ এত অল্প বয়সেই তাঁর এতটুকু তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়েছিল যে, দুনিয়ায় আত্মসম্মান নিয়ে বসবাস করতে হলে স্বাবলম্বী হতে হবে এবং সদুপায়ে জীবিকা অর্জনের জন্যে সংগ্রাম করতে হবে। এদিকে পিতা দারিদ্র্য ও পীড়ার সঙ্গে ক্রমাগত কয়েক বছর সংগ্রাম করে ১৯২০ সালে দুনিয়ার কর্মক্ষেত্র থেকে চির বিদায় গ্রহণ করেন।

সুদৃঢ় নৈতিক চরিত্র ও অটুট মনোবল

পিতার ঘনিষ্ঠ সাহচর্য ও শিক্ষা-দীক্ষার প্রভাবে বালক মওদূদী ভাল-মন্দের তারতম্য নির্ণয় করতে শিখেছিলেন। প্রাথমিক শিক্ষা ও তরবিয়তের দ্বারা তাঁর মধ্যে এমন এক নৈতিক চরিত্রের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যে, ভিন্ন পরিবেশ তাঁকে কোনভাবে প্রভাবিত করতে পারেনি। এর সুফল এই হয়েছিল যে, যখন তিনি মাত্র পনেরো বছরের বালক, তখনই তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পেরেছিলেন। তখন তাঁর সুদৃঢ় নৈতিক চরিত্রের গুণাবলীই তাঁকে সত্যপথে অবিচল রেখেছিল। যেরূপ অবস্থায় নব যৌবনের উদ্যম-উচ্ছ্বাস মানুষকে পথভ্রষ্ট করে, সে অবস্থায়ই জীবনের যৌবন জোয়ার জল-তরঙ্গ মওদূদীর পদতলে আছাড় খেয়েছে, ফেটে চুরমার হয়েছে। কিন্তু তাঁকে বিচলিত করতে পারেনি, মাঝ দরিয়ায় ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারেনি।

মওদূদীর কর্মময় জীবনের সূত্রপাত

দয়াময় আল্লাহ্ তায়ালা কিশোর মওদূদীকে অসাধারণ প্রতিভা দান করেছিলেন। তাই তিনি অল্প বয়সেই সাহিত্য সাধনায় সিদ্ধহস্ত হয়েছিলেন। মাত্র সতেরো বছর বয়সে এক অতি সংকট মুহূর্তে তাঁকে জীবিকা অর্জনের দুর্গম পথ বেছে নিতে হয়। কোন অফিসে কেরানীগিরি করা অথবা কারো অধীনে চাকরি করা ছিল তার প্রকৃতি বিরুদ্ধ। অতএব তাঁর লেখনি শক্তিকেই তিনি একমাত্র অবলম্বন মনে করলেন।

উনিশ শ' আঠারো সালে মওদূদীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সাইয়েদ আবুল খায়ের মওদূদী সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। বিজ্নৌর থেকে প্রকাশিত 'মদীনা' পত্রিকার সম্পাদনার ভার তিনি নিজ হস্তে গ্রহণ করেন। সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীও বড় ভাইয়ের সঙ্গে মিলে 'মদীনা' পরিচালনা করতে থাকেন। কিন্তু দু'মাস পর কনিষ্ঠ মওদূদী সেখান থেকে দিল্লী চলে যান। সে সময় ভারতে স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রবল ঝড় উঠেছিল। মন ও চিন্তার স্বাধীনতা, বংশীয় ঐতিহ্য এবং শৈশবকালীন পরিবেশের প্রভাব আবুল আ'লা মওদূদীকে ব্রিটিশ শাসন ও সভ্যতার প্রতি স্বভাবতই বীতশ্রদ্ধ করে তুলছিল। ফলে স্বাধীনতার যে কোন আন্দোলনই তিনি সমর্থন করতেন। উপরন্তু তাঁর মধ্যে ছিল ইসলামের বিরাট সংগ্রামী প্রেরণা। অতএব এসব কারণে তিনি তৎকালীন "আনজুমানে এয়ানাতে নযরবন্দানে ইসলাম"-এর কর্মী হিসাবে কাজ করতে থাকেন। ১৯১৯ সালে যখন খেলাফত ও সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু হয়, তখন তিনি তাতেও অংশগ্রহণ করেন।

খেলাফত আন্দোলন ও মাওলানা মওদূদী

খেলাফত আন্দোলন মাওলানা মওদূদীর জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায়ই নয়, বরঞ্চ মুসলমানদের জাতীয় ইতিহাসের দিগ্‌দর্শী। সংক্ষেপে হলেও এ সম্পর্কে কিছু আলোচনার প্রয়োজন, যাতে করে তার পটভূমিকায় মাওলানার জীবন চরিত সম্যক উপলব্ধি করা যেতে পারে।

বিগত প্রথম মহাযুদ্ধে ইউরোপের রুগ্ন ব্যক্তি তুরস্ক (The sick man of Europe) ইংরেজদের বিরুদ্ধে জার্মানীর পক্ষে যুদ্ধ করে। সে সময় পর্যন্ত তুরস্কে উসমানিয়া সাম্রাজ্য খেলাফতের রক্ষণাবেক্ষণকারী হিসাবে গণ্য হতো। ইংরেজ প্রতিপক্ষকে চরম আঘাত এবং মুসলিম ঐক্য ভেঙে চুরমার করার উদ্দেশ্যে লরেন্স অব অ্যারাবিয়াকে আরব জাতীয়তাবাদের প্রচারক হিসাবে আরব দেশে প্রেরণ করেন । মক্কার তদানীন্তন শরীফ হুসাইন হাশমী এ প্রচারণায় এতোটা প্রভাবিত হয়ে পড়েন যে, ১৯১৫ সালে মাঝামাঝি আরবদের জাতীয় স্বাধীনতার জন্যে মুসলমানদের বিরুদ্ধেই অস্ত্র ধারণ করে তুরস্কের পৃষ্ঠে ছুরিকাঘাত করেন। প্রথম মহাযুদ্ধে ইংরেজ তথা সম্মিলিত বাহিনী (Allied Forces) বিজয় লাভ করে। তারা যুদ্ধের প্রারম্ভেই একটি গোপন চুক্তির মাধ্যমে উসমানিয়া সাম্রাজ্যকে নিজেদের মধ্যে বন্টন করে রেখেছিল। ১৯১৯ সালে যুদ্ধ শেষে তুরস্ক সাম্রাজ্যকে ছিন্নভিন্ন করে দেয়া হলো। ইউরোপীয় অংশ তার হাতছাড়া হলো। আরব জাতীয়তাবাদের বিষক্রিয়ার ফলে আরবদেশগুলি তুরস্ক সাম্রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল বটে, কিন্তু সেগুলিকে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও গ্রীসের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হলো। উসমানিয়া সাম্রাজ্য প্রাচীন আনাতোলিয়াতে (ইস্তাম্বুল) সীমিত হয়ে থাকল। ১৯১৯ সালের মে মাসে উসমানিয়া রাজধানীতে শুধুমাত্র নাম সর্বস্ব সুলতানের অস্তিত্ব বাকী রইল। এখানেও তার স্বাধীনতা ছিল বিপন্ন। বৃটিশ ভারতের মুসলিম নেতৃবৃন্দ মুসলমানদের মনে এ বিশ্বাস সৃষ্টি করেছিলেন যে, খলীফাতুল মুসলিমীন এবং খেলাফত ব্যবস্থা তাদের প্রকৃত ঈমানের অঙ্গ-অংশ। অতঃপর উসমানিয়া সাম্রাজ্যের পতন এবং তার ছিন্নভিন্ন অবস্থা দৃষ্টে ভারতীয় মুসলমানদের মনে এ সন্দেহের উদ্রেক হয় যে. ইংরেজ

হয়তো খেলাফতের কেন্দ্রকেই ধ্বংস করে দেবে- যেটাকে মুসলমানগণ তাদের দ্বীনী এবং রূহানী কেন্দ্র মনে করতো।

অতঃপর মুসলমান নেতৃবৃন্দ ভারতের বড়লাটের সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁদের মনোভাব ব্যক্ত করেন। মাওলানা মুহাম্মদ আলী জওহর, মাওলানা সাইয়েদ সুলায়মান নদ্ভী প্রমুখ নেতাদের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল লণ্ডনে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁদের বক্তব্য পেশ করেন। প্রত্যুত্তরে তাঁদেরকে বলা হয় যে, মূল তুরস্কের ভূখন্ড ব্যতীত অন্যান্য এলাকা তাদেরকে দেয়া যাবে না।

ব্রিটিশের আচরণে ভারতের মুসলমান অতিশয় ক্ষুব্ধ হয়ে পড়েন এবং খেলাফতের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্যে ভারতে প্রচণ্ড খেলাফত আন্দোলন শুরু হয়। খেলাফত কমিটি গঠিত হয় এবং ভারতীয় কংগ্রেস, জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ এবং খেলাফত কমিটি সম্মিলিতভাবে এ আন্দোলন পরিচালনা করে। ১০ই আগস্ট সারা দেশে খেলাফত দিবস পালন করা হয় এবং এ সময় থেকে বিভিন্ন স্থানে হরতালও পালিত হতে থাকে। মোটকথা, সমগ্র ভারতে ইংরেজদের বিরুদ্ধে এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণ শুরু হয়। এক মাসের মধ্যেই প্রায় ত্রিশ হাজার মুসলমান কারাবরণের জন্যে নিজেদেরকে পেশ করেন। শহরে-বন্দরে, হাটে-বাজারে, গ্রামে-গঞ্জে খেলাফত আন্দেলন এক প্রচণ্ড রূপ ধারণ করে। কিন্তু এতো বড়ো আন্দোলন ও ব্রিটিশ বিরোধী বিক্ষোভ-বিস্ফোরণ সবই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

তার কারণ এই যে, কামাল আতাতুর্ক তুরস্কের মুসলমানদের জেহাদী প্রেরণার সুযোগ গ্রহণ করে অসাধারণ বীরত্ব ও বিচক্ষণতার সাথে যুদ্ধ পরিচালনা করে বহু এলাকা ইংরেজদের নিকট থেকে পুনরুদ্ধার করেন। তুরস্কবাসীদের একতাবদ্ধ করেন এবং তাদের হৃত মর্যাদা ও গৌরব পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হন। এভাবে ক্ষমতা হস্তগত করার পর কামাল আতাতুর্ক ১৯২২ সালের নভেম্বর মাসে উসমানিয়া খেলাফতের সুলতান মুহাম্মদ হাশেমকে ক্ষমতাচ্যুত করেন এবং ১৯২৪ সালের মার্চ মাসে কাষ্ঠপুত্তলিসম সর্বশেষ সুলতান আবদুল মজীদকে দেশ থেকে বহিষ্কার করে খেলাফতের উচ্ছেদ সাধন করেন।

ডক্টর মঈনুদ্দিন তাঁর History and freedom movement VIII part 1- এ মন্তব্য করেন ঃ

কামাল আতাতুর্কের এ পদক্ষেপ খেলাফত আন্দোলনের সাথে সংশ্লিষ্ট ভারতীয় মুসলমানদের মনে চরম আঘাত করে। সর্বাপেক্ষা আঘাত পান মাওলানা মুহাম্মদ আলী– যিনি ছিলেন খেলাফত আন্দোলনের প্রাণস্বরূপ। যে শরীফ হুসাইন ইংরেজের হাতের পুতুল হিসেবে কাজ করেন এবং যার বিশ্বাসঘাতকতায় তুরস্ক সাম্রাজ্য লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়, তিনি খেলাফতের দাবিদার হিসাবে নিজেকে ঘোষণা করেন। কিন্তু একেতো তিনি মুসলিম জগতের কাছে ঘৃণার পাত্র হয়ে পড়েছিলেন এবং ইংরেজ সরকারও তার এ দাবি প্রত্যাখ্যান করেন। অপরদিকে বিপ্লবী ওহাবী নেতা ইবনে সউদের আক্রমণও তিনি প্রতিহত করতে ব্যর্থ হন। বছরের শেষের দিকে ইবনে সউদ মক্কা এবং তায়েফ অধিকার করেন এবং হেজাযের অধিকাংশ এলাকা তাঁর হস্তগত হয়।

যাঁরা খেলাফত আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিলেন, তাঁদের সহানুভূতি ছিল ইবনে সউদের প্রতি। কিন্তু তিনি যখন কবর পূজার মূলোৎপাটনের জন্যে কবরের উপর তৈরি সকল প্রকার স্মৃতিস্তম্ভ ভেঙে চুরমার করেন, তখন বাদাউনী, বেরেলভী প্রভৃতি মতাবলম্বীগণ খেলাফত কমিটি থেকে বেরিয়ে আসেন। তথাপি ভারতীয় খেলাফত কমিটি ৪ঠা জানুয়ারী ইবনে সউদকে খলীফাতুল মুসলেমীন হিসাবে মুবারকবাদ জানিয়ে তারবার্তা প্রেরণ করেন। কিন্তু মাত্র চারদিন পর তিনি জবাবে বলেন যে, তিনি হেজাযের বাদশাহ, খলীফা নন।

– (History of freedom movement- Dr. Moyeenuddin)।

ওদিকে কামাল আতাতুর্ক উসমানিয়া খেলাফতের ধ্বংসস্তূপের উপরে এক নতুন দ্বীন-ই-ইলাহীর প্রাসাদ নির্মাণ করেন।

বাবায়ে উর্দূ মৌলভী আব্দুল হক বলেন ঃ

কামাল পাশা এতদূর অগ্রসর হন যে, পাশ্চাত্যের অনুকরণে পানাহার, পোশাক-পরিচ্ছদ, চালচলন, নাচগান, মদ্যপান ও অন্যান্য বহুবিধ ইসলাম বিরোধী সংস্কৃতি তুরস্কের জাতীয় প্রতীক বলে ঘোষণা করেন। এমন কি ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে ধর্মীয় শিক্ষা উচ্ছেদ করেন। তুরস্কের নিজস্ব ভাষার প্রাচীন বর্ণমালা পরিবর্তন করে রোমান বর্ণমালা প্রবর্তন করেন। তুরস্কের একটি প্রতিনিধি দল দিল্লী আগমন করেন। তারা বারবার নিজেদেরকে ইউরোপীয় জাতি বলে পরিচয় দিতে গর্ববোধ করেন। দিল্লীর মুসলমানগণ তাদেরকে দিল্লী জামে মসজিদে জুমার নামায আদায়ের আমন্ত্রণ জানান। কিন্তু সে আমন্ত্রণ তারা

প্রত্যাখ্যান করেন। আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণও প্রত্যাখ্যান করা হয়। অথচ পূর্ব থেকে কোন কর্মসূচী না থাকলেও বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় তাঁরা আনন্দের সাথে পরিদর্শন করেন।

স্যার-সৈয়দ আহমদ- মৌলভী আব্দুল হক (পৃঃ ৩৪)।

খেলাফত আন্দোলন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলেও তা ভারতের ইতিহাসে বিরাট প্রভাব রেখে যায় এবং ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্যে একটা অদম্য প্রেরণার সঞ্চার করে। মাওলানা মওদূদীর উপর এর প্রভাব এই যে, এ আন্দোলন তাঁর মধ্যে জনসভায় বক্তৃতা করার প্রেরণা, সাহস ও শক্তি দান করে এবং লেখনীর মাধ্যমে মুসলিম মিল্লাতের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা প্রকাশেরও সুযোগ দান করে। খেলাফত আন্দোলনের সময় মাওলানা জব্বলপুর থেকে 'তাজ' পত্রিকার সম্পাদনার কাজ করছিলেন। তাঁর বয়স তখন মাত্র সতেরো বছর। তিনি তাঁর আত্মকথায় বলেন ঃ

"সে সময় এখানে মুসলমানদের পক্ষ থেকে জনসভায় কিছু বলার কোন লোক ছিল না। বাধ্য হয়ে আমাকেই এ কাজ করতে হয়। এতে আমার দু'টি বড়ো উপকার হয়েছিল। প্রথমটি এই যে, আমার মধ্যে বিরাট আত্মবিশ্বাস জন্মেছিল যা পূর্বে ছিল না। পূর্বে কোন দায়িত্বপূর্ণ কাজ করতে সাহস করতাম না। কিন্তু জব্বলপুরে যখন অপরের সাহায্য ব্যতিরেকে সম্পূর্ণ একাকী এবং সম্পূর্ণ নিজের দায়িত্বে সাংবাদিকতা ও জনসেবার কাজ শুরু করলাম, তখন অনুভব করলাম যে, আমার মধ্যে এমন কিছু শক্তি লুক্কায়িত আছে, যা প্রয়োজনের সময় স্বতঃস্ফূর্তভাবে আত্মপ্রকাশ করে। তারপর থেকে কোন দায়িত্ব গ্রহণে কখনো দ্বিধাবোধ করিনি।

দ্বিতীয় উপকার এই যে, আমি আমার জীবনে একেবারে আত্মনির্ভরশীল হয়ে পড়লাম। ইতঃপূর্বে আমি আমার কোন না কোন আত্মীয় বন্ধুর সাথে একত্রে বাস করতাম এবং অপরের উপর নির্ভর করার দুর্বলতা কিয়ৎ পরিমান হলেও আমার মধ্যে বিদ্যমান ছিল। কিন্তু জব্বলপুরে আত্মনির্ভরশীল হয়ে কাজ করতে পেরেছি।"

জব্বলপুরে সে সময়ের 'তাজ' পত্রিকায় লিখিত মাওলানার সম্পাদকীয় প্রবন্ধ পড়লে এ কথা স্বীকার করতে হয় যে, অত অল্প বয়সে তিনি এতখানি তত্ত্ব-জ্ঞানী হয়ে পড়েছিলেন যে, জনগণের মধ্যে উদ্দীপনা ও অদম্য প্রেরণা সৃষ্টি করার

ভাষাজ্ঞানও তাঁর ছিল। তাঁর প্রতিটি কথা ছিল অতীব যুক্তিপূর্ণ, সুধী সমাজের গ্রহণযোগ্য এবং অতীব দূরদৃষ্টিসম্পন্ন। তাঁর পূর্বাপর কথার মধ্যে ছিল পরিপূর্ণ ভারসাম্য ও সামঞ্জস্য। সে সময়ে ব্রিটিশ কর্তৃক তুরস্কের প্রতি যে চরম অবিচার করা হয়েছিল, তিনি সেজন্যে ব্রিটিশের তীব্র সমালোচনা করে দীর্ঘ সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লেখেন। যার ফলে 'তাজের' প্রকাশনা সরকার বন্ধ করে দেয়।

হিজরত আন্দোলন ও মাওলানা মওদূদী

খেলাফত আন্দোলনে ব্রিটিশের অনমনীয় মনোভাব লক্ষ্য করে ভারতের আলেম সমাজ ঘোষণা করেন যে, ভারত 'দারুল হরব' এবং এখান থেকে হিজরত করা মুসলমানের দ্বীনী দায়িত্ব। ১৯২০ সালে মাওলানা আবুল কালাম আযাদ রাঁচী জেল থেকে মুক্তি লাভ করার পর হিজরত আন্দোলন শুরু করেন।

সে সময়ে আফগানিস্তানের বাদশাহ্ আমীর আমানুল্লাহ্ খান এক জনসভায় বলেন যে, ভারতীয় মুসলমান হিজরত করে আফগানিস্তান চলে যেতে পারে। মাওলানা আযাদের কথায় মুসলমানগণ চক্ষু বন্ধ করে হিজরতের জন্যে ব্যাকুল হয়ে পড়েন। হিজরত কমিটি গঠিত হয় এবং দিল্লীতে দস্তুর মতো তার দফতর কায়েম করা হয়। হাজার হাজার ধর্মভীরু মুসলমান পরিবার নামমাত্র মূল্যে তাদের স্থাবর- অস্থাবর সম্পদ বিক্রি করে হিজরত কমিটির দফতরে পৌঁছতে থাকেন। শুধু আগস্ট মাসেই আঠারো হাজার লোক হিজরত করে আফগান সীমান্ত অতিক্রম করে। প্রায় পাঁচ লক্ষ মুসলমান হিজরতের নামে তাদের বহু মূল্যবান সম্পদ হাতছাড়া করে।

মওদূদী ভ্রাতৃদ্বয় (আবুল আ'লা মওদূদী ও তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আবুল খায়ের মওদূদী) হিজরতের উদ্দেশ্যে দিল্লী হিজরত কমিটির দফতরে হাজির হন। মাওলানার জনৈক পরিচিত বন্ধু মিঃ তোজাম্মেল হোসেন ছিলেন সেক্রেটারী। তার সাথে মাওলানার দীর্ঘ আলোচনা হয়। আলোচনায় মাওলানা জানতে পারেন যে, হিজরতের পশ্চাতে কোন সুচিন্তিত ও সুষ্ঠু পরিকল্পনা বা স্কীম নেই। শত সহস্র লোক আফগাস্তিানে চলে যাচ্ছেন, অথচ আফগান সরকারের সাথে এ ব্যাপারে কোনই আলাপ-আলোচনা করা হয়নি। হিজরতের ব্যাপারে মুফতী কেফায়েতুল্লাহ্, মাওলানা আহমদ সাঈদ প্রমুখ জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দের নেতৃবৃন্দ পরম আগ্রহী ছিলেন। মাওলানা মওদূদী (বালক মওদূদী) তাঁদের সাথে সাক্ষাত করে বলেন যে, কোন সুষ্ঠু পরিকল্পনা ব্যতিরেকে হিজরত অবাস্তব ও ক্ষতিকর হবে। তাঁরা ত্রুটি স্বীকার করেন এবং বালক মওদূদীকে এ বিষয়ে পরিকল্পনা পেশ করতে অনুরোধ জানান।

মাওলানা মওদূদী প্রস্তাব করেন যে, সর্বপ্রথম আফগান সরকারের সাথে আলোচনা করে এ কথা জেনে নেয়া যাক যে, ভারত থেকে হিজরতকারীগণের পুনর্বাসনের ইচ্ছা তাঁদের আছে কি না এবং থাকলে তার পদ্ধতি ও কর্মসূচী কি হবে। অতঃপর দিল্লীস্থ আফগান রাষ্ট্রদূতের সাথে সাক্ষাত করে জানা গেল যে, তাঁরা ইতোমধ্যেই এ নিয়ে বিব্রত হয়ে পড়েছেন। যারা ভারত থেকে চলে গেছেন তঁদেরকে বিদায় করে দিতে সরকার যদিও দ্বিধাবোধ করছেন, কিন্তু তাদের ব্যয়ভার বহন করা সরকারের সাধ্যের অতীত হয়ে পড়েছে। এরপর হিজরত পরিকল্পনার অকাল মৃত্যু ঘটে।

কোন সুষ্ঠু পরিকল্পনা ব্যতিরেকে শুধুমাত্র ধর্মীয় ভাবপ্রবণতার বশবর্তী হয়ে তদানীন্তন আলেম সমাজ হিজরতের ফতোয়া দিয়ে কয়েক লক্ষ মুসলমানকে নিঃস্ব বাস্তুহারায় পরিণত করেন। মাওলানা মওদূদীর দূরদর্শিতা ও সময়োচিত হস্তক্ষেপের ফলে আরও কয়েক লক্ষ মুসলমান বিপদ থেকে বেঁচে যান।

বালক মওদূদীর এ অসাধারণ প্রতিভা ,তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও দূরদর্শিতা মাওলানা মুহাম্মদ আলী ও জমিয়ত নেতৃবৃন্দকে স্তম্ভিত ও আকৃষ্ট করে। যার ফলে তাঁরা তাঁদের নিজ নিজ পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণে বালক মওদুদীকে বারবার অনুরোধ জানান।

সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে মওদূদী

তাজুদ্দীন নামক মধ্য প্রদেশের জনৈক মহৎ ব্যক্তি উপরে বর্ণিত 'আনজুমানের' প্রাণস্বরূপ ছিলেন। তিনি জব্বলপুর থেকে 'তাজ' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন এবং তাঁরই একান্ত অনুরোধে মওদূদী ভ্রাতৃদ্বয় উক্ত পত্রিকার সম্পাদনা-ভার গ্রহণ করেন। সেকালে পত্রিকা প্রকাশনা অতি দুষ্কর ছিল। ফলে কিছুকাল পর 'তাজের' প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়। এরপর মওদূদী ভ্রাতৃদ্বয় জব্বলপুর থেকে দিল্লী চলে যান। এ সময়ে মাওলানা মওদূদী সাংবাদিকতার প্রতি এতখানি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলেন যে, তিনি ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করতে বাধ্য হন। অতঃপর জনৈক মুহাম্মদ ফাযেলের নিকট তিনি ইংরেজী শিখতে আরম্ভ করেন। ইংরেজীর প্রাথমিক পুস্তকাদি পাঠ না করে প্রথমেই তিনি তৎকালীন ম্যাট্রিকুলেশন মানের পুস্তকাদি পড়তে শুরু করেন। অসাধারণ মেধাশক্তির বলে মাত্র ছ'মাসের মধ্যে তিনি ইংরেজীতে এতখানি জ্ঞান লাভ করেন যে, যে কোন ইংরেজী সংবাদপত্র অথবা পুস্তক পাঠ করলে মোটামুটি তার মর্ম উপলব্ধি করতে পারতেন। দু'বছর যাবৎ তিনি ইংরেজী ভাষা অধ্যয়ন করেন। শিক্ষকের সাহায্য ব্যতিরেকেই তিনি বিভিন্ন গ্রন্থাদি শুধু অভিধানের সাহায্যে অধ্যয়ন করে প্রভূত জ্ঞান সঞ্চয় করতে থাকেন।

জনাব তাজুদ্দীন পুনরায় জব্বলপুর থেকে 'তাজ' প্রকাশ করে মাওলানাকে তার সম্পাদনা-ভার অর্পণ করেন। মাওলানার প্রচেষ্টায় 'তাজ' সাপ্তাহিক পত্রিকা থেকে একটি বিশিষ্ট দৈনিকে পরিণত হয়। এ সময় থেকে তিনি রাজনীতির সাথে জড়িত হয়ে পড়েন। জব্বলপুরে সেকালে মুসলমানদের নেতৃত্ব দেয়ার কেউ ছিল না। তাই মাওলানাকে বিভিন্ন জনসভায় বক্তৃতা করে মুসলমানদের মধ্যে প্রাণচাঞ্চল্য সৃষ্টি করতে হয়েছিল।

জব্বলপুরে অবস্থানকালে মাওলানার মধ্যে আত্মনির্ভরশীলতা, কর্তব্যনিষ্ঠা দায়িত্বজ্ঞান প্রভৃতি সদ্গুণাবলীর বিকাশ ঘটে। এ সময়ে সম্পূর্ণ নিজের উপর নির্ভর করে তিনি বিরাট গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে পারতেন। কিন্তু জব্বলপুরেও তার অধিক দিন থাকা সম্ভব হলো না। 'তাজের' একটা সম্পাদকীয় প্রবন্ধের জন্য সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকারের রোষানল প্রজ্জ্বলিত হয়। 'তাজের' সম্পাদক,

মুদ্রাকর ও প্রকাশকের বিরুদ্ধে সরকার মামলা দায়ের করেন। কিন্তু ঘোষণাপত্রে তাজুদ্দীন সাহেব স্বয়ং উক্ত পত্রিকার একাদিক্রমে সম্পাদক, মুদ্রাকর ও প্রকাশক থাকায় মাওলানা মামলা থেকে অব্যাহতি পান। কিন্তু এজন্য তাঁর বিবেক তাঁকে দংশন করতে থাকে। তিনি প্রতিজ্ঞা করেন যে, এখন থেকে অপরের অধীনে কোন দায়িত্বপূর্ণ কাজ তিনি গ্রহণ করবেন না। সকল গুরুদায়িত্ব নিজ স্কন্ধে বহন করে কাজ করবেন বলে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেন।

উনিশ শ' বিশ সালের শেষভাগে তিনি দিল্লী যান। ১৯২১ সালের প্রথম দিকে মাওলানা মুফতী কেফায়েতুল্লাহ ও জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের সভাপতি মাওলানা আহমদ সাঈদের সাথে তাঁর পরিচয় হয়। তাঁরা জমিয়তের পক্ষ থেকে 'মুসলিম' নাম দিয়ে একটা পত্রিকা প্রকাশ করেন এবং মাওলানা মওদূদীর প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে তাঁকে তার সম্পাদক নিযুক্ত করেন। ১৯২৩ সাল পর্যন্ত পত্রিকাটি সুচারুরূপে চলতে থাকে এবং মাওলানা শেষ পর্যন্ত তার সম্পাদনা করেন।

উনিশ শ' ষোল সাল থেকে একুশ সাল পর্যন্ত পাঁচ-ছয় বছরকাল মাওলানাকে বিরাট অগ্নিপরীক্ষার ভেতর দিয়ে চলতে হয়। পিতার দুরারোগ্য ব্যাধি, জীবিকার্জনের নিষ্ঠুর তাড়না, সহায়হীনতা প্রভৃতি কারণে মাওলানা যথোপযুক্ত জ্ঞান সঞ্চয়ের সুযোগ পাননি। ১৯২১ সাল থেকে দিল্লীতে নিশ্চিত মনে তিনি সংবাদপত্র পরিচালনা ও অবসর সময়ে জ্ঞানার্জনে মন দেন। বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শী উলামায়ে কেরামের নিকট আরবী সাহিত্য, হাদীস, তাফসীর ফেকাহ, মানতেক (তর্কশাস্ত্র), দর্শন প্রভৃতি অধ্যয়ন করে গভীর পাণ্ডিত্য লাভ করেন।

মাওলানা আব্দুস সাত্তার নিয়াযী ছিলেন তৎকালীন ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলেমে দ্বীন। কুরআন, হাদীস ও আরবী ভাষায় তাঁর গভীর জ্ঞান-গরিমা চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং তিনি আমল আখলাকে ছিলেন একেবারে দরবেশ। সাইয়েদ মওদূদী প্রতিদিন ফজর নামাযের পূর্বে এক ঘন্টা করে তাঁর কাছে আরবী ব্যাকরণ (নাহু ও সারফ্), মা'কুলাত, মায়ানী ও বালাগাত শিক্ষা লাভ করেন।

অতঃপর ১২ই জানুয়ারী (১৯২৬) বাইশ বছর বয়সে সাইয়েদ মওদূদী দিল্লীর দারুল উলূম ফতেহপুরীর শিক্ষক মাওলানা মুহাম্মদ শরীফুল্লাহ খানের

নিকট থেকে 'উলুমে আক্‌লিয়া ও আদাবিয়া ও বালাগত' এবং 'উলুমে আসলিয়া ও ফরুইয়া' বিদ্যার সনদ হাসিল করেন।

পরবর্তী বছর (১৯২৭) উক্ত দারুল উলুমের শিক্ষক মাওলানা আশ্‌ফাকুর রহমান কান্ধলভীর কাছে থেকে সাইয়েদ আবুল আ'লা হাদীস, ফেকাহ ও আরবী আদবে সনদ হাসিল করেন।

উপরন্তু ১৯২৮ সালে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী মাওলানা আশফাকুর রহমান কান্ধলভীর কাছে থেকে জামে তিরমিযী ও মুয়াত্তায়ে ইমাম মালেকের সমাপ্তির সনদ হাসিল করেন।

উল্লেখ্য, মাওলানা শরীফুল্লাহ খানের কাছে মাওলানা মওদূদী তাফসীরে বায়যাবী, হেদায়া, ইল্‌মে মায়ানী ও বালাগতও শিক্ষা করেন।

এভাবে সাত-আট বছর দিল্লী অবস্থানকালে সাংবাদিকতার সাথে সাথে অসাধারণ মেধাশক্তি ও প্রজ্ঞাবলে মাওলানা মওদূদী তাঁর শিক্ষাজীবনের অসমাপ্ত শিক্ষা সমাপ্ত করেন এবং আরবী ভাষা, হাদীস, তাফসীর, ফেকাহ প্রভৃতিতে গভীর পাণ্ডিত্য লাভ করেন।

উনিশ শ' তেইশ সালে 'মুসলিম' বন্ধ হওয়ার পর মাওলানা মওদূদী হায়দারাবাদ রওয়ানা হন। কিন্তু পথিমধ্যে ভূপালে যাত্রা ভঙ্গ করে সেখানে দেড় বছরকাল নিবিষ্টচিত্তে অধ্যয়নে রত হন। ১৯২৪ সালে তিনি পুনরায় দিল্লী গমন করেন। ওই সময়ে পাকভারতের সিংহপুরুষ মরহুম মাওলানা মুহাম্মদ আলী জওহরের সাথে তাঁর পরিচয় ঘটে। মাওলানা মুহাম্মদ আলী তখন 'হামদর্দ' পত্রিকা পরিচালনা করছিলেন। তিনি তরুণ উদীয়মান সাংবাদিক মাওলানা মওদূদীকে উক্ত পত্রিকার কার্যভার গ্রহণ করতে অনুরোধ জানান। ঠিক এই সময়ে জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের পক্ষ থেকে 'আল জমিয়ত' পত্রিকা প্রকাশ করার অভিপ্রায়ে মাওলানা আহমদ সাঈদ মাওলানা মওদূদীকে আহবান জানান। মাওলানা মুহাম্মদ আলীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও মওদূদীর স্বাধীন মন অন্যের অধীনতা স্বীকারে বাধা দান করলো। অতএব তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে 'আল জমিয়ত' পত্রিকার সম্পাদনা ভার গ্রহণ করাই সমীচীন মনে করলেন। ১৯২৪ সাল থেকে ১৯২৮ সাল পর্যন্ত সম্পূর্ণ সুষ্ঠুভাবে তিনি অর্ধ সাপ্তাহিক 'আল জমিয়ত' পরিচালনা করেন। এ সময়ের মধ্যে তিনি বিভিন্ন বিষয়ের মূল্যবান গ্রন্থও রচনা করেন। তাঁর প্রথম প্রকাশনা 'আল জিহাদু ফিল ইসলাম' এবং 'দওলতে আস্‌ফিয়া ও হুকুমতে বরতানিয়া' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

'আল জিহাদু ফিল ইসলাম'

মাওলানা মওদূদীর 'আল জিহাদু ফিল ইসলাম' গ্রন্থ প্রণয়নের কিছু ঐতিহাসিক পটভূমিকা আছে।

ইংরেজী ১৯২৬ সালের শেষ ভাগে শুদ্ধি আন্দোলনের প্রবর্তক ও নেতা স্বামী শ্রদ্ধানন্দ এক মুসলমান আততায়ীর হাতে নিহত হন। এর ফলে হিন্দু ভারত অতিমাত্রায় বিক্ষুব্ধ হয়ে পড়ে। মুসলমান ও ইসলামের বিরুদ্ধে এক ব্যাপক অভিযান শুরু হয় হিন্দুদের পক্ষ থেকে। তারা প্রচার করেন যে, ইসলাম তার অনুগামীদেরকে নরহত্যায় উদ্বুদ্ধ করে। এমন কি মিঃ গান্ধী পর্যন্ত এক বিবৃতির মাধ্যমে মন্তব্য করেন যে, অতীতে তরবারীর সাহায্যেই ইসলাম প্রচারিত হয়েছে এবং বর্তমান কালেও তাই হচ্ছে। ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের প্রচারণা ভারতের আকাশ বাতাস মুখরিত করে তোলে এবং বিদেশের বিভিন্ন স্থানে হিন্দু মুসলমান দাঙ্গা-হাঙ্গামার সূত্রপাত হয়। মাওলানা মুহাম্মদ আলী জওহর এ সমস্ত ভিত্তিহীন এবং উস্কানীমূলক প্রচারণা বন্ধ করতে গিয়ে অতীব দুঃখ প্রকাশ করে বলেন,"আহা! আজ যদি ভারতে এমন কোন মর্দে মুজাহিদ আল্লাহর বান্দা থাকতো, যে তাদের এসব হীন প্রচারণার দাঁতভাঙ্গা জবাব দিতে পারতো, তাহলে কতই না ভাল হতো!"

তরুণ মুজাহিদ মাওলানা মওদূদী জামে মসজিদের উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, এ সময়ে তিনি 'আল জমিয়ত' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তাঁর মন-মস্তিষ্ক এবং শিরায় শিরায় প্রবাহিত হলো জিহাদের অনুপ্রেরণা। তিনি হিন্দুভারত ও অন্যান্য ইসলাম-দুশমনদের জবাব দেয়ার জন্য দৃঢ়-সংকল্প হলেন। অতঃপর ১৯২৭ সালের প্রথম থেকেই তাঁর পত্রিকার মাধ্যমে ধারাবাহিকভাবে "আল জিহাদু ফিল ইসলাম" শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশ করতে শুরু করেন। পরবর্তী সময়ে তা বিরাট গ্রন্থ আকারে প্রকাশিত হয়।

ডঃ ইকবাল গ্রন্থখানি সম্পর্কে নিম্নোক্ত মন্তব্য করেন–

"জেহাদ, যুদ্ধ ও সন্ধি সম্পর্কে ইসলামী আইন-কানুন সম্বলিত এ গ্রন্থখানা অভিনব ও চমৎকার হয়েছে। প্রত্যেক জ্ঞানী ও সুধী ব্যক্তিকে গ্রন্থখানি পাঠ করতে অনুরোধ করি।"

মাওলানার নিজ হাতে লেখা গ্রন্থখানি তাঁর আপন চরিত্রের উপরও কম প্রভাব বিস্তার করেনি। তিনি এ বিষয়ে নিম্নরূপ মন্তব্য করেন-

"এ গ্রন্থখানির দ্বারা আমি নিজে সর্বাপেক্ষা বেশী উপকৃত হয়েছি। গ্রন্থখানি রচনা করার সময়ে আমার অন্তরে দ্বীনী মর্যাদাবোধ অপেক্ষা জাতীয় মর্যাদাবোধের আবেগ অনুরাগ প্রবলতর ছিল। কিন্তু গ্রন্থ প্রণয়ন ও তৎসংক্রান্ত তথ্যানুসন্ধানকালে ইসলামের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং তার আদেশ নিষেধগুলো সম্পর্কে মনোযোগ সহকারে পুঙ্খানুপুঙ্খ অধ্যয়ন করার সুযোগ আমার হয়েছিল। তার ফল এই হয়েছিল যে, আমার মনের মধ্যে কেবল মাত্র যে শরীয়তের বিধান সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান এবং তার সত্যতা সম্পর্কেই পূর্ণ প্রত্যয় (Conviction) জন্মেছিল তা নয় বরঞ্চ আল্লাহর শাসন-সংবিধানকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার জন্যে একটা অদম্য প্রেরণার উন্মেষও আমার মনের মধ্যে হয়েছিল। উপরন্তু এ বিষয়ে সংগ্রাম করার কর্মপদ্ধতিও আমি অবগত হয়েছিলাম। এরপর সাংবাদিকতার তদানীন্তন প্রচলিত পন্থা পরিত্যাগ করতে মনস্থ করলাম। এজন্যে 'আল জমিয়ত' পত্রিকার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করলাম। তখন এরূপ সংকল্প করলাম যে, ভবিষ্যতে যদি কোনদিন সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করি, তবে একমাত্র এই শর্তে করব যে, তাকে 'দ্বীনে হক' প্রচারের অস্ত্র স্বরূপই ব্যবহার করব। এরপর দীর্ঘ পাঁচ বছর শুধু অধ্যয়ন ও জ্ঞান চর্চায় কাটিয়ে দিলাম।"

ঊনিশ শ' আটাশ সালের পূর্বে মাওলানা মওদূদী জার্মান ভাষা শিখতে শুরু করেছিলেন। কিন্তু কয়েক মাস শিক্ষা করার পর তাঁর শিক্ষক দিল্লী থেকে অন্যত্র চলে যওয়ায় তাঁর আশা অপূর্ণ থেকে যায়।

এ সময়ে 'আল জমিয়ত' পত্রিকার কর্তৃপক্ষ জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের সাথে মাওলানার মৌলিক মতবিরোধ শুরু হয়। জমিয়তে উলামা ভারতীয় কংগ্রেসের অন্ধ সমর্থক হয়ে পড়েছিল। যে সময়ে মাওলানা মুহাম্মদ আলী প্রমুখ দেশবরেণ্য নেতৃবৃন্দ কংগ্রেসের একগুঁয়েমি, দ্বিমুখী নীতি ও ইসলাম বিরোধী মনোভাবের জন্য একে পরিত্যাগ করছিলেন, সে সময়ে সেই কংগ্রেসের তল্পিবাহক হয়ে থাকা জমিয়তে উলামার মর্যাদার পক্ষে অত্যন্ত অশোভনীয় ছিল। জমিয়তের এরূপ মনোভাব মাওলানা মওদূদীকে ব্যথিত ও মর্মাহত করেছিল এবং তারই জন্যে ১৯২৮ সালে তিনি উক্ত পত্রিকার সম্পাদনা-ভার চিরদিনের জন্যে পরিত্যাগ করেন।

মাওলানার স্বাধীন জীবন

সাংবাদিকতা পরিত্যাগ করার পর মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী গ্রন্থ সংকলন ও রচনার কাজে আত্মনিয়োগ করতে মনস্থ করেন। কিন্তু যে সমস্ত বিষয়ে তাঁর গ্রন্থ রচনার কামনা ছিল, সে সম্বন্ধে তথ্যাদি সংগ্রহের জন্যে আবশ্যকীয় মূল্যবান গ্রন্থ দিল্লীতে দুষ্প্রাপ্য ছিল বলে তাঁকে পুনরায় হায়দারাবাদে চলে যেতে হয়। ১৯২৮ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি হায়দারাবাদ (দাক্ষিণাত্য) পৌঁছেন এবং ১৯৩০ সালের আগষ্ট মাস পর্যন্ত সেখানে থাকেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি তারিখে আস-সলজুক (সলজুকীয় ইতিহাস) প্রণয়ন করেন এবং ইবনে খল্‌কনের ইতিহাসের– 'মিসরে ফাতেমীয় খলিফাগণ' অংশের অনুবাদ করেন এবং আগস্ট মাসেই অসুস্থ হয়ে দিল্লী চলে যান।

পূর্ণ আরোগ্য লাভ করতে কয়েক মাস লাগে। অতঃপর তিনি কয়েক মাস ভূপালে অবস্থান করে তাঁর বহু বাঞ্ছিত "দাক্ষ্যিণাত্যের ইতিহাস" প্রণয়নের আবশ্যকীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করেন। ১৯৩১ সালের জুলাই মাসে তিনি আবার হায়দারাবাদ গমন করেন এবং উপরিউক্ত গ্রন্থ প্রণয়নে আত্মনিয়োগ করেন।

ইতোমধ্যে তিনি নিযাম-উল্-মুল্ক প্রথম আসফ্জাহের জীবনী এবং দাক্ষিণাত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস প্রণয়ন করেন।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সাইয়েদ আবুল খায়ের মওদূদী পূর্ব থেকেই হায়দারাবাদে ছিলেন। তিনি "উসমানিয়া দারুত্তরজরমা"'র সভ্য ছিলেন। মাওলানা মওদূদী হায়দারাবাদে ক'বছর স্বীয় ভ্রাতার সঙ্গেই বসবাস করেন।

উনিশ শ' বত্রিশ সালে মাওলানা মওদূদী উসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের দারুত্তরজমার (Department of Translation)- পক্ষ থেকে আল্লামা সদরুদ্দীন সিরাজীর "আল্‌আস্‌ফারুল আরবায়া" নামক আরবীগ্রন্থের অনুবাদ করেন। বইটি আরবী ভাষায় দর্শন শাস্ত্রের একটি অতি জটিল গ্রন্থ।

আরবী গ্রন্থখানির পূর্ণ নাম ছিল "আল্‌হিকমাতুল মুতাআলিয়া ফি আস্‌ফারিল আকলীয়া"। কিন্তু আরবী ভাষাবিদগণের নিকটে তা শুধু 'আসফারুল আ'রবায়া' নামেই খ্যাত ছিল। আরবী ভাষার সুপণ্ডিতগণ মন্তব্য করেছেন যে,

গ্রন্থখানি এত জটিল ও কঠিন ছিল যে, তার অনুবাদ করা তো দূরের কথা, বিশুদ্ধভাবে তা পাঠ করার লোকও সেকালে সমগ্র ভারতে পাঁচ-দশজনের বেশী ছিল না।

যা হোক গ্রন্থখানির সার্থক এবং সন্তোষজনক অনুবাদের জন্যে অনুবাদ বিভাগ থেকে মাওলানাকে মোটা অংকের পারিশ্রমিক দেয়া হয়।

এ অনুবাদলব্ধ বিরাট অর্থ মাওলানার প্রতিভা বিকাশের সহায়ক হয়। অর্থ হাতে পেয়ে মাওলানা তা দিয়ে "ENCYCLOPAEDIA BRITANICA"-এর সমুদয় খণ্ডগুলো ক্রয় করেন। শুধু তাই নয় এ অর্থের একটা মোটা অংশ তাঁর পরবর্তীকলে প্রকাশিত "তর্জুমানুল কোরআনের" জন্যে নির্দিষ্ট করে রাখেন এবং বাকী অংশের দ্বারা হাদীস, তাফসীর, ফেকাহ ও অন্যান্য মূল্যবান গ্রন্থ খরিদ করেন।

মাওলানার সংগ্রামী জীবন

ইংরেজী ১৯৩২ সাল থেকে মাওলানা মওদূদীর জীবনের এক নতুন অধ্যায় শুরু হয়। আধুনিক ধ্বংসোন্মুখ জগতের বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট মানব সমাজকে একটা বিজ্ঞানসম্মত সরল ও সুষ্ঠু পথের সন্ধান দেবার জন্যেই মাওলানা তাঁর সারা জীবন উৎসর্গ করেছেন, তা কোন জ্ঞানী এবং সুস্থ বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তি অস্বীকার করতে পারে না। সত্য কথা বলতে কি, তাঁর জীবনব্যাপী সাধনা পাপতাপ দগ্ধ জগতের বুকে বলিষ্ঠ ইসলামী আন্দোলন এবং মানব সমাজে একটা নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিপ্লবেরই শুভ সূত্রপাত করেছে।

উনিশ শ' বত্রিশ সালে মাওলানা দাক্ষিণাত্যের হায়দারাবাদ থেকে "তর্জুমানুল কোরআন" নামে একটি মাসিক পত্রিকা বের করেন। তখন থেকেই তিনি পৃথকভাবে বসবাস শুরু করেন। মুয়ায্যামশাহী মার্কেটের সন্নিকটে একটি দোতলা বাড়িতে একজন কর্মচারী নিয়ে সেখান থেকে উক্ত পত্রিকা প্রকাশ করতে থাকেন। তিনি তখনও ছিলেন অবিবাহিত।

একটি পত্রিকা প্রকাশ করা যেমন তেমন কথা নয়। এর জন্য প্রয়োজন আর্থিক স্থিতিশীলতা। কিন্তু বলতে কি, তাঁর কোন আর্থিক সঙ্গতিই ছিল না। না ছিল সহায়-সম্পদ, না পৈত্রিক বাড়ী-ঘর, আর না কোন নিয়মিত মাসিক আয়-উপায়। এ নিয়ে তাঁর বড় ভাইয়ের সঙ্গে অনেক আলাপ-আলাচনা হয়। এমন আর্থিক দৈন্যের ভেতর দিয়ে একটা মাসিক পত্রিকা প্রকাশের সংকল্পের কথা শুনে বড় ভাই বিচলিত হন। তিনি অবশেষে উসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ গ্রেডের একটি প্রফেসারীর পদ মাওলানার জন্যে সংগ্রহ করে তাঁকে পত্রিকা প্রকাশের দুঃসাহস ও ঝুঁকি থেকে বিরত থাকতে বলেন। বড় ভাই ছোট ভাইকে এ বিষয়ে সম্মত করার জন্য ছ'ঘন্টা ধরে বুঝাতে থাকেন। এরপরও মাওলানা ধীর গম্ভীর স্বরে বড় ভাইয়ের নিকট আবেদন জানান–

"আর সময় নষ্ট করা যেতে পারে না। আমার দৃঢ় প্রত্যয় আছে যে, যদি আমার কথায় আন্তরিকতা থাকে, তা হলে আমার অনুপ্রেরণা বিফলে যাবে না।"

তিনি আরও বলেন, "অবস্থা বড়ই সঙ্গিন হয়ে পড়েছে। আমি দেখতে পাচ্ছি যে, প্লাবন আসতে আর বিলম্ব নেই। এ প্লাবন ১৮৫৭ সালের ইংরেজ শাসনের প্লাবন থেকে বেশী মারাত্মক ও ধ্বংসাত্মক হবে। এ বিপদ থেকে মুসলমানদেরকে সাবধান করে দেয়া আমি আমার কর্তব্য মনে করি। আমার সাধ্যমত তাদের কোন না কোন খেদমত করার চেষ্টা আমি করব।"

ছোট ভাইয়ের অকাট্য যুক্তি ও অটুট মনোবল দেখে বড় ভাই নিরস্ত হলেন। উসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের লোভনীয় মোটা বেতনের চাকরির লোভ সংবরণ করে মাওলানা মওদূদী পত্রিকার মাধ্যমে জাতির খেদমতে আত্মনিয়োগ করলেন। লেখনীর মাধ্যমে একটা বিপ্লবী আন্দোলনের সূচনা করলেন।

এটা অবশ্য অনস্বীকার্য যে, কোন আদর্শভিত্তিক আন্দোলন বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে পরিচালিত করতে হলে প্রধানত তিনটি বিষয়ের একান্ত প্রয়োজন হয়।

প্রথমত, যে বিষয়ের আন্দোলন করতে হয়, সে সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান ও দৃঢ় প্রত্যয় এবং আন্দোলন পরিচালনা করার বিজ্ঞানসম্মত কর্মপন্থা আয়ত্ত করতে হয়।

দ্বিতীয়ত, যে আদর্শ প্রচারিত হবে, একদিকে তারই ভিত্তিতে স্বীয় চরিত্র গঠন করতে হয় এবং অপরদিকে তা মানবসমাজে প্রচার করতে হয়।

তৃতীয়ত, উক্ত আদর্শে পূর্ণ চরিত্রবান কতিপয় ব্যক্তির সমন্বয়ে একটি জামায়াত বা দল গঠন করে সে আদর্শ রূপায়ণের জন্য জীবন-মরণ সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হয়।

যে কোন আন্দোলনকে সফলকাম করার এটাই হচ্ছে একমাত্র বিজ্ঞানসম্মত সুষ্ঠু পন্থা। মাওলানা মওদূদীর জীবনকেও আমরা এই তিন ভাগে বিভক্ত দেখতে পাই।

প্রথমত, শৈশবকাল থেকে ১৯৩২ সালের পূর্ব পর্যন্ত- এ সুদীর্ঘকাল তাঁর ইসলাম, ইসলামী আন্দোলন, কোরআন-হাদীস, ফেকাহ্, জেহাদ, যুদ্ধ ও সন্ধি, ইসলামী রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ, বৈদেশিক ও আন্তর্জাতিক নীতি প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞান লাভ করতে কেটে যায়। তাছাড়া তিনি আধুনিক জগতের জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথেও পরিচিত হন।

অতঃপর ১৯৩২ সালে তাঁর জীবনের দ্বিতীয় স্তর শুরু হয়। এসময় তিনি "তর্জুমানুল কোরআন" নামক মাসিক পত্রিকার মাধ্যমে ইসলামী আদর্শ মানব সমাজে তুলে ধরেন।

তৃতীয় স্তরে অর্থাৎ ১৯৪১ সালে কতিপয় আদর্শবান ও চরিত্রবান লোকের সমন্বয়ে একটা ইসলামী জামায়াত বা দল গঠিত হয়। এ দলটি ১৯৭১ সাল পর্যন্ত গোটা ভারত-পাকিস্তানে এবং একাত্তরের পর থেকে অবশিষ্ট পাকিস্তানে ও বাংলাদেশে বিশিষ্ট কর্মপন্থা অনুযায়ী একটানা ইসলামী আন্দোলন পরিচালনা করে আসছে। এই দলটিই 'জামায়াতে ইসলামী' নামে অভিহিত। পাকিস্তানে ১৯৫৮ সালের ৭ই অক্টোবর সামরিক শাসন জারী হওয়ার পর অন্যান্য দলের ন্যায় এটাকেও নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। ১৯৬২ সালের জুলাই থেকে পুনরায় জামায়াত কাজ শুরু করে।

যা হোক, ১৯৩২ সালে প্রতিষ্ঠিত ও প্রকাশিত মাসিক "তর্জুমানুল কোরআন" এ যাবত নিয়মিত সুচারুরূপে চলে আসছে। এই পত্রিকাটির মাধ্যমে তিনি দেশ ও জাতিকে যে উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন এবং ১৯৪১ সালে প্রতিষ্ঠিত জামায়াতে ইসলামীর মাধ্যমে পাহাড়ের মত অটল অচল ইসলামের কিছু সাচ্চা সৈনিক যে তিনি তৈরি করেছেন, তা কারো কাছে অজানা নেই।

মাওলানার সত্যানুসন্ধিৎসা ও বিপ্লবী চিন্তাধারা একটা বিপ্লবেরই ঘোষণা করছিল এবং সে বিপ্লব ছিল পূর্ণ ইসলামী, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক। তিনি পরিপূর্ণরূপে উপলব্ধি করেছিলেন যে, তাঁর অবলম্বিত পথ কন্টকাকীর্ণ, বিপদ-সংকুল ও নিঃসঙ্গ। তবু সত্যের আহ্বান তাঁকে পাগল করেছিল। একাধারে পাশ্চাত্য ধর্মহীন পুঁজিবাদী সভ্যতা মানব সমাজকে নিষ্পেষিত করছে এবং তারই প্রতিক্রিয়াস্বরূপ অপরদিকে কমিউনিজম বা সাম্যবাদের মায়া-মরীচিকা মানবের মৌলিক অধিকার হরণ করে তাঁকে পশুর খোঁয়াড়ে আবদ্ধ করছে। ইসলামী শিক্ষাবিবর্জিত মুসলমান কওম মানসিক বিভ্রান্তির প্লাবনে ভেসে চলেছে। ঠিক এ সংকট সন্ধিক্ষণেই মাওলানা মওদূদী কোরআনে করীম ও সুন্নাতে রাসূলের মশাল জ্বালিয়ে মানুষকে সত্য পথের দিকে আহ্বান জানালেন। তাঁর পরিষ্কার জানা ছিল, এ পথ নয় কুসুমাস্তীর্ণ, বরঞ্চ অতি বন্ধুর, অতি বিপদ-সংকুল। তবু এ পথেই তিনি ছুটেছিলেন নির্ভীক চিত্তে। প্রথমত, বন্ধু-বান্ধব উপহাস করলো পাগল বলে। আত্মীয়-স্বজন দূরে সরে দাঁড়ালো হতাশার দীর্ঘশ্বাস ফেলে। সহযাত্রীগণ থমকে গেল পথিমধ্যে। কিন্তু থেমে গেল না তাঁর যাত্রা। মন্দীভূত হলো না তাঁর গতি, দমে গেলো না তাঁর হৃদয়-মন।

আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ

মাওলানা তাঁর প্রথম প্রকাশনা "আল জিহাদু ফিল্ ইসলাম' গ্রন্থের মাধ্যমেই আল্লাহ্‌র পথে জেহাদ শুরু করেন। এ হলো লেখনীর দ্বারা জেহাদ।

গ্রন্থখানার বিষয়বস্তু সম্পর্কে আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। এটা তাঁর প্রাথমিক জীবনে প্রণীত হলেও এর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু সম্পর্কে তাঁর যে গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়, তা ভূমিকাদৃষ্টেই বেশ উপলব্ধি করা যায়। তাঁর খোদাভীতি, খোদাপ্রেম এবং ইসলামের বিজয় গৌরব ও প্রাধান্য বিস্তারের অদম্য অনুপ্রেরণার পরিচয় এ গ্রন্থের প্রতি পৃষ্ঠায় মূর্ত হয়ে উঠেছে। তিনি গ্রন্থখানির প্রথম সংস্করণে যে ভূমিকা লিপিবদ্ধ করেন, পাঠকগণের অবগতির জন্য তা উদ্ধৃত করছিঃ

"আধুনিক যুগে ইউরোপ রাজনৈতিক স্বার্থের খাতিরে ইসলামের প্রতি যে সব মিথ্যা ও ভিত্তিহীন অপবাদ আরোপ করেছে, তার মধ্যে মারাত্মক অপবাদ এই যে, ইসলাম এটা রক্তক্ষয়ী ধর্ম এবং এটা তার অনুসারীদেরকে রক্তমন্ত্রে দীক্ষিত করে। এ সকল অপবাদের মূলে যদি কোন সত্য নিহিত থাকতো, তাহলে সম্পূর্ণ স্বাভাবিকভাবে তা ঠিক ঐ সময়েই আরোপিত হত, যখন মুসলমানদের দিগ্‌বিজয়ে দুনিয়া কেঁপে উঠেছিল। প্রকৃতপক্ষে সেই সময়েই এ ধরণের সন্দেহের উদ্রেক হতে পারতো যে, উক্ত বিজয়-অভিযান রক্তক্ষয়ী ধর্মীয় শিক্ষারই পরিণাম ফল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, ইসলামের গৌরব-রবি অস্তমিত হওয়ার বহুকাল পরে উক্ত অপবাদ উত্থাপিত হয়েছে। অপবাদের এই স্বকল্পকল্পিত প্রতিমায় এমন এক সময়ে আত্মা ফুৎকারিত হয়, যখন ইসলামের তরবারি ভোঁতা হয়ে পড়েছে। পক্ষান্তরে ঠিক সেই সময়ে ইউরোপের নগ্ন তরবারি নিষ্পাপ মানব সন্তানের তাজা রক্তে রঞ্জিত হচ্ছিল। বিরাটকায় অজগর যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীব-জন্তুকে দংশন ও গলধঃকরণ করে, ইউরোপও তেমনি সে সময়ে দুর্বল জাতিগুলোকে টপাটপ্ গিলে ফেলছিল। সেকালে জগতে যদি কারো কণামাত্রও শুভবুদ্ধির উদয় হতো, তা হ'লে অবশ্যই প্রশ্ন উঠত যে, যারা স্বয়ং দুর্বলের তাজা রক্তে পৃথিবীতে রক্তের নদী প্রবাহিত করছে এবং অন্যান্য জাতির প্রতি দস্যুবৃত্তি করছে, ইসলামের প্রতি দোষারোপ করার কোন অধিকার কি তাদের আছে? বরঞ্চ তারা নিজেরাই

ছিল সে দোষে দোষী। তাদের যাবতীয় ইতিহাস মন্থন ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিতর্কের পশ্চাতে এরূপ দুরভিসন্ধিই কি ছিল না যে, জগতের ঘৃণা ও ক্রোধের যে প্রবল বন্যা তাদের দিকে প্রবাহিত হওয়ার উপক্রম হয়েছিল, তার গতিবেগ ইসলামের দিকে প্রবাহিত করবে? কিন্তু মানবের এ এক স্বাভাবিক দুর্বলতা যে, যখন সে যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজয় বরণ করে, তখন সে শিক্ষাক্ষেত্রেও পরাভূত হয়। যার অসির আঘাতে সে পরাস্ত হয়, তার মসির আঘাতও সে বরদাশত করতে পারে না। এ জন্যেই প্রত্যেক যুগে জগতে ঐ সকল চিন্তা ও মতবাদ প্রভাব বিস্তার করে, যা তরবারির আশ্রয়পুষ্ট হয়ে আত্মপ্রকাশ করে। বস্তুত এ ব্যাপারে জগতের চোখে ধূলি নিক্ষেপ করতে ইউরোপ সাফল্য লাভ করলো। ফলে দাস মনোভাবাপন্ন জাতিসমূহ ইসলামী জেহাদ সম্পর্কে উত্থাপিত ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি বিনা বিচারে ও বিনা চিন্তা-গবেষণায় আসমানী 'ওহী'র ন্যায় ধ্রুব সত্য বলে গ্রহণ করলো।

বিগত শতাব্দীতে এবং বর্তমান কালেও মুসলমানদের পক্ষ থেকে বারংবার উপরিউক্ত অভিযোগগুলোর প্রত্যুত্তর দেয়া হয়েছে। এ বিষয়ে এত অধিক আলোচনা হয়েছে যে, বিষয়টি এখন এক প্রকার বাহুল্য ও পরিত্যক্ত বলে বিবেচিত হয়। কিন্তু এসব প্রত্যুত্তরে আমি যে সব ত্রুটি লক্ষ্য করেছি, তা এই যে, ইসলামের আত্মপক্ষ সমর্থনকারীগণ যেন প্রতিপক্ষের দ্বারা অভিভূত হয়ে আসামীর কাঠগড়ায় দণ্ডায়মান এবং অপরাধীর ন্যায় সাফাই পেশ করতে প্রস্তুত। কোন কোন মহাত্মা এতদূরও অগ্রসর হয়েছেন যে, মামলাকে স্বপক্ষে মজবুত করার জন্যে ইসলামী শিক্ষা ও রাজনীতি রদবদল ও সংশোধন করে ফেলেছেন। উপরন্তু প্রতিপক্ষের ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে যে সকল বিষয় তিনি আপন বিবেচনায় মারাত্মক মনে করেন, তা ইসলামের ইতিহাস থেকে অপসারিত করতে চেষ্টিত হয়েছেন। যাতে করে তা বিরোধীদের দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারে। যাঁদের মধ্যে আবার এসব ত্রুটি দেখা যায় না, তাঁদের জবাবও অসম্পূর্ণ রয়ে যায়- এ কারণে যে, তাঁরা জেহাদ ও ইসলামী যুদ্ধ সম্পর্কে ইসলামী শিক্ষার পূর্ণ আলোকপাত করেন না। তাঁরা যেন এসব বিষয় ধামাচাপা দিতে সচেষ্ট, যার ফলে এ সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ রয়ে যায়।

বিভ্রান্তি দূর করার জন্যে প্রয়োজন হচ্ছে আল্লাহ্‌র দ্বীন ও বাণীকে সমুন্নত করার উদ্দেশ্যে আল্লাহ্‌রই পথে জেহাদ ও যুদ্ধ বিগ্রহ সম্পর্কিত ইসলামী শিক্ষা ও আইন-কানুনকে কোরআন, সুন্নাহ্ ও ফেকাহ্ শাস্ত্রের আলোকেই বিশ্লেষণ করা।

এসব আইন কানুনের কোনটিরই কণামাত্র পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা চলবে না। ইসলামের মূল উদ্দেশ্য ও শিক্ষাকে পরিবর্তনের কোন চেষ্টা করা চলবে না। নিজের ধারণা-বিশ্বাস যে অপরের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী নতুন করে প্রচার করতে হবে এ বিষয়ে আমার মৌলিক মতভেদ রয়েছে। পৃথিবীতে এমন কোন সমস্যাই নেই, যে সম্পর্কে সকলে একই দৃষ্টিভঙ্গিসহ একমত হবে। প্রতিটি দলের স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি আছে এবং তাকেই সে অভ্রান্ত মনে করে। আমরা অপরের দৃষ্টিভঙ্গির খাতিরে নিজস্ব মৌলিক বিশ্বাস যতই রঞ্জিত করে উপস্থাপিত করিনা কেন, বিভিন্ন মতবাদের লোক তার সাথে একমত হবে তা কখনো সম্ভব নয়। অতএব উৎকৃষ্টতর পন্থা এই যে, আমরা আমাদের বিশ্বাস ও মতবাদ, সমস্যাবলী, শিক্ষা ও রাজনীতির সত্যিকার চিত্রটিই পরিস্ফুট করব এবং উৎকৃষ্টতম পন্থায় জগতকে আপন দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে অবহিত করব। অতঃপর সেটা তাদেরই জ্ঞান বিবেকের উপর ছেড়ে দেব। যদি সে তা গ্রহণ করে অতি উত্তম। যদি গ্রহণ না করে তাতেও আমাদের কোন পরোয়া নেই। সত্যের আহ্বান ও প্রচারণার এটাই একমাত্র সুষ্ঠু পন্থা। আম্বিয়ায়ে কেরাম (আঃ) এবং দৃঢ় সংকল্প সত্যাশ্রয়ী মহাপুরুষগণ এ পথই অবলম্বন করেছেন।

আমি বহুদিন যাবৎ এর আবশ্যকতা অনুভব করছিলাম। কিন্তু এ অনুভূতি থাকা সত্ত্বেও এ বিষয়ে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারিনি। তার একমাত্র কারণ সময়ের অভাব। কেননা, সাংবাদিকের ভাগ্যে সময় ও অবসর বলতে কমই ঘটে থাকে, তা সর্বজনবিদিত। কিন্তু ১৯২৬ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষের দিকে এক ঘটনা ঘটে গেল, যা আমাকে বহু অসুবিধার ভেতর দিয়েও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে বাধ্য করলো। ঘটনাটি এই যে, শুদ্ধি আন্দোলনের নেতা স্বামী শ্রদ্ধানন্দ নিহত হন। এরই সুযোগে নির্বোধ ও সংকীর্ণমনা লোকেরা ইসলামী জেহাদ সম্পর্কে বিভ্রান্তি ছড়াতে থাকে। কারণ দুর্ভাগ্যবশত এ হত্যাকাণ্ডের জন্য একজন মুসলমান অভিযুক্ত হয় এবং সংবাদপত্রে এই বলে প্রচারণা চালানো হয় যে, উক্ত ব্যক্তি স্বামী শ্রদ্ধানন্দকে তার ধর্মীয় দুশমন বলেই হত্যা করেছে। উপরন্তু এও প্রচার করা হয় যে, এ কাজের জন্য সে বেহেশ্‌ত লাভ করবে বলে তার বিশ্বাস ছিল। প্রকৃত রহস্য তো অন্তর্যামীই জানেন। তবে জনসাধারণের কাছে ঘটনার এরূপ চিত্রই প্রকাশ করা হয়েছিল। এ কারণেই সাধারণভাবে ইসলাম বৈরীদের মধ্যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। অতঃপর আলেমদের

ঘোষণা, ইসলামী প্রচার পুস্তিকা প্রকাশ এবং সমাজের মনীষীবৃন্দের সর্বসম্মত বিবৃতি বিশ্লেষণ সত্ত্বেও তারা ঘটনাটিকে স্বাভাবিক পর্যায়ে সীমাবদ্ধ না রেখে সমগ্র মুসলিম জাতি এবং ইসলামী শিক্ষাকে এ হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী করলো। পবিত্র কোরআনের বিরুদ্ধেও তারা এরূপ অপবাদ রটালো যে, এটা মুসলমানদেরকে এমন ধর্মান্ধ বানিয়ে দেয় যে, তারা প্রত্যেকটি কাফেরকে হত্যা করা অবশ্য কর্তব্য বলে মনে করে এবং এর দ্বারা জান্নাতবাসী হওয়ার আশাও পোষণ করে। কতক প্রগল্ভ ব্যক্তি এতদূর পর্যন্ত মন্তব্য করে বসে যে, যতদিন কোরআনের শিক্ষা প্রচলিত থাকবে, ততদিন শান্তি স্থাপিত হবে না। অতএব মানব জাতিকে এর বিলোপ সাধনের জন্য সচেষ্ট হতে হবে। এ সমস্ত ভ্রান্ত মতবাদ এত অধিক পরিমাণে প্রচারিত হয় যে, সুস্থ মস্তিষ্ক ব্যক্তিও হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে। এমন কি হিন্দু সম্প্রদায়ের সর্বশ্রেষ্ঠ বিচক্ষণ ব্যক্তি গান্ধীজীও উক্ত প্রচারণায় প্রভাবান্বিত হয়ে মন্তব্য করে বসলেন ঃ

"ইসলাম এমন এক পরিবেশে জন্মলাভ করেছে যে, তার সকল সিদ্ধান্ত তরবারির দ্বারাই সম্পন্ন করা হতো এবং এখনো তা করা হচ্ছে।"

যদিও এসব প্রচারণা কোন সত্যানুসন্ধান ও দার্শনিক আলোচনাপ্রসূত ছিল না বরঞ্চ প্রচারকদের ওস্তাদগণ আবহমানকাল থেকে তাদেরকে যা শিক্ষাদান করেছিল অবিকল তাই তারা তোতাপাখির মতো আওড়াচ্ছিল, তথাপি একটা অসাধারণ ঘটনা এসব অন্ধবিশ্বাসের মধ্যে এমন এক রং লাগিয়ে দিলো যার দ্বারা অজ্ঞ লোক সহজেই প্রতারিত হতে পারে। বস্তুত এ ধরনের ভ্রান্ত ধারণা ইসলাম প্রচার কার্যে সর্বদাই বাধার সৃষ্টি করেছে। এরূপ অবস্থাতেই ইসলামের প্রকৃত শিক্ষাকে উজ্জ্বলতর করার প্রয়োজন হয়, যেন মেঘচ্ছটার অবসানে রবিকর তার উজ্জ্বল কিরণরশ্মিসহ উদিত হতে পারে। এ জন্যেই সংবাদপত্র চালাবার পরে যে অবসর টুকু পেতাম, তাই এ বিষয়ে প্রবন্ধ লেখার কাজে ব্যয় করতে লাগলাম। সঙ্গে সঙ্গে 'আল জমিয়ত' পত্রিকার মাধ্যমেও তা প্রকাশ লাভ করতে লাগলো।

প্রথমত, এ বিষয়ে একটা সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ লিখতেই মনস্থ করেছিলাম। কিন্তু আলোচনা শুরু হওয়ার পর প্রসঙ্গক্রমে বিষয়বস্তুর বিভিন্ন দিকে আলোকপাত করার প্রয়োজন হয়ে পড়লো বলে সংবাদপত্রের স্তম্ভ এর জন্য নিতান্তই অপর্যাপ্ত হলো। অতএব বাধ্য হয়ে তেইশ-চব্বিশ সংখ্যা প্রকাশিত হওয়ার পর সংবাদপত্রে এর প্রকাশ বন্ধ করে দিলাম। তারপর বিষয়টি পরিপূর্ণরূপে এই গ্রন্থাকারে প্রকাশ

করছি। যদিও এ গ্রন্থে বিভিন্ন বিষয়ের বিভিন্ন দিক আলোচনা করা হয়েছে, তথাপি সময়ের অভাবে অনেক বিষয় অসমাপ্ত রাখতে বাধ্য হলাম। যেসব বিষয়ে এক একটি অধ্যায় রচিত হওয়া উচিত ছিল, তা সংক্ষেপে দু'এক ছত্রে শেষ করেছি। এ গ্রন্থ প্রণয়নে যে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রেখেছি তা হচ্ছে এই যে, এর কোথাও নিজের অথবা কারো ব্যক্তিগত মন্তব্য সন্নিবেশিত করিনি। বরঞ্চ সমগ্র মৌলিক ও খুঁটিনাটি বিষয় কোরআনে পাকের আলোকেই লিপিবদ্ধ করেছি। কোথাও এর বিশদ ব্যাখ্যার প্রয়োজন বোধ করলে, হাদীস গ্রন্থাবলী, নির্ভরযোগ্য ফেকাহের গ্রন্থাবলী এবং নির্ভরযোগ্য সঠিক তাফসীরগুলোর সাহায্য গ্রহণ করেছি। এসব দেখে প্রতিটি পাঠক যেন বুঝতে পারেন যে, বর্তমান জগতের সাথে তাল রেখে এ গ্রন্থে কোন নতুন বিয়য় সৃষ্টি করা হয়নি। বরঞ্চ এতে যা কিছু বলা হয়েছে তার সবটুকুই আল্লাহ তাঁর প্রিয় রাসূল (সাঃ) এবং আম্বিয়ায়ে কেরামের (আঃ) বাণীর ভিত্তিতেই বলা হয়েছে।

যে সকল অমুসলমান নিছক বিদ্বেষ ভাবাপন্ন হয়ে ইসলামের প্রতি অন্ধ দুশমনি পোষণ করেন না, তাদের কাছে আমার নিবেদন, তাঁরা যেন এ গ্রন্থের মাধ্যমে যুদ্ধ সম্পর্কিত প্রকৃত ইসলামী শিক্ষা লাভ করার চেষ্টা করেন। অতঃপর এর বিরূদ্ধে কিছু বলার থাকলে যেন তা বলেন। এর পরেও যদি কারও মনে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে, তা দূর করার চেষ্টা করব।

দিল্লী

১৫ই জুন, ১৯২৭ সাল। আবুল আ'লা।

এ গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়বস্তু

এ বিরাট গ্রন্থখানার প্রথম পাঁচটি অধ্যায়ে ইসলামী জেহাদের মর্যাদা, আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ, ইসলাম প্রচার ও তরবারি এবং যুদ্ধ ও সন্ধি সম্পর্কে ইসলামী আইন কানুনের উপর বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে হিন্দু, বৌদ্ধ, ইহুদী ও খ্রিষ্টান ধর্মের যুদ্ধনীতি। সপ্তম অধ্যায়ে বর্তমান সভ্যতার অধীনে পরিচালিত যুদ্ধ-সন্ধিকে আলোচনার বিষয়বস্তু করা হয়েছে।

এ কথা দ্বিধাহীন চিত্তে বলা যেতে পারে যে, বিষয়টির উপর এমন তথ্যবহুল যুক্তিপূর্ণ ও প্রামাণ্য গ্রন্থ দুনিয়ার কোন ভাষায় কোন গ্রন্থকারের দ্বারা লিখিত হয়নি। এ সম্মান ও খ্যাতি আল্লাহ তায়ালা দান করেন মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীকে।

তর্জুমানুল কোরআন

উপরে বলা হয়েছে "আল জিহাদু ফিল ইসলাম" গ্রন্থের দ্বারা মাওলানা মওদূদী নিজে সবচেয়ে বেশী উপকৃত হয়েছেন। এ থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করে তিনি পাঁচ-ছয় বছর যাবত গভীর অধ্যয়ন ও জ্ঞানার্জনের পর ১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্যের হায়দারাবাদ থেকে মাসিক পত্রিকা 'তর্জুমানুল কোরআন' প্রকাশ করে বিরামহীন সংগ্রাম শুরু করেন। একাকী আর্থিক দৈন্যের ভেতর দিয়ে একটা সুপ্ত জাতিকে জাগ্রত করে সত্যের পথে পরিচালিত করতে তিনি যে বিপ্লবী আহবান জানিয়েছিলেন, তর্জুমানুল কোরআনের পাতায় পাতায় তার স্বাক্ষর পাওয়া যায়।

তর্জুমানুল কোরআনের প্রকাশনা

ইংরেজী ১৯৩১ সালের ৩১শে জুলাই মাওলানা মওদূদী দিল্লী থেকে হায়দারাবাদ প্রত্যাবর্তন করেন। হায়দারাবাদ শহরে জনৈক নেক্‌দিল মুসলমান আবু মুহাম্মদ মুসলেহ সাহেব 'তর্জুমানুল কোরআন' নামে একখানা মাসিক পত্রিকা কিছুদিন যাবত বের করছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল কোরআনের পবিত্র বাণী ঘরে ঘরে পৌঁছে দেয়া। তিনি মাওলানা মওদূদীর প্রজ্ঞা, প্রতিভা, সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে প্রশংসনীয় দক্ষতা এবং সর্বোপরি তাঁর অসাধারণ ইসলামী জ্ঞানের প্রতি মুগ্ধ হয়ে তর্জুমানুল কোরআনের সম্পাদনার ভার তাঁর উপর ন্যস্ত করেন। ইসলামী দাওয়াত ও আন্দোলনের কাজে পত্রিকাটিকে পুরোপুরি ব্যবহার করতে পারবেন মনে করে মাওলানা এ দায়িত্ব-ভার গ্রহণ করেন। তখন থেকে পত্রিকাটির পশ্চাৎ পৃষ্ঠায় (Back Page) নিম্নের কথাগুলো প্রতি মাসে ছাপা হতে থাকে ঃ

"সমগ্র ভারতে এ ধরনের পত্রিকা মাত্র একটি। এর একমাত্র উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর কালেমা বুলন্দ করা ও জিহাদ ফী-সাবীলিল্লাহর ডাক দেয়া। দুনিয়ায় যেসব চিন্তাধারা, মতবাদ ও সভ্যতা-সংস্কৃতির মূলনীতি ছড়ানো হচ্ছে, কোরআনের দৃষ্টিকোণ থেকে তার পর্যালোচনা-সমালোচনা করা, দর্শন, বিজ্ঞান, রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি ও সামাজিকতা– মোটকথা প্রতিটি বিষয়ের কোরআন ও সুন্নাহর উপস্থাপিত মূলনীতির আলোকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা এ পত্রিকাটির মূল লক্ষ্য ও আলোচ্য বিষয়। এ পত্রিকাটি উম্মতে মুসলেমাকে এক নব জীবনের দাওয়াত দিচ্ছে। তার দাওয়াতের সারমর্ম ঃ "নিজের মন-মস্তিষ্ককে মুসলমান বানাও। জাহেলিয়াতের রীতি-পদ্ধতি পরিহার করে ইসলামের সিরাতুল মুস্তাকীমের উপরে চলো। কোরআন হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়ো এবং দুনিয়ার বুকে বিজয়ীর বেশে অবস্থান কর।"

উল্লেখ্য যে, আবু মুহাম্মদ মুসলেহ সাহেবের মালিকানাধীন যে তর্জুমানুল কোরআনের সম্পাদনা মাওলানা করছিলেন, ১৯৩২ সালের প্রারম্ভেই তার মালিকানা তিনি খরিদ করে স্বাধীনভাবে দ্বীন ও মিল্লাতের খেদমতে আত্মনিয়োগ করেন।

তাঁর সম্পাদনায় ১৯৩২ সালে তর্জুমানুল কোরআনের প্রথম সংখ্যার তৃতীয় পৃষ্ঠায় তিনি বলেন ঃ "ইসলামকে তার প্রকৃত আলোকে পেশ করতে হবে, যে আলোকে কোরআন হাকীম তাকে পেশ করেছে।"

পঞ্চম পৃষ্ঠায় বলেন ঃ "মুসলমান-অমুসলমান নির্বিশেষে সকলকেই কোরআন উপলব্ধি করতে সাহায্য করতে হবে---- এবং ঐসব সন্দেহ সংশয় দূর করতে হবে--- যা কোরআন অধ্যয়নকারীদের মনে সৃষ্টি হয়।

পত্রিকাটির ১৫০ পৃষ্ঠায় জীবন সম্পর্কে ইসলামী ধারণা সম্ভবতঃ তিনিই প্রথম এভাবে পেশ করেন-

"ইসলামের দৃষ্টিতে দুনিয়া না তো এমন কোন পরিত্যাজ্য ঘৃণ্য ও বস্তু আর না এমন কোন বস্তু যার প্রতি মানুষ মোহাবিষ্ট হয়ে পড়বে। আর না তার আনন্দ সম্ভোগে নিজেকে বিলীন করে দেবে। না সে একেবারে প্রশান্তি, আর না একেবারে অমঙ্গল, অশান্তি। তার থেকে দূরে থাকাও ঠিক নয় এবং পুরোপুরি তার মধ্যে নিমজ্জিত থাকাও ঠিক নয়। না সে পুরোপুরি অপবিত্র ও আবিলতাপূর্ণ, আর না পুরোপুরি পবিত্র-পরিচ্ছন্ন। তারপর এ দুনিয়ার সাথে মানুষের সম্পর্ক তো এমন হওয়া উচিত নয়- যেমন রাজ্যের সাথে বাদশাহের হয়ে থাকে। এমনও হওয়া উচিত নয়- যেমন কোন কয়েদীর জেলখানার সাথে হয়ে থাকে। মানুষ এতটা তুচ্ছ নগণ্য নয় যে, প্রতিটি বস্তুর সামনে সে মাথা নত করবে। আর এতটা বিজয়ী ও পরাক্রমশালী নয় যে, প্রতিটি বস্তু তার সামনে মাথা নত করবে। সে এতটা অসহায় নয় যে, তার ইচ্ছা কোন বস্তুই নয় এবং সে এতটা শক্তিশালী নয় যে, তার ইচ্ছা ও মর্জিই সব। না সে সৃষ্টিজগতের নিরঙ্কুশ শাসক, আর না সে অসংখ্য অগণিত প্রভুর অসহায় গোলাম। প্রকৃত সত্য যা কিছু তা হলো এ দুই প্রান্তিকতার মাঝে এক মধ্যম অবস্থা।

তাঁর পত্রিকা দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করলে তিনি সম্পাদকীয় প্রবন্ধে মন্তব্য করেন-

'তর্জুমানুল কোরআন' আমার সম্পাদনায় প্রথম বর্ষ অতিক্রম করে দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করছে। এই এক বছরের মধ্যে আল্লাহ তায়ালা তাঁর দ্বীন এবং অমূল্য গ্রন্থ কোরআন পাকের খেদমত করার যে শক্তি আমাকে দিয়েছেন এবং কঠিন নৈরাশ্যজনক অবস্থার ভেতর দিয়েও যেভাবে আমাকে এ কাজের জন্যে অটল ও অবিচল রেখেছেন তার জন্যে তাঁর শুকরিয়া জ্ঞাপন করা আমার

একান্ত কর্তব্য বলে মনে করি। অবশ্য তাঁর অনুগ্রহ ও দানের তুলনায় আমার এ কৃতজ্ঞতা অতি নগণ্য। যে অবস্থার ভেতর দিয়ে আমি এ পত্রিকার সম্পাদনা ভার গ্রহণ করি এবং পরবর্তী সময়ে যে সকল বিপদের সম্মুখীন আমাকে হতে হয়, তাতে যদি আমি একমাত্র খোদার উপর ভরসা না করে পার্থিব উপায়-উপাদান এবং নিজের শক্তি সামর্থ্যের উপর নির্ভর করতাম তাহলে নিশ্চয়ই আমি হতাশ হয়ে পড়তাম। কিন্তু খোদাকে ধন্যবাদ, পার্থিব কোন কিছুর উপরই আমার কণামাত্র ভরসা ছিল না এবং একমাত্র আল্লাহরই অনুগ্রহের উপর নির্ভর করেছিলাম। খোদার এ প্রতিশ্রুতি অক্ষরে অক্ষরে সত্য যে, যে ব্যক্তি তাঁরই পথে ধৈর্য ও নিষ্ঠা সহকারে চেষ্টা-চরিত্র করে, তার সাফল্য সুনিশ্চিত এবং দুঃখ-কষ্টও তাকে স্পর্শ করতে পারে না।" (তর্জুমানুল কোরআন, মুহররম, ১৩৫৩ হিঃ)।

বিরাট বিপদ ও আর্থিক দৈন্যের সম্মুখীন হয়েও মাওলানা মওদূদী মানুষের নিকট সাহায্য প্রার্থনা বা নতি স্বীকার করেন নি। এটা প্রভুর সাথে তাঁর গভীর সম্পর্কেরই পরিচায়ক। হায়দারাবাদ নিযাম রাজ্যের ধর্মীয় বিভাগ প্রতি বছর কয়েক শত সংখ্যা তর্জুমানুল কোরআন ক্রয় করত। একবার তা বন্ধ করে দেয়া হয়। নওয়াব যুল কদর জঙ বাহাদুর উক্ত বিভাগের কর্মকর্তা ছিলেন। তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করলেন যে, মাওলানা স্বয়ং তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে অনুরোধ ও তোষামোদ করলে তিনি তাঁর পত্রিকা অধিক সংখ্যায় পুনর্বার খরিদ করার ব্যবস্থা করবেন। মাওলানা এ সংবাদ শুনে বললেন, "আমি কিয়ামত পর্যন্ত জীবিত থাকলেও তাঁর কাছে যাব না। কারণ, এ আমার ব্যক্তিগত কাজ নয়, বরং দ্বীনের কাজ।"

এর ফলে স্বাভাবিকভাবেই মাওলানাকে বিরাট আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়েছিল।

পত্রিকাটি তৃতীয় বর্ষে পদার্পণ করলে মাওলানা নিম্নোক্ত সম্পাদকীয় লেখেন–

"এ মাস থেকে 'তর্জুমানুল কোরআনের' তৃতীয় বর্ষ শুরু হচ্ছে। প্রথম বছর দৈন্যের ভেতর দিয়ে কেটেছে। দ্বিতীয় বছর খোদার অনুগ্রহে কিছুটা স্বাচ্ছল্য দেখা যায়। তৃতীয় বছর পুনরায় বিপদ ও দৈন্যের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু যাই হোক, সুখে-দুঃখে একমাত্র আল্লাহ্‌রই উপর নির্ভর করতে হবে। কারণ তিনিই একমাত্র নির্ভরযোগ্য ও ভরসা-স্থল। তিনি তো দৃঢ়তার সাথে বলেছেন যে,

নিশ্চয়ই দুঃখের পরে সুখ আসবে এবং তা অনিবার্য। অতএব, আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, যদি আমরা বিপদেও দ্বীনের খেদমতে অটল থাকি এবং আল্লাহকেই একমাত্র সাহায্যকারী ও মনোবাঞ্ছা পূরণকারী মনে করে তাঁর উপর নির্ভর করে থাকি, তা হলে তাঁর অনুগ্রহ-কণা সুখের আকারে আমাদের সম্মুখে এসে দাঁড়াবে। আমরা জানি যে, যাবতীয় বিপদ, লাঞ্ছনা ও দুঃখ-দারিদ্র্য আমাদের পরীক্ষার জন্যেই হয়ে থাকে।"

উক্ত সম্পাদকীয় প্রবন্ধে তিনি আরও বলেন,

"বর্তমান মুসলমান জাতির অবস্থা এক অনুর্বর ভূমিখন্ডের ন্যায়, সেখানে নিকৃষ্ট গাছপালা প্রভূত পরিমাণে উৎপন্ন হয়। কিন্তু উৎকৃষ্ট ধরনের বৃক্ষ সেখানে উৎপন্ন হতে পারে না। আমাদের চোখের সামনে বহু কল্যাণ ও মঙ্গলের বীজ মাটির তলায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। কোথাও আবার বীজ অংকুরিত হলেও তা মূল বিস্তার করতে না পেরে শেষ হয়ে গেল। ..... কিন্তু আমার মতে কোন পুরুষ মুসলমানের কাজ এ হতে পারে না যে, ভূমির অনুর্বরতা, মওসুমের প্রতিকূল আবহাওয়া এবং পানির স্বল্পতা দেখে তাকে নিরুৎসাহে বসে থাকতে হবে। আদিকাল থেকে এটাই তো প্রকৃতির বিধান রয়েছে যে, অনুর্বর জমিতে হাল কর্ষণ করতে হবে, তার কাঠিন্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে। আপন ঘর্ম এমন কি প্রয়োজন হলে রক্তবিন্দুর দ্বারাও সেই মাটিকে সিক্ত করতে হবে এবং ফলাফলের চিন্তা না করে বীজ বপন করতে হবে। যদি তার চেষ্টায় অনুর্বর জমি শস্য শ্যামল হয়ে পড়ে, তা হলে তো কোন কথাই নেই। কিন্তু যদি সেই অনুৎপন্ন জমিতে তার সারা জীবন ব্যর্থ পরিশ্রমে কাটিয়ে অবশেষে একদিন মৃত্যুবরণ করে, তবুও প্রকৃতপক্ষে এটা তার পরাজয় নয়। একি তার কম সাফল্যের কথা যে, যে কাজকে সে অবশ্য করণীয় (ফরয) মনে করতো, সে তার জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তার উপরেই অবিচল ছিল এবং কোন ব্যর্থতাই তাকে কর্তব্য-কর্ম থেকে বিমুখ করতে পারে নি? (তর্জুমানুল কোরআন, মুহররম, ১৩৫৪ হিঃ)

খোদার প্রেম ও ভালবাসা, তাঁর সাথে গভীর নিবিড় সম্পর্ক, তাঁরই উপর নির্ভরশীলতা এবং তাতেই আত্মবিলীনতা-- এসব কিছুই ঐ সব পথিকের পাথেয় যারা চলতে চায় আল্লাহর পথে। মাওলানা মওদূদীর চরিত্রেও আমরা এ সবেরই পরিচয় পাই। উপরিউক্ত সম্পাদকীয় প্রবন্ধ এবং তাঁর প্রত্যক্ষ কার্যকলাপ তাই নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে।

তর্জমানুল কোরআন চতুর্থ বর্ষে পদার্পণ করলে তিনি তার সম্পাদকীয় স্তম্ভে মন্তব্য করেন–

"এটা কি খোদার কম অনুগ্রহ যে, দ্বীনের বিরাট খেদমতের জন্যে তিনি আমার ন্যায় একজন নগণ্য ব্যক্তিকে কাজে লাগিয়েছেন? যদি জ্ঞান, খোদাভীতি, ঐকান্তিকতা এবং জাহেরী ও বাতেনী পূর্ণ জ্ঞানের ভিত্তিতে কোন ব্যক্তিকে এ কাজে নিযুক্ত করা হতো তা হলে কস্মিনকালেও আমি এ কাজের যোগ্য বিবেচিত হতাম না। উপরন্তু তাঁর অধিকতর অনুগ্রহ এই যে, আমার সমস্ত ত্রুটি বিচ্যুতি উপেক্ষা করা হয়েছে। আমি জ্ঞানহীন ছিলাম তিনি আমাকে জ্ঞান দান করেছেন। পথভ্রষ্ট ছিলাম, তিনি সুপথ দেখিয়েছেন। অনন্যোপায় ও নিরুৎসাহ ছিলাম। তিনি আমাকে ধৈর্য, সাহস এবং আপন সংকল্পে দৃঢ়তা দান করেছেন। সহায় সম্বলহীন ছিলাম--তিনি অদৃশ্য ভাণ্ডার থেকে প্রতি পদে পদে সাহায্য দান করেছেন এবং প্রতিটি বিপদকে এমন সহজ করে দিয়েছেন যে, তা আমার কল্পনার অতীত। আমি জ্ঞান পিপাসু-- তিনি ব্যতীত এ পিপাসা নিবারণ করার আর কেউ নেই। আমার জ্ঞান বুদ্ধিতে অগণিত ত্রুটি বিচ্যুতি আছে। তা দূর করার যদি কেউ থাকেন তো একমাত্র তিনিই আছেন। আমার মন ব্যাকুল, আত্মা অধীর চঞ্চল, আমার মস্তিষ্ক অশান্ত। একমাত্র তিনিই আমার এ ব্যাধি নিরাময় করতে পারেন। আমি পাপ সমুদ্রে ডুবে আছি। আমার কাজে অসংখ্য দোষ-ত্রুটি আছে। স্বাভাবিক দুর্বলতা আমাকে পদে পদে খোদার সন্তুষ্টি বিধানের পথ থেকে বিচ্যুত রাখছে। খোদা ব্যতীত আর এমন কেউ নেই যিনি আমার এ দোষগুলি দূর করতে পারেন। আমি তাঁর নিকট সুষ্ঠু চিন্তাশক্তি ও পরিচ্ছন্ন দৃষ্টিভঙ্গি প্রার্থনা করছি। একমাত্র আল্লাহরই জন্যে ভালবাসা ও হিংসা পোষণ করার শক্তি প্রার্থনা করছি।"

(তর্জুমানুল কোরআন, মুহররম, ১৩৫৫ হিঃ)

একজন খোদাপ্রেমিক ও একনিষ্ঠ সাধকের অন্তরাত্মার অভিব্যক্তিই উপরিউক্ত ভাষায় পরিস্ফুট হয়েছে। আপন পাপ চিন্তায় নতশির। অযোগ্যতার জন্যে লজ্জিত, অবনত। সিরাতুল মুস্তাকীমের উপরে চলবার উগ্র বাসনা, জ্ঞান পিপাসায় কাতর, আপনাকে প্রভুর সামনে হেয়-বিনীত, ধুলায় লুণ্ঠিতকরণ, প্রভু-প্রেম লাভের জন্যে আকুল আগ্রহ– এত সবকিছুই পাগল প্রেমিক মর্দে মুমিনেরই পরিচায়ক।

উপরের বর্ণনা থেকে একথা পরিষ্কার জানতে পারা যায় যে, তিনি কেমন প্রতিকূল অবস্থার ভেতর দিয়ে ধীর-স্থির চিত্তে মুসলমান জাতিকে সত্যের দিকে আহবান জানাচ্ছিলেন। ক্রমাগত ছ'-সাত বছর তিনি এভাবে পাক-ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে একটা চেতনা সঞ্চার করার চেষ্টা করেন। বন্ধুর পথে একাকী একটানা সংগ্রাম করে চলেছেন তিনি। বুকে অসীম সাহস, হাতে দুর্বার

লেখনীশক্তি, খোদার উপর পরিপূর্ণ ভরসা। তবু মানব সুলভ স্বাভাবিক দুর্বলতাহেতু কখনও গভীর দুঃখ ও বেদনা ফুটে উঠেছে। তিনি তাঁর পত্রিকার মাধ্যমে মন্তব্য করেন–

---"এ পত্রিকাটির সর্ববিধ উন্নতি সাধনই আমার অন্তরের একান্ত অভিলাষ। কিন্তু যে ধরণে এটি প্রকাশিত হচ্ছে তাতে আমি সন্তুষ্ট নই। আমি চাই এ যেন একটা বিপ্লবী শক্তিতে পরিণত হয়। এ যেন মানবীয় চিন্তাধারাকে অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে ইসলামের আলোক আভায় উদ্ভাসিত করে এবং খাঁটি ইসলামী মূলনীতির ভিত্তিতেই উক্ত চিন্তাধারা পরিশুদ্ধ, আলোকিত ও বিকশিত হয়। যে ইসলামকে অতীতের নিছক স্মরণীয় একটা অনুৎপন্ন জড়পদার্থে পরিণত করে রাখা হয়েছে, এ পত্রিকাটি যেন তাকে গতিশীল এবং জীবন ব্যবস্থার জন্যে সক্রিয় আন্দোলন ও বিপ্লব সৃষ্টিকারীরূপে জনসমাজের সামনে তুলে ধরতে পারে। উচ্চাঙ্গ সমালোচনা ও প্রতিবাদের দ্বারা পৃথিবী থেকে এক একটি করে ইসলাম বিরোধিতার মূলোৎপাটন করবে এবং গভীর তথ্যানুসন্ধানের দ্বারা জীবনের প্রতিটি সমস্যার সমাধান ইসলামের মৌলিক নীতির ভিত্তিতেই করবে– এই আশা আমি করি। গত ছ'বছর যাবত এই আশা হৃদয়ে পোষণ করে আমার সর্বশক্তি প্রয়োগে উক্ত অভীষ্ট সিদ্ধির চেষ্টা করছি। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এ পথে আমি সম্পূর্ণ একাকী, উপায়-উপাদান ও সহায়-সম্বলহীন। আমার শক্তি-সামর্থ্য সীমাবদ্ধ। সুতরাং যা আমি করতে অভিলাষী, তা আমি করতে পারছি না। চারদিকে সহযোগী-সহকর্মী অনুসন্ধান করে বেড়াচ্ছি। কোথাও তার সন্ধান মিলছে না। জনবহুল এ শহরে নিজেকে নিঃসঙ্গ, অপরিচিত ও আগন্তুক মনে করছি। যার প্রেমে আমি উদভ্রান্ত, সে প্রেমাস্পদের সন্ধান নেই। বছরের পর বছর ধরে যাদের নিকট আমার মনোভাব ব্যক্ত করছি, তাদের নিকটবর্তী হলে মনে হয়, তারা আমা থেকে বহু দূরে। তাদের আকাঙ্ক্ষা আমার আকাঙ্ক্ষা থেকে পৃথক। তাদের জীবনের লক্ষ্য আমার লক্ষ্য থেকে স্বতন্ত্র। তাদের অন্তরের কাছে আমার অন্তর অপরিচিত। তাই আমার আকুল আহ্বান তাদের কর্ণগোচর হয় না। আমি যেন একটা সম্পূর্ণ ভিন্ন জগতে বাস করছি।"

যা হোক আশা-নিরাশা ও আঘাত-প্রত্যাঘাতের ভেতর দিয়ে 'তর্জুমানুল কোরআন' সামনের দিকে এগিয়েই চললো তার দু'ধারী তলোয়ার দিয়ে মুসলমানদের চিন্তারাজ্যের স্তূপীকৃত জঞ্জাল ও নৈরাশ্য পরিষ্কার করে, তার হেদায়াতের মশাল দিয়ে দিগ্‌দিগন্ত আলোকিত করে।

দারুল ইসলামে মাওলানা মওদূদী

উনিশ শ' আটত্রিশ সনের এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী দাক্ষিণাত্যের হায়দারাবাদ থেকে পূর্ব পাঞ্জাবের গুরুদাসপুর জেলার পাঠানকোট নামক স্থানে হিজরত করেন। আল্লামা ইকবাল মরহুমের পরামর্শে পাঠানকোট শহর থেকে প্রায় চার মাইল দূরে 'দারুল ইসলাম' নামে একটি ইসলামী গবেষণাগার স্থাপিত হয়। ১৯৩৮ সন থেকে ভারত বিভাগের সময় পর্যন্ত দারুল ইসলাম শুধুমাত্র ইসলামী গবেষণাকেন্দ্রই ছিল না, বরঞ্চ এখান থেকে বেশ কিছু সংখ্যক ইসলামের সাচ্চা সৈনিক ও মর্দে মুজাহিদও তৈরি হয়েছিলেন।

এ কথা উল্লেখযোগ্য যে, পাকিস্তানের স্বপ্নদ্রষ্টা দার্শনিক ইকবাল মাওলানা মওদূদীর প্রকাশিত তর্জুমানুল কোরআন নিয়মিত পাঠ করতেন। তিনি মাওলানার বিপ্লবী চিন্তাধারা ও প্রবন্ধাবলীর দ্বারা এতখানি প্রভাবিত হয়ে পড়েছিলেন যে, তাঁকে মাঝে মাঝে এরূপ মন্তব্য করতে শোনা যেতো "একমাত্র এ মওদূদীই বিভ্রান্ত ভারতীয় মুসলমানদেরকে একটা সঠিক পথের সন্ধান দিতে পারে।" কারণ দার্শনিক ইকবাল মাওলানার মধ্যে লক্ষ্য করেছিলেন ভবিষ্যতের এক মহান মানুষের সুস্পষ্ট নিদর্শন। মাওলানার বিভিন্নমুখী প্রতিভা, কর্মদক্ষতা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও নিষ্কলুষ চরিত্রের পরিচয় পেয়ে কবি ইকবাল তাঁকে লাহোর ডেকে পাঠান। এটাই ছিল কবি ইকবালের সাথে মাওলানার প্রথম সাক্ষাত পরিচয়। আলাপ-আলোচনার মূল বিষয় এই ছিল যে, পাঞ্জাবকেই মাওলানার কর্মস্থল বানানোর জন্যে বিচক্ষণ কবি অনুরোধ করেন। সাক্ষাতের পর মাওলানা পুনরায় হায়দারাবাদ গমন করেন।

মিল্লাতে ইসলামিয়ার ভবিষ্যত সঠিক কর্মপন্থার জন্যে যাঁরা চিন্তা ও পরিকল্পনা করছিলেন, তাঁদের মধ্যে চৌধুরী নিয়ায আলী খান সাহেবও একজন ছিলেন। তিনি তাঁর পরিকল্পনা ও কর্মসূচীর চিত্র কবি ইকবালের নিকট পেশ করেন। কিন্তু স্বাস্থ্যগত কারণে কবি এ বিষয়ে কিছু করতে তাঁর অক্ষমতা জ্ঞাপন করে বলেন, "যেমন করেই হোক মাওলানা মওদূদীকে 'দারুল ইসলামে' নিয়ে আসুন।"

এখানে একটি মজার ঘটনা উল্লেখযোগ্য। একবার পাঞ্জাবের পতোকী শহর ভ্রমণের আমার সুযোগ হয়েছিল। সেখানে আতিথেয়তা গ্রহণ করেছিলাম জনৈক বুযুর্গ হাকীম নে'মাত আলীর গৃহে। তিনি আমার কাছে যে ঘটনাটি বিবৃত করেন তা এই–

জনৈক খোদাপ্রেমিক চৌধুরী নিয়ায আলী খান তাঁর বিরাট সম্পদ দ্বীনের কোন কল্যাণকর কাজে ব্যয় করার উদ্দেশ্যে বন্ধু-বান্ধবের পরামর্শ চান। তাঁর জনৈক বন্ধু এ বিষয়ে আলাপ আলোচনা করার জন্যে তাকে আল্লামা ইকবালের নিকট যেতে বলেন। অতঃপর চৌধুরী নিয়ায আলী খান আল্লামা ইকবালের সাথে সাক্ষাত করে তাঁর মনের বাসনা তাঁর কাছে ব্যক্ত করেন। আল্লামা ইকবাল তাঁর সকল কথা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করার পর উঠে বাড়ীর ভেতরে চলে যান। চৌধুরী সাহেব বহুক্ষণ আল্লামার প্রত্যাগমনের অপেক্ষায় বসে থাকার পর নিরাশ হয়ে উঠে আসেন। আল্লামা তাঁকে কোন একটি কথাও না বলায় তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হন।

অতঃপর তাঁর বন্ধুটি একথা শুনে বলেন, "আপনি পুনরায় আল্লামার নিকটে যান। তিনি অতি দার্শনিক ও চিন্তাশীল। হয়তো কোন চিন্তার সাগরে ডুবে গিয়ে আপনার কথা ভুলে গেছেন। এবার হয়তো আপনাকে সঠিক পরমর্শই দিবেন।" চৌধুরী নিয়ায আলী পুনরায় আল্লামা ইকবালের নিকট তাঁর বাসনা ব্যক্ত করে বিনীত কণ্ঠে বলেন–

"হুযুর সেদিন আমাকে কোন কথা না বলেই ভেতরে চলে গেলেন। তাতে করে আমার বিশ্বাস যে, আমার পরিকল্পনাটি আপনার মনঃপূত হয়নি।"

আল্লামা বলেন, "সেকি, কিছু বলিনি? বলেছি, আলবৎ বলেছি। তুমি বুঝতে পারনি।"

অতঃপর তিনি মাওলানা মওদূদী সম্পাদিত 'তর্জুমানুল কোরআন' দেখিয়ে বলেন–

"সেদিন তুমি লক্ষ্য করনি, এ পত্রিকাখানি তোমাকে দেখিয়ে দেখিয়ে ভেতরে চলে গেলাম? তার অর্থ হলো এই যে, তোমার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্যে প্রয়োজন এ পত্রিকার সম্পাদক আবুল আ'লা মওদূদীর। তাকে আনতে পারলে তোমার সব কাজ হবে।"

চৌধুরী নিয়ায বলেন, "হুযুর, তাঁর সাথে তো আমার পরিচয়ই নেই।"

আল্লামা বলেন, "আচ্ছা, ঠিক আছে। সে অমুক দিন দিল্লী আসছে। আমার একখানা চিঠি নিয়ে তার সাথে দেখা করো।"

যথা সময়ে চৌধুরী নিয়ায আলী খান দিল্লী গিয়ে আল্লামার পত্র মাওলানা মওদূদীর হাতে দেন।

মাওলানা মওদূদী আল্লামা ইকবালের পত্র পাঠে হতবাক হন। আল্লামা তাকে হায়দারাবাদ পরিত্যাগ করে পাঞ্জাবে চলে আসার আহবান জানান। মাওলানা মওদূদী অতঃপর কিছুদিন পরে আল্লামার সাথে সাক্ষাত করেন এবং বিষয়টির উপরে দীর্ঘ আলোচনা করেন।

অতঃপর মাওলানা হায়দারাবাদ পরিত্যাগ করে 'দারুল ইসলাম' এসে পৌছেন। কিন্তু কে জানতো যাঁর আহবান অনুরোধে মাওলানা তাঁর জন্মভূমি ও আত্মীয়-বন্ধু পরিত্যাগ করে বিদেশের এক পল্লীগ্রামে নিজের আবাস-স্থল বেছে নিলেন, তিনি ডাক দিয়েই পরপারে যাত্রা করবেন? মাওলানা 'দারুল ইসলাম' পৌছে তাঁর লট-বহর সাজ-সরঞ্জাম সাজিয়ে-গুছিয়ে নিতে ব্যস্ত রয়েছেন এমন সময় লাহোর থেকে সাইয়েদ নযীর নিয়াযী সাহেবের একখানা পত্র তাঁর হস্তগত হলো। পত্রের সারমর্ম নিম্নরূপ ঃ

"ডাক্তার সাহেবের অবস্থা খুবই সংকটাপন্ন। তিনি আপনাকে একবার দেখার জন্যে খুবই ব্যস্ত। সম্ভব হলে শীঘ্রই চলে আসুন।"

মাওলানা মওদূদী নিজে এ সম্পর্কে বলেন, "আমি পত্র পেয়ে হতবাক হলাম । সবেমাত্র নতুন জায়গায় এসে পড়েছি। মালপত্র স্তূপীকৃত হয়ে পড়ে আছে। মনে করলাম একটু সাজিয়ে-গুছিয়ে নিয়ে দু'চারদিন পর যাব। কিন্তু কে জানতো যে, মরণের ফেরেশতা একেবারে ওৎ পেতে বসে রয়েছেন। লাহোরে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছি, এমন সময় হঠাৎ আল্লামার ইন্তেকালের সংবাদ এসে পৌছালো।"

অজানা-অচেনা বিদেশ বিভূঁয়ে পা দিতে না দিতেই তাঁর হিতাকাঙ্ক্ষী ও পৃষ্ঠপোষকের পরলোকগমনে হয়তো মাওলানার জীবনতরী বিরাট ধাক্কা খেলো, ক্ষণিকের জন্যে ঘুরপাক খেলো; কিন্তু সুদক্ষ কর্ণধার নীরবে অবিচল চিত্তে সবলে হাল ধরে রইলেন।

দারুল ইসলামে কর্মসাধনা

কোলাহল বিবর্জিত দারুল ইসলামের নির্জন নির্ঝঞ্ঝাট পরিবেশ ইসলামী চিন্তা-গবেষণার পরিস্ফুরণ ও পূর্ণ বিকাশ লাভের সহায়ক হয়। সুদীর্ঘ দশ বছর একটানা মসি চালনার ফলে একদিকে কোরআন হাদীসের গবেষণা প্রসূত ইসলামী সাহিত্য ভাণ্ডার গড়ে উঠেছে ও কিছু সংখ্যক আল্লাহর বান্দার মন-মস্তিষ্ক, আচার-আচরণ, কাজ-কর্ম খোদার রঙে রঞ্জিত হয়েছে, অপরদিকে দারুল ইসলামের গবেষণাকেন্দ্রেই সৃষ্টিলাভ করেছে পাকিস্তান সৃষ্টির মৌলিক উপাদান, দ্বিজাতিতত্ত্বের মতবাদ। এখান থেকে মাওলানার যে সব গ্রন্থ প্রকাশিত হয়, তার মধ্যে খুতবাত (ঈমান, ইসলাম, নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত প্রভৃতির মর্মকথা), ইসলামের রাজনৈতিক মতবাদ, কোরআন কি চার বুনিয়াদী ইস্তেলাহে, তাজদীদ ওয়া ইহ্ইয়ায়ে দ্বীন, ইসলামী বিপ্লবের পথ প্রভৃতি অন্যতম। মাওলানার মর্মস্পর্শী ও বিপ্লবী কোরআনের তাফসীর 'তাফহীমুল কোরআনের' সূচনা এখান থেকেই হয়। উপরন্তু ইসলামী মননশীলতা ও জাতীয় অনুভূতির অনুপম গ্রন্থ 'মুসলমান আওর মওজুদা সিয়াসী কাশ্মকাশ্ ৩য় খন্ড' দারুল ইসলামের এক পবিত্র রমযান মাসেই সমাপ্ত করা হয়। মোটকথা, মুসলিম জাতি যখন তমসাচ্ছন্ন রাতের অন্ধকারে পথহারা হয়ে পড়েছিল দারুল ইসলামের উদ্দীপ্ত মশাল তাদের পথ আলোকিত করে দিয়েছিল।

একথা বললেও অত্যুক্তি হবে না যে, 'দারুল ইসলাম' ছিল একটি 'অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরী', যেখান থেকে তৈরি হয়েছিল দুটি মজবুত ও শক্তিশালী যুদ্ধের আগ্নেয়াস্ত্র, যা দিয়ে পাক ভারত উপমহাদেশের দশ কোটি মুসলমান কংগ্রেস ও তার সকল রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ষড়যন্ত্র জাল করেছিল ছিন্নভিন্ন। সে দু'টি আগ্নেয়াস্ত্র হচ্ছে 'মাসয়ালায়ে কওমিয়াত' এবং 'মুসলমান আওর মওজুদা সিয়াসী কাশ্মকাশ্'।

মাওলানার হিজরত

হিজরত শব্দের অর্থ ইসলামের স্বার্থে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আপন জন্মভূমি, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, ক্ষেত-খামার, ব্যবসা-বাণিজ্য পরিত্যাগ করে অন্যত্র কোথাও আল্লাহর যমীন বসবাসের জন্যে বেছে নেয়া, যেখানে ইসলাম পুরোপুরি মেনে চলা সম্ভব হয়, অথবা যেখান থেকে দ্বীনের খেদমত করার অধিকতর সুযোগ পাওয়া যায়। এ কাজ যে অত্যন্ত কঠিন ও বেদনাদায়ক তা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। যেখানে মানুষ জন্মগ্রহণ করে, যেখানকার আলোবাতাসে সে প্রতিপালিত ও বর্ধিত হয়, যেখানকার গাছ-পালা, নদী-নালা, প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী, আপনজন, বন্ধু-বান্ধব ও বিভিন্ন সম্পদ ও ব্যবহার্য দ্রব্যসম্ভার এক মায়াজাল সৃষ্টি করে তাকে আঁকড়ে ধরে থাকে, তা ছিন্ন করে অন্যত্র চলে যাওয়া কম কথা নয়। এ ধরনের সম্পর্ক ছিন্ন করতে নবী পাকেরও (সাঃ) দুঃখ হয়েছিল। কিন্তু আল্লাহর জন্যে তাঁকে তা করতে হয়েছিল।

মাওলানা মওদূদীর জন্ম হায়দারাবাদেরই এক আধুনিক শহর আওরংগাবাদে। পরবর্তী সময়ে হায়দারাবাদ শহরকেই তিনি কর্মক্ষেত্র হিসেবে বেছে নেন। কিন্তু এক মহান উদ্দেশ্যে আল্লামা ইকবালের আহ্বানে পাঞ্জাব প্রদেশে পাঠানকোট থানার অধীন জামালপুর নামক নিভৃত পল্লীতে হিজরত করেন। এখানে কোন বিদ্যুতের ব্যবস্থাও ছিল না। নিকটতম রেলস্টেশন সার্নাও এখান থেকে কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত ছিল। রাতে কেরোসিন তেলের বাতি জ্বালিয়ে কাজকর্ম করতে হতো। আধুনিক বাড়ীঘর ও আধুনিক বাথরুম লেট্রিনের কোন ব্যবস্থা ছিল না। কূপ থেকে পানি উত্তোলন করে গোসলাদি ও পাক-শাকের ব্যবস্থা করতে হতো। কাঠ ফেড়ে ধূম্ররাশির মধ্যে নাকানি চুবানি খেয়ে বহু কষ্টে রান্না বান্না করতে হতো।

মাওলানা দিল্লী শহরের এক অতি সম্ভ্রান্ত পরিবারে বিয়ে করেন। তাঁর বিবির জন্যে এমন নিভৃত পল্লীতে বসবাস করা যে কত কষ্টকর ছিল তা সহজেই অনুমান করা যায়। এমন স্থানে বসবাস তাঁদের রুচি ও স্বাস্থ্যের জন্যে অনুপযোগী হলেও তাঁদেরকে মনের উপর পাথর চাপা দিয়ে তা মেনে নিতে হয়েছিল। এটা কি কোন সামান্য ত্যাগ ও কুরবানী ছিল? কিন্তু তা তিনি করেছিলেন নিছক দ্বীনী খেদমতের জন্যে, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে। এ পথে যে কোন ত্যাগ ও কুরবানী করতে তিনি দ্বিধা বোধ করেননি। সে কুরবানীর স্বর্ণ ফসল আজ বিশ্বের অসংখ্য অগণিত মানুষ ভোগ করছে- জীবনের ভ্রান্ত পথ থেকে সঠিক পথে আসছে।

মাওলানার বিবাহ

'দারুল ইসলামে' হিজরত করার এক বছর পূর্বে ইংরেজী ১৯৩৭ সালের ৫ই মার্চ মাওলানা মওদূদী এক প্রসিদ্ধ সাইয়েদ বংশে বিয়ে করেন।

ভারত সম্রাট শাহজাহান একমাত্র সাইয়েদ বংশীয় ইমামের পেছনেই নামায পড়তে ভালবাসতেন। তাই তিনি দিল্লী জামে মসজিদের জন্যে বুখারা থেকে একজন সাইয়েদ বংশীয় উচ্চ শিক্ষিত আলেমকে ইমাম নিযুক্ত করেন। এ বংশেরই একটি শাখা সম্ভূত আলেম এখনো দিল্লী জামে মসজিদের ইমামতির পদে অধিষ্ঠিত আছেন। এই বংশেই বিয়ে হয় মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর।

পাকিস্তান আন্দোলনে মাওলানার অমর অবদান

দ্বিজাতিতত্ত্ব ও মাওলানা মওদূদী

হিন্দু কংগ্রেসের সর্ব ভারতীয় জাতীয়তা আন্দোলন তথা অখণ্ড ভারতে রামরাজ্য স্থাপনের আন্দোলনে মুসলমান জাতি যখন বিভ্রান্ত ও পথহারা হয়েছিল, তখন মাওলানা মওদূদী উক্ত জাতির সম্মুখে সত্যের মশাল প্রজ্জ্বলিত করে পথের সন্ধান দিয়েছিলেন এবং ইসলামী ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছিলেন। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, তিনি "আল জিহাদু ফিল ইসলাম" গ্রন্থে ইসলামকে একটা সত্যিকার আদর্শবাদী বিপ্লবী আন্দোলন হিসেবে পেশ করেছেন এবং মুসলমান জাতির কর্তব্য, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বর্ণনা করেছেন। জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের অন্ধ কংগ্রেসপ্রীতির জন্যে তিনি "আল জমিয়ত" পত্রিকার সংস্রব বর্জন করেছিলেন। পরবর্তীকালে মিঃ মুহম্মদ আলী জিন্নাহর (তখনও তিনি কায়েদে আযম হননি) ঐতিহাসিক চৌদ্দ দফা ইংল্যান্ডের গোল টেবিল বৈঠকে গৃহীত হওয়ার পর হিন্দু জাতীয়তাবাদী কংগ্রেসের বিপক্ষে মুসলিম লীগ এক আত্মরক্ষামূলক আন্দোলন গড়ে তুলেছিল। এটাও প্রকৃতপক্ষে কোনও সুষ্ঠু আদর্শবাদী আন্দোলন ছিল না।

বলাবাহুল্য, কংগ্রেসের বহুদিনের সাধনা ছিল সকল জাতির সমন্বয়ে একটা ভৌগোলিক ও আঞ্চলিক জাতি গঠন। এর ভয়াবহতা উপলব্ধি করে মুসলমানগণ তা থেকে আত্মরক্ষার জন্যে অপর এক ভ্রান্ত পথ অবলম্বন করছিল। আর তা ছিল হিন্দু সভ্যতা-সংস্কৃতি প্রভাবিত একজাতীয়তার পরিবর্তে মুসলিম জাতীয়তা। প্রকৃতপক্ষে উভয় প্রকারের জাতীয়তাই মারাত্মক। তাই মাওলানা মওদূদী তাঁর "সিয়াসী কাশ্‌মকাশ্‌" গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে প্রথমত ইসলামের মূল লক্ষ্য, আদর্শ এবং রাজনৈতিক ভূমিকার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করেন। অতঃপর উক্ত গ্রন্থেরই দ্বিতীয় খণ্ডে কংগ্রেসের কাম্য জাতীয়তাবাদের দোষত্রুটি ও ভয়াবহ পরিণামের ফল বিশ্লেষণ করেন। তারপর ভারতীয় মুসলমানগণ মুসলিম লীগের নেতৃত্বে যে মুসলিম জাতীয়বাদের দিকে ঝুঁকে পড়ছিল, তারও ভয়াবহ পরিণাম বিশ্লেষণ করেন। বস্তুত ইসলাম কোন জাতীয়তাবাদ সৃষ্টি করতে অথবা কোন

National State (জাতীয় রাষ্ট্র) কায়েম করতে আসেনি। বরং দুনিয়ার বুকে একটা সুষ্ঠু আদর্শ, জীবন দর্শন, সমাজ দর্শন উপস্থাপিত করে একটা Ideogical State বা আদর্শ রাষ্ট্র গঠন করতে চায়। এ গ্রন্থে (সিয়াসী কাশ্‌মকাশ্‌ ২য় খণ্ডে) মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের পরিবর্তে একটা ইসলামী রাষ্ট্র গঠনের কথাই বলা হয়েছে।

১৯৩৫ সালের পর থেকে ভারতীয় মুসলমান যে রাজনৈতিক ঘূর্ণিপাকের আবর্তে পড়ে দিকভ্রান্ত হয়েছিল মাওলানা তৎপ্রণীত "তানকিহাত", "সিয়াসী কাশ্‌মকাশ্‌", "পর্দা", "তাজ্‌দীদ ওয়া ইহ্‌ইয়ায়ে দ্বীন" প্রভৃতি গ্রন্থে সে সম্পর্কে সাবধানবাণী উচ্চারণ করে সমাধান পেশ করেন।

কংগ্রেসের সর্বনাশা আন্দোলন মাওলানা কোনদিনই সমর্থন করতে পারেননি। বরং কংগ্রেস থেকে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে মুসলমানদের একটা স্বতন্ত্র আদর্শবাদী দল বা জাতি হিসেবেই বসবাস করতে হবে– এ ছিল তাঁর বক্তব্য। ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা ও আদর্শ নৈতিকতা বিস্মৃত হয়ে মুসলমানগণ ইউরোপীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির দিকে ঝুঁকে পড়ছিল। তিনি তাদের বিরুদ্ধে কঠোর সাবধানবাণী উচ্চারণ করেন এবং 'তানকিহাত' গ্রন্থের মাধ্যমে ইউরোপীয় সভ্যতার বিষবৃক্ষের বিষময় পরিণাম ফল চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেন। তাঁর যাবতীয় লেখনী ও চেষ্টা-চরিত্রের মূল লক্ষ্যই এই ছিল যে, মুসলমানদের একটা আদর্শ জাতি হিসেবে দুনিয়ায় মাথা তুলে দাঁড়াতে হবে এবং মানবের সমগ্র জীবনে একমাত্র আল্লাহ তায়ালারই অনুশাসন পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। প্রকৃতপক্ষে পরবর্তীকালে এটাই পাকিস্তান আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করেছিল।

মাওলানা মাদানীর একজাতীয়তাবাদ

কংগ্রেস কিন্তু বরাবরই তার আপন লক্ষ্যে অবিচল ছিল। অর্থাৎ সমগ্র ভারতে একজাতীয়তা সৃষ্টি এবং তারই ভিত্তিতে দেশের স্বাধীনতা লাভ। ভৌগোলিক ও আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদ প্রমাণ করে ভারতীয় মুসলমানদেরকে বিভ্রান্ত ও প্রতারিত করার উদ্দেশ্যে হিন্দু-কংগ্রেস একজন শ্রেষ্ঠ আলেমকে কাজে লাগালো। ভারতের শ্রেষ্ঠতম ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্র দেওবন্দের হাদীস শাস্ত্রের অধ্যক্ষ মরহুম হযরত মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী একদা লাহোর জামে মসজিদে কোরআন হাদীস উদ্ধৃত করে ভারতের হিন্দু-মুসলমান, বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান-জৈন নির্বিশেষে সকলকে নিয়ে এক ভৌগোলিক জাতি প্রমাণ করার চেষ্টা করলেন। তাঁর বক্তৃতা পুস্তিকাকারেও প্রকাশিত হলো। এ সময়ে মুসলিম লীগ আন্দোলন বেশ দানা বেঁধে উঠছিল এবং মুসলমানদেরকে একটা স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে পেশ করেই এ আন্দোলন এতদুর অগ্রসর হয়েছিল। কিন্তু বিখ্যাত শিক্ষাকেন্দ্রের হাদীস শাস্ত্রের অধ্যক্ষের মুখে মুসলিম-অমুসলিমের সমন্বয়ে একজাতীয়তার যুক্তি-প্রমাণ শুনে মুসলিম লীগ মহল এবং সাধারণভাবে মুসলিম ভারত স্তম্ভিত, বিস্ময়বিমূঢ় ও নিরাশা বিক্ষুব্ধ হয়ে পড়লো। এ সময়ে পাকিস্তানের স্বপ্নদ্রষ্টা দার্শনিক কবি ইকবাল রোগ শয্যায় শায়িত ছিলেন। তিনি রোগশয্যায় মাদানী সাহেবের উক্তির বিষয় জানতে পেরে অত্যন্ত ব্যথিত ও চঞ্চল হয়ে পড়েন। তিনি ধীরে ধীরে কম্পিত কলেবরে শয্যার উপর উঠে বসেন এবং স্বভাব-কবি রোগ যন্ত্রণার মধ্যেই কবিতার সুরে মাওলানা মাদানী সাহেবের উক্তির তীব্র সমালোচনা করেন–

আজম হনুয ন দানিস্ত্ রমুযে দীঅরনা,
যে দেওবন্দ্ হুসাইন আহমদ ইঁচে বুল্ আজবীস্ত্।
সরুদে বরসরে মেম্বর কে মিল্লাত আয ওতনস্ত্।
চে বেখবরয আয্ মকামে মুহাম্মাদে আরবীস্ত।
বমুস্তফা বরেসাঁ খেশ্রা কে দী হমা উস্ত্
আগর বাউ না রসীদী তামামে বু লহবীস্ত।

অর্থাৎ––

বোঝেনি ঐ আজমবাসী
দ্বীনের মর্ম বিহ্বলতা,
দেওবন্দে তাইতো হুসেন
আহমদ কন আজব কথা।
"ওয়াতন থেকে মিল্লাত হয়"
এই কথা ফের গান যে তিনি,
বোঝেননি হায় নবীর মকাম
আল আরবীর মান যে তিনি।
নবীর কাছে পৌঁছিয়ে দাও
নিজেকে— এই দ্বীনের দাবি।
পৌঁছাতে না পারো যদি
সবই হবে 'বু-লাহাবী'।

বলা বাহুল্য, ডাঃ ইকবালের কয়েক ছত্র কবিতা যদিও মরহুম মাদানী সাহেবের মতবাদকে কশাঘাত করলো, তথাপি তা একজাতীয়তা মিথ্যা প্রমাণ করার জন্যে যথেষ্ট ছিল না। ফলে ভারতীয় মুসলমান এবং মুসলিম লীগ তাদের আন্দোলনকে কুয়াশাচ্ছন্ন দেখে দিশাহারা হয়ে পড়লো। ঠিক এই সংকট মুহূর্তে মাওলানা মওদূদী তাঁর বলিষ্ঠ মসি চালনা শুরু করেন এবং "মাস্য়ালায়ে কওমিয়ত" নামে একখানা বিপ্লবাত্মক অমূল্য গ্রন্থ রচনা করেন।

এখানে মরহুম মাওলানা মাদানী সাহেবের উক্তির কিঞ্চিৎ উল্লেখ প্রয়োজন বোধ করছি। তিনি তাঁর বক্তৃতায় এটাই প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন যে, বর্তমানকালে জাতি ভৌগোলিক আঞ্চলিকতার ভিত্তিতেই গঠিত হয়। তিনি তাঁর উক্তি প্রমাণ করার জন্যে প্রথমেই বলেন–

"একজাতিতত্ত্বের বিরোধিতা এবং উহাকে ন্যায়নীতির বিপরীত প্রমাণ করার প্রসঙ্গে যাহা কিছু প্রকাশিত হইয়াছে এবং হইতেছে তাহার ভুলত্রুটি দেখাইয়া দেওয়া এখন জরুরী মনে করিতেছি। কংগ্রেস ১৮৮৫ খ্রিষ্টাব্দ হইতে ভারতবাসীর নিকট স্বদেশিকতার ভিত্তিতে জাতীয় ঐক্যের দাবি করিয়া যথেষ্ট পরিমাণে চেষ্টা ও সাধনা করিতেছে। উহার বিরোধী শক্তিসমূহ উহার অস্বীকার যোগ্য হওয়া বরং নাজায়েয ও হারাম হওয়ার কথা প্রমাণ করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে। বস্তুতঃ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে ইহা অপেক্ষা মারাত্মক আর

কিছুই নাই। ইহা আজ নয়, ১৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দে কিংবা তাহার পূর্ব হইতে এইসব কথা প্রকাশ করা হইয়াছে।"

তিনি আরও বলেন–

"একজাতীয়তা যদি এমনই অভিশপ্ত ও নিকৃষ্ট বস্তু হইয়াও থাকে, তবুও ইউরোপীয়গণ যেহেতু এই অস্ত্র প্রয়োগ করিয়াই ইসলামী বাদশাহী ও ওসমানী খেলাফতের মূলোচ্ছেদ করিয়াছিল, তাই এই হাতিয়ারকেই ব্রিটিশের মূলোৎপাটনের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা আজ মুসলমানদের কর্তব্য।"

(ইসলাম ও জাতীয়তাবাদ– পৃঃ ৪৩)

মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী মাদানী মরহুম সাহেবের উক্তির প্রত্যুত্তরে যে বিপ্লবী গ্রন্থ* রচনা করেন তার প্রারম্ভে তিনি বলেন–

"দারুল উলুম দেওবন্দের প্রিন্সিপাল জনাব মওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী 'একজাতিতত্ত্ব ও ইসলাম' নামে একখানি পুস্তিকা লিখিয়াছেন। একজন সুপ্রসিদ্ধ আলেম এবং পাক-ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানের লিখিত এই পুস্তিকায় 'জটিল জাতিতত্ত্বের' সরল বিশ্লেষণ এবং প্রকৃত ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির পূর্ণ অভিব্যক্তি হইবে বলিয়া স্বভাবতই আশা করা গিয়াছিল। কিন্তু ইহা পাঠ করিয়া আমাদিগকে নির্মমভাবে নিরাশ হইতে হইয়াছে এবং এই বইখানিকে গ্রন্থকারের পদমর্যাদার পক্ষে হানিকর বলিয়া মনে হইয়াছে। বর্তমান যুগে অসংখ্য ইসলাম বিরোধী মতবাদ ইসলামের মূলতত্ত্বের উপর প্রবল আক্রমণ চালাইতে উদ্যত, ইসলাম আজ ইহার নিজের ঘরেই অসহায়। স্বয়ং মুসলমানগণ দুনিয়ার ঘটনাবলী ও সমস্যাবলী খালেছ ইসলামের দৃষ্টিতে যাচাই করে না। বলা বাহুল্য, নিছক অজ্ঞানতার দরুনই তাহারা উহা করিতে পারিতেছে না। উপরন্তু 'জাতীয়তার' ব্যাপারটি এতই জটিল যে, উহাকে সুস্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম করার উপরই এক একটি জাতির জীবন-মরণ নির্ভর করে। কোন জাতি যদি নিজ জাতীয়তার ভিত্তিসমূহের সহিত সম্পূর্ণ ভিন্ন মূলনীতির সংমিশ্রণ করে, তবে সে 'জাতি' হিসাবে দুনিয়ার বুকে বাঁচিতে পারে না। এই জটিল বিষয়ে লেখনী ধারণ করিতে গিয়া মাওলানা হুসাইন আহমদ সাহেবের ন্যায় ব্যক্তির নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন থাকা বাঞ্ছনীয় ছিল। কারণ তাঁহার নিকট নবীর আমানত গচ্ছিত রহিয়াছে। ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা ও মূল তত্ত্বের উপর যদি কখনও

*"ইসলাম ও জাতীয়তাবাদ" মাওলানা মওদূদী প্রণীত উর্দূ গ্রন্থ 'মাসয়ালায়ে কওমিয়তের' বাংলা অনুবাদ।

জঞ্জাল-আবর্জনা পুঞ্জীভূত হয়, তবে ইহাদের ন্যায় লোকদেরই তাহা দূরীভূত করা কর্তব্য।

বর্তমান অন্ধকার যুগে তাঁহাদের দায়িত্ব যে সাধারণ মুসলমানদের অপেক্ষা অনেক বেশী এবং কঠোর, সে কথা তাহাদের পুরাপুরিই অনুধাবন করা উচিত ছিল। সাধারণ মুসলমান যদি ভ্রান্তির মধ্যে নিমজ্জিত হইয়া থাকে, তবে সে জন্যও সর্বপ্রথম এই শ্রেণীর লোকদিগকেই দায়ী করা হইবে। সেইজন্য আমাকে আবার বলিতে হইতেছে যে, মাওলানা মাদানীর এই পুস্তিকায় তাঁহার দায়িত্বজ্ঞান ও দায়িত্বানুভূতির কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।"

(ইসলাম ও জাতীয়তাবাদ– পৃষ্ঠা ৪১)।

সমগ্র ভারতবাসীর "একজাতিতত্ত্বকে" সঙ্গত বলে প্রমাণ করার জন্যে মাওলানা মাদানী সাহেব আর একটি দলীল পেশ করেছেন ঃ

"আমরা প্রতিদিন সম্মিলিত স্বার্থের জন্য জনসংঘ বা সমিতি গঠন করিয়া থাকি এবং তাহাতে শুধু অংশগ্রহণই করি না, উহার সদস্যপদ লাভ করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টাও করিয়া থাকি। .....শহর এলাকা, ঘোষিত এলাকা, মিউনিসিপ্যাল বোর্ড, জেলা বোর্ড, ব্যবস্থা পরিষদ, শিক্ষা সমিতি এবং এই ধরনের শত শত সমিতি রহিয়াছে যাহা বিশেষ উদ্দেশ্যের জন্য নির্দিষ্ট নিয়মনীতি অনুসারে গঠিত হইয়াছে। এই সব সমিতিতে অংশগ্রহণ করা এবং সেজন্য সম্পূর্ণরূপে বা আংশিকভাবে চেষ্টা করাকে কেহই নিষিদ্ধ ঘোষণা করে না। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই ধরনের কোন সমিতি যদি দেশের স্বাধীনতা এবং বৃটিশ প্রভুত্বের বিরুদ্ধে কাজ করার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে তাহাতে অংশগ্রহণ করা হারাম, ন্যায়পরায়ণতার বিপরীত, ইসলামের শিক্ষার পরিপন্থী এবং জ্ঞানবুদ্ধি ইত্যাদির বিপরীত হইয়া যায়।" (ইসলাম ও জাতীয়তাবাদ– পৃঃ ৫২)

তদুত্তরে মাওলানা মওদূদী বলেন–

"বস্তুত ইহাকেই বলে ভুলের ভিত্তিতে ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ। মাওলানা মাদানী একটি পাপের কাজকে ফরয গণ্য করতঃ উহারই অন্ধ প্রেমে পড়িয়া অনুরূপ আর একটি পাপকে সঙ্গত প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিতেছেন। অথচ উভয় ক্ষেত্রেই হারাম হওয়ার একই মূল কারণ বিদ্যমান। আমি স্পষ্ট ভাষায় বলিতে চাই, উলামায়ে হিন্দের নিকট কাউন্সিল ও এসেম্বলীতে যোগ দেওয়াকে একদিন হারাম এবং অন্যদিন হালাল বলিয়া ঘোষণা করা একেবারে পুতুল খেলার শামিল হইয়াছে। কারণ প্রকৃত ব্যাপার লক্ষ্য করিয়া কোন জিনিসকে হারাম ঘোষণা করার নীতি তাহাদের নয়। গান্ধীজীর একটি শব্দেই তাহাদের ফতোয়াদান ক্ষমতা

সক্রিয় হইয়া ওঠে। কিন্তু আমি ইসলামের শাশ্বত ও অপরিবর্তনীয় নীতি ও আদর্শের ভিত্তিতে বলিতেছি, আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল (সাঃ) যে সব বিষয়ে সুস্পষ্ট ফয়সালা করিয়াছেন, সে সম্পর্কে নতুনভাবে ফয়সালা করিবার নিরঙ্কুশ অধিকার মানুষকে দেয় যেসব সামগ্রিক প্রতিষ্ঠান– মুসলমানদের পক্ষে তাহা সমর্থন করা এক চিরন্তন অপরাধ সন্দেহ নাই। কিন্তু এইরূপ নিরঙ্কুশ অধিকার ও কর্তৃত্বসম্পন্ন সামগ্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহে অমুসলিমদের সংখ্যা যখন অধিক হইয়া পড়ে এবং তাহাতে সংখ্যাধিক্যের ভিত্তিতেই যাবতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়, তখন ইহা দ্বিগুণ অপরাধরূপে পরিগণিত হয়। অতএব এইসব সামগ্রিক প্রতিষ্ঠানের কর্মসীমা খোদার শরীয়তের নির্দিষ্ট সীমা হইতে স্বতন্ত্র করিয়া দেওয়াই মুসলমানদের প্রথম কর্তব্য এবং তাহাদের পক্ষে প্রকৃত আযাদী যুদ্ধ ইহাই। কর্তৃত্ব প্রয়োগের উল্লিখিত সীমা উভয়ের যদি স্বতন্ত্র হয়, তবে মুসলিম অমুসলিম উভয় জাতির কোন মিলিত স্বার্থের জন্য গঠিত দলের সহযোগিতা করা মুসলমানদের পক্ষে সঙ্গত হইবে। তাহা কোন শত্রুর আক্রমণের প্রতিরোধের জন্য হউক, কি কোন অর্থনৈতিক বা শৈল্পিক কাজকর্ম আঞ্জাম দেওয়ার জন্য হউক, তাহাতে কোনরূপ পার্থক্য নাই। কিন্তু উভয় জাতির কর্ম ও ক্ষমতার সীমা যতদিন পরস্পর যুক্ত থাকিবে, মিলন ও সহযোগিতা তো দূরের কথা এইরূপ যুক্ত শাসনতন্ত্রের অধীন জীবনযাপন করাও মুসলমানদের পক্ষে সম্পূর্ণ অসঙ্গত। এই ব্যাপারে নির্বিশেষে সকল মুসলমানই অপরাধী বলিয়া বিবেচিত হইবে, যতদিন না তাহারা সকলে মিলিয়া মিলিত শক্তির সাহায্যে উক্ত শাসনতন্ত্রকে চূর্ণ করিয়া দিবে। আর যাহারা সাগ্রহে এই শাসনতন্ত্র গ্রহণ করিবে এবং উহাকে চালু করার জন্য চেষ্টা করিবে তাহারা তদপেক্ষা বেশী অপরাধী হইবে। কিন্তু যে ব্যক্তি, সে যে-ই হউক না কেন, সেই শাসনতন্ত্র চালু করার অনুকূলে কোরআন-হাদীস হইতে যুক্তি পেশ করিবে, তাহার অপরাধ হইবে সর্বাপেক্ষা বেশী।" (ইসলাম ও জাতীয়তাবাদ– পৃঃ ৫৩)

কংগ্রেসের একজাতীয়তার বিষময় ফল লক্ষ্য করে মাওলানা মওদূদী বলেন–

'এই উদ্দেশ্যেই ওয়ার্ধা স্কীম রচনা করা হইয়াছে। বিদ্যামন্দির স্কীমেরও ইহাই উদ্দেশ্য ছিল। এই উদ্দেশ্য এই উভয় স্কীমেই স্পষ্ট ভাষায় লিখিয়া দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু মাওলানা মাদানী এই সব স্কীম এবং উহাদের পাঠ্য তালিকা মোটেই দেখেন নাই। পণ্ডিত নেহেরু কয়েক বছর পর্যন্ত এই জাতীয়তারই শিঙ্গা ফুঁকিতেছেন। কিন্তু তাঁহার কোন বক্তৃতা বা রচনাও মাওলানা মাদানীর গোচরীভূত হয় নাই। কংগ্রেসের দায়িত্বসম্পন্ন প্রত্যেকটি ব্যক্তি এই কথাই ঘোষণা

করিতেছেন, লিখিতেছেন এবং নতুন শাসনতন্ত্রলব্ধ রাষ্ট্রশক্তির সাহায্যে তাহা প্রবলভাবে প্রচারও করিয়া বেড়াইতেছেন। কিন্তু মাওলানা মাদানী ইহার কিছুই শুনিতে, দেখিতে ও অনুভব করিতে পারিতেছেন না। অথচ তিনি যে সব সামগ্রিক প্রতিষ্ঠানের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাদের প্রত্যেকটির দ্বারাই এইসব কাজ সম্পন্ন করা হইতেছে।' (ইসলাম ও জাতীয়তাবাদ– পৃঃ ৫৯-৬০)।

মাওলানা মওদূদী আরও বলেন–

"সুতরাং মাওলানা মাদানী যদি তাঁহার মনোভাব ব্যক্ত করার জন্য 'পারস্পরিক বন্ধুতা' ইত্যাদি কোন শব্দ ব্যবহার করিতেন এবং ইহাকে কংগ্রেসের নীতি ও কর্ম হিসাবে পেশ না করিয়া নিজের তরফ হইতে একটি প্রস্তাবও সুপারিশ হিসাবে পেশ করিতেন, তবেই ভাল হইত। অন্তত এখনও যদি তিনি এই জাতির প্রতি এতটুকু অনুগ্রহ করেন, তবে তাহা বড়ই মেহেরবানী হইবে। অন্যথায় তাঁহার লেখনীতে মহা বিপর্যয় সৃষ্টি হওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা রহিয়াছে-- জালেম রাজা বাদশাহ ও ফাসেক রাষ্ট্রনেতা যাহা কিছুই করিয়াছেন, আলেমগণ তাহাকেই কোরআন হাদীসের দলীল দিয়া সত্য প্রমাণ করত ধর্মকে অত্যাচার ও শোষণের অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করিয়াছেন।

মাওলানা মাদানীর উল্লিখিত পুস্তিকা প্রকাশিত হওয়ার পর খালেছ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে 'জাতীয়তার' বিশ্লেষণ করা এবং এই ব্যাপারে ইসলামী ও অনৈসলামিক মতবাদের পারস্পরিক মূলগত পার্থক্য উজ্জ্বল করিয়া ধরা অত্যন্ত জরুরী হইয়া পড়িয়াছে। তাহা করা হইলে এ সম্পর্কীয় যাবতীয় ভুল ধারণা লোকের মন হইতে দূর হইবে এবং উভয় পথের কোন একটি পথ বুঝিয়া-শুনিয়া গ্রহণ করা তাহাদের পক্ষে সম্ভব হইবে। ইহা আলেমদেরই কর্তব্য ছিল, কিন্তু আলেম সমাজের প্রধান ব্যক্তিই যখন একজাতীয়তার পতাকা উত্তোলন করিয়াছেন এবং কোন আলেমই যখন প্রকৃত কর্তব্য পালনে প্রস্তুত হইতেছেন না, তখন আমাদের ন্যায় সাধারণ লোকেরই তজ্জন্য তৎপর হইতে হইবে।"

(ইসলাম ও জতীয়তাবাদ– পৃঃ ৬১)

এ গ্রন্থে তিনি ইসলামী জাতীয়তার ভিত্তি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন ঃ

"যেসব গণ্ডীবদ্ধ, জড় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও কুসংস্কারপূর্ণ ভিত্তির উপর দুনিয়ার বিভিন্ন জাতীয়তার প্রাসাদ গড়ে উঠেছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাঃ) তা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেন। বর্ণ, গোত্র, জন্মভূমি, অর্থনীতি ও রাজনীতিক অবৈজ্ঞানিক বিরোধ ও বৈষম্যের ভিত্তিতে মানুষ নিজেদের মূর্খতা ও চরম অজ্ঞতার দরুন মানবতাকে চূর্ণ

করে দেয় এবং মানবতার দৃষ্টিতে সমস্ত মানুষকে সমশ্রেণীর সমমর্যাদাসম্পন্ন ও সমানাধিকার প্রদান করেছে।"

"ইসলামী জাতীয়তায় মানুষে মানুষে পার্থক্য করা হয় বটে, কিন্তু জড়, বৈষয়িক ও বাহ্যিক কোন কারণে নয়। করা হয় আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও মানবিকতার দিক দিয়ে। মানুষের সামনে এক স্বাভাবিক সত্য বিধান পেশ করা হয়, যার নাম ইসলাম। আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্য, হৃদয়মনের পবিত্রতা ও বিশুদ্ধতা, কর্মের অনাবিলতা, সততা ও ধর্মানুসরণের দিকে গোটা মানব জাতিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। তারপর বলা হয়েছে যে, যারা এ আমন্ত্রণ গ্রহণ করবে, তারা এক জাতি হিসাবে গণ্য হবে। আর যারা তা অগ্রাহ্য করবে, তারা সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতির অন্তর্ভুক্ত হবে। অর্থাৎ মানুষের একটি হচ্ছে ঈমান ও ইসলামের জাতি এবং তার সমস্ত ব্যক্তিসমষ্টি মিলে একটি উম্মাহ। অন্যটি হচ্ছে কুফর ও ভ্রষ্টতার জাতি। তার অনুসারীগণ নিজেদের পারস্পরিক মতবিরোধ ও বৈষম্য সত্ত্বেও একই দল ও একই দলের মধ্যে গণ্য।"

"এ দু'টি জাতির মধ্যে বংশ ও গোত্রের দিক দিয়ে কোন পার্থক্য নেই। পার্থক্য বিশ্বাস ও কর্মের। কাজেই একই পিতামাতার দু'টি সন্তানও ইসলাম ও কুফরের উল্লিখিত ব্যবধানের দরুন স্বতন্ত্র দুই জাতির মধ্যে গণ্য হতে পারে এবং দুই নিঃসম্পর্ক ও অপরিচিত ব্যক্তি ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার কারণে এক জাতির অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।"

"জন্মভূমির পার্থক্যও এ উভয় জাতির মধ্যে ব্যবধানের কারণ হতে পারে না। এখানে পার্থক্য করা হয় হক ও বাতিলের ভিত্তিতে। আর হক ও বাতিলের 'স্বদেশ' বা জন্মভূমি বলতে কিছু নেই। একই শহর, একই মহল্লা ও একই ঘরের দুই ব্যক্তির জাতীয়তা ইসলাম ও কুফরের পার্থক্যের কারণে বিভিন্ন হতে পারে। একজন নিগ্রো ইসলামের সূত্রে একজন মরক্কোবাসীর ভাই হতে পারে।"

"বর্ণের পার্থক্যও এখানে জাতীয় পার্থক্যের কারণ নয়। বাহ্যিক চেহারার রং ইসলামে নগণ্য। এখানে একমাত্র আল্লাহর রঙেরই গুরুত্ব রয়েছে। তা-ই হচ্ছে সবচেয়ে উত্তম রং।"

"ভাষার বৈষম্যও ইসলাম ও কুফরের পার্থক্যের কারণ নয়। ইসলামে মুখের ভাষার কোনই মূল্য নেই। মূল্য হচ্ছে মনের, হৃদয়ের-ভাষাহীন কথার।

ইসলামী জাতীয়তার এ বৃত্তের কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে কালেমা– লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। বন্ধুতা আর শত্রুতা এ কালেমার ভিত্তিতেই হয়ে থাকে। এর স্বীকৃতি মানুষকে একীভূত করে, অস্বীকৃতি মানুষের মধ্যে চূড়ান্ত

বিচ্ছেদ ঘটায়। এ কালেমা যাকে বিচ্ছিন্ন করে, তাকে রক্ত, মাটি, ভাষা, বর্ণ, অন্ন, শাসন ব্যবস্থা প্রভৃতি কোন সূত্র এবং কোন আত্মীয়তাই যুক্ত করতে পারে না। অনুরূপভাবে এ কালেমা যাদেরকে যুক্ত করে তাদেরকে কোন কিছুই বিচ্ছিন্ন করতে পারে না।"

মাওলানা আরও বলেন ঃ

"উল্লেখ্য যে, অমুসলিম জাতিসমূহের সাথে মুসলিম জাতির সম্পর্কের দু'টি দিক রয়েছে। প্রথমটি এই যে, মানুষ হওয়ার দিক দিয়ে মুসলিম অমুসলিম সকলেই সমান। আর দ্বিতীয়টি এই যে, ইসলাম ও কুফরের পার্থক্য হেতু আমাদেরকে তাদের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র করে দেয়া হয়েছে। প্রথম সম্পর্কের দিক দিয়ে মুসলমানরা তাদের সাথে সহানুভূতি, দয়া, ঔদার্য ও সৌজন্যের ব্যবহার করবে। কারণ মানবতার দিক দিয়ে এরূপ ব্যবহারই তারা পেতে পারে। এমনকি তারা যদি ইসলামের দুশমন না হয়, তাহলে তাদের সাথে বন্ধুত্ব, সন্ধি, এবং মিলিত উদ্দেশ্যের (Common Cause) সহযোগিতাও করা যেতে পারে। কিন্তু কোন প্রকার বস্তুগত ও বৈষয়িক সম্পর্ক তাদেরকে ও আমাদেরকে মিলিত করে 'এক জাতি' বানিয়ে দিতে পারে না।"

যা হোক, মাওলানা মওদূদীর উপরিউক্ত গ্রন্থখানি তৎকালীন সমাজে এক আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং মাওলানা মাদানীর বক্তৃতা ও পুস্তিকা যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে তা সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয়। পাকিস্তান আন্দোলনের নেতা ও কর্মীগণ একে একটি শাণিত হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করেন। বস্তুত এই গ্রন্থখানিই দ্বিজাতি তত্ত্বের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি স্থাপন করে এবং ইহাই পাকিস্তান সৃষ্টির মূল কারণ হয়ে পড়ে। গ্রন্থখানি কংগ্রেসের রামরাজ্য স্থাপনের মারাত্মক পরিকল্পনা এবং মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী সমর্থিত আঞ্চলিক জাতীয়তার যুক্তি তর্ক নস্যাৎ করে তাকে অবৈজ্ঞানিক, অযৌক্তিক, অনৈসলামী এবং অন্তঃসারশূন্য প্রমাণ করে দেয়। শুধু তাই নয়, মাওলানা মওদূদী এই গ্রন্থখানি দ্বারা মুসলমানদের স্বতন্ত্র জাতীয়তার ও স্বতন্ত্র রাষ্ট্র স্থাপন দাবির যৌক্তিকতা উজ্জ্বল ও পরিস্ফুট করে তুলেছিলেন।

মাওলানা মওদূদীর প্রতি মাওলানা মাদানীর অন্ধ আক্রোশের এটাই মূল কারণ। এই আক্রোশকে ভিত্তি করেই মাওলানা মাদানী পরবর্তীকালে মাওলানা মওদূদীর উপরে আমরণ ফতোয়াবাজীর মেশিনগান থেকে অমূলক, ভিত্তিহীন ও বিদ্বেষমূলক অভিযোগ টেনে রোষানল প্রজ্জ্বলিত ফতোয়ার গোলাবর্ষণ করেছেন। ততোধিক পরিতাপের বিষয় এই যে, মরহুম মাদানী সাহেবের অনেক শিষ্য-

সাগরিদ, যাঁরা 'উলামায়ে দ্বীন' হিসাবে পরিচিত, ওস্তাদের অনুসরণ করে তাঁরাও মাওলানা মওদূদীর অন্ধ বিরোধিতায় মেতে ওঠেন। একথা অনস্বীকার্য যে, মাওলানা মাদানীসহ তাঁর শিষ্য-সাগরিদগণ পাকিস্তান সৃষ্টিতে চরম বাধা দান করেন। এমন কি পাকিস্তান ঘোষিত হওয়ার পরও 'সিলেট রেফারেন্ডামের' সময় এসব উলামায়ে কেরাম পাকিস্তানের বিপক্ষে ভোট সংগ্রহ করার জন্য সিলেটের মুসলমানদের দ্বারে দ্বারে ধরণা দেন। পাকিস্তান হওয়ার পর এ সব উলামায়ে কেরাম হঠাৎ পাকিস্তানের পরম ও চরম কল্যাণকামী সেজে মাওলানা মওদূদীকে পাকিস্তান আন্দোলন বিরোধী বলে অভিযুক্ত করেন। 'ইসলাম' ও 'উলামায়ে দ্বীনের' ইতিহাসে এর চেয়ে বড় কলঙ্ক, এর চেয়ে বড় সত্যের অপলাপ আর কি হতে পারে?

পাকিস্তান সৃষ্টির পশ্চাতে মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর যে বিরাট অবদান ছিল, তা কোন বিবেকসম্পন্ন, জ্ঞানী, ন্যায়পরায়ণ ও সুস্থ মস্তিষ্ক ব্যক্তির অস্বীকার করার উপায় নেই। এ কথা ভবিষ্যত বংশধরদের জন্যে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

আমাদের দেশের স্বার্থান্ধ ও সুবিধাবাদী কিছু রাজনৈতিক দল এবং তাদেরই অন্ধ সমর্থক কিছু লোক, এমনকি কিছু সংখ্যক আলেম পর্যন্ত মাওলানা মওদূদীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করে থাকেন যে তিনি এক সময়ে কংগ্রেস ও জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের অনুসারী হিসাবে পাকিস্তানের ঘোর বিরোধী ছিলেন। তাঁদের এসব প্রচারণা যে ইসলাম বিদ্বেষ প্রসূত এবং ইসলামের পুনর্জাগরণকে রোধ করার অশুভ চক্রান্ত, তা জ্ঞানী লোকের বুঝতে মোটেই কষ্ট হবার কথা নয়। আমরা নিরপেক্ষ পাঠক-পাঠিকা ও দেশের সুধীজনকে অনুরোধ করি, তাঁরা যেন মাওলানার সমগ্র অতীত কার্যপ্রণালী জানবার ও বুঝবার চেষ্টা করেন। মাওলানা মওদূদী একজন মানুষ ব্যতীত কিছুই নন। তাঁর মধ্যে মানবসুলভ দোষত্রুটি থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু তাই বলে যে ব্যক্তি তাঁর সমগ্র জীবনের সময়, অর্থ ও শ্রম আল্লাহরই পথে উৎসর্গ করেছেন এবং দ্বীন ইসলামের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্যে অক্লান্ত সাধনা করে চলেছেন, তাঁর প্রতি বিদ্বেষমূলক মিথ্যা অভিযোগ আরোপ করা কোন ভাল মানুষের কাজ নয়। তাঁর প্রতি এর চেয়ে বড় জুলুম ও অবিচার আর কি হতে পারে? তবে এ ধরনের লোকের মনে রাখা উচিত যে, সত্য একদিন তার স্বর্গীয় আলোক আভায় উদ্ভাসিত হয়ে পড়বেই এবং সেদিন শূন্যে বিলীন হয়ে যাবে যত সব মিথ্যার ফানুস।

মাওলানা মওদূদী ও মুসলিম লীগ

নিখিল ভারত মুসলিম লীগের নেতৃত্বে পাকিস্তান আন্দোলন পরিচালিত হতে থাকলেও মাওলানা মওদূদী মুসলিম লীগে যোগদান করেননি। কেন করেননি তা নিম্নের আলোচনায় জানা যাবে। তথাপি একথা অনস্বীকার্য যে, পাকিস্তান আন্দোলন যেসব মনীষীর চিন্তাধারার ফল মাওলানা মওদূদী তাঁদের অন্যতম। শুধু তাই নয়, এ আন্দোলনে তাঁর সক্রিয় সহযোগিতা ছিল। এ শুধু আমাদের কথা নয়, অন্য মহল থেকে এবং বিশেষ করে মুসলিম লীগ মহল থেকেও এর স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। প্রমাণস্বরূপ নিম্নে কিছু উদ্ধৃতি দেয়া হলো–

মাওলানা যফর আহমদ আনসারী এম, এ, এল, এল, বি, বিভাগ পূর্বকালে মরহুম কায়েদে আযম ও মরহুম লিয়াকত আলী খানের দক্ষিণ হস্ত ছিলেন। তিনি নিখিল ভারত মুসলিম লীগের যুগ্ম সম্পাদক এবং এর কার্যকরী সংসদ (Committee of action) ও কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টারী বোর্ডের সম্পাদক ছিলেন। তিনি বলেন–

"এ বিষয়বস্তুর উপরে মাওলানা আবুল আ'লা মওদূদী সাহেব 'জাতীয়তার সমস্যা' (মাস্য়ালায়ে কওমিয়াত) শীর্ষক এক ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখতে থাকেন। অকাট্য যুক্তি-প্রমাণাদি ও শক্তিশালী প্রকাশভঙ্গির দরুন প্রবন্ধটি মুসলমানদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত হয়। অল্প সময়ের মধ্যে অত্যন্ত দ্রুততার সাথে মুসলমানদের মধ্যে এ এক আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে পড়ে। এ গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার ফলে একজাতীয়তার ধারণা বিশ্বাস ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায় এবং স্বতন্ত্র জাতিতত্ত্বের অনুভূতি মুসলমানদের মধ্যে বিদ্যুত বেগে সঞ্চারিত হয়। জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে এ একটা নিছক আদর্শিক বিতর্ক-আলোচনা ছিল না, বরং এ কংগ্রেস ও জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের স্বপ্ন প্রাসাদ ভেঙ্গে দিয়েছিল। মুসলমানদের অন্তর থেকে স্বতন্ত্র জাতিতত্ত্বের অনুভূতি কোন প্রকারে বিদূরিত করে তাদের জাতীয় অস্তিত্বের মূলকে অন্তঃসারশূন্য করে দেয়াই ছিল হিন্দুদের সর্বাপেক্ষা মারাত্মক কৌশল। স্বয়ং মুসলিম লীগ এ বিতর্ক আলোচনায় ধর্মীয় দিকটা বেশী করে পরিস্ফুট করে তুলবার চেষ্টা করছিল, যাতে জনসাধারণ

কংগ্রেসের খেলা ধরে ফেলতে পারে এবং তাদের দ্বীন ও ঈমানের দাবি পূরণের জন্যে প্রবৃত্ত হতে পারে।" *

মাওলানা আনসারী সাহেব আরও বলেন-

"প্রকৃতপক্ষে পাকিস্তান প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পূর্ব থেকেই বিভিন্ন মহল থেকে 'হুকুমতে ইলাহিয়া', 'মুসলিম হিন্দুস্তান', 'খেলাফতে রব্বানী' প্রভৃতির দাবি উঠছিল। আল্লামা ইকবাল একটা মুসলিম হিন্দুস্তানের ধারণা দিয়েছিলেন। মওদূদী সাহেবের সাহিত্য 'হুকুমতে ইলাহিয়ার' আওয়াজ তুলেছিল। মাওলানা আযাদ সোবহানী 'খেলাফতে রব্বানী'র ধারণা দিয়েছিলেন। বিভিন্ন স্থান থেকে এ ধরণের দাবি উত্থিত হওয়াতে এ কথাই প্রমাণিত হচ্ছিল যে, মুসলমানগণ তাদের নিজস্ব চিন্তাধারার ভিত্তিতে একটা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা গভীরভাবে অনুভব করছিল এবং পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে তাদের সুপ্ত সংকল্প পুনর্জাগরিত হচ্ছিল।"**

আল্লামা ইকবাল মাওলানা মওদূদীর প্রবন্ধাদির দ্বারা অত্যন্ত প্রভাবিত হয়েছিলেন। লাহোর থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'ইকদাম' পত্রিকার সম্পাদক মিয়া মুহাম্মদ শফি সাহেব বলেন যে, আল্লামা ইকবাল "তর্জুমানুল কোরআনের" ঐসব প্রবন্ধ অন্যের সাহায্যে পাঠ করিয়ে শুনতেন। এ সবের দ্বারা তিনি এতটা মুগ্ধ ও প্রভাবিত হয়েছিলেন যে, মাওলানাকে তিনি দাক্ষিণাত্যের হায়দারাবাদ ত্যাগ করে পাঞ্জাব চলে আসতে অনুরোধ জানান। তাঁর এ আহ্বানেই মাওলানা মওদূদী ১৯৩৮ সালে পাঞ্জাবে চলে আসেন।

মিয়া মুহাম্মদ শফি সাহেব ১৯৬৩ সালের ৯ই জুনে প্রকাশিত সাপ্তাহিক ইকদামে "লাহোরের ডাইরী" শীর্ষক প্রবন্ধে মন্তব্য করেন-

"মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী তো প্রকৃতপক্ষে জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের দুশমন ছিলেন। আমি পূর্ণ দায়িত্বের সাথে একথা বলছি যে, আমি আল্লামা ইকবালকে একথা বলতে শুনতাম, 'মওদূদী এসব কংগ্রেসী মুসলমানদের শিক্ষা দিয়ে ছাড়বে-।' আল্লামা ইকবাল আযাদ (মাওলানা আবুল কালাম আযাদ) ও মাদানীর (মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী) সুস্পষ্ট ভাষায় সমালোচনা করতেন। কিন্তু তিনি মাওলানা মওদূদীর তর্জুমানুল কোরআনের বিশেষ বিশেষ অংশ অন্যের দ্বারা পড়িয়ে শুনতে অভ্যস্ত ছিলেন।

* "পাকিস্তান আন্দোলন ও উলামা" মাসিক চেরাগে রাহ, পাকিস্তানের আদর্শ সংখ্যা, পৃঃ ২৩২।

** ঐ- পৃঃ ২৩৩

তারপর এ ব্যাপারে তো আমি ষোলআনা দায়িত্ব সহকারে বলছি যে, আল্লামা ইকবাল একখানা পত্রের দ্বারা দাক্ষিণাত্যের হায়দারাবাদের পরিবর্তে পাঞ্জাবকে কর্মস্থল বানানোর জন্য মাওলানা মওদূদীকে অনুরোধ জানান এবং এ পত্রখানা তিনি আমারই দ্বারা লিখিয়েছিলেন।"

পাকিস্তানের সামরিক শাসন আমলে গঠিত গঠণতন্ত্র কমিশনের পরামর্শদাতা ও কোম্পানী ল' কমিশনের সভাপতি সাইয়েদ শরীফউদ্দীন পীরজাদা তাঁর Evolution of Pakistan গ্রন্থে বলেন–

"মাওলানা মওদূদী ১৯৩৮-৩৯ সালে 'তর্জুমানুল কোরআনে' প্রকাশিত এক ধারাবাহিক প্রবন্ধের দ্বারা কংগ্রেসের অবগুণ্ঠণ উন্মোচন করে মুসলমানদেরকে সাবধান করে দেন। উপরন্তু তিনি এই উপমহাদেশের মুসলমানদের ইতিহাস পর্যালোচনা করেন। কংগ্রেসের ধর্মনিরপেক্ষতার মুখোশ খুলে ফেলেন এবং একথা প্রমাণ করে দেন যে, ভারতের বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এর জন্যে গণতন্ত্র অনুপযোগী। কারণ এখানে মুসলমানদের একটি ভোট এবং হিন্দুদের চারটি ভোট রয়েছে। তিনি হিন্দুদের জাতীয় সাম্রাজ্যবাদের নিন্দা করেন এবং এই মতামত ব্যক্ত করেন যে, যুক্ত নির্বাচন অথবা পরিষদসমূহে কিছু বেশী সংখ্যক আসন লাভ এবং চাকরিতে একটা সংখ্যার হার নির্ধারণ মুসলমান জাতির রাজনৈতিক সমস্যার কোন সমাধানই নয়। তিনি এ ব্যাপারে তিনটি বিকল্প প্রস্তাবও পেশ করেন।"

Evolution of Pakistan, P. 191.

এ তিনটি প্রস্তাবের মধ্যে তৃতীয়টিই ছিল ভারত বিভাগের প্রস্তাব। পীরযাদা সাহেব তাঁর গ্রন্থে সর্বশেষ মন্তব্য করেন ঃ

"ঐ সব প্রস্তাব ও পরামর্শ যা স্যার আব্দুল্লাহ হারুন, ডাঃ লতিফ, স্যার সেকান্দর হায়াত খান, জনৈক পাঞ্জাবী, ডাঃ কাদেরী, মাওলানা মওদূদী, চৌধুরী খালিকুজ্জামান প্রমুখ ব্যক্তিগণ উপস্থাপিত করেন তা সবই এক অর্থে পাকিস্তান সৃষ্টির পথ নির্দেশক ছিল।" উক্ত গ্রন্থ।

আমাদের কথা প্রমাণ করার জন্যে উপরের উদ্ধৃতিগুলোর প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু শুধু তাদেরই জন্যে প্রয়োজন বোধ করছি যারা সে সময়ের অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ছিলেন না। এসব থেকে প্রমাণিত হয় যে, পাক-ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনেও বিশেষ করে পাকিস্তান অর্জনের পথে মাওলানা মওদূদী প্রণীত "মুসলমান আওর মওজুদা সিয়াসী কাশ্‌মকাশ্‌" এবং "মাস্‌য়ালায়ে কাওমিয়াত" গ্রন্থদ্বয় কতখানি জাতীয় খেদমত করেছে।

শরীফ উদ্দীন পীরজাদা তাঁর গ্রন্থে মাওলানার যে তিনটি প্রস্তাবের উল্লেখ করেন, তা এমন তিনটি বিকল্প শাসনতন্ত্রের প্রস্তাব যা ১৯৩৮ সালের তর্জুমানুল কোরআনের অক্টোবর, নভেম্বর ও ডিসেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

সংক্ষেপে তা নিম্নে প্রদত্ত হলো–

প্রথম প্রস্তাব

(ক) রাষ্ট্র ব্যবস্থা হবে আন্তর্জাতিক ফেডারেশনের (International Federation) মূলনীতির ভিত্তিতে। অন্য কথায় এটা একটিমাত্র কোন জাতির রাষ্ট্র হবে না বরং সন্ধিবদ্ধ জাতিসমূহের একটি রাষ্ট্র (A state of federated nations)।

(খ) এ ফেডারেশনে শরীক প্রত্যেক জাতি সাংস্কৃতিক স্বায়ত্বশাসনের (Cultural autonomy) অধিকারী হবে।

(গ) সাধারণ দেশীয় ও আভ্যন্তরীণ ব্যাপারসমূহে কর্মপদ্ধতি তৈরি হবে সমঅংশীদারিত্বের (Equal partnership) ভিত্তিতে।

অতঃপর মাওলানা সাংস্কৃতিক স্বায়ত্বশাসনের মৌলিক নীতিও বিশ্লেষন করেন।

দ্বিতীয় প্রস্তাব

আন্তর্জাতিক ফেডারেশনের প্রস্তাব যদি গৃহীত না হয়, তাহলে দ্বিতীয় বিকল্প প্রস্তাব এই যে, বিভিন্ন জাতির পৃথক পৃথক ভূখণ্ড চিহ্নিত করা হবে যেখানে তারা তাদের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কায়েম করতে পারবে। অধিবাসী বিনিময়ের জন্যে পঁচিশ অথবা কমবেশী দশ বছরের মুদ্দৎ নির্ধারিত করে দেয়া হবে। প্রত্যেক রাষ্ট্রকে অধিক পরিমাণ স্বায়ত্ব শাসনের অধিকার এবং কেন্দ্রীয় ফেডারেশনের অতি অল্প ইখতিয়ারই থাকবে।

তৃতীয় প্রস্তাব

উপরিউক্ত প্রস্তাবও যদি গৃহীত না হয়, তাহলে তৃতীয় বিকল্প প্রস্তাব এই যে, আমাদের জাতীয় রাষ্ট্রগুলোকে স্বতন্ত্রভাবে কায়েম করা এবং তাদের পৃথক পৃথক ফেডারেশন হোক।

তৃতীয় এবং শেষ প্রস্তাবটি প্রকারান্তরে মাওলানার ভারত বিভাগেরই প্রস্তাব যা মুসলিম লীগ পনেরো মাস পরে ১৯৪০ সালের ২৩শে মার্চ গ্রহণ করে– যা ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব তথা পাকিস্তান প্রস্তাব নামে আখ্যায়িত হয়।

এখন প্রশ্ন এতসব করার পরও মাওলানা মওদূদী মুসলিম লীগের সাথে মিলে আন্দোলন করেননি কেন? তার একমাত্র কারণ ছিল মুসলিম লীগের কর্মপন্থা। মাওলানা একাধিকবার এর বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেন–

● যদি আমাদের লক্ষ্য একটি ইসলামী রাষ্ট্র গঠন হয়, তাহলে সে লক্ষ্যে পৌঁছার জন্যে আমাদের জাতিকে নৈতিক দিক দিয়েও তৈরী করে নিতে হবে। এর জন্যে শিক্ষা-দীক্ষা, চিন্তাধারা, নৈতিকতা, তাহযীব-তামাদ্দুন, রাজনীতি প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই আমাদেরকে কাজ করতে হবে। তা ছাড়া এ উদ্দেশ্য সফল হওয়া বড়ই সুকঠিন।

● এ আন্দোলনে সার্বিকভাবে ও সকল বিভাগে নেতৃত্ব নির্বাচনে অতি সাবধানতার সাথে কাজ করতে হবে। সমাজতন্ত্রী, নাস্তিক, ধর্মহীন, জায়গীরদার, জমিদার প্রভৃতি সকলকে একস্থানে একত্র করলে যে ভীড় জমে উঠে, তা কোনদিনই জাতিকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারে না। এরা তো একে অপরের ধ্বংস সাধনে ও নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থের জন্যেই জাতিকে ব্যবহার করার চেষ্টা করবে। ফলে গন্তব্যস্থল লক্ষ্যচ্যুত হবে।*

● মুসলমানদের মৌলিক বৈশিষ্ট্য এই যে, তারা একটি আদর্শবাদী ও সত্যের দিকে আহ্বানকারী দল । কোন মূল্যেই যেন এ বৈশিষ্ট্য প্রভাবিত হতে না পারে।

দুঃখের বিষয় মুসলিম লীগ কর্তৃপক্ষ এসব কথায় কোন গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন বোধ করেনি।

নিখিল ভারত মুসলিম লীগের কার্যকরী সংসদের (Committee of Action) পক্ষ থেকে লিখিত এক পত্রের জবাবে মাওলানা বলেন–

---

* বলা বাহুল্য মাওলানার তৎকালীন আশংকা প্রতিফলিত হয়েছে। পাকিস্তানের বিগত তিন যুগের ইতিহাস বারবার একথারই প্রমাণ দিয়েছে। -গ্রন্থকার।

"আপনারা কখনও একথা মনে করবেন না যে, কোন প্রকার মতানৈক্যের কারণে আমি এ কাজে অংশগ্রহণ করছি না। প্রকৃতপক্ষে আমার অক্ষমতা এই যে, আমি বুঝতে পারছি না যে, যদি অংশগ্রহণ করি তা কিভাবে করব। অর্ধ বা অসম্পূর্ণ উপায়-পদ্ধতি আমার মনে ধরে না। নিজের জন্যে এটাই সঙ্গত মনে করি যে, আমি এ ব্যাপারে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার পরিবর্তে একজন ছাত্রের মতো দেখতে থাকি যে, পরিকল্পনাকারীগণ এ আংশিক সংস্কার ও গঠনমূলক কাজের কি উপায় নির্ধারণ করেন এবং কার্যসম্পাদনকারীগণ তা কার্যে পরিণত করে কি সুফল প্রদান করেন।"

(তর্জুমানুল কোরআন, জুলাই-অক্টোবর– ১৯৪৪)

এ ছিল মুসলিম লীগের কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে মাওলানার মতানৈক্য। তাঁর এ অভিমত সম্পর্কে দ্বিমত হতে পারে। কিন্তু ভবিষ্যতের ইতিহাস লেখক বোধহয় এ সত্যকে উপেক্ষা করতে পারবেন না যে, ভারত বিভাগের পর পাকিস্তানে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পথে যে সব প্রতিবন্ধকতা দেখা দিয়েছে ও দিচ্ছে, স্বাধীনতা লাভের সাঁইত্রিশ বছর পরও পাকিস্তান যে বাস্তব ক্ষেত্রে ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত না হয়ে শুধু কাগজে কলমেই রয়ে গেছে, উপরন্তু তাকে সত্যিকার ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত করার চেষ্টা-চরিত্র যারা করছে, তাদেরকে যেভাবে জেল, ফাঁসি ও নানাবিধ অত্যাচার-নির্যাতনে নিষ্পেষিত হতে হচ্ছে, এসবের ভবিষ্যদ্বাণী বিভাগপূর্বকালেই মাওলানার প্রবন্ধাদিতে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।

তথাপি এ কথা ভুললে চলবে না যে, মাওলানা পাকিস্তান আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ না করলেও লেখনীর মাধ্যমে ইসলামী জীবন বিধানের সুস্পষ্ট বিশ্লেষণ করে পাকিস্তান আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষকতাই করে এসেছেন। পাকিস্তান আন্দোলন চলাকালে মুসলমানদের মধ্যে কিছু লোক এরূপ মন্তব্য করতে লাগলো যে, ভারতকে খণ্ড-বিখণ্ড করা কি করে সহ্য করা যায়। মাওলানা তার জবাবে বলেন–

"মুসলমান হিসাবে আমার কাছে এ প্রশ্নের কোনই গুরুত্ব নেই যে ভারত অখণ্ড থকবে না দশ খণ্ডে বিভক্ত হবে। সমগ্র পৃথিবী এক দেশ। মানুষ তাকে সহস্র খণ্ডে বিভক্ত করেছে। আজ পর্যন্ত পৃথিবী যত খণ্ডে বিভক্ত হয়েছে তা যদি ন্যায়সঙ্গত হয়ে থাকে, তাহলে ভবিষ্যতে আরও কিছু খণ্ডে বিভক্ত হলেই বা ক্ষতিটা কি? এই দেব-প্রতিমা খণ্ড-বিখণ্ড হলে মনঃকষ্ট হয় তাদের, যারা একে দেবতা মনে করে। আমি যদি এখানে এক বর্গমাইলও এমন জায়গা পাই, যেখানে মানুষের উপর খোদা ব্যতীত অন্য কারও প্রভুত্ব-কর্তৃত্ব থাকবে না,

তাহলে এ সামান্য ভূমিখণ্ডকে আমি সমগ্র ভারত থেকে অধিকতর মূল্যবান মনে করব।"

(সিয়াসী কাশ্‌মকাশ্‌, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৭৬-৭৭)

যে সময়ে পাকিস্তান দাবিকে ইসরাঈলীদের দাবির সাথে তুলনা করা হলো, তখন তার তীব্র প্রতিবাদ করে মাওলানা জানালেন–

"আমার মতে পাকিস্তান দাবির সাথে ইহুদীদের জাতীয় আবাসভূমির দাবির কোন তুলনাই হতে পারে না। ফিলিস্তিন প্রকৃতপক্ষে ইহুদীদের আবাসভূমি নয়। ইহুদীদের এ অবস্থা ছিল না যে, জাতীয় আবাসভূমি স্বরূপ তাদের একটা দেশ আছে, যার স্বীকৃতির জন্যে তারা চেষ্টা করছে। বরং তাদের সত্যিকার পজিশন এই যে, একটা দেশ তাদের জাতীয় আবাসভূমি মোটেই নয়, অথচ তাদের দাবি যে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান থেকে তাদেরকে সেখানে একত্র করে বসবাসের সুযোগ দেয়া হোক এবং বলপূর্বক সে দেশকে তাদের জাতীয় আবাসভূমি বানিয়ে দেয়া হোক। পক্ষান্তরে পাকিস্তান দাবির ভিত্তি এই যে, যে সব অঞ্চলে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ সেগুলো তো তাদের জাতীয় আবাসভূমি। মুসলমানদের বক্তব্য এই যে, বর্তমান গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের সঙ্গে এক হয়ে থাকার ফলে তাদের জাতীয় আবাসভূমির রাজনৈতিক সত্তা ক্ষতিগ্রস্ত হয় বলে তা থেকে তাদেরকে রক্ষা করা হোক এবং অখণ্ড ভারতে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের পরিবর্তে 'হিন্দু ভারত' ও 'মুসলিম ভারত' নামে দু'টি স্বাধীন রাষ্ট্র হোক। অন্য কথায় মুসলমানদের এ দাবি নয় যে, তাদের জন্যে একটা জাতীয় আবাসভূমি সৃষ্টি করা হোক। বরং তাদের বক্তব্য এই যে, তাদের যে জাতীয় আবাসভূমি বর্তমান রয়েছে, স্বতন্ত্রভাবে সেখানে এক স্বাধীন রাষ্ট্র কায়েম করার অধিকার তাদের দেয়া হোক।"

তর্জুমানুল কোরআন (জুলাই-অক্টোবর– ১৯৪৪)

পাকিস্তান একটা পূর্ণ ইসলামী রাষ্ট্র হবে একথা মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে জোরে-শোরে প্রচার করা হচ্ছিল। লীগ মহল থেকে কেউ কেউ অনুভব করছিলেন যে, ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার জন্যে আন্দোলন গড়ে উঠছে, তার জন্যে মৌলিক নীতি সম্বলিত একটা খসড়া তৈরি করা প্রয়োজন। এ উদ্দেশ্যে ইউপি প্রাদেশিক মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে একটি উলামা কমিটি গঠন করা হয়। এতে যারা ছিলেন তাঁদের মধ্যে মাওলানা সাইয়েদ সুলায়মান নদভী, মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, মাওলানা আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদী,মাওলানা আযাদ সুবহানী, নবাব মুহাম্মদ ইসমাঈল (ছাতারীর নবাব), নবাব শামসুল হাসান এবং চৌধুরী খালিকুজ্জামানের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

উক্ত কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন ছাতারীর নওয়াব মুহাম্মদ ইসমাঈল খান। একচল্লিশের জানুয়ারীর প্রথম সপ্তাহে লখনৌর 'নাদ্ওয়াতুল উলামা' কমিটির বৈঠকে যোগদানের জন্যে ছাতারীর নওয়াব মাওলানাকে অনুরোধ জানিয়ে পত্র দেন। বৈঠকে যোগদানের আগে মাওলানা 'নাদওয়ার' সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভীর কাছে যে পত্র দেন তা 'আমার প্রিয় গ্রন্থ' শীর্ষক বর্ণনা গ্রন্থের শেষে সন্নিবেশিত হয়েছে।

সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট অফ ইসলামিক রিসার্চের রীডার জনাব কামারুদ্দীন খান সাহেব বলেন যে, তিনি একবার মাওলানা মওদূদীর ইঙ্গিতে ১৯৪১ সালে কায়েদে আযমের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তিনি এ বিষয়ে নিম্নরূপ বিবরণ দেন ঃ

"মাহমুদাবাদের রাজার মাধ্যমে দিল্লীর গুলরানা ভবনে আমাদের সাক্ষাতের ব্যবস্থা করা হয়। কায়েদে আযম পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর্যন্ত অত্যন্ত ধৈর্য সহকারে আমার কথা শুনতে থাকেন। তারপর বলেন যে, মাওলানা মওদুদী যে খেদমত করছেন, তা তিনি অত্যন্ত পছন্দ করেন। কিন্তু এই উপমহাদেশের মুসলমানদের জন্যে একটা স্বাধীন রাষ্ট্র লাভ তাঁর পবিত্র জীবন ও কর্মধারা অপেক্ষা আশু প্রয়োজনীয়। জামায়াত একটা মহান উদ্দেশ্যের জন্যে কাজ করছে এবং লীগ সেই সমস্যার আশু সমাধানে প্রবৃত্ত রয়েছে। কারণ এর সমাধান না হলে জামায়াতের কাজ পূর্ণ হতে পারবে না।"

– সাপ্তাহিক Thinker (১৯৬৩ সালের ২৭শে ডিসেম্বরের একটি প্রবন্ধ)।

উপরের আলোচনা দ্বারা একথা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, মাওলানা মওদূদী শুধু যে পাকিস্তান আন্দোলনের সমর্থক ছিলেন তা নয়, বরং এ আন্দোলনকে সার্বিক সাহায্য করেছেন, এর গতিবেগ বর্ধিত করেছেন, আন্দোলন বিরোধী উক্তি ও সমালোচনার অকাট্য যুক্তিপূর্ণ জবাব দিয়েছেন। তবে তিনি মুসলিম লীগে যোগদান করেননি, করতে পারেননি। বিভিন্ন চরিত্র ও মতাদর্শের এমনকি ইসলামের বিপরীত মতাদর্শের লোকের ভীড় জমিয়ে যে দল গঠিত হয়, তা কোনদিনই কোন মহৎ আদর্শের দিকে চলতে পারে না। এ তত্ত্বজ্ঞান মাওলানার ছিল। এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই যে, এ বিষয়ে তিনি ভারত বিভাগের বহু পূর্বে যে সব ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, তা পাকিস্তান সৃষ্টির পর প্রতিটি অক্ষরে অক্ষরে প্রতিফলিত হতে দেখা গেছে এবং আজও যাচ্ছে। আশা করি এতে করে মাওলানা সম্পর্কে বিরূপ মত পোষণকারীদের ভ্রান্তি দূর হবে।

মাওলানা মওদূদী –– ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের পর

মুসলিম লীগের নেতৃত্বে ভারতীয় মুসলমান অবশেষে ১৯৪০ খ্রিষ্টাব্দের ২৩শে মার্চ লাহোরে অনুষ্ঠিত লীগের এক ঐতিহাসিক অধিবেশনে পাকিস্তান প্রস্তাব গ্রহণ করে। মুসলমানদেরকে একটি স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে স্বীকৃতি দান এবং তাদের জন্যে ভারত উপমহাদেশেই একটি স্বতন্ত্র আবাসভূমি দান করতে হবে, যেখানে তারা তাদের দ্বীন, তাহযীব-তামাদ্দুন ও ঐতিহ্য অনুযায়ী একটি পূর্ণ ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা তথা "হুকুমতে ইলাহিয়া" বা ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করতে পারে। এই ছিল পাকিস্তান আন্দোলনের মূল কথা। ইসলামের নামে এই পাকিস্তান আন্দোলন চলতে থাকলেও তা যে ইসলাম কায়েমের জন্যে মোটেই অনুকূল ও উপযোগী ছিল না, তা মাওলানা মওদূদী স্পষ্ট বুঝেছিলেন। কারণ মুসলিম লীগ তার বিঘোষিত গন্তব্যের দিকে যাত্রা না করে ভিন্ন পথে ভিন্ন দিকেই যাত্রা শুরু করেছিল। এর দু'প্রকার কারণ হতে পারে। প্রথমত, হয়তো তার উদ্দেশ্যের মধ্যে পূর্ণ আন্তরিকতার অভাব ছিল কিংবা দ্বিতীয়ত, লক্ষ্যস্থলে উপনীত হওয়ার সুষ্ঠু ও বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি তার জানা ছিল না।

পাকিস্তান প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার ছ'মাস পরে ১১ই সেপ্টেম্বর আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্ট্রাচী হলে "আনজুমানে ইসলামী তারীখ ও তামাদ্দুনের" উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এক সভায় মাওলানা মওদূদী এক দীর্ঘ বক্তৃতা করেন। তাঁর বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল 'ইসলামী রাষ্ট্র কিরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়?' (ইসলামী হুকুমাত কিসতরাহ কায়েম হুতি হ্যায়?) তাঁর এ বক্তৃতা উর্দু, ইংরেজি, বাংলা ও অন্যান্য ভাষায় পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়। "ইসলামী বিপ্লবের পথ" গ্রন্থখানি এরই বাংলা অনুবাদ।

বক্তৃতায় মাওলানা বলেন––

"ইসলামী রাষ্ট্র নিছক একটি আদর্শভিত্তিক রাষ্ট্র। সংকীর্ণ জাতীয়তা ও উহার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব হইতে উহা সম্পূর্ণ মুক্ত। বস্তুত ইসলামী হুকুমাতের ইহা প্রথম বৈশিষ্ট্য এবং এই বৈশিষ্ট্যই উহাকে দুনিয়ার অন্যান্য রাষ্ট্র হইতে সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য দান করিয়াছে। ইংরেজি ভাষায় এই ধরনের রাষ্ট্রকে বলা হয় IDEOLOGICAL STATE । এহেন আদর্শভিত্তিক রাষ্ট্রের সহিত পৃথিবী

একাধিকবার পরিচিত হইতে পারে নাই। মুসলিম সমাজে জন্মগ্রহণ করিয়াও যাহারা সামাজিক ধারণা ও মতবাদ ইউরোপীয় ইতিহাস, ইউরোপীয় রাজনীতি ও সমাজ বিজ্ঞান হইতে গ্রহণ করিয়াছে, তাহাদের মন ও মস্তিষ্কে এই আদর্শবাদের স্থান হইতে পারে না। (ইসলামী বিপ্লবের পথ– পৃঃ ৪৮)

মাওলানা আরও বলেন–

"ইসলামী রাষ্ট্রের গোটা ইমারতের কাঠামো আল্লাহ তায়ালার প্রভুত্বের বুনিয়াদের উপর স্থাপিত। বস্তুত ইহা ইসলামী হুকুমাতের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য। নিখিল বিশ্বজগত একমাত্র আল্লাহ তায়ালার রাজ্য, তিনিই ইহার প্রভু, শাসক ও বিধানকর্তা। ইহাই ইসলামী রাষ্ট্রনীতির মৌলিক ধারণা। কোন ব্যক্তি, পরিবার, শ্রেণী কিংবা জাতি তথা সমগ্র মানুষেরও কোনরূপ প্রভুত্বের অধিকার নাই। রাষ্ট্রীয় বিধান রচনার এবং হুকুম-নির্দেশ দেওয়ার অধিকার একমাত্র আল্লাহ তায়ালার– অন্য কাহারও নয়। মানুষ এই দুনিয়ায় আল্লাহ তায়ালার খলীফা বা প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করিবে। পৃথিবীর রাষ্ট্র পরিচালনার ইহাই একমাত্র বিশুদ্ধ ও সুষ্ঠু পন্থা।" (ইসলামী বিপ্লবের পথ)

ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনার জন্যে বিশেষ গুণাবলী সম্পর্কে মাওলানা বলেন–

"ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনার জন্যে এক বিশেষ মনোবৃত্তি, বিশেষ প্রকৃতি এবং বিশেষ ধরনের কার্যক্রম নির্ধারণ আবশ্যক। অন্য কোন রাষ্ট্র ব্যবস্থার সহিত উহার কোন তুলনাই হইতে পারে না। উহার সৈন্যবাহিনী, উহার পুলিশ, আদালত, উহার অর্থনীতি, আইন-কানুন ও রাজনীতি, উহার সন্ধি ও যুদ্ধনীতি এবং তৎসংক্রান্ত কার্যকলাপ প্রভৃতি সবকিছুই ধর্মহীন রাষ্ট্র হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। ধর্মহীন বৈষয়িক রাষ্ট্রের আদালতের জজ ও প্রধান বিচারপতি ইসলামী হুকুমাতের কেরানী বা চাপরাশী হওয়ারও যোগ্য নয়। ওখানকার পুলিশ ইন্সপেক্টর জেনারেল ইসলামী হুকুমাতে একজন সাধারণ কনস্টেবলের পদেও নিয়োগ পাইতে পারে না। ওখানকার ফিল্ড মার্শাল এখানে সাধারণ সৈন্যবাহিনীতেও প্রবেশ করিতে পারে না। ওখানকার পররাষ্ট্র সচিব ইসলামী রাষ্ট্রে কোন পদ লাভ করা তো দূরের কথা, মিথ্যা প্রচারণা, প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধের দরুন নির্বাসন দণ্ড লাভের যোগ্য।" (ইসলামী বিপ্লবের পথ– পৃঃ ১১)

মাওলানা তাঁর বক্তৃতায় স্পষ্ট ভাষায় এ কথা বলেন যে, ইসলামী রাষ্ট্র যেহেতু একটি আদর্শভিত্তিক রাষ্ট্র, অতএব রাষ্ট্র গঠন ও পরিচালনা করতে হলে সর্বপ্রথম ইসলামী আদর্শে পূর্ণ চরিত্রবান ও ইসলামী গুণে গুণান্বিত কিছুসংখ্যক লোক ও অনুরূপ পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। নতুবা এ ধরনের কোন আদর্শভিত্তিক রাষ্ট্র সম্ভব নয়। তিনি দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলেন–

"রুশো, ভলটেয়ার এবং মনটেস্কিভ প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ দীর্ঘকাল ধরিয়া ফ্রান্সে যে বিশেষ আদর্শের নৈতিক ও মানসিক ক্ষেত্র তৈয়ার করিয়াছিলেন, তাহার ফলেই সেখানে তাহাদের উদ্দেশ্য অনুযায়ী বিপ্লব সৃষ্টি সম্ভব হইয়াছিল। রুশ বিপ্লব কেবল মার্কসের চিন্তাধারা, লেনিন ও ট্রটস্কির নেতৃত্ব, আর কমিউনিজমের মতাদর্শে সুদীক্ষিত হাজার হাজার কমিউনিস্ট কর্মীর বিপ্লবী কার্যকলাপের দ্বারাই সৃষ্টি হইতে পারিয়াছিল, অন্য কোন উপায়ে নয়। জার্মানীর জাতীয় সমাজতন্ত্রবাদ সেই বিশেষ ধরনের নৈতিক, মনস্তাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেই শিকড় গাড়িয়া দাঁড়াইতে পারিয়াছিল, যাহা হেগেল, ফিস্‌টে, গ্যেটে, নিট্‌শে এবং তাহাদেরই মত আরও অসংখ্য চিন্তানায়কের গবেষণা, চিন্তাধারা, মতবাদ এবং হিটলারের দুর্ধর্ষ নেতৃত্ব দ্বারা সৃষ্টি হইয়াছিল। ঠিক তদ্রুপ ইসলামী বিপ্লবও তখনই সৃষ্টি হইবে এবং ইসলামী রাষ্ট্রও তখনই প্রতিষ্ঠিত হইবে, যখন কোরআনের আদর্শ ও মতবাদ এবং নবী মুস্তাফার (সাঃ) চরিত্র ও কার্যকলাপের বুনিয়াদে কোন গণ-আন্দোলন জাগিয়া উঠিবে। আর সমাজ জীবনের সমগ্র মানসিক, নৈতিক, মনস্তাত্ত্বিক এবং সাংস্কৃতিক বুনিয়াদকে একটি প্রবলতর সংগ্রামের সাহায্যে একেবারে আমূল পরিবর্তন করিয়া ফেলা সম্ভব হইবে। জাতীয়তাবাদ আন্দোলন দ্বারা কোন ইসলামী বিপ্লব সৃষ্টি হইতে পারে না। কারণ তাহার পশ্চাতে রহিয়াছে ভুল শিক্ষা পদ্ধতি এবং উহার ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে সুবিধাবাদী মনোবৃত্তি ও কালের গড্ডালিকা প্রবাহে অনির্দেশের পথে ভাসিয়া বেড়াইবার উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তির উপর। বস্তুতঃ রাষ্ট্র ও সমাজ দর্শনের ক্ষেত্রে প্রাক্তন ফরাসী মন্ত্রী মঁসিয়ে রেনোর ন্যায় আমি এই ধরনের কোন অস্বাভাবিক ঘটনায় মোটেই বিশ্বাসী নই। ইহাই আমার আন্তরিক বিশ্বাস। কাজ যেরূপ হইবে, ফল উহার অনুরূপ হইবেই– ইহার ব্যতিক্রম সম্ভব নয়।" (ইসলামী বিপ্লবের পথ, পৃঃ ১৮-১৯)।

পাকিস্তান তথা ইসলামী হুকুমাতের জন্যে যে ধরনের আন্দোলন ও কর্মপদ্ধতি চলছিল, তার কঠোর সমালোচনা করে মাওলানা বলেন–

"এক শ্রেণীর মুসলমান মনে করেন যে, মুসলিম জাতিকে কোনরূপে সঙ্গঠিত করিতে পারিলেই সকল দুঃখের অবসান হইবে। মুসলিম নামধারী একটি জাতিকে নির্দিষ্ট কোন প্লাটফরমে সমবেত এবং একটি কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের অধীনে সংগঠিত ও পরিচালিত করিতে পারিলেই আপনা আপনিই ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা অবাস্তব কল্পনাবিলাস ছাড়া আর কিছুই নহে। উপরন্তু ইহা অন্ধ জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ও জাতীয়তাবাদী কর্মপন্থা মাত্র, তাহাতে সন্দেহ নাই। যে জাতিই দুনিয়াতে নিজেদের প্রভুত্ব কায়েম করিতে চাহিবে, তাহাকে এই পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে, সে যে ধর্মের বা যে দেশের অন্তর্ভুক্তই হউক না কেন। জাতির প্রেমে আত্মহারা নেতার সর্বাপেক্ষা বড় পরিচয় এই যে, তিনি সময় ও সুযোগ বুঝিয়া কথা বলিতে পারেন, বিভিন্ন প্রকার চাল চালিতে পারেন এবং নির্দেশ দান ও দল পরিচালনার দক্ষতা তাঁহার মধ্যে পূর্ণমাত্রায় থাকে। এহেন নেতার নেতৃত্বে জাতির যথেষ্ট উন্নতি লাভ হইতে পারে, তাহা অনস্বীকার্য। অনুরূপভাবে মুসলমানও যদি কেবলমাত্র একটি বংশানুক্রমিক কিংবা ঐতিহাসিক ঐতিহ্যসম্পন্ন জাতির সমষ্টির নাম হইত, তবে তাহাদের জন্য যাহা কিছু করা হইয়াছে বা হইতেছে কিংবা ভবিষ্যতেও হইবে, তাহা সবই ঠিক হইতেছে বলিয়া স্বীকার করা হইত। কিন্তু এই ধরনের নেতৃত্ব ও কর্মপ্রণালীর দ্বারা যে আদৌ কোন ইসলামী বিপ্লব সৃষ্টি হইতে পারে না এবং উহার দ্বারা ইসলামী রাষ্ট্রও প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না, তাহা আর নতুন করিয়া বলিবার আবশ্যক হয় না।" (ইসলামী বিপ্লবের পথ- পৃঃ ২০-২১)

অবিভক্ত ভারতে পাকিস্তান আন্দোলন পূর্ণ উদ্দমে চলছিলো বটে, কিন্তু পথভ্রষ্ট ও চরিত্রহীন সমাজের সংস্কার সাধনের কোনই চেষ্টা করা হয়নি এবং সে সম্পর্কে কোন কর্মসূচিও গ্রহণ করা হয়নি। সমাজের মধ্যে ইসলামী চেতনাবোধ ও নৈতিক অবস্থা অতীব নৈরাজ্যজনক ছিল। জাহেলী যুগের আবর্জনা ও চরিত্রদোষসহ ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলছিল। মাওলানা এসবের তীব্র প্রতিবাদ করে বলেন-

"যে জাতির নৈতিক অবস্থা এত হীন ও অধঃপতিত, তাহার সেই নানা মতের ও নানা প্রকৃতির জনতার ভিড় জমাইয়া একটি বাহিনী গঠন করিয়া দিলে কিংবা রাজনৈতিক শিক্ষাদীক্ষার সাহায্যে তাহাদিগকে শৃগালের ন্যায় চতুর করিয়া তুলিলে অথবা যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী করিয়া তাহাদের মধ্যে ব্যাঘ্রের হিংস্রতা জাগাইয়া তুলিলে অরণ্য জগতের প্রভুত্বলাভ করা হয়ত বা সহজ হইতে পারে, কিন্তু তাহার সাহায্যে মহান আল্লাহ্ তায়ালার দ্বীন ইসলামের কোন প্রচার হওয়া

বা ইসলামী হুকুমাত কায়েম হওয়া মোটেও সম্ভব নয়। কারণ এমতাবস্থায় দুনিয়ার কেহই তাহাদের নৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিবে না, কাহারও মনে ইসলামের আবেগময়ী ভাবধারা ও অনুপ্রেরণা জাগ্রত হইবে না এবং এইসব কারণেই ইসলামের সীমার মধ্যে দুনিয়ার মানুষের দলে দলে অনুপ্রবেশের মনোমুগ্ধকর দৃশ্য অবলোকন করার ভাগ্য কখনই হইবে না।"

(ইসলামী বিপ্লবের পথ- পৃঃ ২২)

মুসলিম লীগ যে ভুল পথে তার আন্দোলন পরিচালনা করছিল, বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে তার ভুল ধরে দিয়ে মাওলানা মওদূদী বলেন-

"আমি বুঝতে পারি না, একবার একটি ধর্মহীন জাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেলে অনির্দিষ্ট ভবিষ্যতে তাহার পরিবর্তন করিয়া উহাকে ইসলামী আদর্শে ঢালিয়া গঠন করা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে। গণতান্ত্রিক নিয়ম অনুসারে দেশের ভোটদাতাদের মধ্যে যদি ইসলামী মতবাদ, ইসলামী স্বভাব-চরিত্র ও দৃষ্টিভঙ্গি এবং ইসলামী মুল্যবোধ জাগ্রত না হয়, তাহারা যদি ইসলামী জীবন যাপন করিতে পূর্ব হইতেই অভ্যস্ত না হয়, তাহা হইলে তাহাদের ভোটে কখনই 'প্রকৃত মুসলিম' ব্যক্তি নির্বাচিত হইয়া পার্লামেন্টে বা ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য হইতে পারিবে না। ফলে রাষ্ট্রশক্তি এমন সব লোকের কুক্ষিগত হইয়া পড়িবে যাহারা আদম শুমারী রেজিষ্ট্রি বহিতে 'মুসলমান' বলিয়া গণ্য হইলেও মতবাদ ও চিন্তাধারা, আদর্শ ও কর্মপন্থার দিক দিয়া ইসলামের নামগন্ধও তাহাদের মধ্যে পাওয়া যায় না। এই ধরনের লোকদের হাতে রাষ্ট্র ক্ষমতা ন্যস্ত হওয়ার ফলে পূর্ণ আযাদী ও আযাদ রাষ্ট্র লাভ করিয়াও আমরা ঠিক সেই অবস্থায়ই জীবন যাপন করিতে বাধ্য হইব, যে অবস্থায় ছিলাম স্বাধীনতা লাভের পূর্বে একটি অমুসলিম রাষ্ট্রের অধীনে। বরং তদপেক্ষা নিকৃষ্ট ও মারাত্মক পরিস্থিতির উদ্ভব হইতে পারে। কারণ যে জাতীয় রাষ্ট্রের উপর 'ইসলামী হুকুমাতের' লেবেল লাগানো থাকিবে, তাহা ইসলামী বিপ্লবের পথ রোধ করিবার ব্যাপারে অমুসলিম রাষ্ট্র অপেক্ষাও অধিকতর সাহসী ও নির্ভীক হইবে। এমনকি একটি অমুসলিম রাষ্ট্র যে সব অপরাধের জন্যে কারাদণ্ড দিবে 'মুসলিম জাতীয় রাষ্ট্র' সেই সব ক্ষেত্রেই প্রাণদণ্ড ও নির্বাসনদণ্ড দান করিবে। আর ইহা সত্ত্বেও মুসলিম জাতীয় রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ তাহাদের জীবদ্দশায় 'গাযী' ও 'বীর মুজাহিদ' এবং মৃত্যুর পর 'মহিমান্বিত' বলিয়া অভিহিত হইবে। অতএব মুসলিম জাতীয় রাষ্ট্রকে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সাহায্যকারী হইতে পারে বলিয়া মনে করা একেবারেই ভুল।"

(ইসলামী বিপ্লবের পথ- পৃঃ ২৮)

বলা বাহুল্য, বিচক্ষণ ও দূরদর্শী মাওলানার উপরিউক্ত কথাগুলি পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মলাভের পর কয়েক বছরের মধ্যে অক্ষরে অক্ষরে প্রতিফলিত হয়েছে এবং আজও হচ্ছে।

মাওলানা উক্ত গ্রন্থে আরও মন্তব্য করেন–

"কিন্তু এখন প্রশ্ন এই যে, আমরা যদি সত্যিকারভাবে একটি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করিতে চাই, তাহা হইলে আমাদের কোন্ পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে? আমাদের সমাজের অনেক লোক আবার নেতৃবৃন্দের উপর সবকিছু নির্ভর করিয়া হাত-পা গুটাইয়া বসিয়া আছে। তাহাদের ভরসা এই যে, নেতৃবৃন্দই ইসলামী হুকুমাত কায়েম করিয়া দিবেন। সেজন্যে তাহাদের কিছুই করিবার আবশ্যকতা নাই। কিন্তু এই ধারণাও ঠিক ততখানি ভ্রান্ত, যতখানি ভ্রান্ত মুসলমানদের জাতীয় সংগঠন ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের গোড়ার দিকের কর্মপন্থা।" (ইসলামী বিপ্লবের পথ– পৃঃ ২৮-২৯)

পরম পরিতাপের বিষয়, আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের স্ট্রাচী হলের বক্তৃতায় ইসলামী রাষ্ট্রের পূর্ণাঙ্গ চিত্র, তা কায়েম করার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, ধারা ও বৈশিষ্ট্য এবং ভুল পন্থার ভয়াবহ পরিণাম বিশ্লেষণ করার পরও মুসলিম লীগ বেপরোয়াভাবে তার গতানুগতিক পদ্ধতিতেই কাজ করে চললো। মাওলানা তাঁর দূরদর্শিতার ফলে একথা স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলেন যে, গণ-আন্দোলনের ফলে একটা নব রাষ্ট্রের জন্মলাভ হয়তো বা নিশ্চয়ই হবে। কিন্তু ইসলমী রাষ্ট্র না হয়ে তা এমন ভ্রান্ত পথে পরিচালিত হবে যে তার ভয়াবহ পরিণাম ফল হতে তাকে রক্ষা করতে হলে পূর্বাহ্নেই তার ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। কারণ ভবিষ্যতের চিত্র মাওলানার মানসপটে তখনই পরিস্ফুট হয়েছিল। তিনি অবশ্য ভবিষ্যদ্রষ্টা ছিলেন না। কিন্তু ইতিহাসের অতীত অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান এবং বৈজ্ঞানিক কার্যকারণ সম্পর্ক দ্বারা তিনি তা বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি তাঁর উপরিউক্ত বক্তৃতায় বলেছিলেন–

"একটি গাছ মৃত্তিকা গর্ভ ভেদ করিয়া উদ্ভূত হওয়ার সময় হইতে পূর্ণাঙ্গ বৃক্ষে পরিণত হওয়া পর্যন্ত যদি কমলা লেবুর গাছ থাকে, তাহা হইলে হঠাৎ ফল ধারণের সময় তাহা আম ফলাইতে পারে না।"

পাকিস্তান আন্দোলনের ভবিষ্যত সম্পর্কে তাই তিনি স্পষ্ট উক্তিও করতে পেরেছিলেন।

ইসলামী আন্দোলনের পরিবেশ সৃষ্টি

মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার যে চিত্র মনের মধ্যে এঁকেছিলেন তাকে বাস্তব রূপ দেয়ার জন্যে যে পরিবেশ ও পটভূমি তৈরির প্রয়োজন ছিল, তার জন্যে তাঁকে নিরলসভাবে বছরের পর বছর ধরে চিন্তা ও প্রেরণার জাল বিস্তার করতে হয়। তার জন্যে অসীম ধৈর্যের সাথে নৈরাশ্যের আঁধার ভেদ করে তাঁকে যে কত পরিশ্রম ও সাধনা করতে হয়েছিল তা সঠিকভাবে উপলব্ধি করার জন্যে তর্জুমানুল কোরআনের ধারাবাহিক আলোচনার মূল বিষয়বস্তু পাঠকবর্গের সামনে পেশ করছি। এর থেকে এ সত্যও তারা উপলব্ধি করতে পারবেন যে, আকীদাহ-বিশ্বাস, চিন্তা ও কর্মের দিক দিয়ে একটি বিকৃত ও অধঃপতিত মুসলমান জাতির মধ্যে সত্যিকার ইসলামী আন্দোলনের সূচনা করা কত বড় দুঃসাধ্য কাজ ছিল, যা মাওলানা মওদূদী করেছিলেন। যে কেউ ইচ্ছা করলেই এবং যে কোন সময়ে ইসলামী আন্দোলন গড়ে তুলতে পারেন না। তার জন্যে প্রয়োজন হয় ইসলাম তথা কোরআন ও সুন্নাহর গভীর জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য, তা সহজ-সরল ও হৃদয়গ্রাহী ভাষায় প্রকাশ করার অনুপম লেখনীশক্তি, পথভ্রষ্ট মানব সমাজকে সত্যের পথে, আলোকের পথে আনবার হিকমত ও দক্ষতা। তদুপরি প্রয়োজন সংবেদনশীল মন-মানসিকতা, অসীম ধৈর্য ও সহনশীলতা, কালজয়ী সাহিত্য রচনার যোগ্যতা ও অতুলনীয় সাংগঠনিক দক্ষতা। এ সবকিছুই পরিপূর্ণরূপে আল্লাহ্ তায়ালা তাঁকে দান করেছিলেন।

জামায়াতে ইসলামী প্রতিষ্ঠা

'দ্বীনে হক' প্রতিষ্ঠার জন্যে মাওলানা আবুল আ'লা মওদূদী তাঁর মাসিক পত্রিকা 'তর্জুমানুল কোরআনের' মাধ্যমে আন্দোলন শুরু করেন। যে কোন আন্দোলন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে এবং তাকে বাস্তব রূপ দিতে প্রয়োজন হয় একটি জামায়াত বা দলের। ঐক্যবদ্ধ সর্বাত্মক প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম ব্যতীত কোন আন্দোলন পরিচালনা মোটেও সম্ভব নয়। এ উদ্দেশ্যে মাওলানা ১৯৪১ সালে 'জামায়াতে ইসলামী' নামে একটি দল কায়েম করেন। পাকিস্তান আন্দোলন চলাকালে 'জামায়াতে ইসলামী' নামে আর একটি দল কায়েম করার কি প্রয়োজন ছিল এবং তৎকালীন ভারতীয় মুসলমান রাজনৈতিক, ধর্মীয়, নৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে কোন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিল তার বিশদ আলোচনার প্রয়োজন। মুসলিম লীগ মুসলমানদের সকল প্রকার প্রয়োজন পূরণ করতে পারতো কিনা এবং না পারলে তার বিকল্প ব্যবস্থা কি হতে পারতো, তাও আমাদের পরিষ্কার জানা দরকার।

ব্রিটিশ সরকার ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে একথা উপলব্ধি করেছিলেন যে, দেশ শাসনে ভারতবাসীকে অংশ গ্রহণের অধিকার দিতে হবে এবং তা হবে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে। সে গণতন্ত্র আবার ইংল্যান্ডে প্রচলিত গণতন্ত্রের অনুরূপই হবে। ব্রিটিশ সরকার মনে করেছিলেন ইংল্যান্ডের ন্যায় ভারতবাসীও জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে এক জাতি। তাদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল শাসনকার্য পরিচালনা করবে এবং সংখ্যালঘু দল বিরোধী দলে থেকে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভের চেষ্টা করবে। এসবের পশ্চাতে আবার ছিল তাদের তামাদ্দুনিক ও রাজনৈতিক দর্শন। তা হলো এই যে, ধর্ম শুধু মানুষের ব্যক্তিগত জীবনেই সীমাবদ্ধ থাকবে এবং রাষ্ট্রকে হতে হবে ধর্মনিরপেক্ষ। এই দৃষ্টিভঙ্গি ও রাজনৈতিক দর্শনের ভিত্তিতে যে শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন সূচিত হবে তার দ্বারা উপকৃত একমাত্র তারাই হতে পারে যারা ছিল ভারতে সংখ্যাগুরু। এ জন্যে ব্রিটিশ সরকার এ ব্যবস্থা শুধু মেনে নিতেই রাজি হয়নি, বরঞ্চ তার জন্যে জোর ওকালতিও শুরু করে দেয়। এদিকে ভারতীয় কংগ্রেসের সমগ্র আন্দোলন প্রথম থেকেই এই চলছিল যাতে করে সে উক্ত দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী একটা দায়িত্বশীল

সরকার গঠনের চেষ্টা-চরিত্র করতে পারে। কিন্তু মুসলমানদের জন্যে উক্ত জাতীয় গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের ধারণা হলাহল সমতুল্য ছিল বলে তারা এক বিরাট সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল।

প্রথমে তারা ভাবলো যে, দেশবাসীর হাতে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার না আসাই ভাল। বরঞ্চ তা ব্রিটিশ শাসকদের হাতেই থাকুক। কিন্তু পরে তারা একজাতীয়তার ভিত্তিতে একটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মূলনীতিই মেনে নিল। তবে তার সঙ্গে তাদের চেষ্টা এই ছিল যে, তাদের জন্যে আইনানুগ রক্ষাকবচ থাকতে হবে, যাতে করে তারা স্বীয় স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে পারে। অতঃপর হঠাৎ খেলাফত আন্দোলনের সময়ে তারা হিন্দু মুসলিম ঐক্যের শ্লোগান শুরু করে দেয় এবং সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের উপর আস্থা স্থাপন করে আত্মসমর্পণে রাজী হয়। এরপর আবার আইনানুগ রক্ষাকবচের দাবি উত্থাপন করে। কিন্তু এই প্রশ্নে ক্রমশ তাদের মধ্যে মতবিরোধ শুরু হয়। একদলের অভিমত এই ছিল যে, প্রথমে সংখ্যাগুরুর সঙ্গে মিলিত হয়ে স্বাধীনতা অর্জন করা হোক। তারপর রক্ষাকবচের দাবি উত্থাপন করা হবে। দ্বিতীয় দল বলেন যে, প্রথমে সংখ্যালঘু হিসাবে তাদের রক্ষাকবচের ব্যবস্থা হোক। তারপর সম্মিলিত স্বাধীনতা আন্দোলন করা যাবে। কিন্তু উভয় দলের মধ্যে কেউ একথা বুঝল না যে, একজাতীয়তার মূলনীতিতে যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম হয়, তার মধ্যে কোন জাতীয় স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ন থাকতে পারে না এবং একটি ধর্মহীন রাষ্ট্রে কোন ধর্মীয় তাহযীব-তামাদ্দুনের বিকাশও সম্ভব হতে পারে না।

এই অবস্থার মধ্য দিয়ে ১৯৩৫ সালে ভারত শাসন আইন পাস হয় এবং ভারতের প্রদেশগুলিতে পূর্ণ স্বায়ত্ব শাসনের ভিত্তিতে নতুন সরকার কায়েম হয়। এতে করে পরীক্ষায় বুঝতে পারা গেল যে, একজাতীয়তায় গণতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতা তথা ধর্মহীনতার মূলনীতির উপর এ দেশের সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় শাসনকার্য চালাতে থাকবে।

দূরদর্শী মাওলানা মওদূদী চিন্তা করলেন যে, এরূপ ব্যবস্থার ফলে মুসলমানদেরকে ভবিষ্যতে যে ভয়াবহ পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে তা পরিষ্কার করে তাদের সামনে তুলে ধরা দরকার। কারণ তাঁর কাছে এ দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট ছিল যে, ঐরূপ ব্যবস্থার অধীনে কোন প্রকার আইনানুগ রক্ষাকবচ মুসলমান ও তাদের তামাদ্দুনকে সংখ্যাগুরুর তাহযীব-তামাদ্দুনে বিলীন হওয়া থেকে রক্ষা

করতে পারবে না। এই বিপদ লক্ষ্য করে মাওলানা মওদূদী ১৯৩৭ সাল থেকে আরম্ভ করে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত ক্রমাগত তিন বছর যাবত তর্জুমানুল কোরআনের মাধ্যমে "মুসলমান আওর মওজুদা সিয়াসী কাশ্‌মকাশ্" এবং "মাস্‌য়ালায়ে কওমিয়ত" শীর্ষক প্রবন্ধ লিখেন যা পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এ সকল প্রবন্ধের দ্বারা তিনি মুসলমানদেরকে একথা বুঝানোর চেষ্টা করেছেন যে, যদি তারা একজাতীয়তার মূলনীতিতে একটা গণতান্ত্রিক ধর্মহীন রাষ্ট্র গঠন মেনে নেয়, তাহলে এটা তাদের আত্মহত্যারই শামিল হবে।

এরপর মুসলমানদের মধ্যে কিছুটা শুভবুদ্ধির উদয় হয়। তারা এখন স্পষ্ট বুঝতে পারলো যে, একজাতীয়তার ভিত্তিতে যে গণতান্ত্রিক শাসন কায়েম হবে, তার অধীনে কোন আইনানুগ রক্ষাব্যবস্থা তাদের কোনই কাজে লাগবে না। কিন্তু এখন তাহলে উপায় কি হবে? এক দল বলল যে, ভারত বিভাগের দাবি করা হোক এবং মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলগুলি ভারত থেকে পৃথক করা হোক। অনেকেই এ প্রস্তাব মানতে প্রথমে রাজী হলো না। মিঃ মুহাম্মদ আলী জিন্নাহও প্রথমে এতে রাজী ছিলেন না। কারণ তাঁদের ধারণা ছিল, এর দ্বারা একটা জাতির এক অংশের সমস্যার সমাধান হয়। পক্ষান্তরে অপর বৃহত্তর অংশ যা ভারতের বিভিন্ন অংশে বিক্ষিপ্তভাবে দুর্বল সংখ্যালঘু হিসাবে ছড়িয়ে আছে, তাদেরকে হিন্দু ভারতের অনুগ্রহের উপরই ছেড়ে দেয়া হবে।

ঠিক এ সময়ে মাওলানা মওদূদী "সিয়াসী কাশ্‌মকাশ্" তৃতীয় খণ্ড প্রকাশ করেন। এ গ্রন্থে মাওলানা মওদূদী বলেন যে, ভারতীয় মুসলমান যে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে তার একমাত্র কারণ এই যে, নিজেদেরকে একটা জাতি হিসাবে তারা একথা চিন্তা করে যে, গণতন্ত্রে তাদের শক্তি নির্ভর করে সংখ্যার উপর। এইজন্যে তারা দ্বিগুণ সমস্যায় পড়েছে। যদি ভারত অখণ্ড থাকে, তাহলে তারা ধ্বংস হয়ে যাবে। আর যদি বিভক্ত হয় তাহলে জাতির অর্ধাংশকে ভারতীয় হিন্দুর কৃপার উপর ছেড়ে দিতে হবে। কিন্তু মাওলানা বলেন যে, ভারতীয় মুসলমান প্রকৃতপক্ষে শুধু একটি জাতি নয় বরং একটা আদর্শবাদী দল বা মিল্লাত। জার্মানী, ফরাসী, ইংরেজদের মতো তারা বংশানুক্রমিক কোন জাতি নয়। তাদের একটা স্বতন্ত্র জীবন দর্শন আছে, একটা আদর্শ আছে এবং জীবনের এক মহান লক্ষ্য আছে। এ আদর্শেরই বলে তারা অতীতে দেশের পর দেশ জয় করেছে। ভারতের বর্তমান কোটি কোটি মুসলমানও সে আদর্শের দ্বারাই বশ

হয়েছে। অতএব মুসলমান যদি জাতীয় অধিকার ও জাতীয় স্বার্থের পরিবর্তে নিজের আদর্শ ও জীবন দর্শনের জন্যে সংগ্রাম করে, তাহলে এই হবে যে, ভারতে তাদেরকে কেউ ধ্বংস তো করতে পারবেই না, উপরন্তু একদিন সারা ভারতের উপর ইসলামী পতাকা উড্ডীন হওয়ার আশাও করা যায়। কারণ ভারতের অন্য কোন জাতি বা দলের নিকট এমন কোন জীবন্ত আদর্শ নেই, যা ইসলাম মুসলমানদেরকে দিয়েছে।

মাওলানা তাঁর উপরিউক্ত মতবাদ ভারতীয় মুসলমানদের সামনে তুলে ধরেন। কিন্তু অধিকাংশ লোকই সেদিকে কোন ভ্রূক্ষেপ করলো না। ১৯৪০ সালে মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে পাকিস্তান প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং জাতীয় লক্ষ্য হিসাবে এর জন্যে জোরদার আন্দোলন চলতে থাকে।

এরপর স্বভাবতই দু'টি প্রশ্ন চিন্তাশীলদের উদ্বিগ্ন করে তুললো। প্রথমটি এই যে, পাকিস্তান আন্দোলনের পর যদি, খোদা না করুন, মুসলমানদেরকে নিরাশ হতে হয়, তাহলে এই জাতীয় পরাজয়ের পরিণাম ফল থেকে ইসলাম, ইসলামী তাহযীব ও মুসলমানদের স্বাতন্ত্র্য কিভাবে রক্ষা করা যাবে । দ্বিতীয়ত, পাকিস্তান হয়ে গেলে ভারতের কোটি কোটি মুসলমানদের মধ্যে ইসলামের আলো প্রজ্জ্বলিত রাখার উপায় কি হবে? এবং যে সকল লোকের নেতৃত্বে পাকিস্তান আন্দোলন চলছে তাতে পাকিস্তানকে দ্বিতীয় তুরস্ক হওয়া থেকে কিভাবে রক্ষা করা যেতে পারে?

এ দু'টি প্রশ্ন মাওলানাকে উদ্বিগ্ন করে তুলেছিল। তাই বহু চিন্তা-গবেষণার পর তিনি ১৯৪১ সালে 'জামায়াতে ইসলামী' নামে একটি দল গঠন করেন। তার উদ্দেশ্য ছিল এই যে, এ দলটির দ্বারা এই পাক-ভারত উপমহাদেশে এমন কিছু ইসলামের সাচ্চা সৈনিক তৈরি হবে, যারা এ দেশে ইসলামের বাণী সমুন্নত রাখার সংগ্রাম করে যাবে। পাকিস্তান আন্দোলন ব্যর্থ হলে জাতীয় পরাজয়ের ভয়াবহ পরিণাম থেকে মুসলমানদেরকে রক্ষা করবে– এবং পাকিস্তান হয়ে যাওয়ার পর তাকে সঠিক পথে চালাতে সাহায্য করবে।

জামায়াতে ইসলামীর সংগঠন

"এখন মানবতার ভবিষ্যত ইসলামের উপর নির্ভরশীল। মানুষের তৈরি সকল মতবাদ ব্যর্থ হয়েছে। তাদের কোন একটিরও সাফল্য লাভের আর কোনই সম্ভাবনা নেই। মানুষের মধ্যে আর তেমন সাহসও নেই যে, নতুন কোন মতবাদ তৈরি করে তা পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্যে জীবনের ঝুঁকি নেবে। এমতাবস্থায় ইসলামই একমাত্র মতবাদ ও পথ যার থেকে মানুষ মঙ্গল ও উন্নতির আশা করতে পারে, যেটা হবে মানব জাতির পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান এবং যার অনুসরণ করে মানুষ ধ্বংস থেকে মুক্তি লাভ করতে পারে।

বিগত একচল্লিশের এপ্রিল সংখ্যার তর্জুমানুল কোরআনে মাওলানা মওদূদী 'একটি সৎ জামায়াতের প্রয়োজনীয়তা'– শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লেখেন। এতে শিরক, বৈরাগ্যবাদ ও পাশ্চাত্যের আধুনিক জড়বাদী জীবন ব্যবস্থার ব্যর্থতার বিশদ বিবরণ দিয়ে উপরিউক্ত মন্তব্য করেন এবং বলেন যে, এখন মানব জাতির মুক্তি একমাত্র ইসলামের মধ্যেই নিহিত আছে। অবশ্য তার অর্থ এই নয় যে, ইসলামের প্রচারকার্য চালাতে থাকুন, এতেই সারা দুনিয়া জয় করে ফেলবেন। আসল কথা, প্রতিটি সভ্যতার মূলোৎপাটনের জন্যে প্রয়োজন হয় একটা শক্তির, একটা দলের। আবার নতুন সভ্যতার জন্যেও প্রয়োজন হয় নতুন চিন্তাধারার এবং নতুন দলের। অতএব দুনিয়াকে ভবিষ্যত অন্ধকার যুগের বিপদ থেকে মুক্ত করার জন্যে এবং ইসলামের অবদান থেকে উপকৃত হওয়ার জন্যে এতটুকুই যথেষ্ট নয় যে, তার একটা সঠিক মতবাদ তো বিদ্যমান আছেই। বরঞ্চ সঠিক মতবাদের সাথে একটা সৎ জামায়াত বা দলেরও প্রয়োজন আছে।

অতঃপর এ জামায়াত বা দলটির প্রতিটি সদস্যকে ঈমান এবং আমলের দিক দিয়ে অতি উচ্চ স্তরের হতে হবে– একথা বলার পর তিনি বলেন, বর্তমান তাহযীব-তামাদ্দুন ও তার অনুসারীদের থেকে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে। এ সভ্যতা ও সমাজ ব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা, সুখ-সম্ভোগ, ও উন্নতি-অগ্রগতির আশা-আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করতে হবে। অতঃপর একটা ভ্রান্ত সমাজ ব্যবস্থার মূলোৎপাটন করে তার জায়গায় একটি সঠিক ব্যবস্থা কায়েম করার জন্যে যে সকল বৈষয়িক ক্ষতি, দুঃখ-কষ্ট ও বিপদ মুসীবত অপরিহার্য, তা বরদাশত করে যেতে হবে। এ বিপ্লবের জন্যে প্রয়োজন সর্বাত্মক প্রচেষ্টার এবং উৎসর্গ করতে হবে জান-মাল ও মূল্যবান সময়। স্বীকার করতে হবে মানসিক ও

দৈহিক সকল প্রকার শ্রম। প্রস্তুত থাকতে হবে জেল, ফাঁসি, নির্যাতন, দণ্ড প্রভৃতির জন্যে। বিষয়-সম্পত্তি হতে পারে বাজেয়াপ্ত এবং স্ত্রী-পুত্র-পরিজন হতে পারে ধ্বংসের সম্মুখীন। এসব কিছুই বরণ করতে হবে হাসিমুখে। প্রয়োজন হলে নিজের জীবনও বিসর্জন দিতে হবে এই পথে। এমন দুর্গম পথ অতিক্রম করা ব্যতীত দুনিয়ায় না অতীতে কোন বিপ্লব এসেছে,আর না এখন আসতে পারে।

অগ্নিপরীক্ষার মন্ত্রে দীক্ষিত উন্নতমানের চরিত্রবান লোকদের প্রসঙ্গে মাওলানা বলেন ঃ

আমাদেরকে বলা হয় যে, এ ধরনের লোক এ যুগে আর কোথায় পাওয়া যাবে। একটি পবিত্র ও মহান যুগে তো এমন লোকের সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু স্রষ্টা তো তেমন ধরনের লোক তৈরি চিরদিনের জন্যে বন্ধ করে দিয়েছেন।

আসলে এ একটা ভ্রান্ত ধারণা, একটা কুসংস্কার। স্বয়ং যারা নৈরাশ্যের স্বীকার হয়েছে, এ কুসংস্কার তাদেরই মনে পয়দা হয়েছে। দুনিয়ায় সকল প্রকার যোগ্যতার লোক সব যুগেই পাওয়া যায়। হিটলার, মার্কস এবং গান্ধীর প্রতি ঈমান এনে লোকে যদি এত কিছূ করতে পারে, তাহলে খোদার উপর ঈমান এনে কি কিছুই করা যায় না? জন্মভূমির জন্যে যদি এতটা আকর্ষণ থাকে যে, মানুষ তার জন্যে জান-মাল উৎসর্গ করতে পারে, তাহলে খোদার সন্তুষ্টি এবং নৈকট্যের জন্যে কি এতটুকুও আকর্ষণ নেই?

'জামায়াতে ইসলামীর সংগঠন'– শীর্ষক প্রবন্ধে তর্জুমানুল কোরআনে মাওলানা জামায়াত গঠনের কারণ বর্ণনা করে বলেন ঃ

"আমি এবং আমার সঙ্গে একমত এমন অনেকে গত তিন বছর ধরে এ চেষ্টা করে আসছিলাম যে, বর্তমানে মুসলমানদের যে বড় বড় দল আছে, তাদের সকলে অথবা তাদের যে কোন একটি তাদের গঠন পদ্ধতি ও কর্মসূচীতে এমন কিছু পরিবর্তন নিয়ে আসুক যাতে করে ইসলামের এই প্রয়োজন পূরণ হয় এবং একটি নতুন দল গঠনের প্রয়োজন না থাকে । কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, আমাদের সে চেষ্টা সফল হয়নি। এরপর যারা বর্তমান দলগুলির কার্যকলাপে সন্তুষ্ট নয় এবং সত্যিকার ইসলামী মূলনীতির ভিত্তিতে কাজ করতে আগ্রহী, তাদেরকে একত্র করা ব্যতীত আমাদের গত্যন্তর রইল না। অতএব একচল্লিশের আগস্টে তাদেরকে দিয়ে একটি সম্মেলন আহ্বান করা হয় এবং পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে জামায়াতে ইসলামী কায়েম হয়।"

জামায়াতে ইসলামী

জামায়াতে ইসলামী কিভাবে এবং কোন পরিবেশের মধ্য দিয়ে গঠিত হলো তার বিবরণ পাঠকদের সামনে পেশ করতে চাই।

মাওলানা মওদূদী তাঁর "মুসলমান আওর মওজুদা সিয়াসী কাশ্‌মকাশ্‌, গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে ইসলামী আন্দোলনের ব্যাখ্যা করে তার জন্যে একটি দল গঠনের আবশ্যকতা বর্ণনা করেন এবং সে দলের গঠন পদ্ধতির একটা খসড়াও পেশ করেন। অতঃপর হিজরী ১৩৬০ সালের সফর মাসের তর্জুমানুল কোরআনে মাওলানা মওদূদী মুসলমান জনসাধারণের নিকট এক আবেদন জানান যে, যারা উক্ত মতবাদ ও দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে তদনুযায়ী কাজ করতে চান, তাঁরা যেন তর্জুমান অফিসের সাথে যোগাযোগ করেন। অল্প দিনের মধ্যেই সংবাদ আসতে লাগল যে, বেশ কিছু সংখ্যক লোক একটা ইসলামী দল গঠন করে কাজ করতে আগ্রহী। অতএব হিজরী ১৩৬০ সালের ১লা শাবান, ইং ১৯৪১ সালের ২৫শে আগস্ট লাহোরে সমবেত হওয়ার জন্যে সংশ্লিষ্ট সকলকে আহ্বান জানানো হলো।

দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে মোট ৭৫ জন অধিবেশনে যোগদান করেন। প্রথম দিনে বিভিন্ন লোক মাওলানাকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করেন। মাওলানা সে সবের সন্তোষজনক জবাব দেন।

দ্বিতীয় দিন সকাল আটটায় অধিবেশন শুরু হয়। সর্বপ্রথম মাওলানা তাঁর বক্তৃতায় তৎকালীন ইসলামী আন্দোলনের ইতিহাসের উপর বিস্তারিত আলোকপাত করেন। তিনি 'দ্বীন'কে একটা আন্দোলন হিসাবে পেশ করে বলেন, "আমাদের জীবনে যেন দ্বীনদারী নিছক একটা ব্যক্তিগত ব্যাপার হিসাবে নিষ্ক্রিয় ও স্থবির হয়ে না থাকে। বরঞ্চ আমরা যেন আমাদের সামগ্রিক জীবনে দ্বীনকে কায়েম করতে এবং প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলোর মূলোৎপাটন করার জন্য সংগ্রাম করতে পারি। ১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দে 'দারুল ইসলামের' প্রতিষ্ঠাই ছিল এর প্রথম পদক্ষেপ। সে সময়ে মাত্র চরজন ছিল আমার সহকর্মী। এ ক্ষুদ্র সূচনা ছিল অত্যন্ত নগণ্য। কিন্তু এতেও আমরা নিরাশ হইনি। বরঞ্চ ইসলামী আন্দোলনের দাওয়াত এবং এই আন্দোলনের জন্যে দৃষ্টিভঙ্গি ও মন মস্তিষ্ক তৈরি করার কাজ খোদার ফজলে অব্যাহত রইলো। আল্লাহর অনুগ্রহে দু'একজন করে সহকর্মী

বাড়তে লাগলো। দেশের বিভিন্ন স্থানে এই ধরনের লোকের ছোট ছোট শাখা প্রতিষ্ঠান কায়েম হতে লাগলো। তার সাথে সাথে ইসলামী সাহিত্য প্রকাশ ও মৌলিক দাওয়াত-তাবলীগের কাজও চলতে থাকলো। অবশেষে আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া যাচাই-পর্যালোচনা করার পর বুঝতে পারা গেল যে, এখন জামায়াতে ইসলামী গঠন করে সংগঠিতভাবে ইসলামী আন্দোলন চালানোর উপযোগী ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে। তার ফলেই এই অধিবেশন আহ্বান করা হয়েছে।"

এ পটভূমিকা বিশ্লেষণের পর মাওলানা বলেন, "মুসলমানদের মধ্যে সাধারণত যে সকল আন্দোলন অতীতে চলেছে এবং বর্তমানে চলছে, সে সব থেকে ইসলামী আন্দোলনের মৌলিক পার্থক্য কি, তা-ই সর্বপ্রথম আমাদের ভাল করে জেনে রাখা দরকার।"

"প্রথমত, হয়তো ইসলামের কোন অংশ বিশেষকে অথবা পার্থিব কোন উদ্দেশ্যকে ভিত্তি করে এ সব আন্দোলন পরিচালিত হয়। কিন্তু আমাদের এ আন্দোলন চলবে পরিপূর্ণ ইসলামকে নিয়ে।"

"দ্বিতীয়ত, এদের দলীয় সংগঠন দুনিয়ার অন্যান্য দলগুলোর পদ্ধতিতে করা হয়েছে। কিন্তু আমরা ঠিক সেই দলীয় সংগঠন ব্যবস্থা অবলম্বন করছি, যা প্রথমে রাসূলুল্লাহর (সাঃ) প্রতিষ্ঠিত দলের মধ্যে ছিল।"

"তৃতীয়ত, এসব দলে যখন কোন লোক ভর্তি করা হয়, তখন এ ধারণার বশবর্তী হয়ে করা হয় যে, যেহেতু সে মুসলমান জাতির মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছে, অতএব সে নিশ্চয়ই প্রকৃত মুসলমানই হবে। এর ফল এই হয়েছে যে, দলের সভ্য ও কর্মী থেকে আরম্ভ করে নেতা পর্যন্ত এমন অনেক লোক এ দলে অনুপ্রবেশ করেছে যে, চরিত্রের দিক দিয়ে তারা মোটেই নির্ভরযোগ্য নয় এবং কোন মহান দায়িত্ব পালনের যোগ্যও নয়। কিন্তু আমরা আমাদের দলে কাউকে এ ধারণায় গ্রহণ করি না যে, 'সে মুসলমানই হবে'। বরঞ্চ যখন সে কালেমায়ে তাইয়েবার অর্থ, মর্ম ও তার দাবি জেনে বুঝে তার উপর ঈমান আনার অঙ্গীকার করে, তখনই তাকে দলে গ্রহণ করি। যোগদান করার পর দলের সদস্য হয়ে থাকবার জন্যে অবশ্য পালনীয় শর্ত হচ্ছে এই যে, ঈমান যে সব বিষয়ে সর্বনিম্ন দাবি করে তা তাকে পূরণ করতে হবে। এভাবে ইনশাআল্লাহ মুসলমান জাতির মধ্য থেকে শুধুমাত্র সৎ ব্যক্তিই বাছাই হয়ে এ দলে যোগদান করবে।"

এমনি করে একটা ইসলামী দল গঠনের কারণ, তার সংগঠন পদ্ধতি এবং অন্যান্য দলগুলোর সঙ্গে তার তুলনামূলক পার্থক্য বিশ্লেষণ করার পর মাওলানা মওদূদী জামায়াতে ইসলামীর গঠনতন্ত্রের খসড়া পাঠ করেন। অবশ্য এর ছাপানো কপি একদিন পূর্বে সকলকে বিতরণ করা হয়েছিল। পূর্ণ আলোচনার পর যৎসামান্য সংশোধনীসহ গঠনতন্ত্র সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

অতঃপর মাওলানা মওদূদী দাঁড়িয়ে কালেমায়ে শাহাদত পাঠ করেন এবং সমবেত সকলকে সম্বোধন করে ঘোষণা করেন, "আপনারা সকলে সাক্ষী থাকুন যে, আমি নতুন করে ঈমান আনছি এবং জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করছি।"

এরপর একে একে সকলেই কালেমায়ে শাহাদাত পাঠ করে জামায়াতে শরীক হওয়ার ঘোষণা করেন। কালেমা পাঠকালে প্রত্যেকেই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিলেন। একদিকে আল্লাহর ভয় এবং অপরদিকে একটি বিরাট দায়িত্ব পালনের আবেগ-অনুভূতি তাঁদের অন্তরাত্মা কাঁপিয়ে তুলছিল।

সর্বপ্রথম পঁচাত্তর জন লোক জামায়াতে ইসলামীতে শামিল হন এবং এদেরকে নিয়েই জামায়াতে ইসলামীর পত্তন হয়। মাওলানা মওদূদী সর্বসম্মতিক্রমে জামায়াতের আমীর নির্বাচিত হন।

(ক) আমীর নির্বাচনের পর মাওলানা মনযুর নো'মানী সাহেব দোয়ার জন্যে হাত উঠান। নো'মানী সাহেব দোয়া করেন ঃ হে খোদা! তোমার কিছু নগণ্য বান্দাহ তোমার পয়গাম সারা দুনিয়ায় পৌছিয়ে দেয়ার সংকল্প করেছে। সমাজকে পরিবর্তন ও ইসলামকে বাতিলের সংস্পর্শ থেকে পবিত্র করার ইচ্ছা পোষণ করেছে। আমরা তোমার নগণ্য, অপদার্থ ও দুর্বল বান্দাহ। আমরা তোমারই সন্তুষ্টি লাভের আশায় এতোবড়ো মহান উদ্দেশ্য নিয়ে দাঁড়িয়েছি। তুমি আমাদেরকে তৌফিক দাও যেন আমরা আমাদের সমগ্র জীবনে এ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ করে নিতে পারি। যেন ইসলামকে তার প্রকৃতরূপে পুনরায় রূপান্তরিত করতে পারি।

মাওলানা নো'মানীর অশ্রু গদগদ কণ্ঠের দোয়া সকলের চোখে অশ্রু-জোয়ার এনে দিল। হৃদয়ে সঞ্চার করলো নব উদ্যম-উৎসাহ ও খোদার পথে চলার দুর্বার সংকল্প।

অংশগ্রহণকারী হাকীম মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ বলেন ঃ 'এ দোয়া এবং দোয়ায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সৃষ্ট অভূতপূর্ব ভাবাবেগ আমাকে এতই মুগ্ধ করলো যে, তা জীবনে কখনো ভুলে যাবার জিনিস নয়। এর চেয়েও মুগ্ধকর ঘটনা, যা আমার হৃদয়ে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে, তাহলো এই যে, মেহমানদের খানাপিনার শেষে মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী দস্তরখানে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হাড়-হাড্ডি প্রভৃতি উচ্ছিষ্ট বস্তুসমূহ নিজ হাতে সরিয়ে খানার জায়গা পরিষ্কার করে দেন।'

আমীর নির্বাচিত হওয়ার পর মাওলানা মওদূদী যে ভাষণ দান করেন তা এই ঃ

"আমি আপনাদের মধ্যে না সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী, আর না সর্বাপেক্ষা মুত্তাকী। অন্য কোন দিক দিয়েও আপনাদের উপর আমার কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। কিন্তু যখন আমার উপর আস্থা স্থাপন করে আপনারা এ বিরাট কাজের দায়িত্ব আমার উপরে ন্যস্ত করেছেন, তখন আমি আল্লাহর কাছে এ দোয়াই করি এবং আপনারাও করুন, যেন এ দায়িত্ব পালনের শক্তি তিনি আমাকে দান করেন এবং আমার প্রতি আপনাদের আস্থাও অক্ষুণ্ন রাখেন। আমি আমার সাধ্যমতো পরিপূর্ণ খোদাভীতি ও দায়িত্বানুভূতি সহকারে এ কাজ করার আপ্রাণ চেষ্টা করবো। আমি স্বেচ্ছায় আমার দায়িত্ব পালনে কোন প্রকার অবহেলা করব না। আমি ইলম ও জ্ঞান অনুযায়ী আল্লাহর কিতাব, রাসূলের সুন্নাহ এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের পদাংক অনুসরণ করে চলতে কোন ত্রুটি করব না। তথাপি আমার কোন ত্রুটি বিচ্যুতি হলে এবং যদি আপনারা কেউ অনুভব করেন যে, আমি সঠিক পথ থেকে সরে পড়েছি, তাহলে এমন ধারণা যেন পোষণ না করেন যে, এসব আমার স্বেচ্ছাকৃত। বরঞ্চ আমার প্রতি ভাল ধারণা পোষণ করে আমাকে সংশোধন করার চেষ্টা করবেন। যতক্ষণ আমি সঠিক পথে থাকবো আপনারা আমার সহযোগিতা করবেন, আমার কথা মেনে চলবেন, সৎ পরামর্শ দেবেন, সম্ভাব্য সকল প্রকার সাহায্য সহযোগিতা করবেন এবং জামায়াতের শৃঙ্খলা ভঙ্গকারী কর্মপদ্ধতি থেকে দূরে থাকবেন। এ আন্দোলনের মহত্ত্ব এবং আমার ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে আমার পূর্ণ অনুভূতি আছে। আমি জানি যে, এ এমন এক আন্দোলন যার নেতৃত্ব দিয়ে এসেছেন আল্লাহর মহান নবী-রাসূলগণ এবং নবুয়তের যুগ শেষ হওয়ার পর এমন সব অসাধারণ মানুষ এ আন্দোলন পরিচালনা করেছেন যারা ছিলেন মানব

সমাজের সবচেয়ে উৎকৃষ্ট ব্যক্তি। আমার নিজের সম্পর্কে এক মুহূর্তের জন্যেও আমার এ ভুল ধারণা নেই যে, এ মহান আন্দোলনের নেতৃত্বের যোগ্য আমি। বরং এটাকে আমি দুর্ভাগ্যজনক মনে করি যে, এ বিরাট কাজের জন্যে আমার চেয়ে যোগ্যতর ব্যক্তি আপনাদের চোখে পড়লো না। ...... আমি কখনও আমার নিজেকে খোদার পথের প্রতিবন্ধক হতে দেব না। কাউকে একথা বলারও অবকাশ দেব না যে, একজন অনুপযুক্ত ব্যক্তি জামায়াতের নেতৃত্ব দিচ্ছে সেজন্যে এতে শরীক হতে পারি না। আমি বলছি যে, উপযুক্ত লোক আনুন। তারপর যে পদ আপনারা আমাকে দিয়েছেন তা সর্বদা তার জন্যে শূন্য থাকবে। অবশ্য আমি এজন্যে প্রস্তুত নই যে, যদি অন্য কেউ এ কাজ চালানোর জন্যে অগ্রসর না হয়, তাহলে আমিও অগ্রসর হবো না।

এ আন্দোলন আমার জীবনের লক্ষ্য। আমার জীবন-মরণ এরই জন্যে। আর কেউ এ পথে চলুক বা না চলুক, আমাকে চলতেই হবে। এ পথে আমার সঙ্গে কেউ না চললে, একাকীই চলব। সারা দুনিয়া ঐক্যবদ্ধ হয়ে বিরোধিতা করলে আমাকে তার বিরুদ্ধে লড়তে হবে এবং তার থেকে পশ্চাৎপদ হবো না।"

মজলিসে শূরা

জামায়াতে ইসলামীর ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার পর জামায়াতের আমীর তাঁর মজলিসে শূরার সদস্যদের নাম ঘোষণা করেন।

পরদিন শূরার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এবং নিম্নোক্ত কর্মসূচী ঘোষণা করেন আমীরে জামায়াত মাওলানা মওদূদী ঃ

যারা এ জামায়াতে শামিল হয়েছেন, তাঁরা তাঁদের নিজেদের আত্মশুদ্ধি করবেন এবং জীবন যাপন প্রণালী ইসলাম অনুযায়ী পরিশুদ্ধ করে নেবেন। অপরদিকে এ জামায়াতের বাইরে যারা আছেন, তাঁরা অমুসলিম হোন অথবা এমন মুসলমান যাঁরা দ্বীনী দায়িত্ব এবং দ্বীনী লক্ষ্য থেকে দূরে সরে আছেন, তাঁদের উভয়ের কাছেই সাধারণত আল্লাহ ব্যতীত অপরের সার্বভৌমত্ব অস্বীকার করার এবং রাব্বুল আলামীনের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে নেয়ার দাওয়াত পেশ করতে হবে। অতঃপর পরিস্থিতি অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। অবশ্য একথা মনে রাখতে হবে যে, খোদা ব্যতীত অন্যের আনুগত্যের ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত একটি সমাজ ব্যবস্থার মূলোৎপাটন করে খোদার আনুগত্যের ভিত্তিতে একটি জীবন ব্যবস্থা কায়েম করা কোনক্রমেই সহজ কাজ নয়। এতে জান-মাল এবং প্রতিটি বস্তুর ক্ষতি অনিবার্য। এজন্যে একাজে শুধুমাত্র তারাই সামনে অগ্রসর হবেন যাঁরা সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা, সম্ভোগ ও ভোগ-বিলাসের কুরবানী ও সকল প্রকার ক্ষতি হাসিমুখে মেনে নিতে প্রস্তুত।

জামায়াতে ইসলামীর ঘোষণাপত্রে নিম্নরূপ ঘোষণা করা হয় ঃ

“সাধারণত যে দলগুলোকে সংকীর্ণ অর্থে রাজনৈতিক, ধর্মীয় বা সংস্কারমূলক দল বলা হয়, জামায়াতে ইসলামী এমন কোন দল নয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ একটা আদর্শভিত্তিক দল। মানব জীবনের জন্যে একটা ব্যাপক ও বিশ্বজনীন জীবনদর্শনে এ দল বিশ্বাসী। মানবীয় চিন্তাধারা ও বিশ্বাসে, চরিত্র ও আচরণে, শিক্ষা-দীক্ষায়, সাহিত্য ও শিল্পকলায়, তাহযীব ও তামাদ্দুনে, ধর্ম ও সামাজিকতায়, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এবং রাষ্ট্র পরিচালনায় এ জীবন দর্শনকে সে কার্যকরীরূপে বাস্তবায়িত করতে চায়। এ জামায়াতের মতে মানুষ যখন খোদার আনুগত্য পরিত্যাগ করে পরকালে আল্লাহর নিকট জবাবদিহিতার

কথা বিস্মৃত হয় এবং আম্বিয়ায়ে কেরামের (আঃ) নির্দেশিত পথে চলতে অস্বীকার করে, তখনই তা পৃথিবীর যাবতীয় অশান্তি-অনাচারের একমাত্র কারণ হয়ে পড়ে।"

সংক্ষেপে তিনটি বিষয়েই মূলত জামায়াতে ইসলামী সমগ্র মানব জাতিকে আহ্বান জানায়। আর তা হচ্ছে ঃ

জামায়াতে ইসলামী'র দাওয়াত

মানব সমাজের নিকট সাধারণভাবে এবং মুসলমানদের নিকট বিশেষভাবে-

● জীবনের সকল ক্ষেত্রে খোদার দাসত্ব ও নবীদের আনুগত্য স্বীকার কর।

● বর্ণচোরা মনোভাব ও মুনাফেকী ত্যাগ কর এবং খোদার সাথে কাউকেও শরীক করো না।

● খোদাবিমুখ লোকগুলোকে নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব থেকে সরিয়ে দাও এবং প্রকৃত ঈমানদার ও সৎকর্মশীলদের হাতে সকল ক্ষমতা ন্যস্ত কর, যেন জীবন ঠিক খোদার পথেই চালিত হয়।

এ আহ্বানকে সত্য বলে বিশ্বাস করলে আমাদের সাথে শামিল হোন। খোদার নিকট এর পুরস্কার নিজেই পাবেন। যে ব্যক্তি এ কাজে বাধা দেবে, সে যেন খোদার নিকট জবাবদিহীর জন্যে প্রস্তুত হয়।

মোটকথা, আল্লাহর নবীগণ যে মিশন নিয়ে দুনিয়ায় এসেছিলেন এবং যার পূর্ণাঙ্গ বিকাশ হয়েছিল শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফার (সঃ) দ্বারা, জামায়াতে ইসলামীও সে মিশন নিয়ে দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ মানব জীবনের প্রতিটি বিভাগে, শিক্ষা-দীক্ষায়, শিল্প-বিজ্ঞানে, সভ্যতা-সংস্কৃতিতে, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনে, রাষ্ট্র পরিচালনায় ও যুদ্ধক্ষেত্রে, ব্যবসা-বাণিজ্য ও অফিস-আদালতে, আন্তর্জাতিক সন্ধিসূত্র ও সম্পর্ক স্থাপনে একমাত্র খোদারই আনুগত্য করতে হবে- এই হচ্ছে জামায়াতে ইসলামীর লক্ষ্য। একেই বলা হয়েছে "ইকামাতে দ্বীন" বা আল্লাহর দ্বীন ইসলামের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা।

উনিশ শ' তেতাল্লিশ খ্রিষ্টাব্দে লাহোর থেকে জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় দফতর পূর্ব পাঞ্জাবের পাঠানকোটের 'দারুল ইসলামে' স্থানান্তরিত হয়। ১৯৪৫ সালে নিখিল ভারত জামায়াতে ইসলামীর প্রথম সম্মেলন এখানেই অনুষ্ঠিত হয়।

নিখিল ভারত জামায়াতে ইসলামী সম্মেলন

উনিশ শ' বিয়াল্লিশের অক্টোবরে লাহোর থেকে জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় দফতর পূর্ব পাঞ্জাবের পাঠানকোটের 'দারুল ইসলামে' স্থানান্তরিত হয়। ১৯৪৫ সালে নিখিল ভারত জামায়াতে ইসলামীর প্রথম সম্মেলন এখানেই অনুষ্ঠিত হয়।

এ সম্মেলনে মাওলানা মওদূদী কর্মীদের সামনে যে ভাষণ দেন, তার কিঞ্চিত এখানে উদ্ধৃত করা হচ্ছে।

প্রকাশ থাকে যে, জামায়াত গঠন হওয়ার পর থেকে কায়েমী স্বার্থবাদী (Vested interests) কিছু ধর্ম ব্যবসায়ী জামায়াত ও মাওলানার বিরুদ্ধে সমালোচনামুখর হয়ে ওঠে। এর কারণ আছে এবং তা অতি স্বাভাবিকও।

জামায়াতে ইসলামী একটি আদর্শবাদী আন্দোলন, নিছক ইসলামী তাবলীগের কোন সংস্থা নয়। প্রকৃতপক্ষে আন্দোলন (তাহরীক) ও তাবলীগের মধ্যে বিরাট পার্থক্য বিরাজমান।

তাবলীগ অর্থ কিছু ভাল কথা ও কাজ মানুষকে শুনিয়ে দেয়া, ভালো কাজের উপদেশ দেয়া এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকার জন্যে সাধারণভাবে আবেদন জানানো। কোন ব্যক্তিকে ভাল কাজের উপদেশ দিলে এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকার নসিহত করলে তার রাগান্বিত অথবা অসন্তুষ্ট হওয়ার কথা নয়। বরঞ্চ এ ধরণের হিতোপদেশ যারা দান করেন, তাদের উপদেশ অমান্য করা হলেও তাদেরকে সাধারণত সম্মান দেখানো হয়। কিন্তু আন্দোলনের অর্থ হচ্ছে সমাজের বুক থেকে মন্দ কাজ, অনাচার , অশ্লীলতা প্রভৃতির মূলোৎপাটন করে সৎ কাজের প্রতিষ্ঠা করা। যদি দশ বিশ হাজার লোকের সমাবেশে উদাত্ত কণ্ঠে বলা হয়, আপনারা সৎ কাজ করুন এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকুন,তাহলে হয়তো এর কিছুটা সুফল হতেও পারে। কিন্তু কোন প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে না। তবে যদি বলা হয়, "আসুন আমরা একতাবদ্ধ হই এবং সমাজে যা কিছু ভাল তার প্রতিষ্ঠা করি এবং যা কিছু মন্দ তার মূলোৎপাটন করি-" তাহলে একেই বলা হবে আন্দোলন এবং তখন অবশ্যই দেখা যাবে যে, একটি প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি আপনার এ আন্দোলনকে রুখে দাঁড়ানোর জন্যে

বদ্ধপরিকর হয়েছে। এ আন্দোলনই ছিল নবীদের কাজ এবং কোরআন পাকে 'আমর বিল-মারূফ ও নিহী আনিল মুনকার' এর যে আদেশ আল্লাহ তায়ালা করেছেন, একটি আন্দোলনের মাধ্যমেই হতে পারে তার সার্থক রূপায়ণ।

যেহেতু জামায়াতে ইসলামী ছিল একটি আন্দোলন, সেজন্যে শুরু থেকেই প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি তার প্রতি বিরূপ হয়ে পড়ে। মাওলানা প্রথম নিখিল ভারত জামায়াতে ইসলামীর সম্মেলনে প্রতিক্রিয়াশীলদের সমালোচনা ও বিরোধিতার আলোকে কর্মীদের সামনে যে ভাষণ দেন, তা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর ভাষণ একদিকে জামায়াতের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে সুস্পষ্ট করে তুলে ধরে এবং অপরদিকে আন্দোলনের পথে স্বাভাবিকভাবেই যেসব বাধাবিঘ্ন, বিপদ-মুসীবত, দুঃখ-কষ্ট ও নির্যাতন-নিষ্পেষণ আসবে তার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে কর্মীদের সজাগ ও সাবধান করে দেয়। তিনি একদিকে এ মহান আন্দোলনের জন্যে কর্মীদের মধ্যে অদম্য প্রেরণা সৃষ্টি করেন এবং অপরদিকে বিরোধী প্রতিক্রিয়াশীলদের প্রতি সহনশীলতারও নির্দেশ দেন।

জামায়াতের লক্ষ্য হুকুমতে ইলাহিয়ার প্রতিষ্ঠা ও আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ

মাওলানা তাঁর ভাষণে বলেন ঃ "দ্বীন প্রতিষ্ঠার এ আন্দোলনের পরিণাম সম্পর্কে আমরা কিছুই বলতে পারি না। পরিণাম তো আল্লাহর হাতে। আমাদের এ প্রচেষ্টার ফল যদি এ হয় যে, আমরা একটি সৎ সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করতে পেরেছি, তাহলে সেটা হবে আল্লাহর একটা বড় দান। অনেকে বিদ্রূপ করে বলেন যে, আমাদের সকল প্রচেষ্টা নাকি ক্ষমতা লাভ করা, আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি লাভ আমাদের লক্ষ্য নয়। তাদের এ ধারণা একেবারে ভ্রান্ত। আমাদের সকল প্রচেষ্টা আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্যে একটি সৎ এবং খোদা প্রদত্ত জীবন বিধান প্রতিষ্ঠার জন্যে। এ প্রচেষ্টায় কোন দোষ নেই। আর এতে লজ্জারও কিছু নেই। আমরা যখন হুকুমতে ইলাহিয়ার কথা বলি, তখন তার দ্বারা আমরা এ ধরনের একটি ব্যবস্থাকেই বুঝাই। আমি বুঝতে পারি না যে, এ ধরনের একটা ব্যবস্থা আমাদের আকাঙ্ক্ষিত ঈপ্সিত বস্তু হলে এতে বিতর্কের কি আছে। এটা কি তবে খোদার সন্তুষ্টি কামনা থেকে ভিন্ন কিছু? আল্লাহর যমীনের উপর আল্লাহরই রাজত্ব চলুক-এর থেকে অধিক খোদার সন্তুষ্টি আর কিসে হতে পারে? ঐসব লোক থেকে অধিকতর খোদার সন্তোষ প্রয়াসী আর কে হতে পারে, যারা কোন কিছুর পরোয়া না করে জীবনকে এজন্যে উৎসর্গীকৃত করে যে, খোদার যমীনের উপর আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারও কর্তৃত্ব যেন চলতে না পারে। এ ধরনের প্রচেষ্টা যদি দুনিয়াদারী হয়, তাহলে দ্বীনদারী কি এই যে, সারারাত জেগে 'আল্লাহু আল্লাহু' যিকির করা হবে এবং দিনের বেলায় খোদার যমীনের উপরে শয়তানের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হবে? যারা এ ধরনের কথা বলে, তাদের মন মস্তিষ্কে দ্বীন সম্পর্কে অতি নিকৃষ্ট ধারণা রয়েছে।

ভাষণের এক পর্যায়ে মাওলানা বলেন ঃ

"আপনারা জানেন যে, আল্লাহ্ তায়ালা আমাদের কাছে এ দাবি করবেন না যে, আমাদেরকে হযরত আবু বকর (রাঃ) এবং হযরত উমরের (রাঃ) রাষ্ট্রের মতো একটি রাষ্ট্র কায়েম করতে হবে। এমনটি করার সাধ্যও কারও নেই এবং এর আদেশও আল্লাহ্ করেননি। অবশ্য আমাদের কাছে এ দাবি করা হয়েছে যাতে আমরা দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্যে সকল প্রকার চেষ্টা-চরিত্র করি এবং এ চেষ্টায় জীবনের সমস্ত সম্পদ নিয়োগ করতে পারি অর্থাৎ নিজের জীবনও এবং ধনসম্পদও। তার সাথে সকল প্রিয় বস্তুও। দ্বীন বলতে আমরা তার কোন বিশেষ

অংশকে বুঝাই নাতা সে যতই গুরুত্বপূর্ণ হোক না কেন। দ্বীন বলতে আমরা সামগ্রিকভাবে পরিপূর্ণ দ্বীনকেই বুঝাই। তার মৌল ও খুঁটিনাটি বিষয়গুলো, তার আকীদাহ বিশ্বাস ও আমল– দ্বীন বলতে এসব কিছুকেই আমরা বুঝাই। দ্বীনের জন্যে আমাদের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাব ঐকান্তিকতা ও উৎসাহ উদ্যমের সাথে। খোদার কাছে এটাই হচ্ছে আমাদের ঈমান ও নিফাকের (মুনাফেকী) কষ্টিপাথর। যে হৃদয়ে দ্বীন প্রতিষ্ঠার প্রেরণা নেই, সেখানে ঈমানের কোন স্থান নেই। দ্বীনের দরদ যে অন্তরে নেই, সে অন্তর কখনও খোদার ঘর হতে পারে না। যতই তসবীহ জপ করা হোক না কেন, যতই ওজীফা ও যিকির আযকার করা হোক না কেন, দ্বীন প্রতিষ্ঠার যে প্রেম, তার সমতুল্য এসব হতে পারে না। সমস্ত দ্বীনদারীর প্রাণই হচ্ছে এটা এবং খোদা আমাদের অন্তরে এটাই প্রথম তালাশ করবেন। তারপর এই যে দ্বীন প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা, তা অবশ্যই হতে হবে সংঘবদ্ধভাবে, ব্যক্তিগতভাবে নয়। দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্যে যে প্রেম ও ভালবাসা, অন্তরে তার অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করার চেষ্টা করতে হবে। এ প্রশ্ন অবান্তর যে, পরিণাম কি হবে। এমনও হতে পারে যে, আমাদেরকে করাত দিয়ে দ্বিখণ্ডিত করা হবে।"

আন্দোলনের বিরোধিতা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে মাওলানা বলেন ঃ

"এ পথের দাবি এই যে, আমাদের মধ্যে যেন বিরোধিতাকে স্বাগত জানাবার প্রবণতা সৃষ্টি হয়। সত্য পথ হোক অথবা বাতিল পথ হোক, এ ব্যাপারে আল্লাহর নীতি এই যে, যে ব্যক্তি যে পথই অবলম্বন করুক, তাকে সে পথে অগ্নি পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে। আর সত্য পথের বৈশিষ্টই তো এই যে, শুরু থেকে আখের তক সে পথ অগ্নিপরীক্ষায় পরিপূর্ণ। অংকের একটি মেধাবী ছাত্র একটি কঠিন অংক পেলে যেমন খুশী হয় যে, এতে করে তার প্রতিভার যাচাই হবে, তেমনি এক দৃঢ়সংকল্প মুমেন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে আনন্দ পায়। কারণ এর দ্বারা সে তার আনুগত্য প্রমাণ করার সুযোগ পায়। মিটমিটে প্রদীপ সামান্য বাতাসের আঘাতেই নিভে যায়। কিন্তু একটি প্রজ্জ্বলিত চুলা বাতাসে অধিকতর প্রজ্জ্বলিত হয়। আপনারা নিজেদের মধ্যে এ যোগ্যতা সৃষ্টি করুন যে, একটি প্রজ্জ্বলিত চুলা সিক্ত জ্বালানী দ্বারা নির্বাপিত না হয়ে যেন তাকে তার ইন্ধন বানিয়ে নেয়, তেমনি আপনারাও যেন বিরোধিতার দ্বারা দমিত না হয়ে আহার ও শক্তি সঞ্চয় করতে পারেন। যতোক্ষণ পর্যন্ত আমাদের মধ্যে এ যোগ্যতার সৃষ্টি না হয়েছে,ততোক্ষণ পর্যন্ত আশা করা যায় না যে, আমরা খোদার দ্বীনের কোন ভালো খেদমত করতে পারবো।"

অতঃপর ভাষণের এক পর্যায়ে মাওলানা কর্মীগণকে জামায়াতের সাহিত্য, কোরআন পাক ও সীরাতুন্নবী গভীরভাবে অধ্যয়ন করার তাগিদ করেন, আত্মশুদ্ধি ও চরিত্র গঠনের উপদেশ দেন। অনর্থক ও বেহুদা কাজকর্ম, বাহাস-

মুনাযিরা (বিতর্কসভা) প্রভৃতি থেকে দূরে থাকার পরামর্শ দেন।

অতঃপর তিনি বলেন ঃ "আমার ব্যক্তিগত চরিত্র ও আচার-আচরণের কেউ তীব্র সমালোচনা করলে আপনারা তার প্রতিরোধ করতে যাবেন না। কারণ আমি নিজেও তা করব না। এসব করতে গিয়ে আপনারা সময় ও শক্তির অপচয় করবেন না । ..... পারস্পরিক আলাপ-আলোচনা করতে গিয়ে যদি প্রতিপক্ষের মধ্যে উত্তেজনা লক্ষ্য করেন, তাহলে আলোচনা বন্ধ করবেন। কারণ উত্তেজনাপূর্ণ আলোচনার বহু অনিষ্টকর কুফল হয়ে থাকে।"

তিনি আরও বলেন, "ইসলামী আন্দোলনের একটা বিশিষ্ট মেজাজ-প্রকৃতি আছে। এর একটি বিশেষ কর্মপদ্ধতি আছে, যার সাথে অন্য কোন আন্দোলনের কর্মপদ্ধতির কোনই মিল নেই। আজ পর্যন্ত যারা বিভিন্ন ধরনের আন্দোলনের সাথে জড়িত এবং যারা সে সব পদ্ধতিতে অভ্যস্ত, তারা এ জামায়াতে যোগদান করলে তাদের অনেক কিছুই পরিবর্তন করতে হবে। সভা-সমিতি, ফেস্টুন, ঝাণ্ডা-পতাকা, শ্লোগান, ইউনিফরম, বিক্ষোভ প্রদর্শন, প্রস্তাবাদি গ্রহণ, বল্গাহীন বক্তৃতা, উত্তেজনা সৃষ্টিকারী রচনা এবং এ ধরনের যাবতীয় জিনিস ঐসব আন্দোলনের প্রাণস্বরূপ আর জামায়াতের আন্দোলনের জন্যে হলাহল। এখানের কর্মপদ্ধতি কোরআন পাক এবং সীরাতে মুহাম্মদী (সাঃ) ও সাহাবায়ে কেরামের জীবন চরিত থেকে শিখে নিয়ে তার অভ্যাস করতে হবে।"

সর্বশেষে মাওলানা বলেন, "এ আন্দোলনের প্রাণ হলো প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর সাথে দৃঢ় সম্পর্ক। তাঁর সাথে আপনাদের সম্পর্ক যদি দুর্বল হয়, তাহলে হুকুমতে ইলাহিয়া কায়েম করার এবং তা সাফল্যের সাথে পরিচালনা করার যোগ্য হতে পারবেন না। সেজন্যে ফরয ইবাদতের সাথে নফল ইবাদতেরও নিয়মিত অভ্যাস করবেন। নফল নামায, নফল রোযা, সদকা প্রভৃতি এমন জিনিস যা মানুষের মধ্যে আন্তরিকতা সৃষ্টি করে। আর এ সব যত বেশী সম্ভব গোপনীয়তার সাথে করবেন যাতে 'রিয়া' (লোক দেখানো) না হয়। নামায বুঝে পড়বেন। এমনভাবে নয় যে, একটা মুখস্থ জিনিসের আবৃত্তি করছেন। বরঞ্চ এভাবে যে, সজ্ঞানে আপনি খোদার দরবারে কিছু আরজি পেশ করছেন। ......

..... যে সকল যেকের-আযকার, রিয়াযাত (সাধনা), মুরাকাবা-মুশাহাদা, তাসবীহ তপজপ সহীহ হাদীস থেকে প্রমাণিত নয়, সে সব থেকে বিরত থাকবেন।"

একটি সাক্ষাৎকার

জামায়াতে ইসলামী কিভাবে কায়েম হলো এবং কোন অবস্থার মধ্যে তার সূচনা হলো, এ সম্পর্কে মাওলানার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে প্রশ্ন করলে তার উত্তরে মাওলানা যা বলেন, তা নিম্নে প্রদত্ত হলো। কারণ শিল্পীর নিজের মুখে তাঁর তৈরি শিল্পের আদিকথা শুনতে পাঠকগণ নিশ্চয়ই আনন্দ পাবেন।

জামায়াতে ইসলামী সংগঠনের পূর্বে ইসলামী আন্দোলনের জন্যে সর্বাত্মক প্রচেষ্টার ধারণা তাঁর মধ্যে কখন এলো তা তাঁর নিজের মুখে শুনুন ঃ

"আমি তো এর সঠিক রূপ সম্পর্কে চিন্তা করেছি উনিশ শ' আটত্রিশ অথবা উনচল্লিশ সালে। অবশ্য এর আগে একটা রিসার্চ একাডেমী এবং একটা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (তরবিয়তগাহ) স্থাপনের বাসনা আমার ছিল, যাতে করে কিছু লোক তৈরি করা যায়। কারণ এটা এমনই একটা কাজ যে, নিজে লোক তৈরি করে না নিলে কাজই চলতে পারে না। একটা আন্দোলনের মধ্যে কিছু লোক শামিল করে সংগঠিত উপায়ে সামগ্রিকভাবে চেষ্টা-চরিত্র করার বিষয় বেশ কিছুকাল পরে আমার মনে জেগেছে।

কিন্তু এ ধারণা কেনই বা আমার মনের মধ্যে জাগলো এবং তখন এমন কি পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল যার জন্যে আমার মধ্যে এ অনুভূতির সঞ্চার হয়েছিল?

উনিশ শ' চব্বিশ খ্রিষ্টাব্দ থেকে প্রায় উনিশ শ' সাঁইত্রিশ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত অবস্থা অত্যন্ত নিরাশাব্যঞ্জক ছিল। মুসলমানগণ বিরাট সংকটের সম্মুখীন হয়ে পড়েছিল। একদিকে খেলাফত আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছিল এবং তারপর হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়েছিল। মুসলমানগণ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে এমনভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল যে, আস্থাভাজন কোন নেতা বা পরিচালক তাদের মোটেই ছিল না। তাদের সামনে জীবনের কোন লক্ষ্য ছিল না এবং পরস্পরে ছিল বিবদমান। অপরদিকে এরই সুযোগে হিন্দুদের সংকল্প ও উদ্দেশ্য ভালোভাবে ধরা পড়লো। তাদের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করছিলেন গান্ধীজী স্বয়ং। মুসলমানগণ তার প্রতি আস্থা রাখতো। অথচ তিনি তাদের কোনই কাজের ছিলেন না। উপকারের পরিবর্তে তিনি তাদের অপকারই করেছেন। তাঁর অবস্থা দেখে মনে হচ্ছিল যে, তাঁর বাইরের দিকটা একরূপ এবং ভিতরের দিকটা অন্যরূপ। কারণ হিন্দু-

মুসলিম দাঙ্গায় সকল দোষ তিনি মুসলমানদের ঘাড়েই চাপাতেন এবং হিন্দুরা বাড়াবাড়ি করলেও তাদের সমর্থন জানাতেন। ফলে তাঁর প্রতি মুসলমানদের যে আস্থাটুকু ছিল, তা তারা হারাতে লাগলো। এই সময়েই মাওলানা মুহম্মদ আলী জওহর নিরাশ হয়ে পড়েছিলেন। হাকিম আজমল খানও নিরাশ হয়েছিলেন।

এ সময় দু'একটি বছর এমনভাবে কাটলো যে তা আমার জন্যে ছিল অত্যন্ত পীড়াদায়ক। সে সময়ে আমি ছিলাম একেবারে নওজোয়ান। আমি তখন চিন্তাও করতে পারতাম না যে, কোন আন্দোলন আমি পরিচালনা করতে পারব। কারণ পরিস্থিতি ছিল সুস্পষ্ট। যে সব নেতার প্রতি আমাদের আস্থা ছিল, তাঁদের সকলেই ব্যর্থ হয়ে পড়েছিলেন। তাঁদের কাছে এমন কোন পয়গামও ছিল না, যার দ্বারা তাঁরা জাতিকে শান্ত করতে পারতেন। ভেবেও স্থির করতে পারতাম না যে কি করা যাবে।

এ সময়ে বহু নতুন নতুন সভ্যতা ও চিন্তাধারার প্রসার শুরু হয়েছিল। খেলাফত আন্দোলন ব্যর্থ হওয়ার পর চার-পাঁচ বছর তো হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা চললো। তারপরে মুসলমানদের মধ্যে নাস্তিকতা ও পাপাচার দানা বাঁধতে লাগলো। ইসলামকে বিকৃত করা শুরু হলো। দেখতে দেখতে এ একটা ঝঞ্ঝার আকার ধারণ করলো। *'নিগার' এ সময়েরই সৃষ্টি। এমন কি আমাদের দেশের দ্বীনী মাদরাসাগুলো থেকে এমন বহু লোক বেরিয়ে আসছিল, যারা ইসলাম সম্পর্কে নিরাশ হয়ে তা থেকে দূরে সরে পড়ছিল। অবশেষে অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছিল যে, নামায পড়তে লোকে লজ্জা বোধ করতো। বিশেষ করে রেলগাড়ীতে ভ্রমণের সময় অথবা বাগ-বাগিচায় কেউ নামায পড়লে সে যেন নিজেকে অত্যন্ত হাস্যাস্পদ মনে করতো।

এসময় চিন্তা করতে করতে আমি এ সিদ্ধান্তে পৌঁছলাম যে, এ অবস্থার মুকাবিলা করার জন্যে কিছু করা দরকার। এ এমনই এক পরিস্থিতি ছিল, যা লক্ষ্য করে প্রত্যক্ষ অনুভব করলাম যে, সংগঠিত প্রচেষ্টা ব্যতীত ইসলামের হেফাযত এবং সমুন্নতি সম্ভব নয়।"

---

* ফতেহ্ নিয়াজপুরী কর্তৃক সম্পাদিত একটি পত্রিকা- যার মাধ্যমে হাদীস শাস্ত্রকে অবিশ্বাস্য প্রতিপন্ন করার আন্দোলন শুরু হয়।

প্রশ্ন- তাহলে সর্বপ্রথম আপনি চিন্তাধারা পরিশুদ্ধিকরণের পরিকল্পনা করেন কি?

উত্তর- জি হ্যাঁ, সে সময়ে আমার মনে এই ছিল যে, সর্বপ্রথম চিন্তার ক্ষেত্রে কিছু কাজ শুরু করা এবং এভাবে কিছু লোক এ কাজের জন্যে তৈরি করা যাক। অবশেষে সম্মিলিত চেষ্টা করা যাবে।

চিন্তার ক্ষেত্রে সংগ্রাম চালানোর পর আমি অনুভব করলাম যে, এখন আমার পক্ষে সম্মুখে অগ্রসর হয়ে কাজ করা ব্যতীত গত্যন্তর নেই। কিন্তু আবার একটু চিন্তাও ছিল যে, কি জানি আমার ডাকে যদি কেউ সাড়া না দেয়, এ আন্দোলন আমি চালাতে পারি কি না। কিন্তু তথাপি ভেবে-চিন্তে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছলাম যে, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় সব প্রমাণিত হবে। যদি সম্মুখে অগ্রসর হয়ে কাজ করার আর কোন ব্যক্তি না থাকে, তবে আমাকেই তা করতে হবে।

প্রশ্ন- আপনি এ কাজে অপরের সাহায্য লাভের জন্যে কিভাবে আবেদন করলেন এবং তাদেরকে কিভাবে উদ্বুদ্ধ করলেন?

উত্তর-- এ ব্যাপারে সব কিছু নির্ভর করতো তর্জুমানুল কোরআনের প্রবন্ধাদি ও দাওয়াতী ঘোষণার উপর। যাঁদেরই সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে, তাঁদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেছি। চিঠিপত্র খুব কম লিখেছি। বেশীর ভাগ কাজ করেছি তর্জুমানে প্রকাশিত প্রবন্ধাদির দ্বারা এবং দেখা-সাক্ষাতের মাধ্যমে। এ কাজের জন্যে তাড়াহুড়া করিনি। যথা, বিরাট সভা-সম্মেলন করে তাতে কিছু লোক জমায়েত করা যাক– এ পথ আমি অবলম্বন করিনি। আমি ক্ষুদ্র সূচনার পক্ষপাতী। সব সময় আমার প্রচেষ্টা এই ছিল যে, যে ক'জনই উপযুক্ত ও বিশ্বাসভাজন লোক পাওয়া যায়, তাদের নিয়ে কাজ শুরু করি।

প্রশ্ন- জামায়াত গঠনের সময় কত লোক পেয়েছিলেন?

উত্তর- প্রথমবার জামায়াত গঠনের সময় প্রায় ১৫০ জন লোক আমার ডাকে সাড়া দিয়েছিল এবং ৭৫ জন প্রত্যক্ষ জামায়াতে শরীক হন। এটাই ছিল প্রাথমিক সংখ্যা।*

---

* প্রকৃত ব্যাপার এই যে, তর্জুমানুল কোরআনে প্রকাশিত জামায়াত গঠনের আহ্বানে সাড়া দিয়ে ১৫০ জন তাঁদের নাম-ঠিকানা তর্জুমান অফিসে পাঠিয়ে দেন এবং তাঁদের সকলের কাছে পত্র দেয়া হয় যেন তাঁরা ২৫শে আগস্ট ১৯৪১, লাহোর তর্জুমানুল কোরআন অফিসে হাযির হন। এ দাওয়াতের পর ৭৫ জন হাযির হন এবং তাঁদের নিয়েই জামায়াত গঠিত হয়– গ্রন্থকার।

প্রশ্ন- জামায়াতের এ সূচনায় নিজের মধ্যে আপনি কি প্রতিক্রিয়া অনুভব করেছিলেন?

উত্তর- আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম যে, এর চেয়ে উত্তম সূচনা কিছুতেই আশা করা যায় না। আমি এ কথা কখনও মনে করিনি যে, ডাক দিব আর হাজার হাজার লোক সাড়া দিয়ে হাযির হবে।

ঐতিহাসিক চৌদ্দই আগস্টে মাওলানা

উনিশ শ' সাতচল্লিশ সালের চৌদ্দই আগস্ট পাক-ভারতের মুসলমানদের এক স্মরণীয় দিন। এই দিন ব্রিটিশ ও হিন্দু সাম্রাজ্যবাদের নিগড় থেকে মুসলমানদের আযাদীর সূর্যকিরণ উদিত হয়েছিল। পাঞ্জাবের গুরুদাসপুর জেলা ছিল সম্পূর্ণরূপে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ। ভারত বিভাগের সর্বসম্মত মৌলিক নীতি অনুযায়ী গুরুদাসপুর জেলা পাকিস্তানেরই ন্যায্য প্রাপ্য। তাই এ জেলার মুসলমানদের জন্যে ছিল আজ ঈদের দিন। কিন্তু অদৃষ্টের নির্মম পরিহাস, মুসলমানদের এ আনন্দ বিষাদে পরিণত হলো। র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদ গুরুদাসপুরের মতো কয়েকটি মুসলিম অধ্যুষিত জেলা পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান থেকে টেনে বের করে ভারতের সাথে জুড়ে দিয়ে চরম পক্ষপাতিত্ব, অবিচার ও নির্লজ্জ হিন্দুপ্রীতির দৃষ্টান্ত স্থাপন করলো।

এই দিন মাওলানা মওদূদী গুরুদাসপুর জেলার পাঠানকোটের নিকটবর্তী "দারুল ইসলামে" অবস্থান করছিলেন। পাঠানকোট শহরের অধিবাসী ছিল প্রায় শিখ ও হিন্দু। 'দারুল ইসলাম' বস্তিও ছিল হিন্দু-শিখ পরিবেষ্টিত। রেডিওর মাধ্যমে গুরুদাসপুর জেলার ভারতভুক্তির কথা শোনা মাত্রই মাওলানা গভীর দুঃখের সাথে মন্তব্য করেন যে, কাশ্মীর মুসলমানদের হাতছাড়া হয়ে গেল। তিনি এ কথাও বলেন যে, যদি তাঁর সাথে একশত সশস্ত্র সিপাহী থাকত তাহলে পাকিস্তানের পরিবর্তে তিনি কাশ্মীর গিয়ে তাকে আযাদ করার সংগ্রামে লিপ্ত হতেন।

ভারত বিভাগের পর পাঞ্জাবের সর্বত্র সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার দাবানল জ্বলে ওঠে। হিন্দু ও শিখ পরিবেষ্টিত দারুল ইসলামের নিরাপত্তার প্রশ্ন এ ক্ষুদ্র পল্লীর অধিবাসীদের তখন বড় হয়ে দেখা দিল। এ সময়ে মাওলানা মওদূদী একজন অতি বিচক্ষণ সেনাধ্যক্ষের ন্যায় কাজ করেন। তাঁর নির্দেশে একদিকে 'দারুল ইসলামে' কয়েকটি পরিখা খনন করা হলো এবং মাত্র দু'টি বন্দুক ও লাঠিসোটাসহ সকলে প্রস্তুত থাকল, যাতে হিন্দু ও শিখদের দ্বারা আক্রান্ত হলে আত্মরক্ষা করা যেতে পারে। অপরদিকে, জামায়াতের দায়িত্বশীল ব্যক্তিগণ দাঙ্গা থেকে বিরত থাকার জন্যে শিখ নেতাদের আবেদন জানাতে লাগলেন।

একবার গুজব রটল যে, কয়েকশত শিখ ও হিন্দু অস্ত্রশস্ত্রসহ দারুল ইসলাম আক্রমণ করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। মাওলানা আল্লাহর উপর সোপর্দ করে

জামায়াতের সেক্রেটারী মিয়া তোফায়েল মুহাম্মদকে দু'জন সঙ্গীসহ শিখ নেতা জায়গীর সিং ও চুনিলাল সিং এর কাছে পাঠালেন। পরিপূর্ণ শিখ বস্তির সশস্ত্র লোকজনের ভেতর দিয়ে তিনজন নিরস্ত্র মুসলমান শিখ নেতাদের বাড়ী পৌঁছলেন। তাদেরকে দেখে তারা অতীব আশ্চর্যান্বিত হয়ে পড়লেন। জামায়াত নেতাগণ নির্ভীকচিত্তে বললেন, শুনলাম আপনারা নাকি 'দারুল ইসলাম' আক্রমণ করতে চান। যদি একথা সত্যি হয় তবে তার কারণ কি? মাওলানা ও দারুল ইসলামের বাসিন্দাদের নিষ্কলুষ চরিত্র পূর্ব থেকেই তাদের মনে প্রভাব বিস্তার করে রেখেছিল। এখন এদের নির্ভীকতায় তারা মুগ্ধ হলেন এবং আশ্বাস দিয়ে নিরাপদ স্থান পর্যন্ত তাঁদেরকে এগিয়ে দিলেন।

মাওলানার নির্দেশে দূর-দূরান্তের বিপন্ন মুসলমানদেরকে দারুল ইসলামে আশ্রয় দেয়া হয়। পরবর্তীকালে পাকিস্তান থেকে আগত কনভয়ের সাহায্যে তাদেরকে পাকিস্তানে স্থানান্তরিত করা হয়। সকল লোকজনকে নিরাপদে পাকিস্তানে পাঠানোর পর সর্বশেষে মাওলানা দারুল ইসলাম ত্যাগ করে লাহোর চলে আসেন।

লাহোরে স্থানান্তরিত হওয়ার পর মাওলানা ও তাঁর সহকর্মী লোকজনদের মাথা গুঁজবার প্রশ্ন বড় হয়ে দাঁড়াল। তাঁদের জন্যে সরকার পক্ষ থেকে একটা বাড়ী এ্যালট করার পর চব্বিশ ঘন্টার মধ্যেই আবার তা ফেরত নেয়া হলো। মাওলানা তাঁর লোকজনকে এ্যালটমেন্টে বাড়ী নিতে নিষেধ করে দিলেন। অতঃপর তারা ইসলাম পার্কে তাঁবু করে মাথা গুঁজলেন। পরে ইছরায় ভাড়াটে বাড়ীতে তাঁরা চলে আসেন।

এ সময় ছিন্নমূল জামায়াত নেতাদের দিয়ে মাওলানা দু'টি অভিযান শুরু করেন– শহরের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও মুহাজিরদের সেবা। এ সময়ে শহরের বহু স্থানে যে দুর্গন্ধময় আবর্জনা স্তূপীকৃত হয়েছিল, তা মহামারী রোগের বার্তা বহন করছিল। জামায়াত কর্মীগণ মুচিদরজা ও ভাটিদরজার আবর্জনা অপসারণের কাজে লেগে গেলেন।

মুহাজিরদের সেবার জন্যে একটি দল সীমান্তে নিয়োজিত হলো এবং অপর দু'টি দল ওয়াল্টন ও বাউলী ক্যাম্পে অবস্থানকারী মুহাজিরদের প্রয়োজন পূরণে আত্মনিয়োগ করলো।

মোটকথা, মাওলানা মওদূদী তাঁর বহু সঙ্গী-সাথীসহ লাহোরে হিজরত করে সরকার বা জনগণের শরণার্থী না হয়ে বরঞ্চ আগত অন্যান্য মুহাজিরের সেবার ভেতর দিয়েই পাকিস্তানে তাঁর কাজের সূচনা করেন।

ভারত বিভাগের পর

ভারত বিভাগের পর জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় দফতর লাহোরে স্থানান্তরিত হয়। জামায়াতে ইসলামী "পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামী" ও "ভারতীয় জামায়াতে ইসলামী" নামে দু'টি স্বতন্ত্র জামায়াতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। মাওলানা মওদূদী এবার পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর আমীর নির্বাচিত হন।

উনিশ শ' সাতচল্লিশ সালের অক্টোবর থেকে পরবর্তী বছরের জানুয়ারী পর্যন্ত পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামী লাহোর মুহাজির ক্যাম্পে সেবা কার্যে আত্মনিয়োগ করে।

এটা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, পাকিস্তান রাষ্ট্রের ভবিষ্যত রূপ সম্পর্কে মাওলানা মওদূদী ছয় বছর পূর্বে আলীগড়ের স্ট্রাচী হলে যেসব ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, রাষ্ট্রের জন্মলাভের পর থেকেই তা অক্ষরে অক্ষরে প্রতিফলিত হতে দেখা গেল। শিশু রাষ্ট্রের লালন-পালনের ভার যারা গ্রহণ করলেন, তাদের শিক্ষা-দীক্ষা, নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি, আকীদা-বিশ্বাস ইসলামী রাষ্ট্র গঠনের মোটেই অনুকূল ছিল না। যে মহান উদ্দেশ্যের জন্যে লক্ষ লক্ষ মুসলমান নর-নারী জান-মাল ও সম্ভ্রম বিসর্জন দিয়েছিল, পাকিস্তান অর্জনের পর ব্রিটিশ শ্বেতপ্রভুদের আসন যারা অলংকৃত করলেন, তারাও পাকিস্তানবাসীর কালো প্রভু সেজে পাকিস্তান হওয়ার সে মহান উদ্দেশ্য সাধনের পথে বিরাট প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ালেন। একমাত্র আল্লাহর দ্বীন কায়েম করার জন্যে যে লক্ষ লক্ষ প্রাণ জিহাদী অনুপ্রেরণায় শাহাদাতের পূর্ণ পাত্র পান করেছিল, তাদের মহান আত্মত্যাগ বিস্মৃত হয়ে নব রাষ্ট্রের শাসকবৃন্দ ব্রিটিশ প্রভুরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে চললেন। উপরন্তু এ শিশু রাষ্ট্রকে ইসলামী ছাঁচে ঢালবার কোন ক্ষুদ্রতম বাসনাও তাদের মনে আছে, আকার-ইঙ্গিতে তাও বুঝতে পারা গেল না। অতএব পাকিস্তান অর্জনের পাঁচ মাস পরে ১৯৪৮ সালের জানুয়ারী মাসে লাহোর আইন কলেজে মাওলানা মওদূদী তাঁর প্রথম বক্তৃতায় দাবি করেন যে, পাকিস্তানের শাসন ব্যবস্থা ইসলামী হতে হবে। পুনরায় ফেব্রুয়ারী মাসে উক্ত কলেজেই "ইসলামী আইন" সম্পর্কে বক্তৃতা প্রসঙ্গে মাওলানা চার দফা দাবি পেশ করেন। মার্চ মাসে করাচীর জাহাঙ্গীর পার্কের ঐতিহাসিক

জনসমাবেশে তিনি তাঁর চার দফা দাবি বিশ্লেষণ করে বক্তৃতা করেন।
চার দফা দাবি এই–

(১) পাকিস্তান রাষ্ট্রের সার্বভৌম মালিক একমাত্র আল্লাহ তায়ালা এবং এ রাষ্ট্রে একমাত্র তাঁরই ইচ্ছা পূর্ণ হবে।

(২) এ যাবত যত প্রকার ইসলাম-বিরোধী আইন বলবৎ আছে, তার সবই রহিত করতে হবে।

(৩) একমাত্র ইসলামী শরীয়তই হবে পাকিস্তানের যাবতীয় আইন-কানুনের উৎস।

(৪) শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত সীমারেখার মধ্যেই পাকিস্তান তার ইচ্ছানুযায়ী কাজ করতে পারে।

উক্ত চার দফা দাবি পাকিস্তান রাষ্ট্র ও গণপরিষদ কর্তৃক মেনে নেওয়ার জন্যে জামায়াতে ইসলামীই সর্বপ্রথম এক গণ-আন্দোলন শুরু করে। তিন মাসের মধ্যে এ আন্দোলন এমন তীব্র ও ব্যাপক আকার ধারণ করে যে, শাসকগণ ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েন। ইসলামী জনতার এ চার দফা দাবিতে নতি স্বীকার না করলেও তা অস্বীকার করার সাহসও তাদের ছিল না। তার কারণ ছিল এই যে–

- এ ছিল সম্পূর্ণ ইসলামসম্মত দাবি এবং বিগত দশ বছর থেকে তারা জনসাধারণের স্কন্ধে সওয়ার হয়েছিলেন এ ইসলামেরই নাম করে। তাই এখন ইসলামী দাবি অস্বীকার করার দুঃসাহস তাদের নেই।
- দাবিগুলো ছিল সকল দিক দিয়েই ন্যায্য ও যুক্তিসঙ্গত।
- দাবিগুলোর পশ্চাতে ছিল একটা সুসংগঠিত ও সুদৃঢ় আন্দোলন।
- জনসাধারণ এত দ্রুততার সাথে এ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল যে, এর বিরোধিতা হতো জনগণের বিরোধিতারই শামিল। কিন্তু এতদসত্ত্বেও ইসলাম বিমুখ শাসকগণ অবশেষে পশ্চাদ্দার দিয়ে যাত্রা শুরু করলেন। তারা ইসলামী আন্দোলন বানচাল করার জন্যে নিম্নের অপকৌশল অবলম্বন করলেন। তারা অপপ্রচার শুরু করলেন যে–

(১) মাওলানা মওদূদী কাশ্মীরের যুদ্ধকে জিহাদ বলে মানতে রাজী নন।

(২) জামায়াতে ইসলামী সৈন্য বিভাগে ভর্তি হতে নিষেধ করে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ব্যবস্থা দুর্বল করেছে।

(৩) জামায়াতে ইসলামী রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করতে চায় না।

দেশের সকল প্রকার প্রচারযন্ত্র রাষ্ট্রের করায়ত্ত থাকে বলে সরকার সত্যকে মিথ্যা ও মিথ্যাকে সত্য বলে ফলাও করতে পারে এবং এ সবের সমালোচনা ও প্রতিবাদ বন্ধ করে দিতে পারে। এ ব্যাপারেও তাই হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে পাকিস্তানের তৎকলীন পররাষ্ট্র সচিব স্যার জাফরুল্লাহ্ খান ১৯৪৮ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারী জাতিপুঞ্জের বৈঠকে ঘোষণা করেন যে, তার সরকার কাশ্মীর যুদ্ধকে জিহাদ বলে মেনে নিতে নিষেধ করেছে। মাওলানা মওদূদীকে কাশ্মীর যুদ্ধকে জিহাদ বলে ঘোষনা করতে বলা হলে তিনি বলেন, "কোন একটি দেশের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষনা করার দায়িত্ব হয় একটা রাষ্ট্রের, এ কাজ কোন ব্যক্তির নয়।

রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে যেখানে কাশ্মীর যুদ্ধকে জিহাদ বলে ঘোষণা করতে নিষেধ করা হচ্ছে, সেখানে সেই রাষ্ট্রের অধীন কোন ব্যক্তি বা দল কি করে একে জিহাদ বলে ঘোষণা করতে পারে? কিন্তু তথাপি ব্যক্তিগতভাবে মাওলানা মওদূদী এবং দল হিসাবে জামায়াতে ইসলামী কাশ্মীর যুদ্ধে সর্বপ্রকার সক্রিয় সহযোগিতা করেন।

মাওলানা ও জামায়াতের বিরুদ্ধে অন্যান্য অভিযোগও ঠিক এমনি অমূলক ও দুরভিসন্ধিমূলক ছিল। এগুলোর কোন প্রমাণ কেউ আজ পর্যন্ত পেশ করতে পারেনি। একেই বলে সরকারী প্রচারযন্ত্রের পুকুর চুরি।

মাওলানা মওদূদীর প্রথম কারাবরণ

ইসলামী দাবিগুলো সরাসরি অস্বীকার না করে শাসকবৃন্দ মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে তা বানচাল করার অপপ্রয়াসে মেতে উঠলেন। সরকারী প্রচারযন্ত্রের সাহায্যে তারা উক্ত অমূলক কাহিনী ফলাও করে প্রচার করতে লাগলেন এবং মিথ্যা ও দুরভিসন্ধিমূলক অজুহাতে ১৯৪৮ সালের ৪ঠা অক্টোবর বাদ মাগরিব জামায়াতের বিশিষ্ট কয়েকজন নেতাসহ (মিয়া তোফাইল মুহাম্মদ ও মাওলানা আমীন আহসান ইসলাহী) মাওলানা মওদূদীকে কুখ্যাত সাম্রাজ্যবাদী নিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার করে মুলতান জেলে রাখা হয়। এক মাস পর তার মিয়াদ আরও ছ'মাস বাড়িয়ে দেয়া হয়।

এগারই অক্টোবর মাওলানা আব্দুল জাব্বার গাজী জামায়াতের আমীর নির্বাচিত হন এবং আন্দোলন পূর্ণ মাত্রায় অব্যাহত রাখেন। সকল প্রকার সরকারী দুষ্ট প্রচারণা ক্রমশ লোকচক্ষে ধরা পড়তে লাগল এবং ইসলামী আন্দোলনও জোরদার হতে লাগল। জনসাধারণও অধিকতর সহানুভূতি ও সহযোগিতার সাথে আন্দোলনে যোগদান করতে লাগল। মুসলিম লীগ সমর্থক জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম জনসাধারণের সমর্থনে জামায়াতের কর্মীগণ এমন প্রচণ্ড বেগে এ আন্দোলন পরিচালনা করলেন যে, ১৯৪৯ সালের ১২ই মার্চ পাকিস্তান গণপরিষদ কর্তৃক ঐতিহাসিক “আদর্শ প্রস্তাব” গৃহীত হলো।

“আদর্শ প্রস্তাব” গৃহীত হওয়ার পর অনুমান করা হয়েছিল যে, জামায়াতে ইসলামী এবং সরকারের মধ্যে যে অসন্তোষের কারণ ছিল তা এ প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর দূরীভূত হবে। বস্তুত জামায়াতের মজলিসে শূরা ১৩ই মার্চে এক বৈঠকে আদর্শ প্রস্তাবের জন্যে সরকারকে মুবারকবাদ জানায়। অনেকে এও আশাআশ্চর্যের বিষয় এই যে, ১৯৪৯ সালের ৪ঠা এপ্রিল থেকে পুনরায় ছ'মাসের জন্য তাঁর কারাবাসের মিয়াদ বৃদ্ধি করা হলো। এতদসত্ত্বেও জামায়াতের কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা ৬ই, ৭ই, এবং ৮ই এপ্রিলের বৈঠকে সরকারের সাথে পূর্ণ সহযোগিতার ইচ্ছা প্রকাশ করে, যাতে আদর্শ প্রস্তাবকে ভিত্তি করে শাসনতন্ত্র রচনার কাজ অগ্রসর হতে পারে। কিন্তু সরকারের ক্রোধবহ্নি তখনও নির্বাপিত হয়নি। জনতার চাপে অনিচ্ছাসত্ত্বেও “আদর্শ প্রস্তাব” মেনে নিতে হয়েছে বলে

৯—

তার পূর্ণ প্রতিশোধ মাওলানা মওদূদীর উপর নিতে হবে বলে তারা পণ করে বসলেন। ১৯৪৯ সালে ৪ঠা অক্টোবর সরকার তৃতীয় বার মাওলানার বন্দী জীবন আরো ছ'মাসের জন্য বাড়িয়ে দেন। মাওলানাকে বিনা বিচারে ও বিনা কারণে সুদীর্ঘকাল লৌহ যবনিকার অন্তরালে রাখার কারণই হলো এই যে, ইসলামী আন্দোলনের নেতাকে এভাবে জব্দ করতে হবে এবং তাঁর দল ও জামায়াতকে খতম করতে হবে।

আদর্শ প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর ইসলাম বিমুখ শাসকদের ভূমিকা

উনিশ শ' উনপঞ্চাশ সালে অক্টোবর থেকে ১৯৫০ সালের মে মাস পর্যন্ত এই আট মাস কাল জামায়াতের কর্মীগণকে বড় দুর্দিনের সম্মুখীন হতে হয়। "আদর্শ প্রস্তাব" অনুযায়ী তাঁরা সমগ্র পাকিস্তানে ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রণয়নের দাবি করেছিল যে, হয়ত এখন সরকার মাওলানা মওদূদীকে মুক্ত করে দেবেন। কিন্তু করে আন্দোলন শুরু করেন। মাওলানা মওদূদীর তৎকালীন দু'খানি গ্রন্থ, যথা- "ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রণয়ন" ও "ইসলামী শাসনতন্ত্রের মূলনীতি" বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কিন্তু শাসকগণ ইসলামী শাসনতন্ত্র ঠেকিয়ে রাখার জন্যে বাহানা খুঁজতে লাগলেন। তাঁরা নানাভাবে ঘোষণা করতে লাগলেন যে-

- কাশ্মীর বিপন্ন- অতএব শাসনতন্ত্র প্রণয়ন সম্ভব নয়।
- পাকিস্তান এখন বিপন্ন- অতএব এটা জিহাদের সময়, শাসনতন্ত্র প্রণয়নের সময় নয়।
- "মোল্লাদের" শাসন হলেই তা ইসলামী শাসন হয় না। বরং মুসলমানদের যে কোন শাসনকেই ইসলামী শাসন বলে।
- "আদর্শ প্রস্তাব" পুরাতন জীর্ণ ইসলামের নীতি অনুযায়ী করা হয়নি বরং করা হয়েছে পাশ্চাত্যের আধুনিক ইসলাম অনুযায়ী।
- আধুনিক যুগের কোন প্রগতিশীল রাষ্ট্রের জন্যে ইসলামী আদর্শে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন যুক্তিসঙ্গত নয়।
- মুসলমানদের মধ্যে বিভিন্ন মাযহাবী ফিরকাহ থাকার কারণে ইসলামী রাষ্ট্র সম্ভব নয়।
- ধর্মীয় গোঁড়ামীর নামে রাষ্ট্র গঠিত হলে আধুনিক দুনিয়া উপহাস করবে।

জামায়াতে ইসলামীর কর্মীগণ সুসংগঠিত ও নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে অকাট্য যুক্তি-প্রমাণাদির দ্বারা ইসলাম বিরোধী শক্তিগুলোর উপরিউক্ত অপপ্রচারণার দাঁতভাঙ্গা জবাব দিয়ে চললেন এবং সমগ্র পাকিস্তানে ইসলামী শাসনতন্ত্রের পক্ষে এক শক্তিশালী জনমত গড়ে উঠতে লাগল।

মাওলানার মুক্তি

ইসলামী আন্দোলনের অগ্রদূত এবং বর্তমান যুগের বিপ্লবী ইসলামী নেতাকে বিনা অজুহাতে কারা প্রাচীরের অভ্যন্তরে আটকিয়ে রাখা শাসকদের পক্ষে আর সম্ভব হলো না। ১৯৫০ সালের ২৮শে মে আইন ঘটিত বাধ্যবাধকতার জন্যে সরকার মাওলানাকে মুক্তি দিলেন। উনিশ মাস পঁচিশ দিন পর লৌহ যবনিকার অন্তরাল থেকে মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী জগতের মুক্ত আবহাওয়ায় ফিরে এলেন। মুক্তির পর পুনরায় জামায়াতে ইসলামী তাঁকে আমীর পদে বরিত করল।

মাওলানার মুক্তির পর জুন মাস থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চার মাস যাবত সরকারপক্ষ "আদর্শ প্রস্তাবের" নানাভাবে বিভ্রান্তিকর ব্যাখ্যা করে ইসলামী শাসনতন্ত্রের পথ রুদ্ধ করার চেষ্টা করেন। কিন্তু মাওলানার নেতৃত্বে জামায়াতের কর্মীবৃন্দ তাঁদের অকাট্য যুক্তি-প্রমাণাদির দ্বারা তাদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দেন এবং "আদর্শ প্রস্তাবের" মূল লক্ষ্য জনসাধারণের সামনে তুলে ধরেন। সরকার বাধ্য হয়ে সেপ্টেম্বর মাসে শাসনতন্ত্র মূলনীতি কমিটির রিপোর্ট গণপরিষদে পেশ করেন। এই রিপোর্টের ভেতর দিয়ে পাশ্চাত্য ঘেষা শাসক শ্রেণীর মনের স্বরূপ প্রস্ফুটিত হয়ে পড়ে। কারণ যা কিছু ইসলামের বিপরীত ছিল, তাই এতে সন্নিবেশিত করা হয়েছিল এবং আদর্শ প্রস্তাবের সাথে এর কোন সামঞ্জস্যই ছিল না। অতএব ১৪ই অক্টোবর লাহোরের মুচিদরজায় অনুষ্ঠিত এক বিরাট জনসভায় মাওলানা মওদূদী উক্ত রিপোর্টের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন। ফলে সমগ্র দেশে উক্ত রিপোর্টের বিরুদ্ধে এক শক্তিশালী প্রতিবাদ গড়ে উঠল এবং সরকার বাধ্য হয়ে শাসনতন্ত্র মূলনীতি কমিটির রিপোর্ট ও সুপারিশসমূহ প্রত্যাহার করেন। অতঃপর সরকার হাত-পা গুটিয়ে চুপচাপ বসে রইলেন। অবশ্য সরকারের কিছু পাশ্চাত্যমনা তাবেদার উলামা সম্প্রদায়ের প্রতি কটাক্ষ করে ইসলামী শাসনতন্ত্রের খসড়া পেশ করার চ্যালেঞ্জ দেন।

আলেমদের ঐক্যবদ্ধ দাবি

অতঃপর পাকিস্তানের বিভিন্ন স্থানের একুশ জন প্রসিদ্ধ আলেম উক্ত চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে ১৯৫১ সালের ২১শে জানুয়ারী করাচী মহানগরীতে সমবেত হন। তাঁদের সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে ২২ দফা মূলনীতি প্রণয়ন করে সরকারের নিকট পেশ করা হয়। এবং তা জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করা হয়। এটা প্রকৃতপক্ষে পাকিস্তানে ইসলামী শাসনতন্ত্রের এক শক্তিশালী "চার্টার" হিসাবে পরিগণিত হয়। উলামা কর্তৃক উপস্থাপিত এই ২২ দফা মূলনীতি জামায়াতে ইসলামী বিপুল সংখ্যায় প্রকাশ করে দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়। এতে সরকারের ইসলাম বিরোধী প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়।

এরপর থেকে ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন পূর্ণ উদ্যমে শুরু হলো। কিন্তু এতে করেও যখন শাসনতন্ত্র প্রণয়নের কাজ বিলম্বিত হতে থাকে, তখন জামায়াতে ইসলামী ৯ দফা দাবি সম্বলিত ছাপানো কাগজে জনগণের স্বাক্ষর অভিযান শুরু করে দেয়। উক্ত ৯ দফা দাবি ছিল–

- ইসলামী শরীয়তই হবে দেশের শাসনতন্ত্রের প্রকৃত উৎস।
- শরীয়তের খেলাপ কোন আইন প্রণয়ন করা চলবে না।
- সকল শরীয়ত বিরোধী আইন-কানুন বাতিল করতে হবে।
- সরকারের কর্তব্য হবে ভালো কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধ করা।
- আদালতে বিচার ব্যতিরেকে নাগরিক অধিকার হরণ করা চলবে না।
- শাসন বিভাগ এবং সরকারী কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে দেশের আদালতে বিচার প্রার্থনা করার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকবে।
- বিচার বিভাগে শাসন বিভাগের হস্তক্ষেপ চলবে না।
- মানবের মৌলিক প্রয়োজন, যথা– খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা– এ পাঁচটি বিষয়ের পূর্ণ দায়িত্ব সরকারকে গ্রহণ করতে হবে।
- কাদিয়ানী সম্প্রদায়কে অমুসলমান সংখ্যালঘু ঘোষণা করতে হবে।

উক্ত নয় দফা দাবিতে স্বাক্ষর অভিযান ব্যতীতও ব্যক্তিগতভাবে এবং সভা-সমিতির পক্ষ থেকে পত্র ও তারযোগে অবিলম্বে ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রণয়নের

দাবি জ্ঞাপনের জন্যেও সমগ্র দেশব্যাপী এক অভিযান পরিচালিত হয়। ১৯৫২ সালের শেষ পর্যন্ত এ অভিযান অব্যাহত থাকে।

এ বছর পাকিস্তানে এক অতি মর্মন্তুদ ঘটনা ঘটে। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জনাব লিয়াকত আলী খান ১৯৫১ সালের ১৬ই অক্টোবর রাওয়ালপিণ্ডিতে আততায়ীর গুলিতে নিহত হন। পাকিস্তানের রাজনীতির আকাশে যে এক অশুভ উপগ্রহের উদয় হয়েছিল, তার পরিণামস্বরূপ এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড পাকিস্তানের ইতিহাসকে মসিলিপ্ত করে দিল। যা হোক মরহুম লিয়াকত আলী খানের পর খাজা নাজিমুদ্দীন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হন।

এ বছরই ২১শে নভেম্বর করাচীতে জামায়াতে ইসলামীর উদ্যোগে উপরের ৯ দফা দাবিতে এক ঐতিহাসিক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় জামায়াতে ইসলামীর আমীর মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী বলিষ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা করেন যে, যদি এবারের শাসনতন্ত্রের খসড়াটি পূর্বের মতোই অনৈসলামিক হয়, তাহলে ইসলামী জনতা সে খসড়াটি তার প্রণেতাদের মুখের উপরই ছুঁড়ে মারবে। অতঃপর সেদিন বিভিন্ন প্লাকার্ডসহ ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রণয়নের দাবিতে যে সুদীর্ঘ শোভাযাত্রা বের হয় তা দেখে শাসকবৃন্দ হতবাক হয়ে যান। করাচী শহরে এর ফলে এমন এক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় যে, সরকার নতি স্বীকার করতে বাধ্য হন এবং বছরের শেষে ডিসেম্বর মাসে দ্বিতীয়বার শাসনতন্ত্রের খসড়া পেশ করেন।

এবারে শাসনতান্ত্রিক সুপারিশগুলো বিবেচনা করে দেখার জন্যে ১৯৫৩ সালের জানুয়ারী মাসে করাচীতে ৩১ জন বিশিষ্ট আলেমের এক সম্মেলন হয়। ১৮ই জানুয়ারী আলেমগণ উক্ত শাসনতন্ত্রের খসড়া সম্পর্কে তাদের অতীব যুক্তিপূর্ণ প্রস্তাবাদি পেশ করেন।

এ মাসেই কাদিয়ানীদের সংখ্যালঘু ঘোষণা করার জন্যে করাচীতেই এক সর্বদলীয় কনভেনশন আহূত হয়। মাওলানা মওদূদীও উক্ত কনভেনশনে যোগদান করেন। তিনি কনভেনশনে একথার উপর জোর দিয়ে বলেন যে, কাদিয়ানী সমস্যাকে পৃথকভাবে বিবেচনা না করে, একে শাসনতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্যেই শামিল করা হোক।

সর্বদলীয় কনভেনশন কর্তৃক ডাইরেক্ট একশান

সাতাশে ফেব্রুয়ারী (১৯৫৩) করাচীতে সর্বদলীয় কনভেনশনের কার্যকরী সংসদের এক অধিবেশন হয়। এতে কাদিয়ানী সমস্যা সম্পর্কে সরকারকে বাধ্য করার জন্যে "ডাইরেক্ট একশান" বা প্রত্যক্ষ সংগ্রাম করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ অধিবেশনে জামায়াতে ইসলামীর প্রতিনিধি Direct Action বা প্রত্যক্ষ সংগ্রামের তীব্র বিরোধিতা করেন এবং কনভেনশন থেকে জামায়াতে ইসলামীর সম্পর্কচ্যুতি ঘোষণা করেন। পরের দিনই "ডাইরেক্ট একশানের" নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করা হয় এবং করাচী শহরে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। কিন্তু পাঞ্জাবে এ এক ভয়াবহ আকার ধারণ করে।

পাঞ্জাবে যে গোলযোগ হয়েছিল সরকারী ভাষায় যাকে Punjab Disturbances বলা হয়, এর পেছনে পশ্চিম পাঞ্জাব সরকারের উস্কানি ছিল বলে মনে করা হয়। গোলযোগের মূল কারণ এই ছিল যে, জনসাধারণের কিছু ন্যায্য দাবি নস্যাৎ করা হয়েছিল। সর্বদলীয় কনভেনশনে পাকিস্তানের সমস্ত রাজনৈতিক ও ধর্মীয় দলগুলিই শামিল ছিল, যথা– মুসলিম লীগ, জামায়াতে ইসলামী, মজলিশে আহ্‌রার, জমিয়তে উলামায়ে পাকিস্তান, জমিয়তে আহ্‌লে হাদীস, আঞ্জুমানে তাহাফ্‌ফুযে হুকুকে শিয়া প্রভৃতি। এসব দলের সম্মিলিত দাবি ছিল যে, কাদিয়ানীদেরকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বলে ঘোষণা করা হোক। এ ধরনের ছোট খাটো আরও দু'-একটি দাবি। এ ছিল পাকিস্তানের জনগণের দাবি। কারণ উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলো পাকিস্তানের সকল শ্রেণীর মুসলমানেরই প্রতিনিধিত্ব করছিল। সরকার এ দাবি মেনে নিতে অস্বীকার করায় Direct action বা প্রত্যক্ষ সংগ্রাম করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

উপরে বলা হয়েছে, পাঞ্জাব ব্যতীত অন্য কোথাও এ প্রত্যক্ষ সংগ্রাম কার্যকর হয়নি। পাঞ্জাবেও সম্ভবত হতো না। কিন্তু পাঞ্জাব সরকার এখানে মারাত্মক ভুল করেছেন বলে মনে করা হয়। পাঞ্জাবে দৌলতানা মন্ত্রিসভা কায়েম ছিল। মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠানের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম– এ যেন দৌলতানা মন্ত্রিসভার মানসিক ভারসাম্য বিনষ্ট করলো। অতএব কালো ছায়া দেখেই ভূতের ভয়ে আঁতকে ওঠা শুরু করলো। ৪ঠা মার্চ থেকে ৬ই মার্চ

পর্যন্ত এ গোলযোগ চলছিল। প্রথম দিন থেকেই জনসাধারণের উপরে পুলিশ নির্মমভাবে লাঠিচার্জ ও গুলী বর্ষণ শুরু করে। ৪ঠা মার্চ অপরাহ্নে জনৈক ছদ্মবেশী পুলিশ এক জনসভায় হাযির হয়ে জানালো যে, পুলিশ অমুক স্থানে জনতার উপর লাঠিচালনা করেছে এবং জনৈক ব্যক্তির গলায় বাঁধা কোরআন শরীফ লাথি মেরে ছিন্নভিন্ন করে ছড়িয়ে দিয়েছে। অতঃপর সে কোরআনের কিছু ছিন্ন পাতা জনতাকে দেখিয়ে দিল। এর ফলে জনতা অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো। সাধারণ মানুষ, শ্রমিক-মজুর, ছাত্র-শিক্ষক এমনকি সরকারী দফতরের কর্মচারীবৃন্দও সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র বিক্ষোভ প্রকাশ করলো। এভাবে সরকারের বিরুদ্ধে জনসাধারণকে প্রবলভাবে উত্তেজিত করে তোলা হচ্ছিল।

অপর একটি ঘটনা এ জ্বলন্ত আগুনে জ্বালানী কাঠ সংযোগ করল। ঐ একই দিনে একখানা জীপ গাড়ী থেকে জনসাধারণের উপরে অবিরল গুলী বর্ষণ করা হচ্ছিল। অনুসন্ধানে জানতে পারা গেল, জীপ গাড়ীতে কয়েকজন কাদিয়ানী আরোহণ করেছিল।

এভাবে সরকারের বিরুদ্ধে এক প্রচণ্ড দাবানল প্রজ্জ্বলিত হয়। কিন্তু বেশীদিন এ গোলযোগ চলতে পারেনি। ৬ই মার্চ লাহোরে সামরিক আইন জারি করা হয় এবং কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই গোলযোগ সম্পূর্ণ থেমে যায়।

৪ঠা এবং ৫ই মার্চ মাওলানা মওদূদীর সভাপতিত্বে জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার অধিবেশনে "প্রত্যক্ষ সংগ্রামের" তীব্র নিন্দা করা হয় এবং এর ভয়াবহ পরিণাম বিশ্লেষণ করে জনসাধারণকে এ থেকে দূরে থাকার আহ্বান জানানো হয়। এ সময়ে মাওলানা মওদূদীর 'কাদিয়ানী সমস্যা' নামক একখানা পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। এ বইখানিতে তিনি মুসলমানদের ও কাদিয়ানীদের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য বিশ্লেষণ করে সমস্যার শান্তিপূর্ণ ও সুষ্ঠু সমাধান পেশ করেন।

মাওলানা মওদূদীর প্রতি মৃত্যুদণ্ডাদেশ

আটাশে মার্চ হঠাৎ সামরিক আইন কর্তৃপক্ষ মাওলানা মওদূদী এবং জামায়াতের অন্যান্য নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করেন। গ্রেফতারের কোন কারণ বলা হলো না।

"কাদিয়ানী সমস্যা" পুস্তিকার মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে বিদ্বেষ প্রচার এবং সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার অভিযোগে মাওলানা মওদূদীর এবং তাঁর সহকর্মী মালিক নসরুল্লাহ খান আজিজ ও জনাব নকী আলীকে সামরিক আদালতে অভিযুক্ত করা হয়। উক্ত অভিযোগেই মাওলানা মওদূদীর প্রতি ৮ই মে সামরিক আদালত কর্তৃক ফাঁসীর আদেশ দেওয়া হয়।

এখানে একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য যে, যে পুস্তিকা প্রণয়নের জন্যে গ্রন্থকারের প্রতি মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেয় হলো, সে গ্রন্থখানি বাজেয়াফ্ত করার সাহস কর্তৃপক্ষের হলো না। সামরিক আদালতে বিচার চলাকালে লাহোর শহরেই উক্ত পুস্তিকা শত শত সংখ্যায় বিক্রি হচ্ছিল। পুস্তিকাটির কোথাও এমন কোন বিষয় ছিল না যা আইনের চোখে দূষণীয় হতে পারে। বরঞ্চ 'কাদিয়ানী সমস্যা' গ্রন্থখানিতে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের নিন্দা করা হয়েছে। কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতার গোলামগণ এবং ইসলাম ও ইসলামী আইনের দুশমনগণ ছলে-বলে কৌশলে ইসলামী আন্দোলনের মৃত্যুঞ্জয়ী বীর সেনানীকে ধরাপৃষ্ঠ থেকে অপসারণের ষড়যন্ত্রে মেতে উঠলেন। মৃত্যুদণ্ডাদেশ প্রকাশিত হওয়ার পর পাকিস্তান এবং বহির্জগত থেকে সরকারের এহেন হঠকারিতা ও অপরিণামদর্শিতার তীব্র নিন্দা করে মৃত্যুদণ্ডাদেশ প্রত্যাহারের দাবি উত্থিত হয়। পৃথিবীর সমুদয় মুসলিম দেশে এমন বিক্ষোভের সৃষ্টি হয় যে, সামরিক আইনের প্রধান কর্মকর্তা মৃত্যুদণ্ডাদেশ বাতিল করে মাওলানাকে চৌদ্দ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

ফাঁসীর আদেশে মাওলানা মওদূদীর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, সমগ্র মুসলিম জগতে তাঁর জনপ্রিয়তা এবং আল্লাহরই জন্যে জান কোরবানের যে মহান মহিমাময় নিদর্শন পাওয়া গেছে, তা ইসলামের ইতিহাসে অক্ষয় কীর্তি হয়ে থাকবে। তাঁর প্রতি ফাঁসীর আদেশ, অতঃপর যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে জামায়াতে ইসলামীকে ভগ্নোৎসাহ না করে বরঞ্চ তার কর্মীবৃন্দকে শত গুণে জিহাদী

অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করেছে। প্রতিষ্ঠানের অগ্রগতি বহুগুণে বর্ধিত করেছে। ইতিহাসের এ শিক্ষা যে, আবহমান কাল থেকে সকল কালে, সকল যুগেই ইসলামী আন্দোলন বিরোধী শক্তির ধাক্কা খেয়ে সম্মুখে অগ্রসর হয়েছে। তার দুর্বার অনমনীয় শক্তির সম্মুখে যারাই প্রতিরোধ গড়ে তুলবার চেষ্টা করেছে, তারাই ভেসে গেছে এর প্রবল স্রোতে, মুছে গেছে ধরাপৃষ্ঠ থেকে তাদের নাম ও নিশানা।

এ প্রসঙ্গে এ কথা উল্লেখ না করে পারা যায় না যে, এক শ্রেণীর ইসলাম ও ইসলামী শাসনতন্ত্র বিরোধী লোক মাওলানা মওদূদীর প্রতি এ মিথ্যা অভিযোগ করে থাকেন যে, পাঞ্জাবের কাদিয়ানী দাঙ্গার জন্যে তিনি প্রধানত দায়ী এবং তাঁরই উস্কানিতে তথায় হাজার হাজার লোক নিহত হয়েছে। উপরে যে শাসনতান্ত্রিক আন্দোলনের ধারাবাহিক কার্যক্রম আলোচনা করা হয়েছে, তার মধ্যে কোথাও কণামাত্র অসত্য অথবা অতিরঞ্জনের লেশ নেই। এ আমরা গর্ব করে বলতে পারি। উপরির্উক্ত আলোচনা থেকে এ কথা প্রমাণিত হয় না যে, মাওলানা মওদূদী পাঞ্জাবের দাঙ্গার জন্যে দায়ী ছিলেন। স্বার্থবাদী লোকেরা একে 'কাদিয়ানী দাঙ্গা' আখ্যা দিয়েছে এবং প্রথম কথা এই যে, এটা মোটেই 'কাদিয়ানী দাঙ্গা' ছিল না এবং এতে হাজার হাজার লোকও নিহত হয়নি। কাদিয়ানীদের অমুসলিম সংখ্যালঘু হিসাবে ঘোষণা করার জন্যে সর্বদলীয় কনভেনশন সরকারের নিকট দাবি জানান। সরকার এ দাবি মেনে নিতে অস্বীকার করলে উক্ত কনভেনশন সরকারের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম (Direct Action) অবলম্বন করে। এটা ছিল প্রকৃতপক্ষে সরকার এবং জনসাধারণের মধ্যে সংগ্রাম। একে দমন করার জন্যে সামরিক আইন জারি করা হয় এবং সামরিক বাহিনীর গুলীতে ১১ জন নিহত ও ৪৯ জন আহত হয়। (মুনির রিপোর্ট– পৃঃ ১ দ্রষ্টব্য)।

মাওলানা মওদূদী এবং জামায়াতে ইসলামী এ সংগ্রামে অংশগ্রহণ করা তো দূরের কথা বরঞ্চ সর্বদলীয় কনভেনশনের "প্রত্যক্ষ সংগ্রামের"ও বিরোধিতা করেছে এবং জনসাধারণকেও তা থেকে বিরত থাকার জন্যে আবেদন জানিয়েছে। তাঁর প্রতি উক্ত অভিযোগ যে সম্পূর্ণ বিদ্বেষপ্রসূত, অমূলক ও ভিত্তিহীন, তা যে কোন বিবেকসম্পন্ন নিরপেক্ষ ব্যক্তি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করবেন।

মুনির রিপোর্টের কোথাও এ গোলযোগের জন্যে মাওলানাকে দায়ী করা হয়নি। এর জন্যে প্রধান দায়ী অধুনালুপ্ত আহ্‌রার দলের নেতৃবৃন্দ এবং অন্যান্য

দলকেও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দায়ী করা হয়েছে। মজার ব্যাপার এই যে, দেশের এক শ্রেণীর সুবিধাবাদী আদর্শহীন রাজনৈতিক দল আহ্‌রার দল প্রধানদেরকে নিয়ে নিজেদের দল গঠন করে আপন অপকর্ম ঢাকবার জন্যে মাওলানা মওদূদীকে পাঞ্জাব হাঙ্গামার জন্যে দায়ী করে।

আরও মজার ব্যাপার এই যে, সরকারী ভাষায় পাঞ্জাবের গোলযোগ (Punjab Disturbance) সংগঠিত হয়েছিল ১৯৫৩ সালে। এটা ছিল সরকার ও জনগণের মধ্যে সংগ্রাম। এ গোলযোগের সাথে জামায়াতে ইসলামী তথা মাওলানা মওদূদীর দূরতম সম্পর্কও ছিল না।

অপরদিকে যে 'কাদিয়ানী সমস্যা' বই লেখার অপরাধে মাওলানার মৃত্যুদণ্ডাদেশ হয়, পাঞ্জাব গোলযোগের সাথে সে বইয়েরও কোন সম্পর্ক নেই। ইসলামের হঠকারী ও অন্ধ দুশমনেরা এখানেই মারাত্মক ভুল করেছে। যে বইয়ের জন্যে প্রাণদণ্ডাদেশ হলো, সে বই বাজেয়াফ্‌ত হলো না, কোনদিন হয়নি, এখনো সে বই বাজারে পাওয়া যায়। সে বইয়ের মধ্যে এমন একটি ছত্রও নেই যার জন্যে লেখকের কোন ন্যূনতম শাস্তিও হতে পারে। কিন্তু বিনা দোষে হলেও ইসলামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রবক্তাকে রাতারাতি শেষ করতে হবে। অতএব একটা কারণ তো দেখাতেই হবে। কাদিয়ানী সমস্যা নামটিতেই ইসলামের দুশমনরা মনে করেছিল এটা একটা মারাত্মক গ্রন্থ। বইখানা পাঠ না করেই তাদের সম্ভবত এ ধারণা জন্মেছিল যে, বইখানিতে কাদিয়ানী নিধনের উস্কানি দেওয়া হয়েছে। বইখানা পড়ে দেখারও তাদের সময় ছিল না। এমনকি যে বইয়ের জন্যে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হচ্ছে, তা বাজেয়াফ্‌ত করারও চিন্তা মনের মধ্যে আসেনি।

তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের সর্বোচ্চ ক্ষমতায় আসীন কতিপয় ব্যক্তি তাদের মনের ব্যাধি গোপন করে ইসলামী আন্দোলনের মূলোৎপাটন করতে চেয়েছিল। তা পারেনি, তাদের গোপন মানসিকতা প্রকাশ হয়ে পড়ে। ইসলামী আন্দোলন মরেনি, মাওলানা মওদূদীও মরেনি। কিন্তু প্রতিপক্ষের অপমৃত্যু ঘটেছে। তাদের অপমৃত্যু আমাদের কাছে আনন্দের নয়। তবে এটাই ইতিহাসের নির্মম বিচার।

পরম পরিতাপের বিষয় এই যে, পাঞ্জাব দাঙ্গার পঁচিশ বছর পরও কিছু লোক মাওলানাকে শত শত কাদিয়ানীর হন্তা বলে গালি দিয়ে থাকে। তৎকালীন পাকিস্তানী শাসকদের চেয়ে এরা অধিকতর মারাত্মক মানসিক ব্যাধিতে ভুগছে,

তাতে সন্দেহ নেই। এদের জন্যে করুণা হয়। তাই তাদের এ মানসিক ব্যাধি নিরাময়ের জন্যে দোয়া করি।

সুবিচার এবং ন্যায়-নীতির এ এক নির্মম পরিহাস যে, যিনি বা যারা পাঞ্জাব হাঙ্গামার জন্যে প্রত্যক্ষ দায়ী, তাদের কারো প্রতি মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেয়া হয়নি। মাওলানা মওদূদীর একমাত্র দোষ এই যে, তিনি পাকিস্তানে ইসলামী শাসনতন্ত্রের দাবি উত্থাপন করেছিলেন। বলা বাহুল্য, তাকে ধরাপৃষ্ঠ থেকে রাতারাতি অপসারিত করে ইসলামী আন্দোলন বানচাল করাই ছিল স্বার্থবাদীদের মনের একান্ত বাসনা। কিন্তু আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর প্রিয়জন ও দলকে যে এভাবেই বিজয়মণ্ডিত করেন, তা সম্ভবত ইসলাম বিরোধীদের জানা ছিল না।

رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ط أُولٰئِكَ حِزْبُ اللّٰهِ اَلَآ اِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ.

"আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারা (বিপদে-আপদে, অত্যাচার ও উৎপীড়নে) আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট আছেন। তারাই আল্লাহর দলভুক্ত। অতএব সাবধান, মনে রেখো, নিশ্চয়ই আল্লাহর দল জয়যুক্ত হবে। মুজাদালা (২২)

ফাঁসী কক্ষে মাওলানা মওদূদী

মর্দে মুমিন যখন দীন-দুনিয়ার বাদশাহ আল্লাহর দরবারে নতশির, ইবাদতে মশগুল, তখন তাঁকে জানানো হলো মৃত্যুর পরওয়ানা। মৃত্যুদণ্ডাদেশে আল্লাহর পিয়ারা বান্দার চোখে-মুখে নেই কোন ভীতির চিহ্ন, নেই কোন উদ্বেগ। অম্লান বদনে হাসিমুখে ফাঁসীর আদেশ মেনে নিলেন ধন্যবাদের সাথে।

জনৈক প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ পাঠকদের সামনে তুলে ধরতে চাই। 'কাদিয়ানী সমস্যা' পুস্তকখানার প্রকাশক ও মুদ্রাকর জনাব সাইয়েদ নকী আলী বলেন–

"আটই মে দেওয়ানী ঘরের প্রাচীন টেনিসকোর্টে আমরা মাগরিবের নামায পড়ছিলাম। মাওলানা ছিলেন ইমাম। মুক্তাদীদের মধ্যে জেলের নম্বরদার এবং বাবুর্চি ব্যতিরেকে আমরা ছিলাম পাঁচজন– মিঞা তোফাইল মুহাম্মদ, মাওলানা আমীন আহসান ইসলাহী, মালিক নসরুল্লাহ খান আজিজ, চৌধুরী মুহাম্মদ আকবর এবং আমি। আমরা যখন দ্বিতীয় রাকআতে, তখন হঠাৎ দরজা খুলে গেল এবং তারপর শোনা গেল কয়েকজনের পদধ্বনি। কিছু ফিসফাস এবং প্রত্যাবর্তনের শব্দ।

সুন্নাতের সালাম ফিরাতে না ফিরাতে আবার শোনা গেল খটাখট। কয়েকজন সৈনিক এবং জেলখানার কর্মচারীকে ভিতরে আসতে দেখা গেল। একজন বললেন, মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী কে?

মাওলানা শান্তকণ্ঠে বললেন– এই যে আমি, বলুন।

সরকারী কর্মচারী– তাসনীম সংবাদপত্রে দু'টি বিবৃতি প্রকাশের জন্যে আপনার সাত বছর সশ্রম কারাবাস এবং মালিক নসরুল্লাহ খান আজিজের তিন বছর। উভয়ে প্রত্যুত্তরে, "আচ্ছা ঠিক আছে" বলে নীরব রইলেন।

কর্মচারী পুনরায় বললেন– 'কাদিয়ানী সমস্যা' পুস্তক প্রণয়নের জন্যে মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর মৃত্যুদণ্ড এবং তার মুদ্রাকর সাইয়েদ নকী আলীর নয় বছর সশ্রম কারাদণ্ড।

আমরা উভয়ে "আচ্ছা ধন্যবাদ" বলে চুপ করে রইলাম।

মাওলানার মৃত্যুদণ্ড ছিল একবারে অপ্রত্যাশিত। তবু কারও মুখে ছিল না কোন উদ্বেগ। তবে মন চিন্তা-ভাবনায় ভরে গেল। আমরা সকলে তাকালাম মাওলানার দিকে। দেখলাম তাঁর ধীর প্রশান্ত মূর্তি। দৃষ্টিতে বিরাট গভীরতা যেন গহীন সমুদ্রের অসীম গভীরতা।

কর্মচারী মাওলানার হাতে একটুকরো কাগজ দিয়ে বললেন–

মাওলানা, আপনি ইচ্ছা করলে এক সপ্তাহের মধ্যে প্রাণভিক্ষা চাইতে পারেন।

মাওলানা নীরবে মৃদু হাস্য সহকারে কাগজটুকু হাতে নিলেন।

কর্মচারী বিদায়ের সময় বলে গেলেন–

– মাওলানা প্রস্তুত হোন আপনাকে একটু পরেই যেতে হবে।

– কোথায়?

– ফাঁসীর কুঠুরিতে।

– আমি তৈরি আছি।

অতঃপর আমরা নীরবে দেওয়ানী ঘরের কামরার দিকে চললাম । যেতে যেতে কর্মচারীকে বলতে শোনা গেল–

মালিক নসরুল্লাহ খান আজিজ এবং সাইয়েদ নকী আলী আপনাদেরও যেতে হবে। কিন্তু, আচ্ছা, ঠিক আছে। আপনাদের কাল সকালে নিয়ে যাব।

আমি এবং মালিক সাহেব যেন শুনেও শুনলাম না। কারণ মাওলানার মৃত্যুদণ্ডের সংবাদ আমাদের এত শোকাভিভূত করেছিল যে, অন্য কোন দিকেই আমাদের লক্ষ্য ছিল না।

দুনিয়ার রঙ্গমঞ্চে সত্যপথের পথিকদের কতই না লাঞ্ছনা, কতই না নির্যাতন নিপীড়ন। আমরা সকলে দ্বীনে হকের নগণ্য খাদেম, সত্যপথের সংগ্রামী পুরুষদের সমপাংক্তেয় হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছিলাম। অপরাধ? কাদিয়ানী সমস্যা বই প্রকাশের অপরাধ? এ তো শুধু দুনিয়াকে প্রতারণা করার জন্যে বলা হচ্ছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমাদের অপরাধ হচ্ছে এই যে, আমরা পাকিস্তানে জাতি ও সরকারের যুক্ত শক্তিকে ইসলামের জন্যে ব্যবহার করতে চাই। আল্লাহর দ্বীন কায়েম করাই আমরা আমাদের জীবনের লক্ষ্য করে নিয়েছি। শুধুমাত্র এই ছিল আমাদের অপরাধ।

হ্যাঁ, যা বলছিলাম। মাওলানাকে সত্যি সত্যিই ফাঁসীকক্ষে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। এমন মনীষী যিনি শুধু পাক ভারতেই নন, সমগ্র আরব জগতেও বিরাট শ্রদ্ধার পাত্র আজ ফাঁসীকক্ষে? আমি ভাবছিলাম, একি সত্যি?

ইসলামী আন্দোলনের বীর মুজাহিদকে আজ ফাঁসী কাষ্ঠে ঝুলান হবে? জাতির মূঢ় পরিচালকগণ, যারা তাদের নির্বুদ্ধিতার কারণে পাকিস্তানে ইসলামের জয়জয়কার দেখতে চায় না– আজ এই পদক্ষেপ করতে চলেছে?

সত্যিই কি ইসলামী আন্দোলন তার শৈশবেই এই মহান ব্যক্তিত্ব থেকে বঞ্চিত হবে?

মাওলানার ধীর গম্ভীর স্পষ্ট উক্তি আমার কর্ণকুহরে ঝংকৃত হতে লাগল– আপনারা মনে রাখবেন যে, আমি কোন অপরাধ করিনি। আমি তাদের কাছে কিছুতেই প্রাণ ভিক্ষা চাইব না। এমন কি আমার পক্ষ থেকে অন্য কেউ যেন প্রাণ ভিক্ষা না চায়– না আমার মা, না আমার ভাই, না আমার স্ত্রী-পুত্র পরিজন। জামায়াতের লোকদের কাছেও আমার এই নিবেদন।

মিঞা তোফাইল মুহাম্মদ সাহেব মাওলানার হোল্ড অল খুলে বিছিয়ে দিলেন। আমরা সকলে মিলে তার মধ্যে জিনিসপত্র ভরতে লাগলাম। চামড়ার সুটকেসটা মাওলানা এবং আমি সাজিয়ে ফেললাম। কারণ এসবই মাওলানার বাড়ীতে ফেরত পাঠাতে হবে।

এদিকে একটা ছোট্ট বিছানা মাওলানার সঙ্গে ফাঁসীকক্ষে পাঠাবার জন্যে তৈরি করা হলো। একটা কাপড়ে বাঁধা খানা, কোরআন মজীদ এবং লোটা-গ্লাসও এসবের সঙ্গে দেয়া হলো।

আমার মুখে কথা ছিল না। হৃদয় কাঁপছিল। হাত-পা আড়ষ্ট হয়ে আসছিল। মাওলানার মৃত্যুদণ্ডের ধারণা যেন ইলেকট্রিসিটির মতো শরীরের অণু-পরমাণুতে পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়ছিল। তোফাইল সাহেবের অবস্থাও ছিল ঠিক এমনি। মালিক নসরুল্লাহ খান আজিজ তাঁর ভাব-গম্ভীর মূর্তি নিয়ে পায়চারী করছিলেন এবং তাঁর মুখ দিয়ে অস্ফুটস্বরে দোয়াও বেরুচ্ছিল। আমাদের সবার বয়োজ্যেষ্ঠ চৌধুরী মুহাম্মদ আকবর সাহেবের অবস্থা ছিল আজিব। তিনি শুধু দাঁড়িয়েছিলেন নির্বাক নিস্তব্ধ হয়ে। ইসলাহী সাহেব কখনও পায়চারী করছেন, কখনও থমকে দাঁড়িয়ে পড়ছেন। তাঁর দমিত আবেগ-উচ্ছ্বাস রক্তবর্ণ ধারণ করে মুখমণ্ডলে পরিস্ফুট হয়ে পড়ছিল।

বিছানাপত্র বাঁধতে বাঁধতে মনকে শক্ত করে একবার বলে ফেললাম–

– মাওলানা, প্রাণভিক্ষা না করার সিদ্ধান্ত তো আপনার নিজস্ব। এ সিদ্ধান্ত জামায়াতকে মেনে নিতে হবে তার কোন মানে নেই। জামায়াতের লোক বাইরের অবস্থা বিবেচনা করে যা সিদ্ধান্ত করবে তা আপনাকে মানতেই হবে।

মাওলানা তাঁর স্বভাবসিদ্ধ কণ্ঠে বললেন–

আমি জামায়াতের দৃষ্টিতেও আমার এ সিদ্ধান্ত সঠিক মনে করি। আমার এ সিদ্ধান্ত জামায়াতের নেতৃবৃন্দকে জানিয়ে দেয়া আপনাদের কর্তব্য।

এর মধ্যে জেল কর্মচারী এসে পড়ল। আমাদের অবস্থা ছিল অত্যন্ত শান্ত, যেমন ঝড়ের প্রাক্কালে সমুদ্র থাকে শান্ত-শিষ্ট।

কিন্তু মাওলানা? ইসলামী আন্দোলন ও সত্য পথের বীর সেনানী, যাঁকে শাহাদতের মর্যাদা দানের ঘোষণা করা হয়েছে, সেই মাওলানা একেবারে শান্ত, ধীর-স্থির, অবিচল।

মাওলানা আমাদের সকলের সাথে বুক ভরে কোলাকুলি করলেন। তা ছিল এমন আন্তরিক যে, চিরদিন মনে থাকবে।

জিনিসপত্র কিছুটা আমরা নিলাম এবং কিছুটা জেলের নম্বরদার। কামরা থেকে বেরিয়ে দেওয়ানী ঘরের দরজা পর্যন্ত গিয়ে মাওলানাকে বিদায় দিলাম। এবার বুকের মধ্যে জমাট বাঁধা তুফান আত্মপ্রকাশ করল। মিঞা তোফাইল সাহেব এবং আমি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলাম এবং আমি ফিরে এসে জায়নামাযে সিজদায় পড়ে গেলাম।

ইসলাহী সাহেব, মালিক সাহেব এবং চৌধুরী সাহেব আগে থেকেই সিজদায় পড়েছিলেন।

আমরা সকলে কেঁদে কেঁদে আল্লাহর দরবারে দোয়া করতে লাগলাম। কান্নার বেগ অপ্রতিহত, অশ্রু জোয়ার উদ্দাম, অফুরন্ত।

এভাবে কতক্ষণ কাটালাম জানি না। হঠাৎ নম্বরদারের কঠোর পদধ্বনি তার দিকে আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করল। দেখি, মাওলানার কাপড়, খাবার, বাসন, জুতা প্রভৃতি ফেরত এনেছে। কোরআন শরীফখানাও ফেরত এনেছে। কারণ ফাঁসীর কুঠুরিতে কোরআন শরীফ রাখার কোন স্থান নেই।

মাওলানা ইসলাহী সাহেব মাওলানার কাপড় আমার হাত থেকে নিয়ে বার বার চুমো দিতে লাগলেন, চোখে ও বুকে তার মধুর স্পর্শ উপভোগ করতে

লাগলেন। কারণ এ কাপড় ছিল আল্লাহর পথে মুজাহিদের, যিনি ছিলেন ফাঁসীকক্ষে আবদ্ধ, শাহাদাতের অমৃতপানের প্রতীক্ষায়।

মিঞা তোফাইল সাহেব মাওলানা ইসলাহীর হাত থেকে সে কাপড় নিয়ে মুখে-চোখে-বুকে লাগাতে থাকলেন। আমাদের সকলেরই অশ্রুজলে সে কাপড় সিক্ত হয়ে পড়ল।

তাঁর জন্যে আমাদের এই যে প্রাণঢালা ভালবাসা তা কিসের জন্যে ?

– তিনি কি আমাদের কোন আত্মীয় ছিলেন?

– তাঁর সাথে আমাদের কি কোন বংশীয় সম্পর্ক ছিল?

– এ প্রেম ভালোবাসা কি এক বর্ণ-গোত্র হওয়ার কারণে?

– এ কি ছিল একই দেশের অধিবাসী হওয়ার জন্যে?

– না, না, শুধু এই কারণে যে, তিনি আল্লাহর পথে প্রাণ বিসর্জন দিতে চলেছেন। শুধু ইসলামের সম্পর্কই আমাদের ভালবাসাকে করেছিল এতখানি ঐতিহাসিক ও নিঃস্বার্থ।

মাওলানার সীমাহীন খোদাপ্রেম এবং খোদার পথে প্রাণ উৎসর্গ করার আকুল আগ্রহ জগতকে করল স্তম্ভিত। জেলখানার কর্মচারীদেরকেও করল বিস্ময়-বিমুগ্ধ এবং রেখে গেল ইসলামের ইতিহাসে এক পরম উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

ফাঁসীকক্ষে মাওলানাকে পরতে দেয়া হলো ইজারবন্দবিহীন পায়জামা। মাওলানা নম্বরদারকে জিজ্ঞেস করলেন–

"ভাই, ইজারবন্দ দিতে ভুলে গেছ।"

নম্বরদার বললে–

"মাওলানা, ফাঁসীর আসামীকে ইজারবন্দ দেয়া হয় না। কারণ যদি সে তাই দিয়ে আত্মহত্যা করে বসে?"

মাওলানা মৃদু হাস্য সহকারে বলেন–

"আরে যে প্রাণভরে শাহাদাতের জাম পান করতে যাচ্ছে, সে কি এমনই নির্বোধ যে, আত্মহত্যা করে জাহান্নামে যাবে?"

ফাঁসীকক্ষে মাওলানার কোন উদ্বেগ নেই। প্রাণনাশের জন্যে কোন চিন্তা-ভাবনা নেই। মুখে-চোখে কালিমার কোন চিহ্ন নেই। কোরআন শরীফের পরিবর্তে সাইয়েদ আহমদ শহীদের (রঃ) জীবনী পড়তে পড়তে অতি স্বাভাবিক

পরম সুখে নিদ্রা গেলেন। স্বাভাবিক অবস্থায় তাঁর আপন গৃহের নিদ্রা আর ফাঁসীকক্ষের নিদ্রায় কোন পার্থক্য সূচিত হলো না।

মাওলানার এ সময়ের আর একটি অমূল্য বাণী এই যে, তাঁর আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও অগণিত ভক্ত-অনুরক্ত ফাঁসীর আদেশে অধীর হয়ে পড়লে তিনি সান্ত্বনা দিয়ে বললেন–

"জীবন-মৃত্যুর ফয়সালা আসমানে হয়, যমীনে হয় না।"

কি দৃঢ় প্রত্যয়! কি অটুট মনোবল!

ফাঁসীকক্ষে মাওলানার অবস্থা মাওলানার মুখে শুনুন। মাওলানাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন–

দেওয়ানী ঘরের পরিবেষ্টনীর মধ্যে যখন আমাকে ফাঁসীর আদেশ শুনান হলো এবং সাথে সাথে এক সপ্তাহের মধ্যে প্রাণভিক্ষার অধিকারও দেয়া হলো, তখন আমার মনের মধ্যে তিন প্রকার ধারণার উদয় হলো।

প্রথমটি এই যে, জালিমের কাছে করুণাপ্রার্থী হওয়া আমার আত্মমর্যাদার পরিপন্থী।

দ্বিতীয় এই যে, কিসের জন্যে ক্ষমাপ্রার্থী হবো? এজন্যে কি যে, আমাকে কেন জান্নাতে পাঠান হচ্ছে? এটা সত্য কথা যে, সারা জীবন দ্বীনের খেদমত করে অন্যভাবে মৃত্যুবরণ করাতে বেহেশত লাভের ততটা নিশ্চয়তা নেই, যতটা আছে শাহাদাত বরণ করে। অতএব আমি কি একথা বলব যে, আমাকে জান্নাত থেকে মুক্তি দাও?

তৃতীয় কথা এই যে, আমার মতো লোক যদি আজ প্রাণভিক্ষা করে, তাহলে এদেশের সাধারণ লোকের মন থেকে মর্যাদাবোধ মুছে যাবে।

অতএব, আমি আমার বন্ধু-বান্ধবদের একথা কঠোর চাপ দিয়ে বলে দিলাম আমার বাড়ীর কোন লোক, অথবা জামায়াতের কোন লোক আমার পক্ষ থেকে যেন ক্ষমাপ্রার্থী না হয়। নতুবা আমি কোনদিন তাদের ক্ষমা করব না।

যখন আমাকে ফাঁসীর কুঠরিতে নিয়ে যাওয়া হলো, তখন আমাকে আবশ্যকীয় সকল দ্রব্যাদি থেকে বঞ্চিত করা হলো। আমার সবকিছু কেড়ে নেয়া হলো। এমনকি আমার পরিধেয় বস্ত্রও কেড়ে নিয়ে জেলের বস্ত্র দেয়া হলো। ইজারবন্দবিহীন পায়জামা দেয়া হলো। তা দেখে প্রথমত মনে করলাম যে, হয়ত ভুলে ইজারবন্দ দেয়নি। কিন্তু জিজ্ঞাসা করে জানলাম যে, ইজারবন্দ মোটেই দেয়া

হয় না। কারণ কয়েদী নৈরাশ্যে যদি তা দিয়ে আত্মহত্যা করে বসে। বাধ্য হয়ে পায়জামার সামনের দুই মাথা একত্রে কষে পরতে হলো। কিন্তু তা সতর ঢাকার উপযোগী হলো না এবং নামায পড়তে বড়ই অসুবিধা হতে লাগল। কোরআন শরীফ প্রথমত সঙ্গে রাখতে চাইলাম, কিন্তু যখন দেখলাম যে, শোবার মেঝে ছাড়া তা রাখবার কোন স্থান নেই, তখন ফেরত দিলাম। যা হৃদয়ে গাঁথা ছিল তাই সঙ্গে রয়ে গেল।

যা হোক, সবাই চলে যাওয়ার পর এক নম্বরদার (warder) এলো এবং সরকার ও মন্ত্রীদের প্রাণভরে গালাগালি করলো। এরপরে এলো দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ। প্রত্যেকেই সরকারকে অভিসম্পাত করে গেল।

রাতের বেলায় ফাঁসীর কুঠরিতে এত চিৎকার আর্তনাদ শুরু হলো যে রাত দু'টোর আগে ঘুম এলো না। কেউ কোন পীর বুযুর্গের নাম ধরে ডাকছে। কেউ বা কবিতা আওড়াচ্ছে এবং কেউ বিড়বিড় করে বকেই চলেছে– 'মাওলা বাঁচাও, মাওলা বাঁচাও'।

মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা সম্পর্কে মাওলানার কি ধারণা ছিল তা জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন–

আমার এই ধারণা ছিল যে, যদি জনসাধারণের পক্ষ থেকে বিরাট বিক্ষোভ করা না হয়, তাহলে সরকারের যা মনোভাব, তাতে তারা ফাঁসী দিয়েই ফেলবে। যদি তারা এ পদক্ষেপ করার সুযোগ পায়, তাহলে তা হবে অত্যন্ত মারাত্মক। এরপর এদেশে দ্বীনের কাজ বহুদিনের জন্য বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু জনসাধারণ যদি সচেতন হয়ে কাজ করে এবং সরকারকে যদি একবার পিছপা হতে হয়, তাহলে ইনশাআল্লাহ্ তাদেরকে পিছনে হঠতেই হবে এবং ইসলামী আন্দোলনের পথকে রুদ্ধ করা সম্ভব হবে না। এ সময়টা হচ্ছে সারাদেশের জন্য এক বিরাট অগ্নি পরীক্ষার সময়।

দ্বিতীয় দিন শেখ সুলতান আহমদ এবং সফ্দর সাহেব ছেলেদের নিয়ে দেখা করতে এলেন। তারা আবার আমার কাছে ক্ষমা ভিক্ষার কথা বললেন। আমি তাদের শাসিয়ে বললাম, যেন তারা কিছুতেই ক্ষমাপ্রার্থী না হন।

অতঃপর মিঞা মাহমুদ আলী কাসুরী এলেন। তিনিও ক্ষমা প্রার্থনার জন্যে তার নিজের খেদমত পেশ করতে চাইলেন। তাঁকে আমি বললাম যে, একথা কিছুতই আমার মাথায় ঢুকছে না।

মাওলানাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, ফাঁসীর কুঠরিতে বিশেষ ধরনের কষ্ট ছিল কি না। তার উত্তরে মাওলানা বলেন–

একে তো সেই পরিধেয় বস্ত্র ছিল অসঙ্গত ও অপর্যাপ্ত এবং চিৎকার হট্টগোল। দ্বিতীয় অসুবিধা এই ছিল যে, ফাঁসীকক্ষের গঠনটাই সকল মওসুমে কয়েদীদের জন্য কষ্টদায়ক ছিল। আলো-বাতাসহীন সংকীর্ণ কক্ষ। রোদ, বৃষ্টি, শীত, গ্রীষ্ম থেকে আত্মরক্ষার উপায় নেই। তদুপরি ফাঁসীর কুঠরিতে আহার দেয়া হয় সি-ক্লাসের– যা একবারে অখাদ্য।

তৃতীয় দিনে প্রায় বেলা দু'টার সময় একজন দৌড়াতে দৌড়াতে এসে বললেন, 'মাওলানা আপনাকে মুবারকবাদ জানাই, আপনার মৃত্যুদণ্ড মওকুফ হয়েছে।' তারপর এ সংবাদ দিতে দলে দলে লোক আসতে লাগলো। এর কিছু পরে মাওলানা নিয়াজী এবং আমাকে সেখান থেকে বের করে হাসপাতালে পৌঁছে দেয়া হলো।

ফাঁসীর আদেশে দেশ-বিদেশে প্রতিক্রিয়া

উপরে বলা হয়েছে যে, লাহোরের সামরিক আদালত মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীকে প্রথমে মৃত্যুদণ্ড এবং পরে তা প্রত্যাহার করে চৌদ্দ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে। এ দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে শুধু পাকিস্তানেই নয়, সমগ্র মুসলিম জগতে যে তুমুল বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়, তার দৃষ্টান্ত অতীত ইতিহাসের পৃষ্ঠায় খুঁজে পাওয়া যায় না। তাঁর প্রতি এহেন আচরণের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে হরতাল, শোভাযাত্রা, সভা-সমিতি প্রভৃতি শুধু বড় বড় শহর ও রাজধানীতেই সীমাবদ্ধ রইল না, বরঞ্চ দেশের অভ্যন্তরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শহর ও গ্রামাঞ্চলেও বিক্ষোভের অগ্নিশিখা দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো। নিভৃত পল্লী থেকে বড় বড় শহর পর্যন্ত সকল স্থান থেকে অগণিত টেলিগ্রাম, পত্র ও প্রস্তাবাদির মাধ্যমে তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দাধ্বনি মুখরিত হতে লাগলো। এই যে বিশ্বব্যপী বিক্ষোভ, এ কোন সাময়িক উত্তেজনা কিংবা ভাবপ্রবণতার বশে প্রদর্শন করা হয়নি। এ ছিল প্রকৃতপক্ষে মাওলানার প্রতি মুসলিম জগতের স্থায়ী শ্রদ্ধার স্বতস্ফূর্ত অভিব্যক্তি। এটি জল বুদবুদের ন্যায় উচ্ছ্বসিত হয়ে হঠাৎ বিলীন হয়ে যায়নি। এ বিক্ষোভ প্রতিবাদ চলেছে অবিরাম পাঁচ মাস ধরে। যারা অতীতে খেলাফত ও কংগ্রেস আন্দোলনের যুগে নানা প্রকার বিক্ষোভ-প্রতিবাদ লক্ষ্য করেছেন, তারাও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন যে, এ ধরনের বিক্ষোভ, আন্তরিক সমবেদনা, শোক ও কাতর ফরিয়াদ ইতঃপূর্বে কখনও দেখা যায়নি।

লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, সাধারণ লৌকিকতা অথবা লোক দেখানোর জন্যে এ বিক্ষোভ করা হয়নি। নীরব রাত্র ও কর্মব্যস্ত দিবসের প্রতিটি মুহূর্ত সাক্ষ্য দেয় যে, শুধু পুরুষই নয়, পর্দানশীন মহিলাগণও মর্মাহত, শোকার্ত ও বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। নিশীথ রাতে তাদের তাহাজ্জুদের মুসাল্লা চোখের পানিতে সিক্ত হতো। ইসলামী আন্দোলনের এ মৃত্যুঞ্জয়ী বীরসেনানীর মৃত্যুদণ্ড এবং তারপর যাবজ্জীবন কারাদণ্ডকে বিশ্ব মুসলিম এক বিরাট ট্রাজেডী মনে করেছিল। সে জন্যে আরব, মিসর, ইরাক, সিরিয়া, মরক্কো, আলজেরিয়া, ইন্দোনেশিয়া এবং অন্যান্য মুসলিম দেশের নেতৃবৃন্দ এর তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন। সে সব দেশে

সংবাদপত্রগুলির সম্পাদকীয় প্রবন্ধে পাকিস্তান সরকারের আচরণের নিন্দা করে মাওলানার আশু মুক্তি দাবি করা হয়।

পাকিস্তানে নিম্নলিখিত সংবাদপত্রের সম্পাদকগণও এক স্মারকলিপির মাধ্যমে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন ঃ

করাচী ঃ দৈনিক জং, দৈনিক আনজাম, দৈনিক মিল্লাত, টাইমস অব করাচী, দৈনিক ইমরোজ, দৈনিক আল মুস্তাজের, দৈনিক ইকবাল, দৈনিক আসরে জাদীদ, দৈনিক মুসলমান, দৈনিক নয়া রুশ্‌নী, দৈনিক শবনম, দৈনিক ওয়াতন, দৈনিক নয়ী সিন্ধ, আল অহীদ, মাকাসেদ, সাপ্তাহিক জাহানে নও, পাক্ষিক নিমকদান, মাসিক ফারান, মাসিক রিয়াজ, মাসিক মুশীর, মাসিক চেরাগে রাহ, পাক্ষিক স্টুডেন্টস ভয়েস, মাসিক কালীম প্রভৃতি।

ঢাকা ঃ দৈনিক পাস্‌বান, আজাদ, আংগারা, সিতারা, মর্নিং নিউজ, সাপ্তাহিক আল কায়েদ (ইংরেজী), দি মেইল, সাপ্তাহিক সৈনিক ও নিজামে ইসলাম।

লাহোর ঃ দৈনিক পাকিস্তান টাইমস, দৈনিক ইমরোজ, দৈনিক আফাক, দৈনিক নওয়ায়ে ওয়াক্ত, দৈনিক ইহসান, সাপ্তাহিক কেন্দিল, দৈনিক হেলালে পাকিস্তান, দৈনিক সাফিনা, সিভিল এন্ড মিলিটারী গেজেট, দৈনিক আসার, মাসিক খাদেমুল হারামাইন, মাসিক আরেফ, মাসিক আল জামেয়া, মাসিক ইসলামিক লাইফ, মাসিক মুসলিম, মাসিক আদাবী দুনিয়া, সাপ্তাহিক ইক্‌দাম, সাপ্তাহিক কারওয়াঁ।

বাহওয়ালপুর ঃ ইনসাফ, কায়েনাত, ইলহাম, আল্‌ ইমাম, আজম, রাহ্‌বার, পরওয়াজ, দেফা, রফীক, নয়া দাওর, কারওয়াঁ, তাবলীগ, নওয়ায়ে বাহওয়ালপুর।

কোয়েটা ঃ মীযান, পাসবান, নারায়ে হক্‌, মাকাসেদ, হেলাল, খুরশীদ, তর্জুমান, রাহ্‌বারে নেসওয়ান, বান্দুকা শাহীন, টাইমস্‌, মুয়াল্লিম, দুশমন, পুকার, নওয়ায়ে বেলুচিস্তান, নিসওয়ায়ে দুনিয়া, নওয়ায়ে ওয়াতন, পয়গামে জাদীদ, সাদাকাত, কারওয়াঁ, তামীরে বেলুচিস্তান।

এতদ্ব্যতীত বিদেশী পত্রিকাগুলোও তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করে—

আস্‌সিজল-বাগদাদ, ইখওয়াতে ইসলামীয়া বাগদাদ, আদ্দাওয়াত-কায়রো, মেম্বরশ্‌ শর্ক্‌-কায়রো।

ইংল্যান্ডে শিক্ষারত মুসলিম দেশগুলোর ছাত্রবৃন্দ এবং ইংল্যান্ডে প্রবাসী মুসলমানগণ পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জনাব মুহাম্মদ আলীর (বগুড়া) নিকটে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করে মাওলানার প্রতি মৃত্যুদণ্ডাদেশের জন্য পাকিস্তান সরকারকে সাবধান করে দেন এবং মাওলানার আশু মুক্তি দাবি করেন।

ফিলিস্তীনের মুফতীয়ে আযম আলহাজ্জ মুহাম্মদ আমীনুল হুসাইনী, ইখওয়ানুল মুসলিমুনের মুরশিদ শেখ হাসানুল হাযেমী, জামে আযহারের উকিল মুহাম্মদ আবদুল লতিফ দারায এবং জমিয়তে শাববানুল মুসলিমীনের সভাপতি মুহাম্মদ সালেহ্ হেরেব, পাকিস্তানের গভর্ণর জেনারেল ও প্রধানমন্ত্রীর নিকট নিম্নোক্ত মর্মে এক যুক্ত তারবার্তায় বলেন–

"পাকিস্তানের প্রতি ভালবাসা ও সদিচ্ছা পোষণকারী সকল মুসলমান মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর ফাঁসীর আদেশে মর্মাহত হয়েছেন। আশা করি পাকিস্তান সরকার বুদ্ধিমত্তার সাথে কাজ করবেন এবং আমাদের বরেণ্য মওদূদী সাহেবের মৃত্যুদণ্ডাদেশ প্রত্যাহার করবেন।"

ইরানের শিয়া সম্প্রদায়ের মুজতাহেদে আযম হযরতুল ইমাম মুহাম্মদ আল খালেসী এবং ইরাকের আহলে সুন্নাতুল জামায়াতের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা আল্লামা আমযাদ আয্যাহাবী নিম্নোক্ত রাষ্ট্রনায়কগণের নিকট এক যুক্ত তার প্রেরণ করে মাওলানা মওদূদীর মুক্তির জন্য পাকিস্তান সরকারকে চাপ দিতে অনুরোধ করেন ঃ

দ্বিতীয় আমীর ফয়সাল– বাগদাদ, সুলতান ইবনে সউদ– সউদী আরব, আল্লামা আয়াতুল্লাহ কাশানী– ইরান, ডাঃ মুসাদ্দেক, ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী– ইরান, ইরাকের প্রধানমন্ত্রী, মিসরের প্রধানমন্ত্রী জেনারেল নজীব, শায়খুল আযহার হাসানুল হাযিমী এবং ফিলিস্তীনের মুফতীয়ে আযম। পাকিস্তানের গভর্ণর জেনারেল ও প্রধানমন্ত্রীর নিকটেও তারা অনুরূপ তার প্রেরণ করেন।

ইন্দোনেশিয়ার মুযাহিদে আযম আল্লামা ঈসা আনসারী ইন্দোনেশিয়ার ষাটটি ইসলামী দলের পক্ষ থেকে বলেন ঃ

"মাওলানা মওদূদী জগতের আমানতস্বরূপ। পাকিস্তানে তাঁর প্রয়োজন না থাকলে ইসলামী জগতে তাঁর প্রয়োজন আছে। আমরা ইন্দোনেশিয়ার মুসলমান তাঁকে পূর্ণ সমর্থন করি এবং মনে করি যে, আজ মুসলিম জগতে তাঁর চিন্তাধারার প্রয়োজন আছে।"

এতদ্ব্যতীত পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দের মধ্যে যারা প্রতিবাদ জ্ঞাপন করে মাওলানার মুক্তি দাবি করেন, তাঁদের মধ্যে পাকিস্তানের ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী খাজা নাযিমুদ্দীন, মিঃ এম. এইচ. গাযদার, মিঃ হুসাইন ইমাম, মাওলানা জাফর আহমদ উসমানী, পীর গোলাম মুজাদ্দিদ সিরহিন্দী, মাওলানা আকরাম খাঁ, মাওলানা দীন মুহাম্মদ খান, মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী এবং মাওলানা রাগেব আহসানের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মোটকথা, যে ইসলাম বিরোধী শক্তি মাওলানাকে রাতারাতি খতম করে ইসলামী আন্দোলন বানচাল করতে চেয়েছিল, বিক্ষুব্ধ মুসলিম বিশ্বের রক্তচক্ষুর সামনে তা নতি স্বীকার করতে বাধ্য হলো বটে, কিন্তু মাওলানার প্রতি বহুদিনের পুঞ্জীভূত বিদ্বেষকে দমন করতে না পেরে তাঁকে চৌদ্দ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দিয়ে সান্ত্বনা লাভের চেষ্টা করলো।

মাওলানার মুক্তি

মাওলানার বিনাশর্তে মুক্তির জন্যে শুধু পাকিস্তান থেকে নয়, সারা মুসলিম বিশ্ব থেকে জোরদার দাবি উঠেছিল এবং তার বিবরণ পূর্বে দেয়া হয়েছে। সরকার অবশেষে চৌদ্দ বছরের কারাদণ্ড হ্রাস করে সাড়ে তিন বছর করেন। অতঃপর পাকিস্তানে এক আইন বিভ্রাটের ফলে মাওলানা দু'বছর ন'মাস পরে মুক্তিলাভ করেন। আইন বিভ্রাট এই যে, ১৯৫৪ সালের শেষের দিকে পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বগুড়ার মুহাম্মদ আলী মরহুম ঘোষণা করেছিলেন যে, সেই বছরই ২৫শে ডিসেম্বর কায়েদে আযমের জন্মদিনে তিনি জাতিকে একটি ইসলামী শাসনতন্ত্র উপহার দেবেন।

গভর্ণর জেনারেল গোলাম মুহাম্মদ মাওলানা মওদূদীকে ফাঁসীর মঞ্চে ঝুলতে না দেখে বড়ই মর্মপীড়া ভোগ করছিলেন। এদিকে আবার প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ইসলামী শাসনতন্ত্রের ঘোষণা তার কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিল। তাই তিনি অগ্নিশর্মা হয়ে পাকিস্তান গণপরিষদ ভেঙ্গে দিলেন।

এর ফলে দেশে এক শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। গণপরিষদ ভেঙ্গে দেয়ার ফলে যাবতীয় আইন-কানুন বাতিল হয়ে যায়।

এদিকে মাওলানার মুক্তির জন্যে হাইকোর্টে বন্দিত্বের কারণ প্রদর্শন (Habious Corpus) আবেদন করা হয়। কিন্তু কোর্টে শুনানি শুরু হওয়ার পূর্বেই সরকার বিনাশর্তে মাওলানার মুক্তি ঘোষণা করেন।

মাওলানার পূর্ব পাকিস্তান সফর

ফাঁসীর মঞ্চ ও যাবজ্জীবন কারাদণ্ড থেকে মাওলানার মুক্তির পর মুসলিম বিশ্ব খোদার দরগায় শুকরিয়া আদায় করে। পূর্ব পাকিস্তানের লোক মাওলানাকে কোনদিন দেখেনি বলে তারা তাঁর সাক্ষাৎ কামনা করতে লাগল। উপরন্তু মাওলানার পূর্ব পাকিস্তান সফর আশু প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছিল।

এ সময়ে পূর্ব পাকিস্তানে পুনর্বার এক নতুন শাসনতন্ত্র সংকট দেখা দেয়। গভর্ণর জেনারেল কর্তৃক গণপরিষদ ভেঙ্গে দেওয়ার পর সামরিক ও বেসামরিক লোক নিয়ে এক ট্যালেন্টেড (প্রতিভাবান) মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। মরহুম শহীদ সোহরাওয়ার্দী এর আইনমন্ত্রী নিযুক্ত হন। অতঃপর কনভেনশন করে অর্ডিন্যান্সের সাহায্যে একটা অনৈসলামী ও অগণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র জনগণের উপর চাপিয়ে দেয়ার ষড়যন্ত্র হয়। কিন্তু ফেডারেল কোর্টের রায়ে কনভেনশন গঠন নিয়মতন্ত্র বিরোধী ঘোষিত হওয়ার পর গভর্ণর জেনারেল ও ট্যালেন্টেড মন্ত্রীসভা ১৯৫৫ সালের মে মাসে গণপরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে বাধ্য হন। এ নির্বাচনের পর চৌধুরী মুহাম্মদ আলী প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। তাঁর একান্ত আগ্রহ ছিল দেশে একটা ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করার। কিন্তু গণপষিদে আওয়ামী লীগ দলীয় নেতা মরহুম শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রণয়নের পথে চরম বাধা হয়ে দাঁড়ান। এ দেশে ইসলামী শাসনতন্ত্রের পথ বন্ধ করার জন্যে যে খাজা নাজিমুদ্দীন সাহেবের অপসারণ ও শেষ পর্যন্ত গণপরিষদ বাতিল করা হয় তার জন্যে সোহরাওয়ার্দী সাহেবের প্রবল ওকালতি ছিল। অতঃপর ট্যালেন্টেড মন্ত্রীসভার আইনমন্ত্রী থাকাকালীন কনভেনশনের মাধ্যমে একটা গণতন্ত্র বিরোধী ও ধর্মহীন শাসনতন্ত্র জাতির মাথায় চাপিয়ে দেওয়ার আশাও সোহরাওয়ার্দী সাহেবের নির্মূল হয়েছিল। অতএব পুনর্নির্বাচিত গণপরিষদ কর্তৃক যাতে ইসলামী শাসনতন্ত্র তৈরি হতে না পারে তার জন্যে তিনি হিন্দু কংগ্রেসের সদস্যদের নিয়ে এক শক্তিশালী ইসলাম বিরোধী ফ্রন্ট গঠন করেন। তাই তাদের এ অপকৌশল বানচাল করে ইসলামী শাসনতন্ত্রের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্যে গণআন্দোলন জোরদার করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল।

মাওলানা মওদূদী জেল থেকে মুক্তি লাভ করার পর ১৯৫৬ সালের ২৪শে জানুয়ারী প্রথমবার পূর্ব পাকিস্তান সফরে আসেন। তিনি দেড় মাসকাল এখানে অবস্থান করে প্রায় প্রতিটি জেলা শহর ও উল্লেখযোগ্য মহকুমা শহরে গমন করেন। এ উপলক্ষে তিনি কয়েক লক্ষ জনতার সামনে বক্তৃতা করেন, ইসলামের দাওয়াত পেশ করেন, ইসলামী শাসনতন্ত্রের আবশ্যকতা বুঝিয়ে দেন, শত শত প্রশ্নের জবাব দেন এবং শত শত লোককে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎ দান করেন। এভাবে তিনি পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলেও ইসলামী শাসনতন্ত্রের দাবি জোরদার করে তোলেন। উপরন্তু তিনি এ প্রদেশের অভ্যন্তরীণ সকল সমস্যা ও অভাব-অভিযোগ সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করেন।

সফরের শেষ ভাগে ৪ঠা মার্চ ঢাকা জিলা বোর্ড হলে জামায়াতে ইসলামীর এক কর্মী সম্মেলনে মাওলানা মওদূদী বক্তৃতা প্রসঙ্গে প্রধানত পূর্ব পাকিস্তানের যাবতীয় সমস্যা ও অভাব-অভিযোগ এবং তার সমাধানের সুষ্ঠু পথ সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করেন। "পূর্ব পাকিস্তানের সমস্যা ও তার সমাধান" নামে উক্ত বক্তৃতার বাংলা অনুবাদ পুস্তিকার আকারে প্রকাশ করা হয়।

মাওলানা মওদূদী পূর্ব পাকিস্তানীদের কয়েকটি জটিল সমস্যার বিস্তারিত আলোচনা করে তার সমাধানও পেশ করেন। পূর্ব পাকিস্তানীদের গুরুতর অভিযোগগুলোর প্রকৃত কারণ নির্ণয় করে তার উপর আলোকপাত করেন।

পূর্ব পাকিস্তানে মুহাজিরগণ যে ভুল পথে চলেছিল সে সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেন–

"যাঁরা এখানে সরকারী কর্মচারী হিসাবে এসেছেন, তাঁদের একটা বিরাট অংশ বিশেষ কোন প্রশংসনীয় ভূমিকা অর্জন করেননি। ইংরেজদের চেয়ারে বসে তাঁরা নিজেদেরকে ইংরেজ মনে করে নিয়েছেন। অপর জাতির উপর শাসন চালাতে ইংরেজরা যে নীতি অনুসরণ করত, তাঁরাও সেই নীতি অবলম্বন করেছেন। তাঁরা একথা চিন্তা করেননি যে, নিজ দেশের নিজ জাতির শাসন তথা খেদমতের ভারই তারা গ্রহণ করেছেন। ইংরেজদের অনুকরণ করাই যদি তাঁদের লক্ষ্য ছিল, তবে ইংল্যান্ডে প্রচলিত নীতি অনুসরণ করাই তাঁদের কর্তব্য ছিল। বস্তুত যে সব কারণে পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ এ ধারণা পোষণ করতে আরম্ভ করেছে যে, তাদেরকে একটি কলোনীতে পরিণত করা হয়েছে, এই হচ্ছে তার প্রধাণ কারণ।" (পূর্ব পাকিস্তানের সমস্যা ও সমাধান– পৃঃ ৫)

বহিরাগতদের প্রতি মাওলানার হুঁশিয়ারী

বহিরাগত ব্যবসায়ীদের সম্পর্কে তিনি নিম্নোক্ত মন্তব্য করেন ঃ

"বহিরাগত ব্যবসায়ী ও কারখানা মালিকগণ এসে এখানকার শিল্প ও বাণিজ্য সামলে নিয়েছেন সেজন্যে আমরা তাঁদের নিকট কৃতজ্ঞ। কিন্তু তাঁদের উচিত ছিল এ দেশকে নিজেদের দেশ এবং এ জাতিকে নিজেদের জাতি মনে করে অনুন্নত ভাইদের সাহায্য করে উন্নত করবার চেষ্টা করা, শিল্প বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়ার জন্যে তাদের সাহায্য করা, তাদের দুরবস্থা দূর করার নিমিত্ত এখানের উপার্জিত অর্থ এখানেই ব্যয় করা, তাদের মঙ্গল ও উন্নতির জন্যে উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান কায়েম করা এবং তাদের বিপদ-আপদের সময় যথোপযুক্ত সাহায্য করা। বড়ই দুঃখের বিষয়, তাদের মধ্যে অনেকেই এ কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন না।" (উক্ত পুস্তিকা– পৃঃ ৭-৮ দ্রঃ)

ভাষা-সমস্যা

পূর্ব পাকিস্তানের বাংলা ভাষা আন্দোলন ও ভাষা সমস্যা সম্পর্কে মাওলানা যে স্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত করেন। তা নিম্নে দেয়া হলো ঃ

"ভাষা সমস্যাই হলো সর্বপ্রথম গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। প্রকৃতপক্ষে পূর্ব পাকিস্তানে উর্দূ ভাষার বিরুদ্ধে কখনো কোন বিদ্বেষ ভাব ছিল না। বরঞ্চ এর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে এখানকার শিক্ষিত লোকদের মধ্যে একটা বিশেষ আগ্রহ পরিলক্ষিত হতো। এখানকার সাধারণ লোক উর্দূভাষীদেরকে অত্যন্ত সম্মান করত। অদ্যাবধি আরবী ভাষার পরে উর্দূ ভাষার এক প্রকার ধর্মীয় মর্যাদাও রয়েছে। কিন্তু একেই একমাত্র জাতীয় ও রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ করলে এখানকার লোকদের পক্ষে তা বিশেষ অসুবিধার কারণ হয়ে পড়ত। কেননা এখানকার শিক্ষিত লোকেরাও উর্দূ ভাষা জানেন না। ফলে তারা প্রতিক্ষেত্রেই উর্দূভাষী শিক্ষিতদের পশ্চাতে পড়ে থাকবার আশঙ্কা করেছিলেন। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই বাংলাভাষীগণ উর্দূর সাথে বাংলাকেও সরকারী ভাষা করার দাবি জানিয়েছিলেন। পরিস্থিতির তীব্রতা সম্যক উপলব্ধি করে প্রথম দিনেই এ দাবি মেনে নিলে বিচক্ষণতার পরিচয় দেয়া হতো। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে এর সম্পূর্ণ বিপরীত কাজ করা হয়েছে। একদিকে একে দমননীতির সাহায্যে নিষ্পেষিত করার চেষ্টা করা হয়েছে, আর অপরদিকে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বার বার এর বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলা হয়েছে। এ কারণে বাংলার দাবি একটি সমাধানযোগ্য সমস্যা না থেকে একটি মতাদর্শ ও ভাবপ্রবণতার রূপ গ্রহণ করেছে এবং এ তারই স্বাভাবিক পরিণতি। কেননা, একটি দাবির উত্তরে যদি 'দেয়া হবে না' বলা হয়, তবে প্রতি উত্তরে 'আদায় করে ছাড়ব' এ আওয়াজ অবশ্যই তোলা হবে। উক্ত ব্যাপারেও ঠিক এ-ই ঘটেছে।"

সরকারী চাকরি সমস্যা

মাওলানা মওদূদী ঢাকা ডি-বি হলে তাঁর প্রদত্ত ভাষণে সরকারী চাকরির ব্যাপারেও পূর্ব পাকিস্তানের অন্তরের ভাষাই ব্যক্ত করেন।

তিনি বলেন–

"দ্বিতীয় সমস্যা হলো সরকারী চাকরি সম্পর্কিত সমস্যা। এতে সন্দেহ নেই যে, ইংরেজ আমলে মুসলমানগণ চাকরির ক্ষেত্রে অত্যন্ত পশ্চাৎপদ ছিল। উচ্চ পদগুলোতে তাদের আনুপাতিক স্থান শূন্যের কোঠায় ছিল। অবশ্য ইংরেজ ও হিন্দুদের দু'শত বছর যাবত কৃত এ ত্রুটির সহসা সংশোধন করা সহজসাধ্যও ছিল না। কিন্তু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর, পূর্বাঞ্চলের মুসলমানগণ ন্যায়তই এ আশা পোষণ করে আসছিল যে, তাদেরকে উন্নতি লাভের সুযোগ দেয়া হবে। দুঃখের বিষয়, তাদের এ আশা পূর্ণ করা হয়নি। পূর্ব পাকিস্তানের যুবকদের মধ্যে এ সম্বন্ধে যে তিক্ততার সৃষ্টি হয়েছে তা সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত। চাকরিজীবী লোকদের এ মনোবৃত্তি অত্যন্ত দুঃখজনক যে, যেখানেই তাদের প্রভাব আছে সেখানেই তারা নিজের আত্মীয়-স্বজনকে চাকরিতে ভর্তি করবার জন্যে চেষ্টা করে থাকে। অন্ততপক্ষে উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন প্রভাবশালী লোকদের এ অবিচার থেকে মুক্ত থাকার প্রয়োজন ছিল। তাদের কর্তব্য ছিল বাংলাদেশের অবহেলিত ও অনুন্নত মুসলমান ভ্রাতাগণকে উন্নত করার চেষ্টা করা, যাতে তারা দেশের সেবায় সমান অংশগ্রহণ করার সুযোগও লাভ করতে পারত। কিন্তু দুঃখের বিষয় এ ব্যাপারে অত্যন্ত অবহেলা প্রদর্শন করা হয়েছে। এমন কি এ অবহেলার কারণে পূর্ব পাকিস্তানে একটি সাধারণ অভিযোগের সৃষ্টি হয়েছে।" (উক্ত পুস্তিকা– ১৪-১৫ পৃঃ দ্রঃ)

দেশরক্ষা সমস্যা

পূর্ব পাকিস্তানের সর্বাপেক্ষা বেদনাদায়ক সমস্যা নিরাপত্তা সমস্যা। এ সম্পর্কে মাওলানা বলেন–

"এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো সৈন্য বিভাগের চাকরি। এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি বাস্তবিকই আপত্তিজনক। আজ পর্যন্ত এখানে ইংরেজ আমলের এ ধারণাই প্রচলিত রয়েছে যে, সৈন্য বিভাগের জন্যে কেবল 'সামরিক জাতিই' উপযুক্ত। এর পরিণাম এই হয়েছে যে, সৈনিকবৃত্তি একটা বিশেষ এলাকার লোকদের জন্যে একচেটিয়া হয়ে রয়েছে। সামরিক বাজেটের কেবল আর্থিক সাহায্যই নয়, সামরিক শিক্ষার অন্যান্য জরুরী বিষয়সমূহেও কোন উল্লেখযোগ্য অংশই পূর্ব পাকিস্তানীদের দেয়া হচ্ছে না।

জানি না আমাদের ক্ষমতাসীন লোকদের নিকট সিংহল, বার্মা, সিরিয়া, ইন্দোনেশিয়া এবং ফিলিপাইন ইত্যাদি দেশগুলির বাসিন্দাগণ সামরিক জাতি বলে গণ্য হয় কি না। যদি না হয়ে থাকে, তবে হয় তাদের দেশরক্ষার ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত হওয়া উচিত, নতুবা অন্যস্থান থেকে সামরিক লোক আহবান করে সৈন্যবাহিনী গঠন করা উচিত। আর যদি এ দেশগুলি নিজেদের দেশ নিজেরাই রক্ষা করতে সক্ষম হয়, তবে পূর্ব পাকিস্তানের লোকেরা তাদের চেয়ে কোন অংশে নিকৃষ্ট যে, তাদেরকে সৈন্য বাহিনীর চাকরির অযোগ্য বলা হবে? এ ব্যাপারটির গুরুত্ব এখানেই শেষ নয়। বরঞ্চ এ পাকিস্তানের জীবন-মরণ সমস্যা। এ দেশের অর্ধেকেরও বেশী লোকসংখ্যা এমন একটি ক্ষুদ্র এলাকায় বাস করে যার তিনটি দিকই হিন্দুস্তানের আওতার মধ্যে রয়েছে। তার প্রায় চৌদ্দশত মাইলের সীমান্ত রক্ষা করতে হয়। যুদ্ধের সময় একে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে কোন সাহায্য করা সম্ভব হবে বলে মনে হয় না। এখানকার বাসিন্দারা যদি নিজেদের দেশ নিজেরা রক্ষা করতে সক্ষম না হয় এবং এ উদ্দেশ্যে তাদেরকে সর্ববিষয়ে যোগ্য করে তৈরি করা না হয়, তবে কখনও তাদের মনে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা আসবে না। তাদেরকে আপনারা এ বিশ্বাস দিয়ে কখনও নিশ্চিত করতে পারবেন না যে, যুদ্ধের সময় পূর্বাঞ্চলকে পশ্চিমাঞ্চল রক্ষা করবে। কারণ এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে, প্রথমত একবার পূর্বাঞ্চল শত্রু কর্তৃক লাঞ্ছিত হবে, তারপর পশ্চিমাঞ্চল থেকে

আপনারা শত্রুকে বিতাড়িত করার জন্যে চাপ দিবেন। এ একটি ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি ছাড়া কিছুই নয়। এবং এটাই পূর্ব পাকিস্তানের লোকদের মনক্ষুণ্ন হওয়ার প্রধান কারণ।" (উক্ত পুস্তিকা– ১৫-১৬ পৃঃ দ্রঃ)

সামরিক শাসন শেষ হওয়ার পর রাজনৈতিক দল আইনসঙ্গতভাবে কাজ শুরু করার পর রংপুর শহরে জামায়াতে ইসলামীর তিনদিনব্যাপী এক সম্মেলন হয়। ১৯৬২ সালের ১৮ই নভেম্বর এ সম্মেলন উপলক্ষে আয়োজিত জনসভায় মাওলানা বলেন–

"আমি সামরিক শাসনের পূর্বে বহুবার বলেছি এবং আজ আবার বলছি যে, পূর্ব পাকিস্তানকে দেশরক্ষার ব্যাপারে সর্বতোভাবে প্রস্তুত করতে হবে।"

মাওলানার উপরিউক্ত ভাষণে একথাই সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, তিনি পাকিস্তানের প্রতিটি ইঞ্চি ভূখণ্ড ও তার অধিবাসীকে নিজের বলে মনে করেন। প্রাদেশিকতা অথবা ভাষাভিত্তিক সংকীর্ণতা তার অন্তরকে স্পর্শ করতে পারেনি কোনদিন। পরিপূর্ণ ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধ ছাড়াও একটা উদার মানবতাবোধ ছিল মাওলানার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। পাকিস্তানের বিভিন্ন আঞ্চলিক সমস্যার প্রতি তাঁর ছিল সমান দরদ। এজন্যে এর কোনটাকেই তিনি উপেক্ষা করতে পারেননি কোনদিন।

মাওলানার সেদিনের ঢাকা ডি-বি হলের বক্তৃতায় এর সুন্দর অভিব্যক্তি তিনি প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন–

"পাকিস্তান আমার দেহ ও প্রাণের তুল্য। আমার দুই হাতের মধ্যে যেমন আমি পার্থক্য করতে পারি না, তদ্রূপ পাকিস্তানের উভয় অংশের মধ্যেও কোন পার্থক্য করতে পারি না। আমার দুই হাতের মধ্যে যেটিই অসুস্থ হোক তা আমার পুরো শরীরেরই একটা রোগ। এর কারণ অনুসন্ধান করা ও সঠিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা আমার কর্তব্য। আর তা না করার মানে হচ্ছে নিজের সাথে শত্রুতা করা।"

ইসলামী শাসনতন্ত্র গৃহীত হওয়ার পর

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী চৌধুরী মুহাম্মদ আলীর আন্তরিক চেষ্টা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে পাকিস্তানে ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রণীত ও গৃহীত হয়। ১৯৫৬ সালের ২৯শে ফেব্রুয়ারী গণপরিষদ ইসলামী শাসনতন্ত্র পাস করে। ২রা মার্চ গভর্ণর জেনারেল স্বাক্ষর করেন এবং ২৩শে মার্চ থেকে তা কার্যকর করা হয়। বলা বাহুল্য, এ শাসনতন্ত্র গৃহীত হওয়ার সময় মরহুম সোহরাওয়ার্দী সাহেব তাঁর আওয়ামী লীগ দলীয় সদস্য ও কংগ্রেসী সদস্যসহ গণপরিষদ বর্জন করেন। ইসলামী শাসনতন্ত্র গৃহীত হলেও দেশের ইসলাম বিরোধী মহল থেকে নিম্নের কয়েকটি বিষয়ের বিরুদ্ধে এক প্রতিক্রিয়াশীল আন্দোলন মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে।

(১) রাষ্ট্রের ইসলামী প্রজাতন্ত্র নামকরণ,
(২) রাষ্ট্রপ্রধানের মুসলমান হওয়া,
(৩) কোরআন ও সুন্নাহ বিরোধী আইন প্রণয়ন না করা,
(৪) মদ, জুয়া, ব্যভিচার ইত্যাদি বন্ধ করা।

পাকিস্তানের জন্য ইসলামী শাসনতন্ত্র (যদিও ইসলাম ও গণতন্ত্রের দৃষ্টিতে তা একেবারে ত্রুটিহীন ছিল না) গৃহীত হলো বলে কিছু লোকের সমস্ত রাগ গিয়ে পড়লো মাওলানা মওদূদীর উপর। তারপর শুরু হয় মাওলানার বিরুদ্ধে অভিযোগ ও সমালোচনা। তাঁর বিরুদ্ধে সবচেয়ে ভিত্তিহীন ও পরিতাপজনক অভিযোগ এই ছিল যে, তিনি বিনা নির্বাচনে শুরু থেকেই জামায়াতে ইসলামীর আমীরের পদ অধিকার করে আছেন।

মাওলানা যে কোনদিনই নেতৃত্বের অভিলাষী ছিলেন না, একথা প্রমাণ করার জন্যে তিনি সন্তুষ্টচিত্তে আমীরের পদ থেকে ইস্তিফা দান করেন। উপরন্তু তিনি ঘোষণা করেন যে, দীর্ঘদিন কারাবাস যাপনের ফলে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়েছে এবং ভবিষ্যতে নেতৃত্বের জন্যেও কিছু লোক তৈরি হওয়া দরকার। অতএব তাঁর স্থলে অন্য কাউকে আমীর নির্বাচিত করা হোক। তাঁর ইস্তিফা দানের পর চৌধুরী গোলাম মুহাম্মদ সাহেবকে সাময়িকভাবে আমীর নির্বাচিত করে গঠনতন্ত্র অনুযায়ী আমীর নির্বাচনের প্রস্তুতি চলতে থাকে।

এ উদ্দেশ্যে ১৯৫৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে বাহওয়ালপুর দেশীয় রাজ্যের অন্তর্গত মাছিগোট নামক স্থানে সপ্তাহব্যাপী জামায়াতে ইসলামীর এক সদস্য সম্মেলন হয়। অধম গ্রন্থকারেরও এ সম্মেলনে যোগদান করার সৌভাগ্য

হয়েছিল। পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আট শতাধিক জামায়াত সদস্য এ সম্মেলনে যোগদান করেন। একটা পরিপূর্ণ শান্ত-শিষ্ট ও অনুপম পবিত্র পরিবেশে এ সম্মেলনের কাজ সমাপ্ত হয়। এ সম্মেলনেই নতুন করে জামায়াতে ইসলামীর আমীর নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। দেখা গেল যে, আট শতাধিক নির্বাচকের মধ্যে মাত্র চারজন ব্যতীত সকলেই মাওলানা মওদূদীকে আমীর পদের জন্যে গোপন ব্যালটে ভোট দান করেছেন। অতএব সকলের স্বতঃস্ফূর্তভাবে অর্পিত দায়িত্ব মাওলানা এড়াতে পারলেন না। তিনি পুনর্বার আমীর পদের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

এ সম্মেলনে জামায়াতে ইসলামীর ভবিষ্যত কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে মাওলানা দীর্ঘ ছয় ঘন্টাব্যাপী এক অতি যুক্তিপূর্ণ ও জ্ঞানগর্ভ ভাষণ দান করেন। এ বক্তৃতা জামায়াতে ইসলামীর এক অমূল্য সম্পদ হয়ে আছে। বক্তৃতাটি "ইসলামী আন্দোলনের ভবিষ্যত কর্মসূচী" নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে।

এদিকে পাকিস্তানের রাজনৈতিক আকাশে বেশ ঘনঘটা দেখা দিল। গোলাম মুহাম্মদের স্থলে ইস্কান্দার মিরযা গভর্ণর জেনারেল এবং পরে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হয়েছেন। শাসনতন্ত্রে সারা পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচন ত্বরান্বিত করার উপর জোর দেয়া হয়েছে কিন্তু নির্বাচনের পদ্ধতি নির্ধারণ করা হয়নি। আওয়ামী লীগ ও কংগ্রেসের চরম বিরোধিতার মুখে কোন প্রকার ইসলামী শাসনতন্ত্র পাস করানোই বড় কঠিন ব্যাপার ছিল। অতএব যুক্ত নির্বাচন পদ্ধতি হবে, না পৃথক নির্বাচন পদ্ধতি– এ নিয়ে আলোচনা করার কোনই সুযোগ ছিল না। এখন ইসলামী শাসনতন্ত্রকে বানচাল করার জন্যে ইসলাম বিরোধী মহল এক সুবর্ণ সুযোগ পেয়ে বসলো। তাদের নিশ্চিত ধারণা যে, মুসলমান অমুসলমানের যুক্ত নির্বাচন পদ্ধতি চালু করতে পারলে নির্বাচনে ইসলামপন্থী লোক জয়লাভ করার অতি অল্প সুযোগই পাবে। ফলে ইসলামী শাসনতন্ত্রকে অথবা শাসনতন্ত্রের ইসলামী ধারাগুলোকে সহজেই পরিবর্তন করা যাবে।

নির্বাচন পদ্ধতি সম্পর্কে এতটুকু সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে, দুই প্রাদেশিক পরিষদের সুপারিশক্রমে জাতীয় পরিষদ এ ব্যাপারে চূড়ান্ত ফয়সালা করবে। পশ্চিম পাকিস্তান পরিষদ পৃথক নির্বাচনের পক্ষে এবং পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগের মন্ত্রীত্ব থাকায় যুক্ত নির্বাচনের পক্ষে সুপারিশ করে। ১৯৫৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ঢাকায় জাতীয় পরিষদের বৈঠক ঘোষণা করা হয়। এই বৈঠকেই নির্বাচন পদ্ধতি সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে বলেও ঘোষণা করা হয়।

মাওলানা দ্বিতীয়বার পূর্ব পাকিস্তানে

এ কথা অনস্বীকার্য যে, যে দেশে মুসলিম ও অমুসলিম একত্রে বাস করে, সে দেশের ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা ও ইসলামী মূল্যবোধ নির্ভর করে পৃথক নির্বাচনের উপর। মুসলমানরা পৃথকভাবে তাদের জাতীয় নেতা নির্বাচন করবে এবং অনুরূপভাবে অমুসলিমরা নির্বাচন করবে তাদের জাতীয় নেতা। যেহেতু মুসলমানরা শুধু মুসলমানদেরকে নিয়েই একটা স্বতন্ত্র জাতি, এ জাতিতত্ত্বের ভিত্তিই পাকিস্তানকে জন্ম দান করে। মুসলমান-অমুসলমান নির্বিশেষে সকল জাতির যুক্ত নির্বাচন যেমন পাকিস্তানের আদর্শকে বানচাল করে দেয়, তেমনি মুসলমানদের জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষাও এতে নির্মূল হয়ে যায়।

পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ দলীয় মন্ত্রীসভা কায়েম ছিল। ইসলামের প্রতি আওয়ামী লীগের মনোভাব কারো অজানা ছিল না। অতএব পূর্ব পাকিস্তানে পৃথক নির্বাচনের পক্ষে জনমত গড়ে তোলার জন্যে জামায়াতে ইসলামী, নেযামে ইসলাম পার্টি ও মুসলিম লীগ সম্মিলিত প্রচেষ্টা চালাতে থাকে। এ উদ্দেশ্যে ঢাকার পল্টন ময়দানে এক জনসভার আয়োজন করা হয়। কিন্তু সরকার কর্তৃক নিয়োজিত সশস্ত্র গুণ্ডাদল সভাস্থলে আক্রমণ করে এবং বহু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে নির্মম আঘাতে ধরাশায়ী করে। গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী প্রাদেশিক সরকার গণতন্ত্র ও মানবতাবিরোধী এহেন দুষ্কর্মের জন্যে বিজয় গর্বে উল্লসিত হয়ে উঠে।

এ সময় মাওলানা মওদূদী ১৯৫৮ সালে দ্বিতীয়বার পূর্ব পাকিস্তান সফরে আসেন। প্রতিটি জেলা শহরে ও বিশিষ্ট মহকুমা শহরে মাওলানার সফরসূচি তৈরি হয়। ২১শে ফেব্রুয়ারী হাজার হাজার লোক রংপুর স্টেশনে মাওলানাকে সাদর অভ্যর্থনা জানানোর জন্যে উদগ্রীব হয়ে মাওলানার আগমন প্রতীক্ষা করতে থাকে। কিন্তু গণতন্ত্রের ইতিহাসে এক চরম ও পরম বিস্ময় ঘটে গেল। মাওলানার রংপুরগামী ট্রেনের মধ্যেই প্রাদেশিক সরকারের পক্ষ থেকে নির্দেশনামা হাতে দেয়া হলো। তাতে ঘোষণা করা হয় যে, শান্তিভঙ্গের আশঙ্কায় মাওলানা রংপুর শহরে ট্রেন থেকে নামতে পারবেন না। জনসভাও নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। গণতন্ত্রের ইতিহাসে এক নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করলেন পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ সরকার।

রংপুর স্টেশনের জনসমুদ্র বিক্ষোভে ফেটে পড়ছিল। মনে হচ্ছিল যেন এক মহাপ্রলয় ঘটে যাবে। ট্রেন স্টেশনে থামলে মাওলানা ট্রেনের দরজায় দাঁড়িয়ে

জনগণের সশ্রদ্ধ অভ্যর্থনা গ্রহণ করেন এবং অত্যন্ত শান্ত ও মিষ্ট ভাষায় বলেন, "আমি চিরদিনই আইন মেনে চলার পক্ষপাতী। দেশের আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করার জন্যে আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করছি। আল্লাহর মরযি হলে এরপর কোনদিন আপনাদের শহরে আপনাদের খেদমতে হাযির হবো।"*

রংপুর স্টেশনে প্লাটফরমের সেদিনের দৃশ্য আজও গ্রন্থকারের চোখের সামনে ভাসছে। মাওলানার এ অতি সংক্ষিপ্ত ভাষণের পর সরকারের প্রতি ক্রুদ্ধ জনতার সকল ক্রোধ ও উত্তেজনা যেন বুদবুদের মতো বিলীন হয়ে গেল। একটা প্রবল কান্নার বেগ কণ্ঠাগত হয়ে দু'টি চোখ অশ্রুসজল করে মৃদু শুষ্ক হাসির আকারে বিদায় নিল। মনে হলো কোথা হতে যেন এক খুন-খারাবীর নকশা আঁকা হয়েছিল। এবং তা ভেঙ্গে গেল বলে অদৃশ্য লোকে শয়তানের বুকে ছুরিকাঘাত করলো। মাওলানাকে নিয়ে ট্রেন সামনের দিকে অগ্রসর হলো। জনতা ভগ্ন হৃদয়ে শহরের দিকে ফিরে চলল।

অতঃপর মাওলানা সৈয়দপুর, ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর, বগুড়া, রাজশাহী ও পাবনা শহরগুলোতে জনসভায় বক্তৃতা করেন।

এমনিভাবে দেশের প্রতিটি জেলা শহরে ও অনেক মহকুমা শহরে জনসভায় বক্তৃতা করে মাওলানা ঢাকায় ফিরে যান। কিন্তু জনগণের ঐক্যবদ্ধ দাবি পৃথক নির্বাচন প্রথাকে উপেক্ষা করে জাতীয় পরিষদ শেষরাতের সুপ্ত পরিবেশে যুক্ত নির্বাচন প্রথা জাতির মাথায় চাপিয়ে দেয়।

মার্চ মাসের শেষভাগে ঢাকায় জামায়াতে ইসলামীর তিনদিনব্যাপী এক সম্মেলন হয়। এ সম্মেলনে মাওলানা মওদূদী অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলনের শেষের দিনে জামায়াতে ইসলামীর কর্মী ও জনগণের এক মাইলব্যাপী এক মিশ্র মিছিল শহরের বিভিন্ন রাজপথ দিয়ে পল্টন ময়দানে সমবেত হয়। মুসলিম জনতার আশা-আকাঙ্ক্ষার পরিপন্থী অগণতান্ত্রিক পদক্ষেপের বিরুদ্ধে প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। অতঃপর মাওলানা পল্টনের জনসভায় বক্তৃতা করেন। সুখের বিষয় সভায় শৃঙ্খলা ভঙ্গের কোন দুঃসাহস দুষ্কৃতকারীদের হয়নি।

---

* ১৯৬২ সালের ১৮ই নভেম্বর মাওলানা মওদূদী রংপুর শহরের এক জনসমুদ্রে তাঁর মূল্যবান ভাষণ দান করে রংপুরবাসীর বহুদিনের আশা পূর্ণ করেন।

মাওলানার বিদেশ ভ্রমণ

দামেশ্‌কে অনুষ্ঠিত মুতামেরে আলমে ইসলামীর দ্বিতীয় অধিবেশনে যোগদানের জন্যে মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী ঈসায়ী ১৯৫৬ সালের জুন মাসে মধ্যপ্রাচ্যে রওয়ানা হন। এর প্রথম অধিবেশনটিতে মাওলানা যোগদান করতে পারেননি। কারণ তিনি সে সময় যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ভোগ করছিলেন। মুতামেরের অনুষ্ঠিত এই অধিবেশনে মুসলিম জগত থেকে আগত প্রতিনিধিবৃন্দ মাওলানার ইসলামী খেদমতের মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করেন। মাওলানা মুতামেরের একটি অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। তিনি সর্বসম্মতিক্রমে উক্ত প্রতিষ্ঠানের 'তাবলীগ ও দাওয়াতে ইসলামী' কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হন।

মুতামেরে আলমে ইসলামীর অধিবেশন শেষ করে মাওলানা মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেন। তিনি এবার হজ্জব্রত সম্পাদন করেন এবং মুসলিম বিশ্বের বহু জ্ঞানী ও চিন্তাশীল মনীষীর সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটে।

মাওলানা দামেশ্‌কের পথে বৈরুত পৌঁছলে লেবাননে ইসলামী আন্দোলনের সংস্থা 'ইবাদুর রহমানের' কর্মী ও নেতৃবৃন্দ এবং শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ মাওলানাকে বিমানবন্দরে বিপুল অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। ইবাদুর রহমানের স্কাউটগণ মাওলানাকে গার্ড অব অনার প্রদান করেন। এদের কাছ থেকে জানা যায় যে, তাদের মধ্যে মাওলানার সাহিত্যের বহুল প্রচার রয়েছে এবং প্রত্যেকে মাওলানা মওদূদী ও জামায়াতে ইসলামী সম্পর্কে ভালোভাবে ওয়াকেফহাল।

সিরিয়ার সীমান্ত অতিক্রম করার সময়ে মাওলানা এবং তার সঙ্গীদের মালপত্র বিনা তল্লাশীতে ছেড়ে দেয়া হয়। চেকপোস্টের জনৈক কর্মচারী বলেন যে, সিরিয়া সরকার ও জাতির পক্ষ থেকে মাওলানাকে সাদর অভ্যর্থনা জানানোর জন্যে সিরিয়া সরকার তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। দামেশ্‌কের দশ বারো মাইল দূরে মাওলানাকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্যে বিরাট মোটর গাড়ীর মিছিলসহ শহরের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ বহুপূর্ব থেকে মাওলানার আগমন প্রতীক্ষায় ছিলেন। বিরাট মিছিল সহকারে রাজকীয় সম্বর্ধনার মাধ্যমে মাওলানা দামেশ্‌ক শহরে প্রবেশ করেন। পরে বৈকালিক নাগরিক সম্বর্ধনায় শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তি ছাড়াও

সিরিয়া সরকারের বিচার সচিব, পার্লামেন্টের প্রেসিডেন্ট এবং স্বরাষ্ট্র সচিব যোগদান করেন।

এ সুযোগে জানতে পারা যায় যে, সুদানে মাওলানার সাহিত্য বহুল পরিমাণে পৌঁছেছে এবং আরব জগতের অন্যান্য স্থানেও পৌঁছাচ্ছে। মরক্কোর ইসলামী দলের নেতা জনাব মক্‌কীউন নাসেরী দামেশ্‌ক ব্যতীতও তুঞ্জা থেকে মাওলানার সাহিত্য প্রকাশের অনুমতি লাভ করেন। তিনি বলেন যে, মাওলানার সাহিত্যগুলো আরবী ভাষায় প্রকাশ করে মরক্কো, তিউনিসিয়া এবং আলজিরিয়ায় ব্যাপক প্রচারের পরিকল্পনা তিনি করেছেন।

পাকিস্তান সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণার অপনোদন

এবারের ভ্রমণে মাওলানা মওদূদী দেশের এক বিরাট খেদমত করার সুযোগ পান। এ যাবত পাকিস্তান সম্পর্কে আরব দেশগুলোর একটা বিরূপ ধারণা ছিল। তারা ভারতীয় প্রচার-প্রোপাগান্ডায় বিভ্রান্ত হয়েছিল। মাওলানা তাঁর ভ্রমণের মাধ্যমে তাদের এ ভুল ধারণা দূর করেন। তিনি আরব জাতীয়তাবাদেরও সমালোচনা করেন এবং এর ভ্রান্তি প্রমাণ করে দেন। তিনি তাদেরকে বলেন যে, পাকিস্তান ও আরব দেশগুলোর মধ্যে সম্পর্কের ভিত্তিই হচ্ছে একমাত্র ইসলাম। তিনি আরও বলেন যে, ইসরাঈল যেমন আরবদের দুশমন, তার চেয়ে পাকিস্তানের বড় দুশমন ভারত। কারণ ভারত অন্যায়ভাবে কাশ্মীরের বিরাট অংশ দখল করে আছে। মাওলানা বলেন যে, ভারত ইসরাইল রাষ্ট্রকে স্বীকার করে নিয়েছে। পাকিস্তান স্বীকার করেনি। তিনি প্রশ্ন করেন যে, এমতাবস্থায় পাকিস্তানের পরিবর্তে আরব দেশগুলো যদি ভারতের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করে তাহলে তারা পাকিস্তানের কাছ থেকে কি আশা করতে পারে? মাওলানা তার মধ্যপ্রাচ্য ভ্রমণকালে সর্বত্র আরবদের সঙ্গে আলাপ আলোচনায় পাকিস্তান সম্পর্কে উক্তরূপ প্রচারকার্য চালান। আরবগণ দুঃখ করে বলেন যে, আরব দেশগুলোতে পাকিস্তানের সত্যিকার প্রতিনিধিত্ব হয়নি।

দামেশ্‌ক থেকে প্রত্যাবর্তনের সময়ও সিরিয়া সরকার মাওলানাকে পরম সম্মান সহকারে বিদায় দেন। যানবাহন সচিব ষ্টেশন পর্যন্ত পৌছে মাওলানাকে শেষ বিদায় সম্ভাষণ জানান। সিরিয়া সীমান্ত পর্যন্ত মাওলানার জন্যে সরকারী যানবাহনের ব্যবস্থা করা হয়।

জর্ডানের বাদশাহ শাহ হুসাইন মাওলানাকে আমন্ত্রণ জানান এবং এখানে মাওলানাকে এক জনসভায় বক্তৃতা করতে হয়। এ সভায় ইসলামী জীবন ব্যবস্থা, জামায়াতে ইসলামী, তার সাহিত্য, আরবী ভাষায় এ সবের অনুবাদ প্রভৃতি বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর মাওলানাকে দিতে হয়। মাওলানা পাকিস্তানের বৈদেশিক নীতি এবং বিশেষ করে বাগদাদ চুক্তি সম্পর্কে আরবদের সমালোচনারও জবাব দেন এবং শোতৃমণ্ডলী তার জবাবে সন্তোষ প্রকাশ করেন। মাওলানা বলেন যে, আরব দেশগুলো ইসরাঈল থেকে বিশগুণ বড় হওয়া সত্ত্বেও তার আক্রমণ থেকে বাঁচবার জন্যে রাশিয়ার নিকট সাহায্যপ্রার্থী হওয়াকে দূষণীয় মনে করে না। পাকিস্তান তার চেয়ে চারগুণ শক্তিশালী ভারতের আক্রমণ থেকে বাঁচবার জন্যে যদি আমেরিকার

সাহায্যপ্রার্থী হয়, তবে তা দূষণীয় হবে কেন? অথচ পাকিস্তান সব সময়ে আরবদের সমর্থকই রয়েছে।

হলব থেকে একটা বিশেষ প্রতিনিধি দল মাওলানাকে নিতে আসে। অতঃপর তিনি মরক্কোর নেতা মক্কীউন নাসেরী এবং আলজিরিয়ার নেতা মুহাম্মদ আল গায়রীর সঙ্গে হলব যাত্রা করেন। এ পথেও মাওলানাকে সর্বত্র আন্তরিক সম্বর্ধনা জানানো হয়। প্রতিটি শহরে-বন্দরে পৌছবার পূর্বে শহর থেকে দশ বারো মাইল দূরে নাগরিকগণ মোটরগাড়ী মিছিলসহ মাওলানাকে স্বাগত জানান।

হাম্‌স্‌ এবং হামাতে ইখওয়ান যুবদল প্রাচীন আরবপ্রথা অনুযায়ী কবিতা পাঠ এবং হাততালি সহকারে মাওলানাকে অভ্যর্থনা জানান। তাদের স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ ও আন্তরিকতায় মাওলানা অতীব প্রীত ও মুগ্ধ হন।

সিরিয়ার সৈন্য বিভাগের বহু যুবক মাওলানার সঙ্গে সাক্ষাত করেন। তারা জানান যে, মাওলানার অনেক বই-পুস্তক তারা পড়েছেন এবং মাওলানার বই-পুস্তক পড়তে সরকার পক্ষ থেকে কোন বাধা-নিষেধ নেই। মাওলানা এসব জেনে মনে মনে খুবই দুঃখিত হলেন যে, তার নিজের দেশে তার সাহিত্য সৈন্য বিভাগের জন্যে নিষিদ্ধ ফলস্বরূপ। তাদের নিকট মাওলানার কোন বই-পুস্তক রাখাকে বিরাট অপরাধ বলে গণ্য করা হয়।

সউদী আরবে যারাই মাওলানার বই-পুস্তক পড়েছেন, তারা এসে মাওলানার সঙ্গে সাক্ষাত করেন এবং তাদের মধ্যে নানা বিষয়ে ভাবের আদান প্রদান হয়।

রুশীয় তুর্কীস্তানের মুহাজিরগণ মাওলানার সঙ্গে সাক্ষাত করে তাদের প্রতি রুশ সরকারের চরম নির্যাতনের কাহিনী বর্ণনা করেন। তাদের মধ্যে জনৈক আলেম মাওলানার কয়েকটি গ্রন্থ তুর্কী ভাষায় অনুবাদ করেন।

অধিকৃত কাশ্মীরের বহু মুসলমান মাওলানার নিকট তাদের দুঃখ-দুর্দশা বর্ণনা করে হেরেম শরীফে কেঁদে কেঁদে আল্লাহর কাছে দোয়া করতে থাকেন।

তুরস্কের বহু মুসলমান বহু অনুসন্ধানের পর মাওলানার সাক্ষাৎ লাভ করেন। তাঁরা জানতে পারেন যে, মাওলানা মওদূদী এ বছর হজ্জ করতে আসবেন। তারা মক্কায় অনুসন্ধান করে মাওলানাকে না পেয়ে অবশেষে মদীনায় তাঁর সাক্ষাত লাভ করেন। তাঁরা তুর্কী ভাষায় মাওলানার সাহিত্য অনুবাদ করার ইচ্ছা প্রকাশ করলে মাওলানা সন্তুষ্টচিত্তে তার অনুমতি দেন।

পাকিস্তানে সামরিক শাসন

পাকিস্তানে ইসলামী শাসনতন্ত্র গৃহীত হয়েছে, কার্যকর করা হয়েছে এবং নতুন শাসনতন্ত্র অনুযায়ী ১৯৫৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে সারা দেশে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের জন্যে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। কিন্তু ইসলামী শাসনতন্ত্রের জ্বালায় রাষ্ট্রপ্রধান থেকে শুরু করে প্রাদেশিক পর্যায় পর্যন্ত ইসলাম বিমুখ মহলের চোখে ঘুম ছিল না। ইসলামী শাসনতন্ত্র বানচাল করার জন্যে রাষ্ট্রপ্রধান ইস্কান্দার মিরযা কেন্দ্রে মন্ত্রীসভা ভাঙ্গা-গড়ার খেলা শুরু করেন। ক্ষমতাহীন দল আগামী নির্বাচনে জয়লাভ করার জন্যে নানাবিধ কলা কৌশল অবলম্বন করতে লাগল। নির্বাচনে শান্তিভঙ্গ রোধ করার নাম করে ক্ষমতাসীন দল দলীয় লোকদের মধ্য থেকে হাজার হাজার স্পেশাল পুলিশ নিয়োগ করতে লাগল। অতীতের ন্যায় এবারেও নির্বাচন বৈতরণী পার হওয়ার জন্যে সরকারী কর্মচারীদেরকে ব্যবহার করার পরিকল্পনা শুরু হলো। আগামী নির্বাচনের নামে সারা দেশে এক ত্রাসের রাজত্ব কায়েম হয়ে গেল।

মাওলানা মওদূদী এ পরিস্থিতি গভীরভাবে উপলব্ধি করছিলেন। এ সম্পর্কে তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করার জন্যে ৬ই অক্টোবর লাহোরের মুচিদরজায় এক জনসভার আয়োজন করা হয়। মাওলানা তাঁর বক্তৃতায় দেশের পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে জাতিকে সাবধান করে দিয়ে বলেন যে, পাকিস্তানের শাসক শ্রেণীর ক্ষমতা-পিপাসা ও অপরিণামদর্শিতার কারণে এখানকার বুরোক্র্যাসী বেশ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। ক্ষমতাসীন দল এবং জনসাধারণ এখনো যদি তাদের ভুলের সংশোধন না করে, তাহলে এ দেশে গণতন্ত্রের সমাধি রচিত হবে এবং তার উপরে গড়ে উঠবে বুরোক্র্যাসির প্রাসাদ।

বলাবাহুল্য, মাওলানার উক্তি ছিল অক্ষরে অক্ষরে সত্য। পাকিস্তানের বুরোক্র্যাসী একটা সুযোগ সন্ধান করছিল। কেন্দ্র ও প্রদেশের মন্ত্রিসভা যেন রাষ্ট্রপ্রধানের নাচের পুতুলে পরিণত হয়েছিল। পূর্ব পাকিস্তানের গুণ্ডামি পরিষদ কক্ষে গিয়ে পৌছলো। ক্ষমতাশিকারী বুরোক্র্যাসির এই ছিল সুবর্ণ সুযোগ।

যে রাতে মাওলানা মওদূদী মুচিদরজার জনসভায় জাতির জন্যে সাবধানবাণী উচ্চারণ করছিলেন, সেই রাতেরই শেষ প্রহরে দেশে জারি হলো সামরিক শাসন। ইস্কান্দার মিরযা তার এতদিনের খেলায় বাজিমাত করলেন এই রাতের অন্ধকারে। তিনি চির আকাঙ্ক্ষিত ও বহু কষ্টসাধ্য শাসনতন্ত্র ভেঙ্গে চুরমার করলেন, দেশের উপর চাপিয়ে দিলেন সামরিক শাসন তথা বুরোক্র্যাসির এক জগদ্দল পাথর। দেশের সমস্ত রাজনৈতিক দল ও তাদের কর্মতৎপরতা নিষিদ্ধ হয়ে গেল।

মাওলানা মধ্যপ্রাচ্যে দ্বিতীয় বার

মাওলানার সউদী আরব ও মধ্যপ্রাচ্য ভ্রমণের পর কয়েক বছর কেটে গেছে। এ ভ্রমণের ফলে সে সব দেশের ইসলামী জনতা ও নেতৃবৃন্দের সাথে সম্পর্ক গভীরতর হয়েছে। তাঁদের ইচ্ছা, প্রতি বছরই যেন তাঁরা মাওলানাকে তাঁদের মধ্যে দেখতে পান।

পাকিস্তানে সামরিক শাসন চলছে। সকল রাজনৈতিক তৎপরতা বন্ধ হয়ে গেছে। জামায়াতে ইসলামীরও কোন তৎপরতা নেই। এ সময়টাই ছিল মাওলানার বিদেশ ভ্রমণের জন্যে অত্যন্ত উপযোগী।

ঈসায়ী উনিশ শ' উনষাট সালের অক্টোবর মাসে মাওলানা দ্বিতীয়বার মধ্যপ্রাচ্য সফরে যান। তাঁর এবারের সফর ছিল নিছক জ্ঞান সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে, ঐতিহাসিক স্থানসমূহের যিয়ারতের জন্যে এবং বিশেষ করে "আরদুল কোরআন" অর্থাৎ কোরআনে বর্ণিত স্থানগুলি সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভের উদ্দেশ্যে। মাওলানার বিশ্ববিশ্রুত তাফসীর 'তাফহীমুল কোরআনের' জন্যে 'আরদুল কোরআন' স্বচক্ষে দর্শন করা মাওলানা প্রয়োজনীয় মনে করেছিলেন।

এবারের ভ্রমণেও মাওলানার সঙ্গে সর্বত্র বিশেষ ভ্রাতৃসুলভ ব্যবহার করা হয়। আরব সরকারগুলি আগ্রহ সহকারে মাওলানার ভ্রমণের বিশেষ সুযোগ সুবিধা করে দিয়েছিলেন। সউদী আরব এবং জর্দান মাওলানার প্রতি যে আন্তরিক আতিথেয়তা প্রদর্শন করেছে, তা কোনদিন ভুলবার নয়। ভ্রমণকালে মাওলানা সুযোগমত আরব জাতীয়তাবাদের তীব্র নিন্দা করে তাদের এ ভ্রান্ত মতবাদ সংশোধনের চেষ্টা করেন। মাওলানা তাঁর আলাপ-আলোচনায় আরবদের কাছে পাকিস্তানের সত্যিকার পজিশন ও বাস্তব চিত্র তুলে ধরেন। মাওলানা তাদেরকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন–

"তোমাদের ও আমাদের সম্পর্ক শুধুমাত্র ইসলামের জন্যে। তোমরা যদি ইসলামকে নিয়ে দাঁড়াও, তাহলে পৃথিবীর কোটি কোটি মুসলমান তোমাদের পেছনে এসে দাঁড়াবে। আর যদি ইসলামের পরিবর্তে তোমরা কুফর ও জাহিলিয়াত অবলম্বন কর, তাহলে দুনিয়ার অন্যান্য মুসলমান কেন, আরব মুসলমানও তোমাদের ত্যাগ করবে।"

মাওলানা আরও বলেন,

"আমার ধারণা যে, আরব দেশগুলোতে জাতীয়তাবাদ, নাস্তিকতা ও পাপাচারের যে স্রোত চলেছে, তার উৎসস্থল একটি। এ তিনের একটা অন্যটার

সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যারা আরব জাতীয়তাবাদের ধ্বজাধারী, তারাই নাস্তিকতা ও খোদাদ্রোহিতারও পতাকাবাহী।"

মাওলানার দ্বিতীয়বারের মধ্যপ্রাচ্য ভ্রমণ অনেকটা আশাপ্রদ হয়েছে। প্রথমবার থেকে এবারে মাওলানার বই-পুস্তক আরব দেশগুলিতে অধিকতর পরিচিত ও আদৃত হয়েছে। দেশের সরকারগুলোও মাওলানার সঙ্গে পূর্বাপেক্ষা অধিকতর আন্তরিকতা, আতিথেয়তাপূর্ণ ও ভ্রাতৃসুলভ ব্যবহার করেছেন। স্থানে স্থানে জনসমাবেশে, কলেজে ও সুধী সমাবেশে মাওলানা বক্তৃতার মাধ্যমে তাঁর বাণী ও মিশন স্পষ্ট করে ব্যক্ত করেছেন এবং বিভিন্ন প্রশ্নের সন্তোষজনক জবাব দিয়েছেন। এতে সুধীসমাজে মাওলানার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটে। মাওলানার বলিষ্ঠ সাহিত্য আরব জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে কিছু মন-মস্তিষ্ক প্রভাবিত করছে বলে জানতে পারা যায়। মোটকথা, মাওলানার দ্বিতীয়বারের মধ্যপ্রাচ্য ভ্রমণ পরিপূর্ণরূপে সার্থক হয়।

ভবিষ্যত বংশধরদের জন্যে লিখিত কোরআনের বিপ্লবী তাফসীর তাফহীমুল কোরআনকে প্রামাণ্য নির্ভরযোগ্য ও আকর্ষণীয় করার উদ্দেশ্যে মাওলানা তিন মাসের অধিক সময় তাঁর এ ভ্রমণে অতিবাহিত করেন। তিনি যে সব ঐতিহাসিক স্থান পরিদর্শন করেন, তার মধ্যে নিম্নলিখিত স্থানগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

দরইয়া– যা ছিল মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাব নজ্দীর আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল। আকরাবাহ্– যেখানে নবুয়তের মিথ্যা দাবিদার মুসায়লামাহ খালেদ বিন ওয়ালীদের নিকট পরাজয় বরণ করে। হযরত আইয়ুব আনসারীর বাসগৃহ, সাকীফায়ে বনি সায়েদাহ, মুতা, ইয়ারমুক, হুদায়বিয়া সন্ধির স্থান শুমাইসী, নবী পাক (সাঃ)-এর জন্মস্থান, দারুল আরকাম, শুয়াবে আবি তালেব, জাবালে নূর, গারে হেরা, কুহে সওর, তায়েফের ভগ্নাবশেষ, মসজিদুল খায়েফ, উহুদের জাবালুর রহমাত, যেখানে নবী পাক (সাঃ) পঞ্চাশজন তীরন্দাজকে পাহারায় নিযুক্ত করেন, খয়বর, মাদায়েনে সালেহের নিদর্শনাবলী, তাবুক, ওকবা– যেখানে আসহাবুস্ সাব্‌ত্ মাছ ধরত, মুসা (আঃ)-এর উপত্যকা, বাত্‌রা, সিনাই উপত্যকা, মুসা (আঃ)-এর কূপসমূহ, ফারান উপত্যকা, জাবালে মুসা (আঃ), হযরত হারূনের কর্মস্থল প্রভৃতি। মাওলানার গবেষণা ও শিক্ষা বিষয়ক এ ভ্রমণের ফল এই যে, তাফহীমুল কোরআনে এসব স্থানের এবং ভগ্নাবশেষগুলোর মনোজ্ঞ আলোকচিত্র সন্নিবেশিত করা হয়েছে। আর কোরআন পাকের মূলবচনে বর্ণিত বিষয়সমূহের আধুনিকতম তথ্যাদি সংগৃহীত হয়েছে।

মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাওলানার অবদান

দ্বিতীয়বার মধ্যপ্রাচ্য ভ্রমণ শেষ করার অল্পদিন পরে আবার ১৯৬০ সালের ডিসেম্বর মাসে মাওলানাকে সউদী আরব যেতে হয়। এবার তিনি গিয়েছিলেন শাহ্ সউদের আমন্ত্রণে। শাহ সউদ বহুদিন থেকে এ অভিলাষ পোষণ করতেন যে, তিনি মদীনা শরীফে একটি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করবেন। এ প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাথমিক খসড়া প্রণয়নের জন্যে তিনি কতিপয় বিশেষজ্ঞের একটা বৈঠক আহবান করেন। এ বৈঠকে মাওলানা মওদূদী 'শাহী মেহমান' হিসাবে যোগদান করেন।

মাওলানা মওদূদী ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের খসড়া আগে থেকেই তৈরি করে নিয়ে গিয়েছিলেন। বৈঠকে যোগদানকারী প্রত্যেক সভ্যের নিকটে একটি করে উক্ত খসড়ার নকল পেশ করেন। বিস্তারিত আলোচনা শেষে যৎসামান্য রদবদলের পর মাওলানার পরিকল্পনা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় এবং একে ভিত্তি করেই স্থাপিত হয় মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়। মদীনা গমন করে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থান ও দালান-কোঠা দেখে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেবার জন্যে শাহ্ সউদ মাওলানাকে অনুরোধ করেন। অতঃপর মাওলানা মদীনা শরীফে গমন করেন।

শাহ্ সউদ কৃতজ্ঞতাস্বরূপ মাওলানাকে মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের গভর্নিং বডির স্থায়ী সদস্য নিযুক্ত করেন। পাকিস্তানী ছাত্রদের জন্যে নানান সুযোগ-সুবিধার প্রতিশ্রুতিও শাহ্ সউদ দিয়েছিলেন। এর মধ্যেই পাকিস্তানের বেশ কিছু সংখ্যক ছাত্র এ বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করছেন।

এবারের ভ্রমণে বহু লোকের সাথে মাওলানার পরিচয় ঘটে। রিয়াদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও ছাত্রবৃন্দ মাওলানার সাথে বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করেন। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে মাওলানা বক্তৃতা করেন।

এবার এখানে আফ্রিকার ইসলামী তাবলীগের কর্মসূচী তৈরি করা হয়। নাইরোবীর আন্জুমানে হিমায়াতে ইসলামের পক্ষ থেকে মাওলানাকে দাওয়াত করে ব্যাপক কর্মসূচী তৈরি হয়। কেনিয়ার মুসলমানগণও অতি আগ্রহে মাওলানার আগমন প্রতীক্ষা করছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত মাওলানার আফ্রিকা ভ্রমণ নানা কারণে সম্ভব হয়নি।

সামরিক শাসনের পর

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ১৯৫৮ সালের ৮ই অক্টোবর পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি করা হয়। ঐ সময়ে পাকিস্তানের সকল রাজনৈতিক দলকে বেআইনী ঘোষণা করা হয়। ফলে দেশের সকল রাজনৈতিক তৎপরতা বন্ধ হয়ে যায়। বলাবাহুল্য অন্যান্য দলের ন্যায় এই সময়ে জামায়াতে ইসলামীর তৎপরতাও বন্ধ থাকে। এর ফলে মাওলানা মওদূদী যে অপ্রত্যাশিত অবসর লাভ করেন, তার পূর্ণ সদ্ব্যবহারও তিনি করতে পেরেছিলেন। সুদীর্ঘ কয়েক মাসব্যাপী তাঁর মধ্যপ্রাচ্য ভ্রমণ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কোরআনে বর্ণিত ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলো ভ্রমণের অভিলাষ তিনি বহুদিন যাবত হৃদয়ে পোষণ করতেন। তাঁর বহুদিনের আকাঙ্ক্ষা এবার পূর্ণ হয়। এতদ্ব্যতীত শাহ সউদের ইচ্ছায় মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরাট খসড়া পরিকল্পনা রচনা করার অবসরও তিনি পেয়েছিলেন। 'আরদুল কোরআন' স্বচক্ষে পরিদর্শন করে, তৎসংক্রান্ত বাস্তব অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করে তিনি তাফসীর সাহিত্যের এক বিরাট অভাব মোচন করেছেন এবং তাঁর পরিকল্পনার ভিত্তিতে স্থাপিত মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামী জগতের এক কীর্তি হয়ে থাকবে সন্দেহ নেই।

যা হোক, ১৯৬২ সালে সামরিক শাসনের সমাপ্তি ঘটে এবং ঐ বছরই জুলাই মাসে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে রাজনৈতিক দল আইন পাস হয়। এই আইনের বলে পুনরায় রাজনৈতিক দলের কর্মতৎপরতা শুরু হয়। পূর্বতন রাজনৈতিক দলগুলো পুনর্জীবিত হতে থাকে। জামায়াতে ইসলামীর দলীয় সাংগঠনিক কাজ সকলের আগে আগের মতই পূর্ণোদ্যমে চলতে থাকে।

নিখিল পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামী সম্মেলন

ঈসায়ী উনিশ শ' তেষট্টি সালের অক্টোবর মাসে নিখিল পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর একটি সম্মেলন লাহোরে অনুষ্ঠিত হবে বলে জামায়াতে ইসলামীর মজলিসে শূরা (Central Council) ঘোষণা করে। মাওলানা মওদূদীর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে জামায়াতে ইসলামীর সুদৃঢ় সংগঠন ও ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করে ক্ষমতাসীন দল বিব্রত হয়ে পড়ে। যাতে এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে না পারে তার জন্যে প্রথমত কোন স্থানের অনুমতি দিতে পশ্চিম পাকিস্তান সরকার অস্বীকার করে। পরে অবশ্য একটা নিকৃষ্ট স্থানের অনুমতি যদিও বা দেয়া হলো কিন্তু মাইকের অনুমতি দেয়া হলো না। এর বিরুদ্ধে পশ্চিম পাকিস্তান হাইকোর্টে আবেদন করলে একটি অর্ডিন্যান্সের বলে সারা পশ্চিম পাকিস্তানে মাইক ব্যবহার নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়। এরপরেও যখন বিনা মাইকে দশ-বারো হাজার লোকের সম্মেলন শুরু হলো, তখন ভাড়াটিয়া গুণ্ডাদল কর্তৃক গোলযোগ সৃষ্টি করা হয় এবং একজন নিরাপরাধ জামায়াত কর্মীকে দিবালোকে পুলিশের চোখের সামনে গুলী করে হত্যা করা হয়। কিন্তু এতসব কাণ্ডকারখানার পরেও পরম ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা সহকারে সম্মেলনের কাজ শেষ হয়।

এ সম্মেলনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠকবর্গের গোচরীভূত করতে চাই, যাতে তারা প্রকৃত ব্যাপার সম্যক উপলব্ধি করতে পারেন। সরকার এ সম্মেলনটি বানচাল করার কোন অপকৌশলই বাকী রাখেননি। প্রায় দশ বছর পর সারা পাকিস্তান ভিত্তিক এ সম্মেলনটি হতে চলেছে বলে এতে দশ-বারো হাজার কর্মীর যোগদানের আশা করা যাচ্ছিল। এর জন্যে যে প্রশস্ত ময়দানের দরকার ছিল তা কিছুতেই না দিয়ে ভাটি দরজা ও টেকসালী দরজার মধ্যবর্তী এক সংকীর্ণ স্থানের অনুমতি সরকার দিলেন। দূরদূরান্ত থেকে যোগদানেচ্ছু কর্মীদের রিজার্ভ করা রেলওয়ে বগিগুলো রওয়ানা হওয়ার অতি অল্প সময় পূর্বে বাতিল করা হলো। এরপর মাইকের অনুমতি দিতে অস্বীকার করা হলো। হাজার হাজার লোকের সম্মেলনের শৃঙ্খলা রক্ষা করা বিনা মাইকে এক অসম্ভব ব্যাপার। মাইক ব্যবহারের গণতান্ত্রিক অধিকারও ত্যাগ করা যায় না। অতএব এই নিয়ে হাইকোর্টে এক রিট দায়ের করা হলো। হাইকোর্টের রায় জামায়াতের অনুকূল হবে মনে করে সে রায়

প্রকাশিত হওয়ার আগেই এক অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে সারা পশ্চিম পাকিস্তানে মাইক ব্যবহার হারাম করে দেয়া হলো। অবশ্য বিশেষ অবস্থায় জেলা কর্তৃপক্ষ ইচ্ছা করলে মাইক ব্যবহারের অনুমতি দিতে পারেন। এ সুযোগে লাহোরের জেলা কর্তৃপক্ষের নিকটে মাইক ব্যবহারের অনুমতি প্রার্থনা করা হলো। জেলা কর্তৃপক্ষ এই বলে অনুমতি দিতে অস্বীকার করলেন যে, শহরের যে মহল্লায় জামায়াতের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে, সে মহল্লাবাসী এ ধরনের সম্মেলন পছন্দ করেন না। তাদের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে যেন মাইক ব্যবহারের অনুমতি দেয়া না হয়। নতুবা শান্তি ভঙ্গের আশঙ্কা রয়েছে।

জামায়াতের পক্ষ থেকে এ কথা মহল্লাবাসীদের বলা হলে তাঁরা হতবাক হন এবং এ একটা অবাস্তব অভিযোগ বলে মন্তব্য করেন। উপরন্তু মহল্লাবাসী তীব্র প্রতিবাদ করে জানালেন যে, তাদের পক্ষ থেকে মাইক ব্যবহারের বিরুদ্ধে কোন আপত্তি করা হয়নি। এই প্রতিবাদ বিবৃতিতে স্বাক্ষরকারী মহল্লাবাসীদের মধ্যে দশজন ইউনিয়ন কমিটির সদস্য, ইউনিয়ন কমিটির একজন চেয়ারম্যান, একজন এ্যাডভোকেট ও একজন অধ্যাপক ছিলেন।

এ সবের পরেও মাইকের অনুমতি পাওয়া গেল না। ২৫শে অক্টোবর থেকে সম্মেলনের কাজ শুরু হওয়ার কথা। ছয়শত শামিয়ানার বিভিন্ন প্যান্ডেল, একশত গোসলখানা, তিনশত পায়খানা, টেলিফোন, বিজলীবাতি প্রভৃতির ব্যবস্থা হয়ে গেছে। দু'দিন আগে থেকে লোকজনের আসা শুরু হয়েছে। ২৪শে অক্টোবর কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার (Central Council) এক জরুরী বৈঠকে সিদ্ধান্ত করা হলো যে, বিনা মাইকেই সম্মেলনের কাজ চলবে।

আমরা সন্ধ্যায় ক্যাম্পে গেলাম। দেখলাম এককালের দুর্গন্ধময় আবর্জনায় পরিপূর্ণ স্থানটি আজ অপরূপ স্বর্গীয় সুষমায় ঝলমল করছে। দূরদূরান্ত থেকে আগত বন্ধুদের পারস্পরিক সাক্ষাতে, কোলাকুলি-আলাপ-পরিচয় ইত্যাদিতে অনেক রাত হয়ে গেল।

পরদিন বেলা ৯টায় সম্মেলনে উদ্বোধনী বক্তৃতা করবেন মাওলানা মওদূদী। পনেরো-বিশ হাজার লোকের সমাবেশ। মাওলানা তাঁর বক্তৃতা ছাপিয়ে এনেছিলেন। তাঁর নির্দেশ হলো, তিনি যখন মঞ্চ থেকে তাঁর উদ্বোধনী বক্তৃতা শুরু করবেন, ঠিক সে সময়ে কিছু কর্মী শ্রোতাদের মধ্যে পনেরো-বিশ হাত পর পর একটি টেবিলের উপর দাঁড়িয়ে ছাপনো বক্তৃতা উচ্চস্বরে পড়তে থাকবেন। তাহলে

বিনা মাইকে একই সময়ে সকলকে বক্তৃতা শুনানো সম্ভব হবে। ঘড়ির কাঁটার মত সেভাবেই কাজ শুরু হলো।

কাজ শুরু হওয়ার মিনিট দশ পর সভামণ্ডপে হঠাৎ কিছু গুণ্ডার অনুপ্রবেশ দেখা গেল। মদের নেশায় তারা ছিল উন্মত্তপ্রায়। তারা সভার শঙ্খলা ভঙ্গ করা শুরু করলো, হঠাৎ শামিয়ানায় আগুন জ্বলে উঠলো, শামিয়ানার বাইরে কিছু হৈ-হল্লা ও পিস্তলের গুলীর শব্দ শুনা গেল। মাওলানাকে লক্ষ্য করেও কয়েকবার গুলী বর্ষিত হয়। কিন্তু প্রত্যেকটি গুলীই লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। এ সময়ে চারিদিক থেকে এ কথা বলতে শুনা যায়– "মাওলানা বসে পড়ুন, মাওলানা বসে পড়ুন।"

কিন্তু মাওলানা পূর্ববৎ দাঁড়িয়ে থেকেই শান্ত কণ্ঠে বলেন, "আমি যদি বসে পড়ি, তাহলে দাঁড়িয়ে থাকবে কে?"

ইসলামী আন্দোলনের পরিচালকের যথার্থ জবাবই বটে। বিপদের চরম মুহূর্তে নেতৃত্বদানকারী যদি বসে পড়েন, পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেন, ভগ্নোৎসাহ হয়ে পড়েন, তাহলে সে আন্দোলনের যে অকালমৃত্যু ঘটবে তাতে আর সন্দেহ কি। তাই বিপদের এ মুহূর্তে তিনি ইসলামী আন্দোলনের সুযোগ্য নেতার ভূমিকাই পালন করলেন, নির্ভীকচিত্তে অটল অচল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। আদর্শের প্রতি কতখানি নিষ্ঠা তাঁর, খোদার সন্তুষ্টির জন্যে জীবন বিসর্জন করার কি মহান প্রস্তুতি! আল্লাহর ইচ্ছার প্রতি কতখানি আত্মসমর্পণ!

জামায়াত কর্মীগণ অসীম ধৈর্য ও হিকমতের সঙ্গে দশ-পনেরো মিনিটের মধ্যে গোটা পরিস্থিতি সম্পূর্ণ আয়ত্বে আনতে ও পূর্ণ শৃঙ্খলা কায়েম করতে সক্ষম হলেন। পুলিশ কিন্তু দাঁড়িয়ে তামাশা দেখছিল। যা হোক, মাওলানা পুনরায় তাঁর উদ্বোধনী বক্তৃতা শুরু করলেন এবং শেষ করলেন। আর কোনরূপ বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়নি।

কিন্তু পনেরো বিশ মিনিটের মধ্যে সভামণ্ডপের বাইরে যে এক মহাপ্রলয় সবকিছু লণ্ডভণ্ড করে গেছে তা আমরা বুঝতে পারিনি। সুশিক্ষিত, সুদক্ষ ও ধৈর্যশীল জামায়াত কর্মীগণ, যাঁরা শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে নিয়োজিত ছিলেন, তাঁরা আমাদেরকে কিছু জানতে দেননি।

উদ্বোধনী বক্তৃতার পর আমরা সভামণ্ডপ ও ক্যাম্পের বাইরে গেলাম। মনে হলো একশ-দেড়শ মাইল বেগে ঝড় বয়ে গেছে। সম্মেলনের উদ্দেশ্যে স্থাপিত বহু দোকান পাট, খাবারের ও চায়ের স্টল, প্রহরায় নিযুক্ত লাহোর

জামায়াত কর্মীদের ক্যাম্প প্রভৃতি একেবারে তছনছ, ছিন্নভিন্ন ধুলায় লুণ্ঠিত। ঘণ্টাখানেক পর জানতে পারলাম জামায়াত কর্মী আল্লাহ বখ্‌শ্‌ গুণ্ডা কর্তৃক পিস্তলের গুলীতে শহীদ হয়েছেন। শহীদের স্ত্রী ও কন্যাগণ মহিলাক্যাম্পে ছিলেন। মহিলাক্যাম্পের উপরেও গুণ্ডাদের আক্রমণ চলেছে। কিন্তু বিস্ময়ে বিমূঢ় হলাম যে, এত কাণ্ড ঘটে গেল, কিন্তু নেই কোন হৈ চৈ, দৌড়াদৌড়ি, কান্নার রোল অথবা কোন,উদ্বেগ-উত্তেজনা। এমন ধৈর্যস্নাত অনুপম পরিবেশ কোনদিন কল্পনা করতে পারিনি। যেখানে খুন আছে– আর্তনাদ নেই, অগ্নিকাণ্ড আছে– হাহাকার ও কলরোল নেই, লুটতরাজ আছে– সংঘর্ষ নেই, বৈধব্য বিরহ আছে– বিলাপ নেই।

মাওলানার উদ্বোধনী বক্তৃতাও পাঠকগণের জ্ঞাতার্থে পেশ করা আবশ্যক বোধ করছি।

জামায়াতে ইসলামীর লাহোর সম্মেলনে মাওলানা মওদূদীর উদ্বোধনী ভাষণ

(এই ভাষণ চলাকালেই ভাড়াটে দুর্বৃত্তদের গুলীতে জামায়াত কর্মী আল্লাহ্ বখ্শ্ শহীদ হন)

বন্ধুগণ!

উনিশ শ' সাতান্ন সালের পর আজ প্রথমবার একটি নিখিল পাকিস্তান সম্মেলনে একত্র হওয়ার সুযোগ পেয়েছি। আজ থেকে বাইশ বছর আগে মাত্র ৭৫ জন সদস্য নিয়ে এই শহরের বুকে জামায়াতে ইসলামীর ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল। আজ আর একবার আমরা এ শহরের বুকে সমবেত হচ্ছি। আল্লাহ্ তায়ালার অশেষ মেহেরবানী যে, আমাদের সমস্ত ভুলত্রুটি সত্ত্বেও যে আন্তরিকতার সাথে আমরা দ্বীনের এ নগণ্য খেদমতের সূচনা করেছিলাম তাকে তিনি কবুল করে নিয়েছেন। এ কাজে তিনি এমন বরকত দান করেছেন যার ফলে আজ পাকিস্তানের প্রতি এলাকায় জামায়াতের হাজার হাজার সদস্য, সমর্থক, জামায়াতের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং জামায়াত প্রভাবিত ব্যক্তির অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হচ্ছে এবং দেশের বাইরে দুনিয়ার বিভিন্ন অংশেও এর প্রভাব পড়েছে। নিজেদের প্রচেষ্টায় এ ফল লাভ করার মতো ক্ষমতা আমাদের ছিল না। এ সবকিছুই খোদার দান এবং তাঁর পাক সত্তার পক্ষ থেকে সাহায্য-সহায়তার বিস্ময়কর ফল। এজন্যে আমরা পুর্ণ আন্তরিকতার সাথে তাঁর শুকরিয়া আদায় করছি।

বন্ধুগণ!

পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর ইতিহাসে এমন একটি দিনও পাওয়া যাবে না, যে দিনটি এ দেশের শাসকদের কোপানলে পতিত হয়নি এবং তাদের চোখে কাঁটার মতো বিঁধেনি। গত ষোল বছর এখানে যারাই ক্ষমতাসীন হয়েছেন, তারাই এ জামায়াতের অস্তিত্বকে বিরক্তিকর ও অসহনীয় মনে করেছেন। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারণা চালিয়েছেন। আমাদের বিরুদ্ধে নিত্য নতুন অপবাদ রটানো হয়েছে। আমাদের পত্র-পত্রিকা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। আমাদের অর্থ সম্পদ বাজেয়াফ্ত করা হয়েছে। আমাদের কাজে নানান

বাধার সৃষ্টি করা হয়েছে। আমাদেরকে কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়েছে। অতঃপর সামরিক শাসনামলে আমাদের সংগঠন খতম করে দিয়ে আমাদের সে সব গঠনমূলক কাজ নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হয়েছে, যা বছরের পর বছর মেহনত করে আমাদের কর্মী ও সমর্থকদের অক্লান্ত পরিশ্রমলব্ধ অর্থ দিয়ে গড়ে তুলেছিলাম। অথচ আমরা কোনদিনই ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলাম না। আমরা কখনও অন্যের পরিবর্তে নিজেদের হাতে ক্ষমতা লাভের প্রত্যাশা করিনি। আমাদের দাবি সব সময় এই ছিল এবং আজও আছে যে, এ দেশ যেহেতু ইসলামের নামে অর্জিত হয়েছে, সেহেতু এখানে পুরোপুরি ইসলামী জীবন ব্যবস্থাই জারি হওয়া উচিত। আমরা বারবার পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে এ কথাই বলেছি যে, সততার সাথে যে-ই এ কাজ সম্পন্ন করবে আমরা মনে প্রাণে তাকে সমর্থন করব এবং তার সঙ্গে ক্ষমতায় শরীক হওয়া দূরের কথা, তার কাছ থেকে কোনরকম প্রতিদানও চাইব না। কিন্তু এখানে যারাই ক্ষমতাসীন হয়েছেন, তারাই একদিকে ইসলামের শ্লোগান দিয়ে এ দেশকে ইসলাম থেকে আরও দূরে সরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছেন এবং অন্যদিকে আমাদেরকে তাদের কর্তৃত্বের পথে প্রতিবন্ধক মনে করে দাবিয়ে দেয়ার এবং নিশ্চিহ্ন করার জন্যে যাবতীয় নিকৃষ্টতম অস্ত্রও প্রয়োগ করেছেন।

কোন অভিযোগ হিসাবে আমি এ ইতিহাসের পুনরুল্লেখ করছি না। আমাদের উপর ক্ষমতাসীনদের যে সুনজর পড়েছে এটা কোন নতুন মেহেরবানী নয়। শুধু এ অনুভূতিটুকু আপনাদের মধ্যে জাগিয়ে দেয়াই আমার উদ্দেশ্য। ষোল বছর থেকে অনুরূপ এবং এর চাইতেও কঠিন মেহেরবানীর শিকার আমরা হয়েছি এবং এ সবের মুখোমুখি হয়ে কাজ করেও খোদার মেহেরবানীতে আমাদের আন্দোলন এতটা অগ্রসর হয়েছে। কাজেই মাইক থেকে বঞ্চিত করে আমাদের এ সম্মেলন বানচাল করার চেষ্টা করা হয়েছে– শুধু এতটুকু কথায় আপনারা মনমরা হবেন না। ইতঃপূর্বে এর চাইতেও কোন কঠিন পদক্ষেপ আমাদের কোন ক্ষতি করতে পারেনি। বরঞ্চ আমাদের জন্যে লাভজনক প্রমাণিত হয়েছে। কাজেই এ সামান্য হীন প্রচেষ্টাটি আমাদের কি ক্ষতি করতে পারে? ক্ষতি হলে আমাদের অজ্ঞতার দরুন হবে, অন্যের কোন আক্রমণ থেকে নয়। অবশ্য আল্লাহ যদি চান তা পৃথক কথা।

বন্ধুগণ!

খোদার দ্বীনের জন্যে যাকে কাজ করতে হয়, তার মধ্যে অবশ্য অবশ্যই দু'টো গুণ থাকতে হবে। একটি সবর ও দ্বিতীয়টি হিকমত বা সুস্থ বিচার-বুদ্ধি। সবরের দাবি হলো আপনার পথে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হলে তাতে উত্তেজিত হয়ে আপনি ভারসাম্য হারিয়ে ফেলবেন না এবং হিম্মতহারা হয়ে নিজের উদ্দেশ্যের পরিবর্তে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারীর উদ্দেশ্য পূর্ণ করবেন না। বরঞ্চ প্রতিটি প্রতিবন্ধকতার মুখে আপনার সংকল্প অটুট রাখতে হবে এবং উত্তেজনার উত্তাপ থেকে নিজের মন-মস্তিষ্ককে রক্ষা করে সুস্থ বিচার-বুদ্ধিসম্মত পথ গ্রহণ করতে হবে।

সুস্থ বিচার-বুদ্ধি হলো আপনি চোখ বুঁজে শুধু একটি নির্দিষ্ট পথে চলতে অভ্যস্ত হবেন না। বরঞ্চ একটি পথ বন্ধ হতেই অন্য দশটি পথ বের করার যোগ্যতা আপনার থাকতে হবে। যে ব্যক্তির মধ্যে এ হিকমত নেই, সে একটি পথ বন্ধ দেখেই বসে পড়ে। এবং এর সঙ্গে যদি সে বেসবরও হয়, তাহলে ঐ প্রতিবন্ধকের সঙ্গে সংঘর্ষে নিজের মাথা ফাটিয়ে দেয় অথবা সে পথ ত্যাগ করে। কিন্তু আল্লাহ যাকে হিকমত ও সবর দু'টোই দান করেছেন, তিনি হন গতিশীল স্রোতস্বিনীর মতো। তার গন্তব্যকে কোন জিনিসই ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে না। বিপুলায়তন প্রস্তরখণ্ড হতবাক হয়ে যায় এবং নদী অন্যদিক দিয়ে তার গন্তব্যের পথে ধাবিত হয়।

সভা-সম্মেলনে বক্তৃতা করে হাজার হাজার লোককে শুনানোই আমাদের পয়গাম পৌঁছানোর ও দাওয়াত সম্প্রসারণের একমাত্র পথ নয়। নিঃসন্দেহে এটিও এ কাজের একটি পদ্ধতি। কিন্তু যদি এটি আমাদের জন্যে বন্ধ করে দেয়া হয়, তাহলে কোন পরোয়া নেই। আপনারা তিন তিন বা চার চার জনের দল গঠন করে সারা লাহোর শহর ছড়িয়ে পড়ুন। ঘরে ঘরে, দোকানে দোকানে, মসজিদে মসজিদে যান। পৃথক পৃথকভাবে প্রত্যেকটি লোকের সঙ্গে সাক্ষাত করুন। প্রত্যেককে জানিয়ে দিন, জামায়াতে ইসলামী কি, তার ব্যবস্থা ও সংগঠন কি, তার উদ্দেশ্য কি, তার কর্মপদ্ধতি কি, সে কোন জিনিসগুলোর সংশোধন চায়, আর কোন সুকৃতিগুলো কায়েম করতে চায়। যারা আরও কিছু বুঝতে চায় তাদেরকে জামায়াতের সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিন। এতে পড়াশুনা করে পরে তারা নিজেদের রায় কায়েম করতে পারবে। যারা আগ্রহশীল নয়, তাদের পেছনে সময় নষ্ট করবেন না। বরঞ্চ আগ্রহশীলদের পেছনেই সময় ব্যয় করুন।

আর যারা বিতর্কে নামতে চায়, তাদের সঙ্গে সংঘর্ষ না বাঁধিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে চলুন। আপনাদের পদ্ধতি–

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ.

হিকমত ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে তোমরা প্রভুর পথে আহ্বান জানাও : (সূরা আন-নহল ১২৫ আয়াত)

আপনার দাওয়াত এই খোদায়ী নির্দেশ অনুযায়ীই হওয়া উচিত। আপনার ভাষা হবে মিষ্টি। চরিত্র হবে নিষ্কলুষ। ব্যবহার হবে ভদ্রোচিত। মন্দের জবাব দেবেন ভালোর মাধ্যমে। সত্যি সত্যিই যে আপনি মন্দের স্থলে ভালো প্রতিষ্ঠিত করতে চান, একথা শুধু মুখে নয়, নিজের কাজ ও প্রকাশভঙ্গির দ্বারা তা আপনাকে প্রমাণ করতে হবে। এরপর বিশ্বাস করুন আল্লাহর রহমত আপনার সহযোগী হবে এবং যতটা কাজ আপনি করবেন, তার চাইতে অনেক বেশী কাজ খোদার ফেরেশতাগণ আপনার সহযোগী হয়ে সম্পন্ন করবেন।

সম্মেলনের এ দিনগুলোতে অনেক চক্ষু বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আপনাদের নিরীক্ষণ করবে। আপনারা নিজেদের জামায়াতের নির্যাস এনে কেন এখানে প্রদর্শনীতে রেখে দিয়েছেন। অসংখ্য কষ্টিপাথরে আপনাদের যাচাই করা হবে। কোন বিশেষ সময়ে নয়, প্রতিটি দিক থেকেই যাচাই করা হবে। এখন আপনারা যদি নিজেদেরকে খাঁটি অথবা ভেজাল প্রমাণ করতে চান, তাহলে তা নির্ভর করবে আপনাদের কার্যকলাপের উপর। যামানা বড় নির্দয় যাচাইকারী। আপনারা কোন কৃত্রিম কৌশলে এবং কোন বাহ্যিক আড়ম্বরের মাধ্যমে তার কষ্টিপাথরে নির্ভেজাল প্রমাণিত হতে পারবেন না। প্রকৃতপক্ষে আপনারা যদি নির্ভেজাল হয়ে থাকেন, তাহলেও অনেক বিবেচনা ও ইতস্তত করার পরই সে আপনাদের খাঁটি বলে স্বীকার করবে। কিন্তু বিশ্বাস করুন, যদি নিজেদের কাজের দ্বারা আপনারা নির্ভেজাল প্রমাণিত হন, তাহলে বিরোধী শক্তি আপনাদের ভেজাল প্রমাণ করার জন্যে যতই বিরাট এবং ব্যাপক প্রচেষ্টা চালাক না কেন, ইনশাআল্লাহ তারা পরাজিত হবে এবং আপনাদের পরিবর্তে নিজেরই ক্ষতি সাধন করবে। মিথ্যার আক্রমণ প্রত্যক্ষ করে আপনারা একটুও ঘাবড়াবেন না। তার আগমন তুফানের মতো, কিন্তু মিলিয়ে যায় বুদবুদের মতো নিমেষে। আর একবার নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার পর তার ভেতরের প্রচ্ছন্ন আবর্জনা এমনভাবে

মানুষের দৃষ্টিসমক্ষে ভেসে উঠে যে, সমগ্র দুনিয়া তারই উপর ছি-ছি করে উঠে। কাজেই মিথ্যার মুকাবিলা করার চিন্তা আপনাদের করা উচিত নয়। আপনাদের চিন্তা করা উচিত নিজেদের সত্যতার। আপনারা যদি সত্য হয়ে থাকেন, তাহলে মিথ্যার মুকাবিলা আপনাদেরকে করতে হবে না। খোদা তার মুকাবিলা করবেন এবং আজকের মিথ্যাকে তিনি ঠিক তেমন শিক্ষণীয় করে রাখবেন যেমন এর আগে প্রতি যুগের মিথ্যাকে শিক্ষণীয় করে রেখেছেন।

শেষ কথা এই বলতে চাই যে, এ জামায়াত এবং এ আন্দোলনকে যে ব্যক্তিই নিজের জন্যে ভয়াবহ বিপদ মনে করে, সেই তার সমগ্র শক্তি আমার বিরুদ্ধে নিয়োগ করে। আমাকে যাঁরা ভালবাসেন, এ জিনিসটা স্বভাবতই তাদের নিকট বিরক্তিকর ঠেকে। আপনারা বারবার এ পরিস্থিতির মুখোমুখি হবেন। আমার ভয় হচ্ছে আপনারা নিজেদের দাওয়াত সম্প্রসারণের পরিবর্তে আমার প্রতিরক্ষায় নিজেদের সময় ও শক্তি ব্যয় না করে ফেলেন। আমার সকল অন্তরঙ্গ ভাইকে আমি নিশ্চিত হতে বলছি যে, খোদার মেহেরবানীতে আমার কোন প্রতিরক্ষার প্রয়োজন নেই। আমি কোন মহাশূন্য থেকে হঠাৎ এখানে আসিনি। এ দেশের মাটিতেই কাজ করে আসছি বছরের পর বছর ধরে। লক্ষ লক্ষ লোক প্রত্যক্ষভাবে আমার কাজ সম্পর্কে অবগত। আমার লেখা শুধু এ দেশেই নয়, দুনিয়ার বিরাট এলাকায় ছড়িয়ে আছে এবং আমার উপর আমার প্রতিপালকের মেহেরবানী এই যে, তিনি আমাকে কলুষমুক্ত রেখেছেন। আমার মুখ কালো করে দেয়া সহজ কাজ নয়। যে কেউ উঠে দশ-বিশটা মিথ্যা দোষারোপ করে আমার মুখে এক পোঁচ কালি লেপে দেবে, এতটা সহজ নয়। বিশেষ করে ঐসব লোক, যাদের না কোন অতীত আছে, না ভবিষ্যত, ঘটনাপরম্পরা যাদেরকে মাত্র কয়েকদিনের জন্যে উপরে এনেছে। এ খেলা খেলে ইনশাআল্লাহ তারা আমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। কাজেই আমি নিজে নিশ্চিন্ত আছি এবং আপনারাও নিশ্চিন্ত থাকুন। আমার প্রতিরক্ষায় ব্যাপৃত না হয়ে আল্লাহর পথের দিকে আল্লাহর বান্দাদেরকে আহবান করতে থাকুন। আমি আমার প্রতিপালকের উপর ভরসা রাখি। যদি আমি স্বচ্ছ নিয়তে তাঁর দ্বীনের খেদমত করে থাকি, তাহলে তিনি নিজেই আমার প্রতিরক্ষা করবেন।

আল্লাহ তায়ালার অসীম করুণা ও অপার মহিমা যে, সর্বপ্রকার অপকৌশল অবলম্বন করেও সম্মেলন বানচাল করা গেল না, মাওলানা অথবা জামায়াতের কোন ক্ষতি করা সম্ভব হলো না। উপরন্তু সারা দেশের লোকের সহানুভূতিশীল দৃষ্টিই আকর্ষণ করলো জামায়াতে ইসলামী। মাওলানার নির্দেশে

তিন-চার জনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলগুলো শহরে ছড়িয়ে পড়ার ফলে জনগণের সহানুভূতিই শুধু পাওয়া গেল না, দশ হাজারের মতো লোক জামায়াতের সমর্থনপত্রে স্বাক্ষর করে জামায়াতে ভর্তি হলেন।

প্রথমদিনের এতো লঙ্কাকাণ্ডের পর অবশিষ্ট দু'দিন ভালোভাবে কেটে গেল। আমরা সবাই সম্মেলনের প্যান্ডেল পরিত্যাগ করলাম। অতঃপর ৫-এ যায়লদার পার্কে অবস্থিত মাওলানার বাসভবনে আমরা কেন্দ্রীয় শূরা সদস্যগণ একত্র হয়ে সম্মেলনের বিভিন্ন বিষয়ের যাচাই পর্যালোচনা শুরু করি। আলোচনার এক পর্যায়ে আমরা সকলে প্রস্তাব করি যে, যেহেতু আইয়ুব সরকার মাওলানার জীবন নাশ ও জামায়াতের মূলোৎপাটনের জন্যে বদ্ধপরিকর, সেহেতু নিরাপত্তার জন্যে মাওলানার বাসস্থানে দু'জন সশস্ত্র প্রহরী নিযুক্ত করা হোক।

মৃদু হাস্য করে মাওলানা প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করে বলেন, 'দেখুন, আমি একটি ইসলামী আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছি, যে আন্দোলনের প্রতি মুহূর্তে জীবনের ঝুঁকি অনিবার্য। একদিকে আমি আপনাদের জীবনের ঝুঁকি নেয়ার পরামর্শ দেব, অপরদিকে নিজের নিরাপত্তার জন্যে প্রহরী নিযুক্ত করব, এর চেয়ে হাস্যকর আর কি হতে পারে? এ আমার মর্যাদারও খেলাফ।'

একটু নীরব থাকার পর পুনরায় বলেন. কারো মৃত্যু যদি আল্লাহর মনঃপূত না হয়, তাহলে সারা দুনিয়া চেষ্টা করেও তাকে মারতে পারবে না। আর তাঁর ইচ্ছা হলে পুত্রের গুলীতেও পিতা প্রাণত্যাগ করতে পারে।

মাওলানা আপন মনে কয়েকটি কথা বলে ফেললেন। সম্মেলনে গুলী চলাকালীন মাওলানাকে আসন গ্রহণ করার অনুরোধ জানালে বলেছিলেন, "বিপদ দেখে আমি যদি বসে পড়ি তাহলে দাঁড়িয়ে থাকবে কে?" মাওলানার সে নির্ভীক উক্তি কর্মীদেরকে শতগুণে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করেছিল। আদর্শ নেতার উক্তিই বটে। এবারের উক্তি ততোধিক গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু তাঁর এ উক্তি কোন ভবিষ্যদ্বাণী ছিল না। কারণ ভবিষ্যদ্বাণী করার কোন ক্ষমতা ও অধিকার মানুষের নেই। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার ধারা ও গতি প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে তার সম্ভাব্য পরিণতি সম্পর্কেই ছিল মাওলানার এ উক্তি। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, তিন-চার মাসের মধ্যেই তার এ উক্তি সত্যে পরিণত হয়। আইয়ুব খানের নির্দেশে তদানীন্তন পশ্চিম পাকিস্তানের গভর্নর কালাবাগ থেকে ভাড়াটিয়া গুণ্ডা এনে জামায়াত সম্মেলনকে একটি রক্তাক্ত প্রাঙ্গণে পরিণত করতে চেয়েছিলেন। তার তিন-চার মাস পর তিনি আপন গৃহে স্বীয় পুত্রের পিস্তলের গুলীতে প্রাণত্যাগ করেন।

জামায়াতে ইসলামী বেআইনী ঘোষিত

পূর্বে বলা হয়েছে, সম্মেলনের পূর্ব থেকেই কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক মন্ত্রিগণ জামায়াতে ইসলামী ও মাওলানা মওদূদীর বিরুদ্ধে উত্তেজনামূলক বিবৃতির পর বিবৃতি দিয়ে আবহাওয়া উত্তপ্ত করে তুলছিলেন। অতঃপর সম্মেলনের বিজয় সাফল্য দেখে তারা মরিয়া হয়ে উঠলেন যে, এ জামায়াতকে খতম করতেই হবে। তদনুযায়ী ১৯৬৪ সালের ৬ই জানুয়ারী সমগ্র দেশে জামায়াতে ইসলামী সংগঠন বেআইনী ঘোষণা করে মাওলানা মওদূদীসহ জামায়াত নেতৃবৃন্দের ষাটজনকে গ্রেফতার করে জেলে পাঠানো হয়।

পাকিস্তানের সবচেয়ে মজবুত নিয়মতান্ত্রিক ও শান্তিপ্রিয় দলটিকে রাজনীতির ময়দান থেকে উচ্ছেদ করা হলো, নেতৃবৃন্দকে জেলের অন্ধকার কক্ষে নির্বাসিত করা হলো। দেশের সকল রাজনৈতিক দলের (শুধুমাত্র সরকারী দল ব্যতীত) নেতৃবৃন্দ তীব্র প্রতিবাদ জানালেন। প্রায় সকল মুসলিম দেশ থেকে প্রতিবাদ ও নিন্দাধ্বনি উত্থিত হলো। কিন্তু সরকার জামায়াতে ইসলামীকে খতম করে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে নীরব রইলেন।

একথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, মাওলানা মওদূদী কর্তৃক ১৯৩২ সালে প্রকাশিত বিপ্লব সৃষ্টিকারী মাসিক পত্রিকা তর্জুমানুল কোরআন এ যাবত নিয়মিত চলে আসছিল। বিগত একত্রিশ বছরের মধ্যে বিভাগপূর্ব ভারত সরকার এবং বিভাগোত্তর কালের পাকিস্তান সরকারের কেউ এ পত্রিকাখানি বন্ধ করে দেয়ার মতো সাহস করেনি। কিন্তু সামরিক শাসনের পরবর্তী তথাকথিত জনপ্রিয় ও গণতান্ত্রিক পাকিস্তান সরকার একটা তুচ্ছ কারণে ১৯৬৪ সালের জানুয়ারী মাস থেকে ছ'মাসের জন্যে এর প্রকাশ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন।

একথা সর্বজন স্বীকৃত যে, মাওলানা প্রণীত কোরআনের তাফসীর 'তাফহীমুল কোরআন' তাফসীর সাহিত্যের এক অমূল্য অবদান। মাওলানার সারা জীবনের সাধনা 'তাফহীমুল কোরআন'। কিন্তু জামায়াতে ইসলামী বেআইনী ঘোষণা করার পর যখন তাকে জেলে পাঠানো হয়, তখন জেলখানায় বসে কোরআন পাকের তাফসীর লেখার অনুমতিও তাঁকে দেয়া হয়নি। অবশ্য ইসলামপ্রিয় জনগণের পক্ষ থেকে প্রবল বিক্ষোভ প্রদর্শিত হওয়ার পর অবশেষে সরকার অনুমতি দান করেন।

জামায়াতের মামলা

কিছুকাল পরে পশ্চিম প্যাকিস্তান ও পূর্ব পাকিস্তান হাইকোর্টে জামায়াতে ইসলামী বেআইনী ঘোষণাকারী সরকারী নির্দেশের বিরুদ্ধে রিট্ আবেদন করা হয়। পশ্চিম পাকিস্তান হাইকোর্ট সরকার পক্ষে এবং পূর্ব পাকিস্তান হাইকোর্ট জামায়াতের পক্ষে রায় দেন। পুনরায় মাওলানা মওদূদীর পক্ষ থেকে পশ্চিম পাকিস্তান হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে আপিল দায়ের করা হয়। সত্যের জয় সুনিশ্চিত ও অবধারিত বলে মহামান্য সুপ্রীম কোর্ট পঁচিশে সেপ্টেম্বর জামায়াতে ইসলামীর পক্ষে সুস্পষ্ট রায় দান করে সুষ্ঠু সুবিচারের ঐতিহাসিক নযীর স্থাপন করেন।

যে সকল অভিযোগের ভিত্তিতে সরকার জামায়াতে ইসলামীকে বেআইনী ঘোষণা করে তার নেতৃবৃন্দকে কারাগারে আবদ্ধ করে, মাওলানা মওদূদী পশ্চিম পাকিস্তান ট্রাইবুন্যাল ও হাইকোর্টের সামনে সে সবের যে সুস্পষ্ট ও নির্ভীক জবাব দান করেন, তা সকলের অবগতির জন্য নিম্নে সন্নিবেশিত করা হল।

অভিযোগগুলোর একটি বিশেষ অভিযোগ এই যে, মাওলানা মওদূদী কাশ্মীরের জিহাদকে হারাম বলে ফতোয়া দিয়েছেন। এই অভিযোগটি পুনঃ পুনঃ প্রচার করা হতে থাকে। কাশ্মীর সমস্যাটি পাকিস্তানের জন্য এক জীবন-মরণ সমস্যা। মাওলানা মওদূদী কাশ্মীর-সমাধান বিরোধী– একথা প্রকাশ করে জনগণকে তাঁর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তোলাই অভিযোগকারীদের মনের ইচ্ছা। এ সম্পর্কে কাশ্মীরী জননেতাদের মন্তব্যও সর্বশেষে সন্নিবেশিত হলো যাতে অভিযোগকারীদের মানসিক ব্যাধি পাঠক ও জনসাধারণের কাছে পরিস্ফুট হতে পারে।

মাওলানা মওদূদীর জবাব

পশ্চিম পাকিস্তান সরকারের হোম সেক্রেটারী সমীপে–

মাননীয়,

আপনার ১৩-১-৬৪ তারিখের পত্রে আপনি আমার গ্রেফতার ও আটকের যে সব কারণ দর্শিয়েছেন, সেগুলো সম্পর্কে সর্বপ্রথম আমি সংক্ষেপে নিজের আইনসঙ্গত আপত্তিসমূহ বিবৃত করব। অতঃপর এগুলোর ওপর একটা মোটামুটি মন্তব্য করব এবং সবশেষে প্রত্যেকটি কারণ পৃথকভাবে বর্ণনা করব।

আটকের ব্যাপারে আইনসঙ্গত আপত্তি

গ্রেফতার ও আটকের কারণসমূহের ব্যাপারে আমার আইসঙ্গত আপত্তিগুলো নিম্নরূপ ঃ

১। ১৯৬৪ সালের ৬ই জানুয়ারী আমাকে গ্রেফতার করা হয় এবং গ্রেফতার ও আটকের কারণসমূহ ১৩ই জানুয়ারী সন্ধ্যায় আমাকে জানানো হয়। কিন্তু এই কারণসমুহের মধ্যে একটি কারণও এমন নয়, যা প্রেসনোটে উল্লিখিত হয়নি। এ প্রেসনোট ৬ই জানুয়ারী সরকারের পক্ষ থেকে জারী করা হয় এবং ৭ই জানুয়ারী দেশের সমস্ত সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। এর অর্থ দাঁড়ায় যে, আটকের কারণসমূহ ৬ই জানুয়ারী তৈরি করা হয়। কিন্তু ৮ দিন বিলম্ব করে তা আমার কাছে পাঠানো হয়। এটা স্পষ্টত সেই আইনবিরোধী যার সাহায্যে আমাকে গ্রেফতার করা হয়েছে– এর ৩ ধারার (৬) উপধারায় বলা হয়েছে যে, আটক ব্যক্তিকে যতদূর সম্ভব শীঘ্রই তার গ্রেফতার ও আটকের কারণসমূহ জানিয়ে দিতে হবে। এ কাজের কি কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ দর্শানো যেতে পারে যে, ৬ই জানুয়ারী প্রকাশিত প্রেসনোটের সংক্ষিপ্তসার ৮ দিনের কম সময়ে বের করা যেতে পারতো না?

২। আপনার পত্র পাওয়ার পর দ্বিতীয় দিনই আমি আপনার নিকট আবেদন জানাই যে, আটকের কারণসমূহের জবাব দেয়ার জন্যে আমাকে বাইরে থেকে প্রয়োজনীয় বইপত্র আনবার অনুমতি দেয়া হোক। কিন্তু এ অনুমতি দেয়ার ব্যাপারে আপনি আরও দেরী করেন এবং প্রয়োজনীয় বইপত্র ৪ঠা ফেব্রুয়ারীর আগে আমি হাসিল করতে পারিনি। এভাবে পূর্ণ একটি মাস আপনি এমনভাবে কাটিয়ে দেন যে, জননিরাপত্তা অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে কোন আটক ব্যক্তি নামকাওয়াস্তে তার বক্তব্য পেশ করার যে সুযোগ লাভ করে তা থেকেও আমি কোনরূপ উপকৃত হতে পারিনি। এ দেরীর জন্যে আপনার দফতরের কার্যধারার দীর্ঘসূত্রিতার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। এ দীর্ঘসূত্রিতার দণ্ড সেই ব্যক্তি ভোগ করবে কেন যার আযাদী আপনারা ছিনিয়ে নিয়েছেন?

৩। আমি ১৪ই জানুয়ারীর আবেদনে আপনার নিকট এও আরয করেছিলাম যে, আটকের কারণসমূহের জবাব দানের জন্যে আমাকে আমার

উকিলগণের সঙ্গে পরামর্শ করার অনুমতি দেয়া হোক। ১লা ফেব্রুয়ারী আমি পুনর্বার এ আবেদন জানালাম। এর বেশ কয়েকদিন পর জেলা সুপারিন্টেন্ডেন্টের মাধ্যমে আমি আপনার পক্ষ থেকে এ জবাব পেলাম যে, আমি উকিলদের সঙ্গে পরামর্শ করতে পারি। কিন্তু এ সাক্ষাতের সময় সি,আই,ডি-এর এক ব্যক্তি উপস্থিত থাকবেন। নিঃসন্দেহে এটি একটি অন্যায় শর্ত ছিল। এই শর্তসহ আইন সম্পর্কিত পরামর্শ করা আমার জন্যে একেবারেই অনর্থক ছিল। কোন ব্যক্তির অভিযোগ যে পক্ষের বিরুদ্ধে এবং ঐ অভিযোগ খণ্ডনের জন্যে নিজের উকিলদের সঙ্গে যে আইন সম্পর্কিত পরামর্শ করতে চায়, তার নিজের উকিলের সঙ্গে আলোচনার সময় অন্য পক্ষ যার বিরুদ্ধে তার অভিযোগ তার এজেন্ট মধ্যস্থলে থাকবেন, এটা সাধারণ বুদ্ধিবিবেক ও জ্ঞানের সঙ্গে মোটেই সামঞ্জস্যশীল নয়।

মনে করুন আটক ব্যক্তি ও তার উকিল এ সিদ্ধান্ত করে যে, এই আটকের বিরুদ্ধে বন্দিত্বের কারণ প্রদর্শন (Habious Corpus) করার অবকাশ আছে। এ আলোচনায় সি,আই,ডি-এর লোকের উপস্থিতির অর্থ এই এ দাঁড়ায় যে, হেবিয়াস করপাসের আবেদন আদালতে পৌছবার আগেই আপনি এর বিষয়াবলী অবগত হবেন এবং তা ব্যর্থ করার জন্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন। এটা কি পরিষ্কার ইনসাফ-হত্যা নয়?*

৪। আপনি এ পত্রে গ্রেফতারী ও আটকের যত কারণ বর্ণনা করেছেন, তন্মধ্যে সপ্তম কারণ ছাড়া বাকি সবগুলোই অস্পষ্ট, অস্বচ্ছ এবং নিছক অভিযোগ। এথেকে জানা যায় যে, এ অভিযোগগুলোর ভিত্তি কি। এভাবে আটকের কারণ বর্ণনা করা বা না করা একই কথা।

৫। আপনার বিবৃত আটকের কারণসমূহের মধ্যে পঞ্চম কারণে বলা হয়েছে যে, জামায়াতে ইসলামী ১৯০৮ সালের সংশোধিত ফৌজদারী আইন অনুযায়ী বেআইনী গণ্য হওয়ার পূর্বে অমুক অমুক কাজে লিপ্ত ছিল এবং তুমি এর আমীর হিসাবে সে সব কাজে শরীক ছিলে। এজন্যে তোমাকে আটক করা হয়েছে।

---

* আমি এজন্যে কৃতজ্ঞ যে, তারা ২৬শে ফেব্রুয়ারী আমার এ অভিযোগ দূর করেছেন।

এ আটকের ব্যাপার ঠিক সেই দিন এবং সেই সময় অনুষ্ঠিত হয়, যেদিন এবং যে সময় ১৯০৮ সালের সংশোধিত ফৌজদারী আইনের সাহায্যে জামায়াতে ইসলামী বেআইনী ঘোষিত হয়। এর পরিষ্কার অর্থ এই যে, এ আটক আমার অতীতের কার্যাবলীর (তর্কের খাতিরে কিছুক্ষণের জন্যে যদি তা মেনে নেয়া হয়) শাস্তি। অথচ যে আইনের সাহায্যে আমাকে গ্রেফতার ও আটক করা হয়েছে, তা আপনাকে Preventive Detention- এর ক্ষমতা দেয়, Punitive Detention- এর নয়। এভাবে আপনি আসলে আইনের সীমা লঙ্ঘন করেছেন। সরকারের যদি এ আশঙ্কা থাকে যে, জামায়াতে ইসলামী বেআইনী ঘোষণা করার পরও আমি সেই কাজ করব, যার কারণে জামায়াত বেআইনী ঘোষণা করা হয়েছে, তাহলে সেজন্যে ১৯০৮ সালের সংশোধিত ফৌজদারী আইনের ১৭ ধারার ১, ২ ও ৩ উপধারা ছিল। সেখানে জননিরাপত্তা অর্ডিন্যান্স ব্যবহার করার প্রয়োজন কি ছিল? এ থেকে কি প্রমাণ হয় না যে, সরকার আমাকে গ্রেফতার করার জন্যে বড়ই অস্থির ছিলেন? এজন্যে জামায়াত নিষিদ্ধ ঘোষিত হওয়ার পরও আমি সে কাজ করি বা না করি তা দেখার জন্যে সরকার সামান্য অপেক্ষা করতেও পারেননি, বরং জননিরাপত্তা অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে আমাকে আমার অতীত কাজের শাস্তি দিয়ে দিলেন।

৬। আটকের কারণসমুহের মধ্যে ৫ম ও ৭ম কারণদ্বয়ের যে অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে আপনি আমাকে গ্রেফতার ও আটক করেছেন তা কর্মসীমা বহির্ভূত। তাতে আপনি আমার বিরুদ্ধে যে সব কাজের অভিযোগ করেছেন, তর্কের খাতিরে যদি ধরে নেয়া হয় যে, তা আমি করেছি, তাহলেও সেজন্যে আপনি জননিরাপত্তা অর্ডিন্যান্স মারফত পদক্ষেপ গ্রহণ করার অধিকার রাখেন না।

৭। ৭ম কারণটি প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স অর্ডিন্যান্সের সীমায় এসে যায়। আর এর মাধ্যমে আপনি আমার পত্রিকা তর্জুমানুল কোরআনকে ইতঃপূর্বেই ৬ মাসের জন্যে বন্ধ করে দিয়েছেন। এখন সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে এবং আইনের সীমা লঙ্ঘন করে জননিরাপত্তা অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে আমাকেও এ প্রবন্ধটি প্রকাশ করার শাস্তি দেয়া হয়েছে।

আটক করার কারণসমূহ সম্পর্কে কতিপয় সাধারণ আলোচনা

এই আইনসঙ্গত আপত্তিগুলো অবতারণা করার পর আমি সেই কারণসমূহ পর্যালোচনা করতে চাই, যেগুলোকে আপনি আমার গ্রেফতার ও আটকের কারণ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। সেগুলো একটার পর একটা পর্যালোচনা করার আগে আমি পূর্ণ দায়িত্ববোধের সঙ্গে সুস্পষ্ট ও দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করতে চাই যে, আপনার পত্রে আমার গ্রেফতার ও আটকের যে সব কারণ দেখানো হয়েছে, সেগুলো আসল কারণ নয়। বরঞ্চ আসল কারণ অন্য কিছু এবং সেগুলো এমন কারণ যা প্রকাশ করতে সরকার নিজেও পেরেশানী অনুভব করেন।

প্রথম কারণ হলো এই যে, ১৯৬৩ সালের রাওয়ালপিণ্ডির এক জনসভায় বক্তৃতাদানকালে আমি দাবি করেছিলাম যে, কালাত, খারান, মাকরান, বাহওয়ালপুর এবং অন্যান্য সীমান্ত রাষ্ট্রগুলোকে যেভাবে পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়েছে, ঠিক একইভাবে গুরুত্বপূর্ণ সোয়াত ও দীর রাজ্য প্রভৃতিকে পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে সংযুক্ত করা উচিত। এবং পাকিস্তানের অন্যান্য নাগরিক যে সব সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার ভোগ করছে, এসব এলাকার অধিবাসীদেরও সে সব সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার দান করা উচিত। আমার দাবি পূর্ণ আইনানুগ ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ছিল যে, যখন প্রাক্তন ব্রিটিশ ভারতের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্র পাকিস্তান ও ভারতের সাথে যুক্ত হলো, তখন গোলামী যুগের এই শেষ চিহ্নটিকেও বা কেন অপসারণ করা হবে না? এমনি পরিষ্কারভাবে একটি নির্ভুল কারণ ব্যক্ত করার দরুন সরকারের কতিপয় ঊর্ধ্বতন ব্যক্তি অস্বস্তি অনুভব করেন এবং ক্রোধে ফেটে পড়েন।

দ্বিতীয়ত, জামায়াতে ইসলামীর প্রচেষ্টায় ক্ষমতাসীন দল রাওয়ালপিণ্ডি ও হায়দারাবাদে দু'টি উপনির্বাচনে পরাজয় বরণ করে। এটি ক্ষমতাসীন ব্যক্তিদের ক্রোধবহ্নিকে উসকিয়ে দেয়। এ নির্বাচন দু'টি অনুষ্ঠিত হয় যথাক্রমে ১৯৬৩ সালের সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে।

তৃতীয়ত, ক্ষমতাসীন ব্যক্তিবর্গ জামায়াতে ইসলামীর সুসংগঠিত আন্দোলনকে নিজেদের কনভেনশন মুসলিম লীগের পথে বিরাট বাধাস্বরূপ মনে

করতেন এবং আগামী নির্বাচনের আগে বিরোধী দলেরই সবচাইতে সুসংবদ্ধ দলকে খতম করে দেয়া এবং তার নেতৃবর্গকে ময়দান থেকে সরিয়ে দেয়া জরুরী মনে করতেন। কেননা উপনির্বাচনের ফলাফল প্রত্যক্ষ করে তারা বুঝতে পেরেছিলেন যে, আগামী নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামী সরকারী দলের শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী প্রমাণিত হবে।

এসব কারণে আমার ও জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে পর পর যে সব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়, সেগুলো আমি তারিখ মতে ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করছি।

'৬৩ সালের ২১শে সেপ্টেম্বর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দফতরের জনৈক দায়িত্বশীল অফিসার টেলিফোনে আমাকে হুমকি দেন যে, কনভেনশন লীগের বিরুদ্ধে সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে আপনি যা বলেছেন, সে সম্পর্কে সংবাদপত্রে নিজের ভুল স্বীকার করুন, নয়তো সরকার আপনার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন (দেখুন 'নওয়া-ই-ওয়াক্ত' ২২শে সেপ্টেম্বর ১৯৬৩)। হুমকি প্রদানের এ ব্যাপারটিকে আমি সঙ্গে সঙ্গেই দেশের বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্যে পাঠাই এবং তা প্রকাশ হয়। কেননা এ থেকে অনুমান করা গিয়েছিল যে, আমার ও জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গৃহীত হবে।

১৬ই অক্টোবর জামায়াতে ইসলামীর নিখিল পাকিস্তান সম্মেলনে ব্যবহারের জন্যে লাউড স্পীকারের অনুমতি দানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা হয়। অথচ ১৪ই সেপ্টেম্বর থেকে ১৩ই অক্টোবর পর্যন্ত লাহোরে পর পর সাত-আটটি এমন জনসভা অনুষ্ঠিত হয় এবং সেগুলোর প্রত্যেকটিতে ১৪৪ ধারার উপস্থিতিতেও লাউড স্পীকারের অনুমতি দেয়া হয়। এ পরিস্থিতিতে এমন একটি সম্মেলনের জন্যে যেখানে পাকিস্তানের সকল এলাকা থেকে প্রায় সাত হাজার ডেলিগেট আসছিল এবং লাহোর শহরেও হাজার হাজার লোক শরীক হতে যাচ্ছিল, সেখানে লাউড স্পীকারের অনুমতি না দেয়া এ কথারই সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, ক্ষমতাসীন ব্যক্তিবর্গের মনে জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে একটি বিশেষ প্রতিশোধ স্পৃহা সক্রিয় আছে।

১৭ই অক্টোবর লাহোরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের উপরোল্লিখিত অন্যায়ের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্যে পশ্চিম পাকিস্তান হাইকোর্টে দরখাস্ত পেশ করা

হয়। ২২শে অক্টোবর এর ফয়সালা হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু হাইকোর্ট তার ফয়সালা শুনাবার পূর্বেই পশ্চিম পাকিস্তান গভর্ণর একটি বিশেষ অর্ডিন্যান্স মারফত সমগ্র প্রদেশে লাউড স্পীকার ব্যবহারের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। এ থেকে একথা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা গভর্ণরের আছে, তাকে বিশেষ করে জামায়াতে ইসলামীর সম্মেলন ব্যর্থ করার জন্যে ব্যবহার করা হয়েছে।

২৫শে অক্টোবর জামায়াতে ইসলামীর সম্মেলন শুরু হচ্ছিল। এর ঠিক একদিন আগে কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্র উজির আমার ও জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে একটি ভীষণ কঠোর ও উত্তেজনাপূর্ণ বিবৃতি প্রকাশ করেন এবং সম্মেলনের দিন প্রভাতী সংবাদপত্রসমূহে প্রাদেশিক সরকারের কতিপয় উজিরের বিবৃতিও প্রকাশিত হয়। ঠিক এই সময় হঠাৎ এই ধরনের ক্রোধের তুফান প্রবাহিত হওয়ার কারণ কি? এর কারণ কি এ ছাড়া অন্য কিছু ছিল যে, সরকার লাহোরের মত একটি কেন্দ্রীয় স্থানে জামায়াতে ইসলামীর শক্তি ও সংগঠনের প্রকাশকে বরদাশত করতে পারছিলেন না।

২৫শে অক্টোবর পূর্বাহ্নে জামায়াতে ইসলামীর সভায় গুণ্ডামী করানো হয়। তাতে পুলিশ যে নীতি অবলম্বন করে লাহোরের প্রায় তিরিশ-চল্লিশ হাজার লোক তা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করে। সংবাদপত্রসমূহের মাধ্যমে সমগ্র দেশ সে সম্পর্কে অবগত হয়। পাকিস্তানের বাইরে বিভিন্ন দেশেও এই লজ্জাকর ঘটনার বিবরণ পৌঁছে যায়। প্রকাশ্য দিবালোকে মানুষের চোখের সামনে গুণ্ডা আনা হয়। তারা ক্যাম্পে অগ্নিসংযোগ করে। শামিয়ানার দড়ি কেটে দেয়। বইয়ের স্টলগুলো লুট করে। মহিলাদের ক্যাম্পেও ইট ও সোডাওয়াটারের বোতল নিক্ষেপ করে। একটি বইয়ের স্টল থেকে কোরআন মজীদগুলো তুলে নিয়ে ইট পাথরের মতো সভার উপর নিক্ষেপ করে। এমনকি অবশেষে একজন নিরপরাধ ব্যক্তিকে পিস্তলের গুলীতে নিহত করে।

এ সমস্তই পুলিশের উপস্থিতিতে সংঘটিত হচ্ছিল এবং পুলিশ দাঁড়িয়ে হাসছিল। এর মধ্যে প্রত্যেকটি কাজ এমন ছিল যার উপর পুলিশের হস্তক্ষেপ করা উচিত ছিল। কিন্তু একজন গুণ্ডাকেও গ্রেফতার করা হয়নি। হত্যাকারীকেও পুলিশ নিজে পাকড়াও করেনি। বরং জামায়াতের কর্মীগণ তাকে ধরে জোরপূর্বক পুলিশের নিকট সোপর্দ করে এবং তাদের বারবার চাপ দেয়ার ফলে পুলিশ

হত্যাকারীকে আটক করে। শাসন কর্তৃপক্ষের মুখ থেকে স্বীকৃতি বের হোক বা না হোক, তাদের বিবেক খুব ভাল করেই জানে যে, এসব কে করিয়েছে এবং কি উদ্দেশ্যে করিয়েছে? তাছাড়া লাহোরে ল' এন্ড অর্ডার কায়েম রাখার দায়িত্ব যে সব শাসকের ওপর ছিল, তাদের একজনও এ গোপন রহস্য সম্পর্কে অনবহিত নন যে, আইনের সংরক্ষকদের দ্বারা আইনকে অপদস্থ করলো কারা?

যে উদ্দেশ্যে এ জঘন্য ষড়যন্ত্র করা হয়, তা আসলে এই ছিল যে, জামায়াতে ইসলামীর কর্মীগণ কোন না কোন প্রকারে গুণ্ডাদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হবে এবং তাদের ওপর গুলী চালিয়ে সমগ্র জামায়াতকে দাঙ্গাকারী গণ্য করে বেআইনী ঘোষণা করার সুযোগ পাওয়া যাবে। কিন্তু জামায়াত কর্মীগণের ধৈর্য ও সংযম এ ষড়যন্ত্রটি বানচাল করে দেয়।

এরপর মাত্র এক সপ্তাহ অতিবাহিত হয়। জামায়াতকে কোনক্রমে ফাঁসানোর জন্যে আবার তার বিরুদ্ধে অন্য একটি ষড়যন্ত্র তৈরি করা হয়। '৬৩ সালের ৬ই নভেম্বর পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিয়নের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছিল। এর মাত্র দু'দিন আগে ইউনিয়নের সভাপতি পদপ্রার্থী বারাকাল্লাহ খানকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হয়। এ পদক্ষেপের অবশ্যম্ভাবী ফল এই ছিল এবং কার্যত এটিই প্রকাশিত হয় যে, ছাত্রদের মধ্যে ব্যাপক অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়ে। এজন্যে ইউনিয়নের সমস্ত পদের সকল প্রার্থী যাদের সংখ্যা ছিল প্রায় ৬৫, একই সঙ্গে প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করে। তারা সঙ্গে সঙ্গে একটি এ্যাকশন কমিটি গঠন করে। ৪ঠা নভেম্বর ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একটি শোভাযাত্রা বের করে। তাদের সঙ্গে লাউড স্পীকার ছিল। (এই শোভাযাত্রা ও লাউড স্পীকার ব্যবহার যদি বেআইনী হয়ে থাকে, তাহলে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষাকারীরা বিশ্ববিদ্যালয়েই তাদেরকে বাধা দেয়নি কেন? বিপরীতপক্ষে তারা শোভাযাত্রাকে এতদূর পর্যন্ত অগ্রসর হতে দেয় যার ফলে ভীড় অত্যন্ত বেড়ে যায় এবং অন্যান্য মতলববাজও ভীড়ের মধ্যে শামিল হয়ে যায়।) তারপর হঠাৎ চ্যারিং ক্রসের কাছে তাদের ওপর লাঠিচার্জ করে তাদেরকে বিক্ষিপ্ত করা হয় এবং তাদের বহু নেতাকেও গ্রেফতার করা হয়। এ কার্যাবলীর পরিষ্কার উদ্দেশ্য ছিল তাদেরকে অধিকতর উত্তেজিত করে ল' এন্ড অর্ডারের শক্তির সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ বাঁধিয়ে দেয়া। অতঃপর এর সমস্ত দোষ জামায়াতে ইসলামীর ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়া। প্রথম দিন থেকে এ ঘটনাবলী সম্পর্কে যেভাবে অনুসন্ধান চালানো হয় এবং শেষ পর্যন্ত তা যেভাবে জারি থাকে, তাতে একথা পূর্ণরূপে পরিস্ফুট হয় যে, আসল উদ্দেশ্য

হলো জামায়াতে ইসলামীকে ফাঁসানো। সে সময় সংবাদপত্র ও রেডিওতে দেশের প্রেসিডেন্ট থেকে নিয়ে উজির সাহেবান পর্যন্ত যে সব বিবৃতি প্রকাশ করছিলেন, তাতেও এই একই উদ্দেশ্যের প্রতিচ্ছায়া পরিলক্ষিত হচ্ছিল। এ থেকে প্রকাশ্যে একথা প্রমাণ হচ্ছিল যে, শাসন কর্তৃপক্ষ জামায়াতে ইসলামীকে ছাত্রদের এই হাঙ্গামায় জড়িয়ে ফেলার জন্যে কত বেশী অস্থির। কিন্তু সমস্ত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এ ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হলো এবং এই হাঙ্গামার ব্যাপারে জামায়াতকে দায়ী করার জন্যে কোন প্রমাণ পাওয়া গেল না।

জামায়াতে ইসলামী কোন অপরাধ করবে এবং তারপর তাকে পাকড়াও করা হবে, সরকার আর কতদিনই বা এর অপেক্ষায় থাকতে পারেন? আবার এও বা কেমন করে হতে পারে যে, যে জামায়াত কনভেনশন লীগের উন্নতির অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে, সে যদি কোন অপরাধ না করে তবু কি তাকে পাকড়াও করা যাবে না?

সংশোধিত ফৌজদারী আইন এবং পিটিশন অব পাবলিক অর্ডারকে তো এ জন্যেই আইনের বারুদখানায় রাখা হয়েছে যে, যারা অপরাধ করে না, তাদেরকে পাকড়াও করার প্রয়োজন যখন দেখা দেবে, তখন এগুলো কাজে লাগবে। কাজেই ৬ই জানুয়ারী এ দু'টি অস্ত্রের সাহায্যে আমাকে ও আমার জামায়াতকে শিকার করা হয় এবং আমার বিরুদ্ধে সেই সব অভিযোগ আনীত হয়, যা ৬ই জানুয়ারী সরকারী প্রেসনোট এবং আপনার প্রেরিত গ্রেফতার ও আটকের কারণসমূহের মধ্যে বর্ণিত হয়েছে।

যে কারণে আমি এ দাবি করছি যে, এসব অভিযোগ সরকারের ঐ পদক্ষেপের আসল কারণ নয়, তা হলো এই যে, আমার ও জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে সরকার এ অভিযান ১৯৬৩ সালের তৃতীয় সপ্তাহ থেকে শুরু করেছেন এবং এ ব্যাপারে সেই সব অভিযোগ আনীত হয়েছে, যার মধ্যে দু'টি (অর্থাৎ লাহোরে ছাত্রদের হাঙ্গামা এবং তর্জুমানুল কোরআনের প্রবন্ধ) এ অভিযান শুরু হওয়ার পরবর্তীকালের ঘটনাবলীর সঙ্গে সম্পর্কিত। আর বাদ বাকী অভিযোগগুলো কয়েক বছরের পুরাতন ব্যাপার ও ঘটনাবলীর সঙ্গে সম্পর্কিত।

এবার আমি আমার গ্রেফতার ও আটকের ব্যাপারে আপনি যে সব কারণ দেখিয়েছেন, তার এক একটির ওপর পৃথকভাবে আলোচনা করে তাদের স্বরূপ উদঘাটন করব।

বল প্রয়োগে ক্ষমতা দখল

আপনার প্রথম অভিযোগ এই যে, জামায়াতে ইসলামীর উদ্দেশ্য ছিল বলপ্রয়োগে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা দখল করা, কিন্তু জামায়াতের এ উদ্দেশ্যটা আপনি কি উপায়ে জানতে পারলেন, তা আপনি বলেননি। কোন জামায়াতের উদ্দেশ্যকে জানার দু'টোই উপায় হতে পারে। এক, তার কাজ। দুই, তার গঠনতন্ত্র, সিদ্ধান্তসমূহ ও দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের বিবৃতি। জামায়াতের কাজ সম্পর্কে বলা যেতে পারে যে, পাকিস্তান সরকারের স্বরাষ্ট্র উজির জনাব হাবিবুল্লাহ খান তাঁর '৬৩ সালের ২৩শে অক্টোবরের সাংবাদিক সম্মেলনে সমগ্র দুনিয়ার সামনে এ কথা স্বীকার করে নিয়েছেন যে, "জামায়াত আজ পর্যন্ত আইন ভঙ্গ করেনি"। এ সাংবাদিক সম্মেলনের রিপোর্ট '৬৩ সালের ২৪শে অক্টোবরের 'পাকিস্তান টাইমস' ও 'ডন'-এ দেখুন। এখন দ্বিতীয় উপায়টির বিস্তারিত বর্ণনা নীচে পেশ করা হলো ঃ

১। ১৯৪৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জামায়াতে ইসলামীর মজলিসে শূরা একটি প্রস্তাবের মাধ্যমে তার নিম্নোক্ত নীতি ঘোষণা করেছিল–

"এর (অর্থাৎ জামায়াতে ইসলামীর) চেষ্টা হলো দেশের (অর্থাৎ পাকিস্তানের) জীবন ব্যবস্থাকে পুরোপুরি ইসলামের ছাঁচে ঢালাই করা। নিজের এ উদ্দেশ্য সফলের জন্যে এ জামায়াতটি এমন পদ্ধতি ও উপায়-উপকরণ ব্যবহার বৈধ মনে করে না, যা সত্য ও সততা বিরোধী অথবা যা থেকে বিশৃঙ্খলা ও অশান্তির সৃষ্টি হয়। সে সংশোধন ও বিপ্লবের জন্যে গণতান্ত্রিক পদ্ধতির ওপর বিশ্বাস রাখে। অর্থাৎ প্রচার-প্রোপাগান্ডার মাধ্যমে মন-মগজ, চরিত্র সংশোধন এবং যে সব পরিবর্তন সাধন আমাদের লক্ষ্য তার জন্যে জনমত গঠন। জামায়াতের কোন কাজ গোপনে অনুষ্ঠিত হয় না। বরঞ্চ সবকিছুই হয় প্রকাশ্যে। যে সব আইনের ওপর দেশের বর্তমান শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত, সেগুলোকে সে ভঙ্গ করতে চায় না, বরঞ্চ ইসলামী রীতি অনুযায়ী সেগুলো পরিবর্তন করতে চায়। যে সব লোক দেশের শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করছেন, তাদেরকে সরিয়ে দেয়া বা নিজেরা তাদের স্থান দখল করা তাদের লক্ষ্য নয়। বরঞ্চ সে তাদেরকে

সংশোধন করতে চায় এবং যদি তারা সংশোধন গ্রহণ না করে, তাহলে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে তাদেরকে পরিবর্তন করে তাদের স্থলে এমন লোক বসাতে চায়, যারা সংশোধিত জনমতের দৃষ্টিতে সৎ বলে বিবেচিত হবেন।"

(তর্জুমানুল কোরআন, সেপ্টেম্বর, ১৯৪৮ সাল, পৃঃ ৩২৯-৩৩০)

২। জামায়াত ১৯৫৩ সালে যে গঠনতন্ত্র প্রকাশ করে, তার ১০ম ধারায় এবং আবার ১৯৫৭ সালে যে সংশোধিত গঠনতন্ত্র প্রকাশ করে, তার ৫ম ধারায় এ কথা পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করা হয় যে–

"উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হাসিলের জন্যে জামায়াত কখনও এমন উপায় ও পদ্ধতি ব্যবহার করবে না, যা সত্য ও সততা বিরোধী অথবা যার ফলে দুনিয়ায় বিপর্যয় সৃষ্টি হয়। জামায়াত তার উদ্দেশ্যে বিবৃত সংস্কার ও বিপ্লব সাধনের জন্যে গণতান্ত্রিক ও আইনানুগ পদ্ধতিতে কাজ করবে। অর্থাৎ প্রচার, প্রোপাগান্ডা ও চিন্তার প্রসারের মাধ্যমে মন, মগজ ও চরিত্র সংশোধন করতে হবে এবং যে সব পরিবর্তন সাধন জামায়াতের লক্ষ্য সেগুলোর জন্যে জনমত গঠন করতে হবে। জামায়াত তার লক্ষ্যে পৌছার জন্যে গোপন পদ্ধতিগুলোর অনুকরণে প্রচেষ্টা চালাবে না, বরঞ্চ প্রকাশ্যে জনসমক্ষে প্রচেষ্টা চালাবে।

(এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, জামায়াতে ইসলামীর প্রত্যেকটি সদস্য জামায়াতে প্রবেশ করার সময় এ গঠনতন্ত্র মেনে চলার জন্যে দস্তুরমত শপথ গ্রহণ করে।)

৩। ১৯৫১ সালের ১০ই নভেম্বর জামায়াতে ইসলামীর নিখিল পাকিস্তান সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে মরহুম জনাব লিয়াকত আলী খানের শাহাদাতের ঘটনা সম্পর্কে মন্তব্য প্রসঙ্গে আমি বলেছিলাম–

"কোন দেশে ফয়সালা করার শেষ ক্ষমতা বুদ্ধি, বিবেক ও যুক্তি জনমতের নিকট থেকে ছিনিয়ে নিয়ে বিচারপতির তলোয়ারের হাতে সোপর্দ করে দেয়ার চাইতে বড় কোন দুর্ভাগ্য আর হতে পারে না। যে জাতি নিজে নিজের দুশমন নয় এবং যার বিবেক দেউলিয়া হয়ে যায়নি, সে এমন নির্বোধ হতে পারে না যে, তার বিভিন্ন বিষয়ের ফয়সালার ভার বিবেক ও যুক্তির পরিবর্তে তলোয়ারের অন্ধ ও ঘুষখোর বিচারপতির উপর ন্যস্ত করবে। যদি আমরা নিজেদের ভবিষ্যত অন্ধকার করতে না চাই, তাহলে আমাদেরকে পূর্ণ শক্তিতে

নিজেদের দেশের অবস্থার এহেন ভয়াবহ দিকে গতি পরিবর্তিত হতে না দেয়া উচিত। আমাদের এবং বিশেষ করে আমাদের দায়িত্বশীল লোকদের এখানে এমন অবস্থা সৃষ্টি করা এবং কায়েম রাখার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করা উচিত, যাতে শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে এমন সব রকমের রাজনৈতিক পরিবর্তন সাধন সম্ভবপর হয়, যার সপক্ষে জনমত গড়ে উঠেছে।"

(আমাদের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক সমস্যা, ১৪ পৃষ্ঠা, প্রকাশক মাকতাবা জামায়াতে ইসলামী)

৪। ১৯৫৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে জামায়াতে ইসলামীর নিখিল পাকিস্তান সম্মেলনে একটি প্রস্তাব পাস করা হয়। তাতে পরিষ্কার বলা হয় ঃ

"যেহেতু জামায়াতে ইসলামী তার গঠনতন্ত্র অনুযায়ী সংস্কার ও বিপ্লব সাধনের পরিকল্পনার জন্যে আইনানুগ পদ্ধতিতে কাজ করতে বাধ্য এবং পাকিস্তানে কার্যত এই সংস্কার ও বিপ্লব সৃষ্টির একটি মাত্র পথ আছে, আর তা হলো নির্বাচনের পথ, সেহেতু জামায়াতে ইসলামী অবশ্য দেশের নির্বাচনসমূহ থেকেও অসম্পর্কিত থাকতে পারে না। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অথবা প্রয়োজনবোধে উভয় পদ্ধতিতেই সে এতে অংশগ্রহণ করতে পারে।"

(ইসলামী আন্দোলনের ভবিষ্যত কর্মসূচী, ১৪ পৃষ্ঠা)

৫। ১৯৫৮ সালে জামায়াতে ইসলামী তার নির্বাচনী ইশতেহার প্রকাশ করে। তাতে তার এ উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয় ঃ

"এমন একটি সত্যিকার গণতন্ত্র কায়েম করা, যাতে নিজেদের পছন্দমত লোককে ক্ষমতাসীন করতে সক্ষম হবে এবং যাদেরকে তারা পছন্দ করে না তাদেরকে কর্তৃত্বের আসন থেকে সরিয়ে দিতে পারবে।"

(নির্বাচনী ইশতেহার, পৃষ্ঠাঃ ১৪)

৬। গত বছর হজ্জের সময় আমি মক্কা মুয়াযযমায় আরব দেশসমূহ থেকে আগত নওজোয়ানদেরকে সম্বোধন করার সুযোগ লাভ করেছিলাম। এ বক্তৃতায় আমি তাদেরকে পরামর্শ দিয়েছিলাম যে, তাদের নিজেদের দেশে সশস্ত্র বিপ্লব সাধনের প্রচেষ্টা পরিহার করা উচিত এবং শান্তিপূর্ণ, আইনানুগ ও গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সংস্কার সাধনের চিন্তা করা উচিত। আমার এ বক্তৃতা সমস্ত

আরব দেশে প্রকাশিত হয়েছে। তর্জুমানুল কোরআন পত্রিকায় এর উর্দূ তর্জমাও প্রকাশিত হয়েছে। তার শেষাংশ হলো এই–

"আমার শেষ নসিহত হলো এই যে, তাদের গোপন আন্দোলন পরিচালনা করে এবং অস্ত্রের মাধ্যমেই বিপ্লব সাধনের জন্যে প্রচেষ্টা চালানো উচিত নয়। ..... একটি নির্ভুল ও সত্যিকার বিপ্লব হামেশা গণ-আন্দোলনের মাধ্যমেই সাধিত হয়। প্রকাশ্যে ও ব্যাপকভাবে দাওয়াতের কাজ করুন, বিরাটভাবে মন, মগজ ও চিন্তাশুদ্ধির কাজ করুন। মানুষের চিন্তাধারা পরিবর্তন করুন। নৈতিকতার অস্ত্র দিয়ে মনের ওপর বিজয় লাভ করুন। এমন প্রচেষ্টায় যে সব বিপদ ও প্রতিবন্ধকতা দেখা দেবে, সৎ সাহসের সঙ্গে তার মোকাবিলা করুন। এভাবে পর্যায়ক্রমে যে বিপ্লব সাধিত হবে, তা এমন স্থায়ী ও শক্তিশালী হবে যে, বিরোধী শক্তিসমূহের কাল্পনিক তুফান তাকে বিলুপ্ত করতে পারবে না। তাড়াতাড়ি কৃত্রিম পদ্ধতিতে কোন বিপ্লব সাধিত হলেও যে পথে সে আসবে, সেই পথেই তাকে বিলুপ্ত করে দেয়া যেতেও পারবে।"

(তর্জুমানুল কোরআন, জুন, ১৯৬৩)

৭। ১৯৬৩ সালের ১০ই নভেম্বর আমি পাকিস্তানে সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতেও নিজের এ চিন্তার পুনরাবৃত্তি করি। এ বিবৃতি নাওয়া-ই-ওয়াক্ত, মাশরিক এবং অন্যান্য পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। এর আসল শব্দগুলো এই–

"আমি নীতিগতভাবে আইন ভঙ্গ, বেআইনী পদ্ধতি ও গোপনে কাজ করার ভীষণ বিরোধী। আমার মত হলো এই যে, কারো ভয়ে বা কোন সাময়িক প্রয়োজনে নয়, বরং বছরের পর বছর অধ্যয়ন করার পর আমি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, সুসভ্য সমাজের অস্তিত্বের জন্যে আইনের প্রতি সম্মানবোধ অপরিহার্য। কোন আন্দোলন এ সম্মানবোধকে যদি একবার নষ্ট করে, তাহলে তারপর মানুষকে আবার আইনের অনুগত করা তার নিজের পক্ষেও বড় কঠিন বরং অসম্ভব হয়ে পড়ে। অনুরূপভাবে গোপন সংগঠনের মধ্যেও এমন দোষ আছে যার ফলে এ পদ্ধতিতে কার্যরত ব্যক্তিরা নিজেরাই অবশেষে সমাজের জন্যে সেইসব লোকের চাইতেও বড় আপদে পরিণত হয়, যাদেরকে সরিয়ে দেয়ার জন্যে তারা এ পদ্ধতি গ্রহণ করে। এসব কারণে আমার আকীদা হলো এই যে, আইন এবং গোপন সংগঠন চরম ত্রুটিপূর্ণ। আমি যা কিছু করেছি সব সময়

প্রকাশ্যে করেছি এবং আইন কানুনের সীমার মধ্যে থেকেই করেছি। এমনকি যে সব আইনের ঘোর বিরোধী সেগুলোকেও আমি গণতান্ত্রিক ও আইনানুগ পদ্ধতিতে পরিবর্তন করার চেষ্টা করেছি, কিন্তু কখনও সেগুলো ভঙ্গ করিনি।

এগুলো ১৯৪৮ সাল থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত আমার ও জামায়াতে ইসলামীর প্রামাণ্য বিবৃতি। এখন জানানো উচিত যে, সরকারের কাছে কি প্রমাণ আছে, যার সাহায্যে তারা আমার ও জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে এ অভিযোগ উত্থাপন করেছেন যে, আমরা বল প্রয়োগে ক্ষমতা দখলের পক্ষপাতী? তাদের কাছে কি আমার বা জামায়াতে ইসলামীর কোন দায়িত্বশীল ব্যক্তির এমন কোন লেখা অথবা বক্তৃতা আছে, যা থেকে এ অর্থ প্রকাশ হয়? অথবা তারা এমন কোন দৃষ্টান্ত পেশ করতে পারবেন যে, গত ১৭ বছর জামায়াতে ইসলামী আইন বিরোধী কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে? যদি এমন কোন প্রমাণ তাদের কাছে থেকে থাকে, তাহলে তা জনসমক্ষে পেশ করছেন না কেন?

সরকার তার ৬ই জানুয়ারীর প্রেসনোটে এই অভিযোগের সমগ্র বুনিয়াদটিই কেবল মুনীর রিপোর্টের একটি উদ্ধৃতির ওপর রেখেছেন। তাতে জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করা হয়েছে। কিন্তু স্মরণ করা উচিত যে, মুনীর রিপোর্ট কোন আদালতের ফয়সালা নয়। বরং একটি অনুসন্ধান কমিটির রিপোর্ট মাত্র। এ রিপোর্টে Terms of Reference এর সীমা লঙ্ঘন করে বিশৃঙ্খলভাবে অসম্পর্কিত আলোচনা করা হয়েছে। বিভিন্ন ব্যক্তি ও দলের ওপর নেহাত অযথা হামলা করা হয়েছে এবং এমন অদ্ভুত বিদ্রূপাত্মক ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে, যা কখনও কোন নিরপেক্ষ অনুসন্ধানকারী আদালতের যোগ্য হতে পারে না। এ আদালতের (বা অনুসন্ধান কমিটির) সামনে কখনো এ প্রশ্ন নিখুঁত পর্যালোচনা সাপেক্ষ হিসাবে স্থান পায়নি যে, জামায়াতে ইসলামীর আদর্শ কি, তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কি এবং তা হাসিল করার জন্যে সে কি কি উপায় অবলম্বন করতে চায়। এসব ব্যাপারে আমাকে বা জামায়াতে ইসলামীর কোন প্রতিনিধিকে কোন প্রশ্ন করা হয়নি। অথবা আমাদের সামনে এ অভিযোগ উত্থাপন করে আমাদের কাছ থেকে এর পক্ষে সাফাই চাওয়া হয়নি। এবং রিপোর্টের মধ্যে যেখানে এ অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছে, সেখানেও এর কোন প্রমাণ পেশ করা

হয়নি, যা থেকে কমিটি কিসের ভিত্তিতে আমাদের বিরুদ্ধে এ অভিযোগ উত্থাপন করেছেন, তা জানা যেতে পারে।

প্রশ্ন হলো এই যে, কোন রিপোর্টে, তা আদালতের অনুসন্ধান রিপোর্টেই হোক না কেন, এভাবে বিনা সাক্ষ্য প্রমাণে কোন জামায়াতের বিরুদ্ধে এই ধরনের একটা রায় দিয়ে দেয়াই কি সেই জামায়াত থেকে তার অস্তিত্বের অধিকার এবং তার নেতৃবৃন্দের আযাদীর অধিকার ছিনিয়ে নেয়ার জন্যে যথেষ্ট হতে পারে? আবার আজ দশ বছর অতীত হওয়ার পর এভাবে মুনীর রিপোর্টের সেই বাক্যটির সুযোগ গ্রহণের বৈধতাই বা কোথায়? মুনীর রিপোর্ট প্রকাশিত হয় ১৯৫৪ সালে আর তার ঐ মন্তব্যের ভিত্তিতে আমরা নিজেদের আযাদী ও জামায়াতের অস্তিত্বের অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছি ১৯৬৪ সালে। এতে যৌক্তিকতার নামগন্ধও আছে কি?

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা

গ্রেফতার ও আটকের কারণ প্রসঙ্গে দ্বিতীয় অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছে যে, 'জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার বিরোধী ছিল এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পাকিস্তান ও এর সরকারের বিরুদ্ধে অনবরত প্রকাশ্যে শত্রুতামূলক মনোভাব প্রকাশ করেছে।'

এ অভিযোগের দু'টি অংশ। প্রথম অংশ হলো, জামায়াত পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার বিরোধী ছিল এবং দ্বিতীয় অংশ হলো যে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকে অনবরত পাকিস্তান ও এর সরকারের প্রতি শত্রুতামূলক মনোভাব প্রকাশ করেছে। সম্ভবত দ্বিতীয় অংশটি এজন্যে বাড়ানো হয়েছে যে, প্রথম অংশটি অভিযোগকারীদের নিজেদের নিকটও এত বেশী বাজে মনে হয়েছে যে, নিছক এরই ভিত্তিতে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করাকে তারা অতীব হাস্যকর মনে করেছেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ষোল বছর পর এমন একটি জামায়াত, যে এই পূর্ণ ষোল বছর (সামরিক শাসনকাল ছাড়া) এখানে কাজ করেছে, তাকে 'পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার বিরোধী ছিল' এই অভিযোগ উত্থাপন করে বে-আইনী ঘোষণা করা এবং তার নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করা, বলা বাহুল্য প্রথম দৃষ্টিতেই প্রত্যেক ব্যক্তির কাছে হাস্যকর মনে হবে। এজন্যে একে যুক্তিসঙ্গত করার জন্যে এটুকু বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে যে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরও এ জামায়াতটি ষোল বছর ধরে শুধু সরকারের নয় বরং পাকিস্তানের বিরুদ্ধেও প্রকাশ্যে শত্রুতা প্রকাশ করে আসছে। কিন্তু এটুকু বাড়ানোর পরও কথাটি ঠিক ততটুকু হাস্যকরই থেকে যায় যতটুকু প্রথম অবস্থায় ছিল।

প্রশ্ন হলো, ১৯৪৭ সাল থেকে যখন জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানে কাজ শুরু করেছে, তখন থেকে ১৯৬২ সালের ৫ই জানুয়ারী পর্যন্ত যে অনবরত শত্রুতা জারি রইল এবং তা গোপনেও ছিল না বরং প্রকাশ্যে জারি ছিল, তা হঠাৎ ১৯৬৪ সালের ৬ই জানুয়ারী কেমন করে দৃষ্টিগোচর হলো? এ দীর্ঘ সময়ে এই প্রকাশ্য শত্রুতা উপেক্ষিত হয়েছিল কেন? এবং এখন এমন কি বিশেষ কারণ সৃষ্টি হয়েছে, যার ফলে সঙ্গে সঙ্গেই এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনের এবং এমন কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজন অনুভূত হলো? স্পষ্ট করে কেন বলা হলো না যে,

কনভেনশন লীগকে সম্প্রসারিত করার জন্যে বিরোধী গ্রুপের একটি সুসংগঠিত পার্টিকে ময়দান থেকে সরিয়ে দেয়ার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে? বিশেষ করে নির্বাচনের পূর্বে তো এ প্রয়োজন আরো অনেক বেড়ে গেছে।

অতঃপর এ অভিযোগের এক একটি অংশের ওপর আমি পৃথকভাবে আলোচনা করব। অভিযোগের প্রথম অংশ সম্পর্কে আমার জবাব হলো–

১। কিছুক্ষণের জন্যে যদি একথা মেনেও নেয়া হয় যে, জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার বিরোধী ছিল, তাহলে আমি জিজ্ঞেস করি যে, সে কি কংগ্রেসের চাইতেও বেশী বিরোধী ছিল? সবাই জানে যে, ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট পর্যন্ত পাকিস্তানের আসল লড়াই জারি ছিল কংগ্রেসের সঙ্গেই। কিন্তু এ সত্ত্বেও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরই কংগ্রেসের যে দলটি এদেশে ছিল, সেটি সঙ্গে সঙ্গেই পাকিস্তান কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করে। তার প্রতিনিধি আমাদের প্রথম ও দ্বিতীয় আইন পরিষদে ছিল। '৫৮ সালের অক্টোবর পর্যন্ত সে একটি মুসলিম বিরোধী দলরূপে প্রতিষ্ঠিত ছিল। এবং কখনও এ প্রশ্ন ওঠানো হয়নি যে, তোমরা যেহেতু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার বিরোধী ছিলে, তাই এখন তোমরা পাকিস্তানে একটি রাজনৈতিক দল হিসেবে কাজ করতে পার না। সামরিক শাসন প্রত্যাহারের পর পাকিস্তান কংগ্রেস পুনরুজ্জীবিত না হওয়ার পেছনে কোন আইন সঙ্গত কারণ নেই, বরং এটি এমন একটি ব্যাপার যেমন আওয়ামী লীগ, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি এবং অন্যান্য দল নিজেদেরকে পুনরুজ্জীবিত করেনি। পাকিস্তান কংগ্রেস যদি আজ নিজেকে পুনর্বহাল করতে চায়, তাহলে তার পথে আইনগত কোন প্রতিবন্ধকতা নেই।

২। কিন্তু এটা সম্পূর্ণ সত্যবিরোধী যে, জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার বিরোধী ছিল। জামায়াতে ইসলামী ১৯৪১ সালের আগস্ট মাসে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তখন থেকে ১৯৪৭ সালের আগস্ট পর্যন্ত পূর্ণ ছ'বছর সময়ে কি কোন ব্যক্তি দেখাতে পারেন যে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করার জন্যে জামায়াতে ইসলামী কোন সভা করেছিল? কোন প্রস্তাব পাস করেছিল? কোন শোভাযাত্রা বের করেছিল? নির্বাচনে মুসলিম লীগের মোকাবিলায় কোন প্রার্থী দাঁড় করিয়েছিল? অথবা মুসলিম লীগের কোন বিরোধী প্রার্থীকে সমর্থন করেছিল? অথবা জনগণকে বলেছিল যে, মুসলিম লীগের প্রার্থীদেরকে ভোট দিও না? অথবা অন্য কোনরূপে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার গতিরোধ করার জন্যে কোন কাজ করেছিল

অথবা কোন রকমের প্রচেষ্টা চালিয়েছিল? যদি এমন কোন প্রমাণ কারও কাছে থাকে তাহলে তা অবশ্য পেশ করা উচিত। কিন্তু জামায়াতে ইসলামীর রেকর্ডে যদি এমন কিছু না পাওয়া যায়, তাহলে মেহেরবানী করে জানানো হোক যে, জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার কি বিরোধিতা করেছিল? কবে করেছিল? কিভাবে করেছিল? বড়জোর এতটুকু বলা যায় যে, জামায়াত পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে মুসলিম লীগের সঙ্গে মিলিতভাবে অংশগ্রহণ করেনি। নিছক অংশগ্রহণ না করাকে কি বিরোধিতা বলা যেতে পারে?

৩। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় জামায়াতে ইসলামীর অংশগ্রহণ না করার কারণ এ ছিল না যে, জামায়াত মুসলমানদের জন্যে একটি পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্র কায়েম করতে চায় না। বরং এর তিনটি কারণ ছিল। এ কারণ তিনটি একাধিকবার জামায়াতে ইসলামীর বইপত্রে পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথম কারণ এই যে, মুসলমানদের মধ্যে এমন একটি জামায়াত থাকা জরুরী ছিল যে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে খোদা না খাস্তা যদি মুসলিম লীগ ব্যর্থ হয়ে যেত, তাহলে যেন জাতিকে সাহায্য করতে সক্ষম হতো এবং এ কারণে এই সংরক্ষিত শক্তিকে (Reserve Force) সংগ্রাম থেকে পৃথক রাখার প্রয়োজন ছিল। দ্বিতীয় কারণ এই যে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরও অবশ্য কয়েক কোটি মুসলমানকে ব্রিটিশ ভারতের সেই অংশে থাকতে হতো, যা পাকিস্তান পরিকল্পনার মাধ্যমে হিন্দুদের কর্তৃত্বাধীনে চলে যাচ্ছিল। দেশ বিভাগের পর ঐসব মুসলমানকে সাহায্য করার জন্যে অবশ্য মুসলিম লীগ কিছুই করতে পারত না। এ উদ্দেশ্যে অন্য একটি সুসংগঠিত দলকে প্রথম থেকে প্রস্তুত রাখার প্রয়োজন ছিল এবং এ দলকে পাকিস্তান সংগ্রাম থেকে পৃথক রাখারও প্রয়োজন ছিল, যাতে হিন্দু-ভারতে সে কাজ করতে সক্ষম হয়। তৃতীয় কারণ এই যে, পাকিস্তানের জন্যে যে দলটি (মুসলিম লীগ) কাজ করছিল তার সমস্ত দৃষ্টি একমাত্র রাজনৈতিক সংগঠন ও রাজনৈতিক সংগ্রামের উপরই নিবদ্ধ ছিল। নৈতিক ও দ্বীনী দিক থেকে দল ও জাতিকে শক্তিশালী ও দৃঢ় রাখার জন্যে তার পক্ষে কোন প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছিল না। এ পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে স্পষ্ট অনুভূত হচ্ছিল যে, এভাবে একটি দল সংগ্রাম করে যদি দেশ হাসিল করে তাহলে তাকে একটি ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত করা তো দূরের কথা, তাকে জাতীয় রাষ্ট্র হিসেবে শক্তিশালী ভিত্তিতে দাঁড় করাতেও সক্ষম হবে না। এবং সেখানে ভীষণ নৈতিক ও

আদর্শিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে। এ পরিস্থিতিতে এ প্রচেষ্টা চলাকালে মুসলমানদের মধ্যে এমন একটি সুসংগঠিত দল গঠনের প্রয়োজন ছিল যে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এ রাষ্ট্রকে নৈতিক ধ্বংস হতে রক্ষার এবং একে ইসলামের পথে পরিচালিত করার জন্যে কাজ করতে পারে । প্রশ্ন এই যে, এই দূরদর্শিতাপূর্ণ পরিকল্পনাকে কার্যকর করা কি গোনাহ্ ছিল? এর শাস্তি আজ সেই সব লোক জামায়াতে ইসলামীকে দিতে চায়, যাদের নিজেদেরও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় কোন উল্লেখযোগ্য অংশ নেই। এর শাস্তি মরহুম কায়েদে আযম দিলেন না, মরহুম লিয়াকত আলী খান দিলেন না, খাজা নাজিমুদ্দীন দিলেন না। তাঁদের সবার শাসনামলে জামায়াতে ইসলামী দস্তুরমত কাজ করে এসেছে।

৪। আমার যে সব রচনাকে আজ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার বিরোধিতার প্রমাণ হিসাবে পেশ করা হচ্ছে, তা ১৯৩৯ ও '৪০ সালে লিখিত। প্রথমত, এগুলোকে জামায়াতে ইসলামীর মাথায় নিক্ষেপ করা ভুল, কেননা জামায়াত ১৯৪১ সালের আগস্ট মাসে কায়েম হয়। দ্বিতীয়ত, ওগুলো সেই যুগের লেখা যখন মুসলমানদের মধ্যে সবেমাত্র এই আলোচনা চলছিল যে, ব্রিটিশ ভারতে তাদের জটিল সমস্যাবলীর সমাধান কি? তৃতীয়ত, ঐ লেখাগুলোর সত্যিকার উদ্দেশ্য ঐ উদ্ধৃতি থেকে বুঝা যায় না, যা সমগ্র রচনা থেকে পৃথক করে কাদিয়ানী এবং হাদীস অস্বীকারকারীগণ (মুনকেরীনে হাদীস) পেশ করেছেন এবং তাদের বিপরীত অর্থ করেছেন। বরং ওগুলোর আসল অর্থ সমস্ত সংশ্লিষ্ট প্রবন্ধকে পুরোপুরি পড়ার পরই বুঝা যেতে পারে। এসব প্রবন্ধ আমি মুসলমানদেরকে একথা বুঝানোর জন্যে লিখেছিলাম যে, একটি জাতীয় রাষ্ট্র কায়েম করা নয়, বরং একটি ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করাই তাদের আসল লক্ষ্য হওয়া উচিত এবং একটি ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করার জন্যে এমন কোন দলীয় সংগঠন উপযোগী হতে পারে না, যা নৈতিক ও দ্বীনী প্রাণবস্তুশূন্য। এ উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট করার জন্যে আমি আমার প্রবন্ধে যে আলোচনা করেছি, তা এ দেশের হাজার হাজার শিক্ষিত লোক পড়েছেন। তারা তা থেকে ঐ অর্থ গ্রহণ করেননি, যা আমার লেখা থেকে কয়েকটি বাক্যকে পূর্বাপর সংযোগ থেকে বিচ্ছিন্ন করে বের করা হচ্ছে।

৫। কোন লেখকের রচনা থেকে এমন অর্থ বের করা, যা ঐ লেখকের নিজেরই সুস্পষ্ট বক্তব্যের বিপরীত, আসলে তা স্পষ্ট বিশ্বাসঘাতকতা। আমার সম্পর্কে কোন ব্যক্তি কেমন করে বলতে পারে যে, আমি দেশ বিভাগ ও পাকিস্তান

প্রতিষ্ঠার বিরোধী ছিলাম, যেখানে আমি নিজেই দ্বি-জাতিত্ববাদের সমর্থনে তিনটি বই লিখেছি (দেখুন আমার বই –'মুসলমান আওর মওজুদা সিয়াসী কাশ্‌মকাশ্‌, ১ম খণ্ড ও ৩য় খণ্ড এবং মাস্‌য়ালায়ে কওমিয়াত), যেখানে আমি নিজেই ১৯৩৮ সালে দেশ বিভাগের পরিকল্পনা পেশ করেছিলাম (দেখুন আমার বই– মুসলমান আওর মওজুদা সিয়াসী কাশ্‌মকাশ্‌ ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২০৮-২১৪), যেখানে ১৯৪৪ সালে পাকিস্তান দাবিকে আমি প্রকাশ্যে ন্যায্য দাবি বলে ঘোষণা করি (দেখুন, আমার বই– রাসায়েল ও মাসায়েল, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৩৫৯-৩৬২), যেখানে সীমান্ত প্রদেশের রেফারেন্ডামে আমি পাকিস্তানের পক্ষে ভোট দেয়াকে সমর্থন করেছি (দেখুন আমার বই– রাসায়েল ও মাসায়েল, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৬২–৩৬৩)।

এখন অভিযোগের দ্বিতীয় অংশে আসুন অর্থাৎ "পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকে জামায়াতে ইসলামী অনবরত পাকিস্তান ও তার সরকারের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে শত্রুতা প্রকাশ করে আসছে। অভিযোগের এ অংশটি যিনি তৈরি করেছেন তার চিন্তা এত বেশী বিক্ষিপ্ত যে, তিনি পাকিস্তান ও তার সরকারের মধ্যে পার্থক্য অনুভব করতে পারেননি এবং তিনি এও জানেন না যে, পাকিস্তান কায়েম হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত এখানে একটি সরকার নয় বরং পর পর কয়েকটি সরকার পরিবর্তিত হয়েছে।

পাকিস্তানের সরকারগুলো সম্পর্কে এতটুকু বলা যায় যে, জামায়াতে ইসলামী অবশ্য তাদের সযে মতবিরোধ প্রকাশ করে এসেছে এবং একটি বিরোধী দল হিসাবে এটি তার আইনসঙ্গত অধিকার। জামায়াতে ইসলামী এ নীতির ওপর অটল ছিল যে, যতক্ষণ না আমরা নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ হই এবং আমরা নিজেরাই সরকার গঠন ও নিজেদের নীতি অনুযায়ী পরিচালিত করার মত ক্ষমতা অর্জন করব, ততক্ষণ আমাদের সরকার যন্ত্রে অংশ গ্রহণ করা উচিত নয়। এ নীতির ভিত্তিতে গত সাড়ে ষোল বছর থেকে জামায়াতে ইসলামী একটি বিরোধী দল হিসাবে কাজ করে আসছিল। প্রশ্ন হলো, একটি যুক্তিযুক্ত ও সর্বস্বীকৃত গণতান্ত্রিক নীতির ভিত্তিতে কোন দল যদি বিরোধী দলে থাকে এবং দেশের পরিবর্তিত সরকার সমূহের সঙ্গে মতবিরোধ প্রকাশ করতে থাকে তাহলে তা কবে এবং কিভাবে অপরাধ হয়ে গেল যে, তাকে বেআইনী ঘোষণা এবং তার নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করার বৈধতা লাভ করা হলো?

আর পাকিস্তানের বিরোধিতার অভিযোগটি এমন একটি জঘন্য ও ঘৃণার্হ অভিযোগ যে, কোন সরকারের তার নিজের দেশবাসীর ওপর ততক্ষণ পর্যন্ত এ অভিযোগটি আরোপ করা উচিত নয়, যতক্ষণ তার নিকট এ অভিযোগের সপক্ষে শক্তিশালী ও সুস্পষ্ট প্রমাণ না থাকে। সরকারের নিকট এই কঠোর অভিযোগের সপক্ষে কি প্রমাণ আছে, তা আমাকে জানানো হোক। কোন্ সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে তারা এ দোষারোপ করেছেন? এবং এই চরম কঠোর অভিযোগের সপক্ষে যদি তাদের কাছে কোন প্রমাণ থাকে, তাহলে তারা প্রকাশ্য আদালতে জামায়াতের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা চালানোর পরিবর্তে সেই সব আইনের সাহায্য গ্রহণ করেছেন কেন, যেগুলোর মাধ্যমে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ ছাড়াই ইচ্ছামত যে কাউকে দোষারোপ করা ও তাকে ইচ্ছামত শাস্তিও দেয়া যেতে পারে?

যদিও কোন ব্যক্তি বা দলকে অপরাধী ঠাওরানোর জন্যে প্রমাণ পেশ করা অভিযোগকারীরই কাজ, যে ব্যক্তি বা দলের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছে, নিজের নিরপরাধ হওয়ার জন্যে প্রমাণ পেশ করার দায়িত্ব তার উপর বর্তায় না, তবু আমি এ কথা প্রমাণ করতে চাই যে, সরকার নেহায়েত ভিত্তিহীন অভিযোগ উত্থাপন করে আমাদের জড়িয়ে ফেলতে চান। এজন্যে আমি জামায়াতে ইসলামীর নিজস্ব ফয়সালার পরিপ্রেক্ষিতে পাকিস্তান সম্পর্কে তার দৃষ্টিভঙ্গি কি তা জানাব। ১৯৪৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জামায়াতে ইসলামীর মজলিসে শূরা নিজের পলিসি সম্পর্কে যে প্রস্তাব পাস করে, তাতে বলা হয়–

"যেহেতু কায়েদে আযমের ইন্তেকালে দেশের অভ্যন্তরীণ শক্তি বিরাট আঘাত পেয়েছে এবং বাইরেও বিপদের আনাগোনা শুরু হয়েছে, তাই মজলিসে শূরা এ কথা সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করে দিতে চায় যে, জামায়াতে ইসলামী সংস্কারমূলক উদ্দেশ্য ও দৃষ্টিভঙ্গির উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে পাকিস্তানের ঐক্য ও তার আযাদী সংরক্ষণের পুরোপুরি প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে এবং এ ব্যাপারে সম্ভাব্য সকল উপায়ে দেশের অন্যান্য দল ও সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করবে।"

"জামায়াতে ইসলামীর মতে, পাকিস্তানের মঙ্গল ও উন্নতি এবং তার স্থিতিশীলতার জন্যে পূর্বেই যথাশীঘ্র আইনগত পদ্ধতিতে এর ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ার কথা ঘোষণা করে দেয়ার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু এখন যখন কায়েদে আযমের ব্যক্তিত্বের সাহায্য রইল না, তখন এ প্রয়োজন আরও বেশী করে দেখা দিয়েছে। এই ঘোষণা হয়ে যাওয়ার পর শাসনতান্ত্রিক ও আইনগত পরিবর্তন পর্যায়ক্রমে সময়মাফিক হতে থাকবে। কিন্তু এ ঘোষণার পর নীতিগতভাবে আমাদের রাষ্ট্র ব্যবস্থা একটি ইসলামী ব্যবস্থায় পরিবর্তিত হয়ে

যাবে। দেশের আসল শক্তি মুসলিম জনগণের দিল ও বিবেক যখন তাতে নিশ্চিন্ততা অনুভব করবে। রাষ্ট্রের লক্ষ্য ও তার অগ্রগতির পথ নির্ধারিত হয়ে যাবে। এবং পাকিস্তানের নৈতিক স্থায়িত্ব, তার বিশৃঙ্খলামুখী অংশসমূহের ঐক্য, গুরুত্বপূর্ণ তামাদ্দুনিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান এবং তার দেশরক্ষা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার জন্যে একান্ত প্রয়োজনীয় আইনসমূহ এ পথে কাজ করার জন্যে একত্রিত হতে পারবে। উপরন্তু এর ফলে সেই আদর্শিক বিরোধও খতম হয়ে যাবে, যা দেশের ভবিষ্যৎ ব্যবস্থা সম্পর্কে জন্ম নিচ্ছে এবং মানসিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে।"

এই অধিবেশনে মজলিসে শূরার পক্ষ থেকে তদানীন্তন গভর্নর জেনারেল খাজা নাযিমুদ্দীন সাহেবের কাছে নিম্নলিখিত পয়গাম পাঠানো হয়, "কায়েদে আযমের ইন্তেকালের পর স্থলাভিষিক্ত হওয়ার কারণে আল্লাহ তায়ালা আপনার ওপর একটি বিরাট দায়িত্বের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছেন। আমরা দোয়া করছি, যিনি আপনার ওপর এ বোঝা চাপিয়েছেন তিনিই আপনাকে এটি বহন করার এবং এ হক আদায় করার শক্তি দান করুন। গভর্নর জেনারেল হওয়ার পর আপনি যে ভাষণ দিয়েছেন তার মধ্যে একটি দ্বীনী প্রাণবস্তুর সন্ধান পাওয়া যায় এবং নেক ইরাদার নিশানা পরিদৃষ্ট হয়। আমরা অন্তর থেকে এর সম্মান করি। আমরা আশা করি, আপনি পাকিস্তানকে দিল ও দেহ উভয় দিক দিয়ে সত্যিকার ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত করার চেষ্টা করবেন। আপনি বিশ্বাস করুন, এ উদ্দেশ্যে আপনি যে কোন সঠিক প্রচেষ্টা চালাবেন, তাতে জামায়াতে ইসলামী আপনার সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করবে।"

(তর্জুমানুল কোরআন, সেপ্টেম্বর, ১৯৪৮ সাল, পৃষ্ঠা ৩২৬ ও ৩২৭)।

একই অধিবেশনে জামায়াতে ইসলামীর কর্মীদের জন্যে যে নির্দেশাবলী তৈরি করা হয়েছিল, তার প্রথম নির্দেশ ছিল–

"দেশের হেফাযতের জন্যে নিজেরা পূর্ণরূপে প্রস্তুত হোন এবং অন্যান্য মুসলমানদেরকেও প্রস্তুতির প্রয়োজন বুঝান। আমরা এ দেশটিকে ইসলামের জন্যে রক্ষা করতে চাই। কাজেই এই প্রেরণা নিয়ে সমস্ত কাজ থেকে এদিকে সবচেয়ে বেশী দৃষ্টি দেয়া আমাদের দ্বীনী কর্তব্য।"

(তর্জুমানুল কোরআন, সেপ্টেম্বর, ১৯৪৮ সাল, পৃষ্ঠা ৩৩৬)

১৯৪৯ সালের ১২ই মার্চ পাকিস্তানের আইন পরিষদ আদর্শ প্রস্তাব পাস করেন এবং তার পরদিনই জামায়াতে ইসলামীর মজলিসে শূরা নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রকাশ করে–

"মজলিসে শূরার মতে আইন পরিষদ এই প্রস্তাবটি পাস করে সেই সর্বনিম্ন আইনগত শর্তাবলী পূর্ণ করেছেন, যা একটি দেশকে ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্যে প্রয়োজন।"

আবার ১৯৪৯ সালের ১৮ই এপ্রিল মজলিসে শূরা আদর্শ প্রস্তাবের প্রভাব ও ফল সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে পাকিস্তান সম্পর্কে তার এ নীতি প্রকাশ করে–

"এখন মন ও মগজের সমস্ত যোগ্যতা এবং যাবতীয় উপায়-উপকরণ এ রাষ্ট্রটিকে রক্ষা ও শক্তিশালী করার, একে তরক্কি দেয়ার এবং দেহ ও দিলের দিক দিয়ে একে একটি ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত করার কাজে ব্যয় করা প্রত্যেক মুমিন ব্যক্তির ওপর ফরয হয়ে গেছে। যেভাবে এবং যেরূপে এর কোন খেদমত করা যেতে পারে, মনে-প্রাণে তা করা উচিত। এখন রাষ্ট্রের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ইতিবাচক (Positive) বিশ্বস্ততা। অসহযোগিতার ভাব শেষ হয়ে গেছে। এখন আমরা শুধু বাইরে থেকেই নয়। বরং ভেতর থেকেও (অর্থাৎ পার্লামেন্ট ও শাসন ব্যবস্থায়) প্রবেশ করে সংস্কার ও উন্নয়নের পূর্ণ প্রচেষ্টা চালাব।"
(জামায়াতে ইসলামী কি পজিশন উসকে আপনে ফায়সালে কি রোশনি মে, পৃষ্ঠাঃ ৬-৭)

সম্প্রতি লাহোরে জামায়াতে ইসলামীর যে নিখিল পাকিস্তান সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো, তাতে '৬৩ সালের ২৬শে অক্টোবর একটি প্রস্তাব পাস করা হয়। তার শব্দগুলো নিম্নরূপ–

"এই সংকট মুহূর্তে জামায়াতে ইসলামী ভারত ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য শক্তিবর্গ, যাদের পাকিস্তান সম্পর্কে ভুল ধারণা রয়েছে, তাদেরকে হুঁশিয়ার করে দিচ্ছে যে, অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে আমাদের মধ্যে যত মতপার্থক্যই থাক না কেন, দশ কোটি পাকিস্তানী স্বদেশের নিরাপত্তা ও তাদের স্বাধীনতা রক্ষায় যে কোন ব্যাপারেই ঐক্যবদ্ধ হয়ে দাঁড়াবে এবং এরূপ কোন অবস্থার সৃষ্টি হলে ইনশাআল্লাহ একজন পাকিস্তানীও পেছনে পড়ে থাকবে না।"

"কেবল দেশের প্রতি আমাদের ভালবাসা রয়েছে এ কারণেই নয় বরং আমাদের বিশ্বাস ও ধর্মীয় দাবির পরিপ্রেক্ষিতেও জামায়াত পাকিস্তানের দেশ রক্ষার প্রশ্নটিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকে। ইসলামের নামে এ দেশ অর্জিত হয়েছিল, তাই সমগ্র পাকিস্তান আমাদের কাছে একটি মসজিদ সমতুল্য এবং এর প্রতি ইঞ্চি জায়গা আমাদের কাছে এক মহান আমানতস্বরূপ। সকল মতপার্থক্য

সত্ত্বেও আমরা সরকারকে সম্পূর্ণভাবে এই নিশ্চয়তা দান করছি যে, আমাদের দেশ রক্ষার ব্যাপারে সরকার যে কোন কার্যক্রম গ্রহণ করুক না কেন, আমরা সর্বান্তকরণে তার সহযোগিতা করব। দেশপ্রেম কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বিশেষের একচেটিয়া জিনিস নয়। প্রত্যেক পাকিস্তানীই সমানভাবে তার দেশের নিরাপত্তার সঙ্গে জড়িত। কারণ তাদের জীবন, সম্পদ, সম্মান ও প্রিয় মূল্যবোধ এ সকল কিছুই সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে তাদের এ দেশের নিরাপত্তা ও সংহতির ওপর। সুতরাং আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, প্রতিটি পাকিস্তানীই যদি সে বিকৃত মস্তিষ্ক অথবা নিজেই নিজের শত্রু না হয়, তাহলে স্বদেশ রক্ষার্থে এগিয়ে আসবে।" (রোয়েদাদ, কুল পাকিস্তান ইজতিমা জামায়াতে ইসলামী, পৃষ্ঠাঃ ৫৬)

এসব জামায়াতে ইসলামী কর্তৃক রীতিমতো গৃহীত ও প্রকাশিত প্রস্তাবাবলী। সরকার এ কথা বলতে পারেন না যে, তারা এ সম্পর্কে অবগত নন। এ সত্ত্বেও চোখ বন্ধ করে এ দোষারোপ করা হয়েছে যে, জামায়াতে ইসলামী অনবরত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে শত্রুতামূলক দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করেছে। এ দোষারোপের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে সরকারের ৬ই জানুয়ারীর প্রেসনোটে "মাযী কারীব কা জায়েযাহ" নামক একটি পুস্তিকার উপর। এ পুস্তিকা সম্পর্কে বক্তব্য হলো এই যে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর যখন আমি তর্জুমানুল কোরআন পত্রিকা পুনরায় লাহোর থেকে বের করলাম তখন তার প্রথম তিন সংখ্যায় '৪৮ সালের জুন, জুলাই ও আগস্ট মাসে পরপর তিনটি সম্পাদকীয় নিবন্ধ লিখি। তাতে দেশ বিভাগের সময় দেশে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল তার উপর বিস্তারিত মন্তব্য করা হয়। ব্রিটিশ সরকার, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ তিন দলের দৃষ্টিভঙ্গি ও কার্যাবলীর ওপর একজন ঐতিহাসিকের ন্যায় নিরপেক্ষ মন্তব্য করে বলা হয়, দেশ বিভাগের ব্যাপারটি মীমাংসা করার এবং একে কার্যকর করার ব্যাপারে তাদের প্রত্যেকের কি কি ভুল হয় এবং তার ফল কিভাবে আত্মপ্রকাশ করে। অতঃপর তৃতীয় প্রবন্ধে বলা হয়, দেশ বিভাগের পর মুসলিম জাতি কি কি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সম্মুখীন হয় এবং মুসলিম লীগ কি এসব সমস্যা সমাধানে সফল হতে পারে? এর মধ্যে প্রথম প্রবন্ধ দু'টিকে সম্ভবত '৪৯ সালে আমার অজ্ঞাতে করাচী জামায়াতে ইসলামীর লোকেরা "মাযী কারীব কা জায়েযাহ" নামে একটি পুস্তিকাকারে করাচী থেকে প্রকাশ করে। যা হোক এ প্রবন্ধগুলো মরহুম কায়েদে আযমের জীবদ্দশায় যখন তিনি গভর্নর জেনারেল ছিলেন, তখন

প্রকাশ হয়। মরহুম লিয়াকত আলী খান তখন পাকিস্তানের উজিরে আযম ছিলেন। তখন কেউ একে এ দৃষ্টিতে দেখেনি যে, এগুলো পাকিস্তানের বিরুদ্ধে লিখিত হয়েছে। বরং এতে মুসলিম লীগের কাজের যে সমালোচনা করা হয়, তাকে একটি বিরোধী দলের নেতার ন্যায়সঙ্গত অধিকার মনে করা হয়। এ কারণেই তার বিরুদ্ধে সে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়নি, যা ষোল বছর পর বর্তমান সরকার করেছেন। আমি বলি, আজ কোন নিরপেক্ষ বিচারপতি যদি ঐ প্রবন্ধগুলো পড়েন– পূর্বাপর সম্পর্ক থেকে বিচ্ছিন্ন করে দু'একটি বাক্য নয়– তাহলে কখনো তিনি এ সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারবেন না যে, ঐ প্রবন্ধগুলো এমন এক ব্যক্তি লিখেছেন, যে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হোক এ কামনা করত না এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়ার পর তাকে বিলুপ্ত করে দিতে চায়। ঐ প্রবন্ধগুলোর এ অর্থ শুধু এমন ব্যক্তি করতে পারে, যে পণ করে বসেছে মওদূদী ও তার জামায়াতকে যে কোন ক্রমেই জালে জড়িয়ে ফেলতে এবং এ উদ্দেশ্যে সব রকমের ফন্দিফিকির বের করতে বদ্ধপরিকর হয়েছে।

সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে গোলযোগ সৃষ্টি

আপনার প্রেরিত গ্রেফতার ও আটকের কারণসমূহের মধ্যে যে তৃতীয় অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছে, তা হলো এই যে, "জামায়াতে ইসলামী সরকারী কর্মচারীদের বিশ্বস্ততার ভিত্তি নড়িয়ে দিয়ে এবং গোলযোগ সৃষ্টি করে কর্তৃত্ব দখল করার নিয়তে সরকারী বিভাগসমূহ ও মজুর প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে অনুপ্রবেশ করেছিল।"

এ অভিযোগেরও দু'টি অংশ। একটি অংশ সরকারী কর্মচারীদের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং অন্যটির সম্পর্ক মজুর প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে। আমি পৃথক পৃথকভাবে এ দু'টি অভিযোগের জবাব দেব।

সরকারী কর্মচারীদের সম্পর্কে যা কিছু বলা হয়েছে, তাতে একটি সোজা ব্যাপারকে জেনে-বুঝে একটি ভয়াবহ রূপ দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। আসল ব্যাপার হলো এই যে, জামায়াতে ইসলামী এদেশে বছরের পর বছর ধরে ব্যাপকভাবে কাজ করে আসছিল। তার বই পত্র হাজার হাজার, লাখো লাখো সংখ্যায় ছাপা হতো। বিভিন্ন স্থানে এগুলো প্রকাশ্যে বিক্রি হতো। শত শত স্থানে তার পাঠাগার প্রতিষ্ঠিত ছিল। প্রত্যেক ব্যক্তির সেখানে এসে বইপত্র পড়ার ও নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে নিয়ে যাওয়ার অবাধ স্বাধীনতা ছিল। দেশের সকল স্থানে তার সভা অনুষ্ঠিত হতো। এতে সব রকমের লোক আসতো ও বক্তৃতা শুনতো। শত শত স্থানে দরসে কোরআন ও হাদীস দেয়া হতো। এতেও সব রকমের লোক শামিল হতো। এ আন্দোলনটি এভাবে সমগ্র দেশে প্রকাশ্যে জারি ছিল। তাহলে এক্ষেত্রে সরকারী কর্মচারী, যারা এদেশেরই বাসিন্দা এবং ঐসব লোকালয়ে সাধারণ মানুষের সঙ্গে একত্রে বসবাস করে তারা কেমন করে এ থেকে অজ্ঞ এবং দূরে থাকতে পারে। জামায়াত নিজে কোন পরিকল্পনা করে কোন বিশেষ প্রচেষ্টার মাধ্যমে সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে অনুপ্রবেশ করেনি। সরকারী কর্মচারীরা নিজেরাই তার বইপত্র পড়েছে, নিজেরাই তার সভায় এসেছে এবং দরসে শামিল হয়েছে। তাদের মধ্যে যাদের মন-মগজে জামায়াতের তাবলীগের আবেদন কার্যকর হয়েছে, সে নিজেই জামায়াতের প্রভাব গ্রহণ করেছে। তার নিকট বই-

পত্র পৌঁছে যাওয়ার পথ আমরা বন্ধ করতে পারতাম না। তারা যাতে বই-পত্র পড়তে না পারে সেজন্যে তাদের চোখে কাপড় বাঁধার কোন ক্ষমতা আমাদের ছিল না। তাদেরকে আমাদের সভা এবং দরসে কোরআন ও হাদীসের মাহফিলে শরীক হওয়া থেকে মানা করতে পারতাম না। এ কাজ যদি সরকার এখন করতে চান, তাহলে করুন। বরঞ্চ যদি সম্ভব হয়, তাহলে সরকারী কর্মচারীদেরকে ঐসব শহর ও লোকালয় থেকে বের করে পৃথক কোন কেল্লার মধ্যে বন্ধ করে রাখতে পারেন, যাতে এদেশে যে সব আন্দোলন চলছে তার কোন হাওয়া তাদের গায়ে না লাগে।

উপরে যা কিছু আমি বলেছি, তা থেকে এ কথা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, জামায়াতে ইসলামী সরকারী দফতর ও কর্মচারীদের মধ্যে অনুপ্রবেশ করেনি। বরঞ্চ তার চিন্তাধারা সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্বাভাবিক পদ্ধতিতে প্রবেশ করেছে এবং সরকার নিজেই বারবার সরকারী দফতরসমূহে সার্কুলার পাঠিয়ে এবং প্রত্যেকটি সরকারী কর্মচারীর কাছ থেকে শপথনামা গ্রহণ করে নিজের কর্মচারীদেরকে তার দিকে আকৃষ্ট করেছেন। এখন এই প্রবেশের কারণে ঐ কর্মচারীদের বিশ্বস্ততার ভিত্তি নড়ে উঠেছে বলে যে কথা বলা হচ্ছে, সে সম্পর্কে সরকারের জানানো উচিত যে, জামায়াতে ইসলামীর বইপত্র এবং তার তাবলীগের মধ্যে এমন কি জিনিস আছে, যা সরকারী কর্মচারীদের বিশ্বস্ততাকে স্থানচ্যুত করে? সত্যি বলতে কি একথা কেউ স্বীকার করুক বা নাই করুক, জামায়াতে ইসলামীর তাবলীগের প্রভাব যেখানেই সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে পৌঁছেছে, সেখানেই তারা বেশী দায়িত্বশীল, বেশী কর্তব্যনিষ্ঠ, বেশী খোদাভীরু এবং বেশী বিশ্বস্ত হয়েছে। সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী যদি কোন শ্রেণী দুর্নীতি, উৎকোচ গ্রহণ ও কর্তব্যে অবহেলা থেকে বেঁচে থাকে, তাহলে তাহলো সেই শ্রেণীটি, যেটি জামায়াতে ইসলামীর বইপত্র ও তার প্রভাব গ্রহণ করেছে। কিন্তু সরকারের নিকট এ বিষয়টির কোন মর্যাদা নেই। তাদের চিন্তা শুধু এই হলো যে, কর্মচারী ও অফিসাররা কনভেনশন লীগের জন্যে অবশ্য ভলান্টিয়ারের মত কাজ করবে কিন্তু অন্য কোন বিরোধী দলের এবং বিশেষ করে জামায়াতে ইসলামীর স্পর্শও যেন তারা না পায়। সরকারী কর্মচারীদের সম্পর্কে আমার নীতি আমি ১৯৫৫ সালের আগস্ট মাসের তর্জুমানুল কোরআনের ৩৬৬-

৩৬৮ পৃষ্ঠায় এবং '৫৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ৪২০-৪২২ পৃষ্ঠায় সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করেছি। এ দু'টো পত্রিকাই বোর্ডের সামনে পেশ করছি।

অভিযোগের দ্বিতীয় অংশ, যাতে মজুর সংগঠন সম্পর্কে বলা হয়েছে, সে ব্যাপারে আমি সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছি যে, তারা যেন এমন একটি দৃষ্টান্ত পেশ করেন, যাতে প্রমাণ হয় যে, জামায়াতে ইসলামী মজুরদের সাহায্যে কোন সময় গোলযোগ সৃষ্টি করেছে অথবা কোন ধর্মঘট করেছে অথবা কারখানায় কোন ধরনের বিবাদ সৃষ্টি করেছে। অনেকগুলো দৃষ্টান্ত নয়, মাত্র একটি দৃষ্টান্ত পেশ করার দাবি জানাচ্ছি। মেহেরবানী করে তার বরাত দেয়া হোক। আসল ব্যাপার হলো এই যে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর যখন জামায়াতে ইসলামী দেখল যে, কমিউনিস্ট কর্মী এবং তাদের 'সহযাত্রী' লাল সাহেবরা মজুরদের মধ্যে অনুপ্রবেশ করছে এবং তারা কমিউনিস্ট বিপ্লব সাধনের উদ্দেশ্যে জমি পরিষ্কার করার জন্যে মালিক-মজুরের শ্রেণী সংগ্রাম শুরু করে দিয়েছে, তখন সে সর্বপ্রথম মেহনতী মানুষের জন্যে একটি পলিসি নির্ধারণ করল এবং তারপর সে অনুযায়ী কাজ শুরু করে দিল।

এ ব্যাপারে যে পলিসি নির্ধারণ করা হয়েছিল, তা ছিল এই ঃ

১। মজুর-কারখানা মালিক অথবা অন্য কথায় বলা যায়, শ্রমদানকারী ও শ্রমলাভকারীদেরকে দু'টি পৃথক সংঘর্ষশীল ও বিবাদী শ্রেণী হিসাবে মনে করার ধারণার বিলোপ সাধন করতে হবে। এই চিন্তাকে শক্তিশালী করতে হবে যে, এ দু'টি শ্রেণী একই সমাজের অংশ এবং তাদের মধ্যে সংঘর্ষের পরিবর্তে ইসলামী ন্যায়-নীতির ভিত্তিতে সহযোগিতা কায়েম হওয়া উচিত, যাতে এ সমাজের অংশ হিসাবে তারা এর উন্নতির সহায়ক হতে পারে।

২। শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে যে সব বিবাদ সৃষ্টি হবে, সেগুলোকে হরতাল, লক-আপ ও দাঙ্গা-হাঙ্গামার দিকে অগ্রসর হতে দেয়া হবে না এবং ঐসব বিবাদ দূর করার জন্যে দেশে যেসব আইন প্রচলিত আছে সেই মোতাবিক আদালতের মাধ্যমে বিবাদসমূহের মীমাংসা করানো হবে।

৩। শিল্প ব্যাপারে ইনসাফ কায়েম করার জন্যে আইনে যেসব অতিরিক্ত সংশোধনের প্রয়োজন, দেশের আইন পরিষদের মাধ্যমে তা করতে হবে।

এ পলিসি বিস্তারিতভাবে আমার বই রাসায়েল ও মাসায়েল প্রথম খণ্ড দ্বিতীয় সংস্করণের ৪২৫-৪২৬ পাতায় এবং 'জামায়াতে ইসলামী কি মানশূর'-এর ৩৭-৩৮ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করা হয়েছে। এ পলিসি অনুযায়ী জামায়াতে ইসলামী যে লেবার ওয়েলফেয়ার কমিটি গঠন করে, তা ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত আদালতের মাধ্যমে অসংখ্য শিল্প-বিবাদের মীমাংসা করায় এবং বহু স্থানে হরতাল ও লক-আপ প্রত্যাহার করিয়ে শিল্প বিবাদ সমূহের আইনগত পথের দিকে মোড় ঘুরিয়ে দেয়। এ প্রচেষ্টার ফলে ৯০ লক্ষ টাকার ব্যাপার আদালতের মাধ্যমে মীমাংসিত হয় এবং সামরিক শাসন প্রবর্তিত হওয়ার পর যখন জামায়াতের নিজের কাজ বন্ধ করতে হয়, তখন ৭ কোটি টাকার মামলা চালু ছিল। আমি আগেই বলেছি যে, এই সমগ্র সময়ের মধ্যে এমন একটি ঘটনাও সৃষ্টি হয়নি যার ফলে জামায়াতে ইসলামী কোথাও হরতাল, বিবাদ বা দাঙ্গা করিয়েছে। সরকার যদি এমন কোন ঘটনা পেশ করতে পারেন, তাহলে অবশ্যই তা পেশ করতে হবে। আর যদি তারা তা পেশ করতে না পারেন তাহলে আমি আরয করব যে, রাজনৈতিক স্বার্থোদ্ধারের জন্যে দেশের শান্তিপ্রিয় ও আইন মান্যকারী নাগরিকদের ফাঁদে ফেলে তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ উত্থাপন করা থেকে সরকারের বিরত থাকা উচিত।

ইসলামী জমিয়তে তালাবা

আপনার বিবৃত চতুর্থ অভিযোগ এই যে, "জামায়াতে ইসলামীর আমীর সক্রিয় সমর্থন ও সহযোগিতাসহ জমিয়তে তালাবার সাহায্যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে বেআইনী হরতাল করার এবং পাবলিক স্থানসমূহে অশান্তি ও হাঙ্গামা সৃষ্টি করার চেষ্টা করছিল।" এ অভিযোগে জমিয়তে তালাবাকে ছাত্রদের মধ্যে জামায়াতে ইসলামীর দোসর (Counter Part) বলেও গণ্য করা হয়েছে।

এ অভিযোগটি আমার ও জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে তখনই উত্থাপিত হতে পারবে, যখন দু'টি কথা প্রমাণ করে দেয়া হবে। এক- জমিয়তে তালাবা কখনো কোন প্রতিষ্ঠানে কোন বেআইনী হরতাল করিয়েছে অথবা কোন শিক্ষায়তনের মধ্যে অশান্তি বা হাঙ্গামা সৃষ্টি করিয়েছে। দুই- এ কাজে আমার বা জামায়াতে ইসলামীর কোন ইঙ্গিত ছিল। আমি জোরের সঙ্গে দাবি জানাচ্ছি যে, সরকার এ দু'টির একটিও প্রমাণ করতে পারবেন না। তাই তাঁরা জননিরাপত্তা অর্ডিন্যান্স ও ১৯০৮ সালের সংশোধিত ফৌজদারী আইনের সাহায্য নিয়েছেন, যাতে কোন আদালতের সামনে কোন সাক্ষী প্রমাণ পেশ করার ঝামেলা না পোহাতে হয় এবং নিরপেক্ষ বিচার বিভাগীয় অনুসন্ধানের মাধ্যমে হাটে হাড়ি না ভেঙে যায়।

যদিও এ অভিযোগের জবাবে ঐটুকু কথাই যথেষ্ট যা আমি উপরে বিবৃত করেছি, কিন্তু গত ৬ই জানুয়ারী জামায়াতকে বেআইনী ঘোষণা ও তার নেতৃবৃন্দকে আটক করে যে সরকারী প্রেসনোট জারি করা হয়, তা আমার সামনে আছে। এ প্রেসনোটে জমিয়তে তালাবার বড়ই ভয়াবহ চিত্র অঙ্কন করা হয়েছে এবং অত্যন্ত পরিশ্রম করে একথা প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে যে, আসলে জামায়াতে ইসলামী জমিয়তে তালাবার মাধ্যমে ছাত্রদের মধ্যে হাঙ্গামা সৃষ্টি করছে। এজন্যে আমি উল্লিখিত অভিযোগটির সংক্ষিপ্ত জবাব দিয়ে ক্ষান্ত থাকতে পারছি না। বরঞ্চ প্রেসনোটে উল্লিখিত অভিযোগের বিস্তারিত জবাব দিয়ে আসল ব্যাপারটি পরিষ্কার করতে চাই।

জমিয়তে তালাবা ১৯৪৭ সালের শেষের দিকে কায়েম হয়। এটি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে সেই ছাত্রদের একটি দল, যারা আমাদের দেশের শিক্ষায়তনগুলোর বিজ্ঞান, দর্শন, অর্থশাস্ত্র, আইনশাস্ত্র, ইঞ্জিনিয়ারিং, চিকিৎসা বিজ্ঞান এবং অন্যান্য আধুনিক বিদ্যা শিক্ষা করার সঙ্গে সঙ্গে ইসলামী মনোবৃত্তি ও

দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী, নৈতিক মূল্যমানের অনুগত এবং নিজের নিজের শিক্ষায়তনে নাস্তিক্য, বেদ্বীনী ও নৈতিক অরাজকতা প্রতিরোধ করার এবং ছাত্রদের মধ্যে ইসলামী ভাব জাগ্রত করার চেষ্টাও করে। এই যুবকদের মধ্যে এমন অসংখ্য ছাত্র দেখতে পাবেন, যারা উচ্চ পর্যায়ের আধুনিক পাশ্চাত্য বিদ্যা শিক্ষা করার সঙ্গে সঙ্গে 'তাহাজ্জুদগুযারও'। তারা গত ষোল বছর যুব সমাজের ঈমান ও নৈতিক বিকৃতি প্রতিরোধ এবং তাদের নাস্তিক্যবাদী চিন্তা ও ফাসেকী কর্মের সয়লাব থেকে রক্ষা করার জন্যে বিরাট কাজ করেছে। যতদূর জানি পূর্ণ বিশ্বাসের সঙ্গে আমি বলছি যে, তারা আজ পর্যন্ত আইন বিরোধী কোন কাজ করেনি। বরং তারা নিজেদের তৎপরতাকে আইন-কানুনের গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার নীতিকে কঠোরভাবে মেনে চলেছে। ঐ ছাত্রদের এই গুণাবলীর কারণে আমি তাদের ব্যাপারে আগ্রহী। কেননা, আমি এদেশে এমন সব যুবক দেখতে চাই যারা উচ্চ থেকে উচ্চতর শিক্ষালাভ করার সঙ্গে সঙ্গে পাক্কা মুসলমানও থাকে। এবং ঐ ছাত্ররাও আমার সম্পর্কে এজন্যেই আগ্রহী যে, তারা আমার কাছ থেকে এটা আশা করে যে, আমি তাদেরকে ইসলামের আলোকে আধুনিক জীবন সমস্যার সমাধান দিতে পারব। আমার ও তাদের এ সম্পর্ক কারুর দৃষ্টি থেকে প্রচ্ছন্ন নেই এবং একে প্রচ্ছন্ন রাখার কোন কারণও নেই।

জামায়াতে ইসলামী ও জমিয়তে তালাবার সম্পর্ককে অধিকতর গভীর এবং নিকটতর প্রমাণ করার জন্যে সরকারী প্রেসনোটে যে জোড় লাগানো হয়েছে, যদিও তা চরম অতিশয়োক্তি এবং এর বিরাট অংশ সত্য-বিরোধী, তবু আমি জিজ্ঞেস করি যে, এ সব কিছু যদি সত্য হয়ে থাকে, তাহলেও বা অপরাধ কি? আমাদের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষারত যুবকগণ নাবালেগ নয়। এই শহর ও লোকালয় থেকে দূরে কোন জঙ্গলে তারা বসবাস করে না। সব রকমের বইপত্র তারা পড়ে। খবরের কাগজ পড়ে, সভা-সম্মেলনে যায়। বক্তৃতা শোনে। লেখাপড়া জানা শিক্ষিত ও বালেগ যুবক তারা। তাহলে কিভাবে কোন বুদ্ধিমান এটা আশা করতে পারেন যে, দেশে যে সব আন্দোলন পরিচালিত হচ্ছে এবং যেসব চিন্তা ও মতাদর্শ সম্প্রসারিত হচ্ছে, তা থেকে এই যুবকরা একেবারেই অসম্পর্কিত থাকবে এবং এর কোন প্রভাব তাদের ওপর পড়বে না? আসলে শিক্ষায়তনের বাইরে যত বিভিন্ন মত ও পথের লোক আছে ছাত্রদের মধ্যেও ঠিক তত বিভিন্ন মতবাদ ও পথানুসারী দল আছে। ছাত্রদের মধ্যে শুধু জামায়াতে ইসলামীরই একটি দোসর নেই, বরং আওয়ামী লীগ, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, মুসলিম লীগ, নেজামে ইসলাম পার্টি, গোপনে কার্যরত (Under ground) কমিউনিস্ট পার্টি– সবার

দোসর তাদের মধ্যে পাওয়া যায়। আর এখন কনভেনশন লীগের দোসরও জন্ম নিচ্ছে, বরঞ্চ নিয়েছে। যদি এসব দোসর বৈধ হয়ে থাকে, তাহলে জামায়াতে ইসলামীর দোসরের অস্তিত্ব কেমন করে গোনাহর পর্যায়ে প্রবেশ করতে পারে?

জামায়াতে ইসলামী ও জমিয়তে তালাবার মধ্যে যে ধরনের সম্পর্ক থাক না কেন, তাকে হারাম বা কোন প্রকার আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের ভিত্তি হিসাবে ততক্ষণ পর্যন্ত গ্রহণ করা যেতে পারে না, যতক্ষণ না পূর্ব বর্ণিত কথা দু'টি প্রমাণ করা যায় অর্থাৎ প্রথমত জমিয়তে তালাবা এমন কোন কাজ করেছে যা আইনত অপরাধ এবং দ্বিতীয়ত এ কাজ জামায়াতে ইসলামীর ইঙ্গিতে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সরকারী প্রেসনোটে বড় কসরত করে এর দু'টি দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়েছে। এক, ১৯৬২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টোর বক্তৃতার সময়ে জমিয়তে তালাবা পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে হাঙ্গামা করেছিল এবং জামায়াতে ইসলামী এ হাঙ্গামা করার নির্দেশ জারি করেছিল। কিন্তু এ প্রেসনোট প্রণয়নকারী এবং এর প্রকাশকারীদের স্মরণ নেই যে, '৬২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে দেশে সামরিক শাসন জারি ছিল। জমিয়তে তালাবা ও জামায়াতে ইসলামী উভয়েই বেআইনী ছিল। এবং একটি দলের হাঙ্গামা করার এবং অন্য একটি দল কর্তৃক তার নির্দেশ দেয়ার কোন প্রশ্নই ছিল না। এ সত্ত্বেও যদি ধরে নেয়া যায় যে, হ্যাঁ এটা সত্যি, তাহলে সামরিক আইনের মাধ্যমে এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ না করার কি ব্যাখ্যা করা যেতে পারে? দু'টি নিষিদ্ধ দল প্রকাশ্যে কাজ করে। তাদের মধ্যে একটি হাঙ্গামা করে এবং অন্যটি এই হাঙ্গামা করার জন্যে নির্দেশ জারি করে। এ সত্ত্বেও মার্শাল ল' নীরব রইল? সরকার কি এর সাহায্যে মার্শাল ল' কর্তৃপক্ষের অযোগ্যতা প্রমাণ করতে চান? সত্যি বলতে কি, দু'বছর পর আজ এ ঘটনাটিকে আমার ও জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনের ভিত্তিরূপে গ্রহণ করা থেকে এ কথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, সরকার আমার ও জামায়াতে ইসলামীর ওপর হাত উঠানোর জন্যে সকল সম্ভাব্য বাহানা তালাশ করে বের করেছেন। তবু সরকার যদি দাবি করেন যে, এটি কোন মনগড়া বাহানা নয় বরং পূর্ণ সত্য, তাহলে তাকে প্রকাশ্য আদালতে সাক্ষ্য পেশ করে একথা প্রমাণ করা উচিত যে, জনাব ভুট্টোর সভায় হাঙ্গামা প্রথমত জমিয়তে তালাবা করেছিল এবং দ্বিতীয়ত জামায়াতে ইসলামী নির্দেশ জারি করেছিল। গোয়েন্দা বিভাগের এটি সন্দেহযুক্ত ও অপূর্ণ রিপোর্ট– যা অনেক সময় কাউকে ফাঁদে ফেলার জন্যে জেনে বুঝে তৈরি করা হয়– সাক্ষ্য ও প্রমাণ হিসাবে কখনো গ্রহণ করা যেতে পারে না।

সরকার যে দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটি পেশ করেছেন, তা হলো এই যে, সম্প্রতি লাহোর ও অন্যান্য স্থানে ছাত্ররা যে হাঙ্গামা করেছিল, তা সরাসরি জামায়াতে ইসলামীর অনুসারীদের উস্কানিদানের ফল ছিল। সরকারের দাবি হলো এই যে, তার নিকট এ ব্যাপারে শক্তিশালী সাক্ষ্য প্রমাণ আছে। আমি বলি, সরকারের কাছে যদি সত্যি এমন কোন সাক্ষ্য-প্রমাণ থেকে থাকে, তাহলে তা লুকিয়ে রাখা হয়েছে কেন? কেন তা আদালতে পেশ করে আমাদের অপরাধ প্রমাণ করা হচ্ছে না? আসলে এ ঘটনাবলীর জন্যে সরকারই সম্পূর্ণ দায়ী। সরকার নিজেই জেনে বুঝে উত্তেজনা সৃষ্টি করে ছাত্রদের উসকানি দিয়েছেন। নিজেই অস্বাভাবিক জুলুম নির্যাতন চালিয়ে ব্যাপারটিকে ভয়াবহ রূপ দান করেছেন। অতঃপর সরকার নিজেই জোরপূর্বক এর সব দোষ জামায়াতে ইসলামীর ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছেন। অথচ এ হাঙ্গামার সঙ্গে জামায়াতের দূরতম কোন সম্পর্কও ছিল না, একথা আমি শুরুতেই বলেছি। এ ব্যাপারটি এভাবে শুরু হয়েছিল যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাচনের মাত্র দু'দিন আগে বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিয়নের জনৈক প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী বারাকাল্লাহ খান, যার প্রার্থীপদ সংক্রান্ত কাগজ-পত্র রীতিমত গৃহীত হয়েছিল, হঠাৎ তাকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হয়, যাতে নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে সে আপনা আপনি বের হয়ে যায়। (এখানে জেনে রাখা দরকার যে, বারাকাল্লাহ খানের জামায়াতে ইসলামী ও জমিয়তে তালাবার সঙ্গে কোন সম্পর্ক ছিল না। কোন এক সময় সে অবশ্য জমিয়তের সদস্য ছিল, কিন্তু জমিয়ত তাকে সদস্য পদ থেকে বহিষ্কার করেছিল।) এটি এমন একটি অন্যায় নির্যাতন ছিল যে, এর ফলে স্বভাবতই ছাত্রদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি হয় এবং নির্বাচনের সকল পদপ্রার্থী– যাদের সংখ্যা ছিল ৬৫ জনের কাছাকাছি এবং যাতে বারাকাল্লাহ খানের বিরোধী প্রতিদ্বন্দ্বীও ছিল– নির্বাচন বর্জন করে। অতঃপর ঐ প্রার্থীরা নিজেরাই একটি এ্যাকশান কমিটি গঠন করে। এ কমিটিতে এমন একজনও ছিল না, যার জমিয়তে তালাবা বা জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে দূরতম কোন সম্পর্ক ছিল। এই এ্যাকশন কমিটিই বারাকাল্লাহ খানের বহিষ্কারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর সিদ্ধান্ত করে। এ কমিটিই প্রতিবাদ জানানোর জন্যে কার্যকরী প্রোগ্রাম তৈরি করে এবং '৬৩ সালের ৪ঠা নভেম্বর শোভাযাত্রা তাদেরই সিদ্ধান্তক্রমে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের হয়। এ শোভাযাত্রাকে পুলিশ নিজেই তাদের লাউড স্পীকারসহ চ্যারিং ক্রস পর্যন্ত যেতে দেয়। অতঃপর হঠাৎ কোন সতর্কবাণী বা নোটিশ না দিয়েই তাদের ওপর লাঠিচার্জ এবং কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করে। এতে ছাত্ররা আরো বেশী উত্তেজিত হয়। তারা ফিরে এসে ভাইস

চ্যান্সেলরের নিকট এই জুলুমের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে দরখাস্ত করে। কিন্তু ভাইস চ্যান্সেলর সাহেব সম্ভবত নিজেকে অসহায় দেখছিলেন। তাই তিনি ছাত্রদেরকে সান্ত্বনা দিয়ে ঠাণ্ডা করা তো দূরের কথা, বাইরে বেরিয়ে এসে তাদের মুখোমুখি হতেও অস্বীকৃতি জানালেন। এ ব্যাপারটি স্বাভাবিকভাবেই ছাত্রদের জন্যে আরো বেশী উত্তেজনার কারণ হয় এবং তাদের একটি গ্রুপ ভাইস চ্যান্সেলরের দফতরে প্রবেশ করে সেখানে হাঙ্গামা শুরু করে। ছাত্রদের এ দলটি যারা সেখানে হাঙ্গামা শুরু করে এতে মূলত সাধারণ ছাত্ররাই ছিল। এতে জমিয়তে তালাবার সঙ্গে সম্পর্কিত কোন ছাত্রের উপস্থিতির সপক্ষে সরকারের নিকট অবশ্যই কোন সাক্ষ্য নেই। ৫ই নভেম্বর এই এ্যাকশন কমিটির প্রোগ্রাম অনুযায়ী ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরের ফুটপাতে ধরনা দিয়ে বসে যাওয়ার সিদ্ধান্ত করে। তাদেরকে বিক্ষিপ্ত হয়ে যাওয়ার জন্যে শুধু দু'মিনিট সময় দেয়া হয়। অথচ কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি ধারণাই করতে পারে না যে, এই বিপুল সংখ্যক ছাত্র দু'মিনিটে বিক্ষিপ্ত হয়-বা কেমন করে। দু'মিনিট শেষ হওয়ার পরই ছাত্রদের ওপর বেদম লাঠিচার্জ করা হয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সীমানায় প্রবেশ করে পুলিশ চরম নির্যাতন শুরু করে।

মাননীয়! এই হলো আসল ঘটনা, যা থেকে জানা যায় যে, শাসন কর্তৃপক্ষই প্রথমে উত্তেজনা সৃষ্টি করেন এবং তারপর ব্যাপারটি আরো বেশী অগ্রসর করার জন্যেও তারা দায়ী। এ সমগ্র ব্যাপারে জামায়াতে ইসলামীকে টেনে আনা তো দূরের কথা জমিয়তে তালাবাও যে কোনক্রমে দায়ী তাও প্রমাণ করা যাবে না। সরকার যদি তার দাবির সত্যতায় বিশ্বাসী হন এবং জামায়াতে ইসলামীর সমর্থকদের প্রকাশ্যে উস্কানিদানের সপক্ষে তার কাছে কোন শক্তিশালী প্রমাণ থাকে, তাহলে তার সাহস করে সামনে আসা উচিত। জামায়াতের কোন্ কোন্ লোক উত্তেজনা সৃষ্টি করে এবং এই হাঙ্গামায় কথা ও কর্মের ক্ষেত্রে তাদের কতটুকু ভূমিকা এবং কি আছে তা জানানো উচিত।

সেনাবাহিনীর মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি

আপনার পঞ্চম অভিযোগ এই যে, "জামায়াত তার নেতৃবৃন্দের আপত্তিকর বক্তৃতার মাধ্যমে সশস্ত্র সেনাবাহিনীর মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে। (একথা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, গ্রেফতার ও আটকের কারণের মধ্যে The Jamaat Attempting শব্দ আছে) এটি একটি একেবারেই অস্পষ্ট অভিযোগ। এ থেকে জানা যায় যে, সে নেতাই-বা কে– যে এই আপত্তিকর বক্তৃতা করল এবং তাতে সে কি বলল। তবু তর্কের খাতিরে যদি মেনে নেয়া যায় যে, কতিপয় নেতা এমন বক্তৃতা করেছিলেন, তাহলে তাদের ওপর মোকদ্দমা চালানো হলো না কেন? তাদের বক্তৃতার দায়ে সমগ্র জামায়াতকে বেঁধে ফেলার বৈধতা কোথায়? জামায়াত কখনো এমন ফয়সালা করেনি যে, সশস্ত্র সেনাবাহিনীর মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি করতে হবে। আমীরে জামায়াত হিসাবে আমি নিজেও এমন কোন নির্দেশ দেইনি। কতিপয় নেতা যদি কোন কথা বক্তৃতার মধ্যে বলে থাকেন, তাহলে তারা নিজেরাই তাদের বক্তৃতার জন্যে দায়ী ছিলেন।

কিন্তু আশ্চর্যের কথা, সরকারের ৬ই জানুয়ারি প্রেসনোটে কেবল মিএগ্রা তোফায়েল মুহাম্মদ সাহেবের উপর এ দোষারোপ করা হয়েছে যে, তিনি ৭ই সেপ্টেম্বর মিয়ানওয়ালীতে এ ধরনের কোন বক্তৃতা করেছিলেন এবং আপনি গ্রেফতার ও আটকের কারণে দোষারোপ করেছেন যে, জামায়াতের নেতৃবৃন্দ এমন বক্তৃতা করেছিলেন। দু'টি সরকারী বিবৃতির এই সুস্পষ্ট বৈপরীত্যের কি ব্যাখ্যা আপনি করবেন? এ থেকে কি একথা স্পষ্ট হয় না যে, এ সমস্ত অভিযোগ বিনা অনুসন্ধানে আনীত হচ্ছে? এবং একটি অভিযোগ উত্থাপন করার সময় স্মরণ ছিল না যে, মাত্র কয়েকদিন আগে এ থেকে ভিন্ন ধরনের কথা স্বয়ং সরকার বাহাদুরের জবান মুবারক থেকে এরশাদ হয়েছিল।

লীডারশীপ গায়ের ইসলামী

উপরের অভিযোগগুলো এমন ছিল যা আপনি জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে এবং তার মাধ্যমে আমার বিরুদ্ধে উথাপন করেছেন। এই ষষ্ঠ অভিযোগে আপনি সরাসরি আমার উপর দোষারোপ করেছেন যে, "আমি আমার বিভিন্ন জনসভায় প্রদত্ত বক্তৃতায় জাতির লীডারশীপকে গায়ের ইসলামী ও শয়তানী বলে ঘোষণা করেছি"। এর জবাব হলো, 'শয়তানী' শব্দ সম্পর্কে আমি বলতে চাই যে, এ শব্দটি আমি কখনো ব্যবহার করিনি এবং কারো সঙ্গে বিরোধ প্রকাশ করে এই ধরনের শব্দ ব্যবহারে আমি অভ্যস্তও নই। অবশ্য পাকিস্তানের কর্তৃত্ব যাদের হাতে তাদের সম্পর্কে আমি প্রকাশ্যে একথা বলেছি এবং এখনো বলছি যে, তারা ইসলাম অনুযায়ী কাজ করছেন না, তাই তাদের নেতৃত্ব গায়ের ইসলামী। একটি বিরোধী দলের নেতা হিসাবে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিগত নেতৃত্ব ও তাদের কার্যাবলীর সমালোচনা করা আমার আইনগত ও গণতান্ত্রিক অধিকার। আমার এ অধিকার ছাড়তে আমি মোটেই রাজী নই। আমাকে জানানো হোক, কোন্ আইনের মাধ্যমে এই মত প্রকাশকে অপরাধ বলা যেতে পারে?

তর্জুমানুল কোরআনের প্রবন্ধ

আপনার শেষ অভিযোগ হলো এই যে, আমার মাসিক তর্জুমানুল কোরআনের ১৯৬৩ সালের ১লা অক্টোবর সংখ্যায় আমি ইরান ও তার শাহী পরিবারের বিরুদ্ধে একটি প্রবন্ধ পেশ করি। আপনি আরো দাবি করেছেন যে, ঐ প্রবন্ধটি প্রকাশ করার পেছনে আমার উদ্দেশ্য ছিল পাকিস্তান ও তার ঐতিহ্যানুগ বন্ধু ইরানের মধ্যকার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের মূলে কুঠারাঘাত করা। এ ব্যাপারে আমার আরয হলো এই ঃ

১। আপনি যে প্রবন্ধটির বরাত দিয়েছেন সেটি ইরাক ও ইরানের নেতৃস্থানীয় উলামা কর্তৃক প্রকাশিত কতকগুলি প্রবন্ধের সংক্ষিপ্তসার। তন্মধ্যে একটি হলো সমকালীন ইরানী আলেমগণের বিস্তারিত অবস্থা সম্পর্কে লিখিত একটি পত্র। এ পত্রটি লেখা হয় জনৈক নেতৃস্থানীয় শিয়া আলেম আস্‌ সাইয়েদ আবুল কাসেম আল খাই-এর নামে। এটি মুদ্রিত হয় নাজাফ-ই-আশরাফ-এর আন-নো'মান প্রেসে। এর শিরোনাম ছিল ঃ "রিসালাতুম-মিন উলামা-ই-ইরান।"

দ্বিতীয় পুস্তিকাটির লেখক হলেন আস্‌-সাইয়েদ আল-খোই নিজে। এতে তিনি ইরানে ইহুদীদের বর্ধিষ্ণু প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং এ সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বন করার জন্যে ইরান সরকারকে হুঁশিয়ার করে দেন। এ পুস্তিকাটির নাম ছিল ঃ "তাসরীহাতুন নাজীরাতুল লিল-উম্মিল খোই"।

তৃতীয় পুস্তিকাটি হলো উল্লিখিত প্রবন্ধটির আর একটি সূত্র। এটির নাম ছিল ঃ "কিফাহুল উলামা-ইল-আ'লাম"। এটি কারবালার সিকাফাতে ইসলামিয়ায় প্রকাশিত হয়। এ পুস্তিকাটিতে ইরানে যেসব ঘটনা সংঘটিত হয়, প্রামাণ্য তারিখসহ তার বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে।

২। উল্লিখিত প্রবন্ধটি প্রকাশিত হওয়ার পর আমি ইরানী দূতাবাস থেকে এর একটি জবাব পাই এবং সেটিও আমার পত্রিকার ১৯৬৩ সালের ডিসেম্বর সংখ্যায় প্রকাশ করি। (এ সংখ্যার একটি কপি বোর্ডের বিবেচনার জন্যে পেশ করা হলো এবং ঐ প্রবন্ধটি সম্পর্কিত সম্পাদকীয় মন্তব্যের দিকে আমি বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি) এখন একটি সাময়িকী বা সংবাদপত্র উভয়

পক্ষের বিবৃতি প্রকাশ করছে, এক্ষেত্রে সাংবাদিকতার সর্বজনস্বীকৃত মূলনীতির বিরুদ্ধে কি অভিযোগ উত্থাপন করা যেতে পারে?

৩। আমি পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রেস থেকে তুরস্ক, মিসর, জর্দান, সউদী আরব, ইরাক, কুয়েত প্রভৃতি দেশের বিরুদ্ধে প্রকাশিত এই রকম বা এর চাইতে অনেক বেশী সমালোচনামূলক অন্যূন ৫০টি প্রবন্ধের উল্লেখ করতে পারি। এমন কি সেই সব প্রবন্ধে উল্লিখিত দেশগুলোর শাসকগণের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কেও মন্তব্য করা হয়। জেলের মধ্যে আমি সেই সব সাময়িকী ও সংবাদপত্রের পুরানো ফাইল সংগ্রহ করতে অক্ষম। কিন্তু সুযোগ দেয়া হলে আমি এগুলো সংগ্রহ করে আপনার বিবেচনার জন্যে পেশ করতে পারতাম। এখন প্রশ্ন হলোঃ ইরান একাই শুধু পাকিস্তানের বন্ধু? অথবা উপরোল্লিখিত দেশগুলোও আমাদের বন্ধুত্বের স্বীকৃতি লাভ করেছে? এবং যদি তারা পাকিস্তানের বন্ধু বলে বিবেচিত হয়ে থাকে, তাহলে সেই সব সাময়িকী ও সংবাদপত্র, যারা তাদের সমালোচনা করেছে, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলো না কেন? এবং তর্জুমানুল কোরআনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনের পেছনে কি যুক্তি আছে?

আমি জেনেছি যে, তর্জুমানুল কোরআনের প্রকাশ বন্ধ করার পর লায়ালপুরের সাপ্তাহিক 'আল মিম্বার' পত্রিকাও বন্ধ করা হয়েছে। পত্রিকাটি সংযুক্ত আরব রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে লিখেছিল। এটা করা হয়েছে এ জিনিসটি দেখানোর জন্যে যে, ইতঃপূর্বে নিছক কোন পার্থক্যমূলক ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি। কিন্তু 'আল মিম্বার' একাই শুধু এ ধরনের রচনা প্রকাশ করেনি। ইতঃপূর্বে বলেছি যে, এই ধরনের কমপক্ষে ৫০টি দৃষ্টান্ত পেশ করতে আমি প্রস্তুত আছি। কাজেই এভাবে শুধু আর একটি পত্রিকার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করলেই কি ভারসাম্য রক্ষিত হয়?

৪। উল্লিখিত প্রবন্ধটি প্রকাশ করার জন্যে ইতঃপূর্বে তর্জুমানুল কোরআনের প্রকাশনা বন্ধ করে দেয়া হয়। এখন সেই একই অপরাধে আমাকে গ্রেফতার করা ও আটক রাখাটা কি ইনসাফের দাবি পূরণ করার জন্যে অথবা প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে?

৫। উল্লিখিত প্রবন্ধটি তর্জুমানুল কোরআনে প্রকাশ করার জন্যে একমাত্র আমিই দায়ী। আমিই এ পত্রিকাটির মালিক এবং আমিই এর সম্পাদক। জামায়াত গঠনের ৯ বছর পূর্বে ১৯৩২ সাল থেকে আমি এটি জারি করেছি। এর মালিকানা, সম্পাদনা, পরিচালনা, লাভ ও ক্ষতি কোন ব্যাপারে জামায়াতের কোন

প্রকার সম্পর্ক নেই। আমার ব্যক্তিগত অবস্থা ও যোগ্যতা অনুসারে আমি এটি চালিয়েছি। এখন এহেন একটি পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ প্রকাশের জন্যে সরকার জামায়াতে ইসলামীকে দায়ী করেছেন, তাকে বেআইনী ঘোষণা করেছেন এবং তার অর্ধ শতেরও বেশী নেতৃবৃন্দকে জেলে আটক করেছেন। এ থেকে কি প্রমাণ হয় না যে, সরকার ন্যায়নীতি ও লজ্জার যাবতীয় মূল্যমান দূরে নিক্ষেপ করেছেন? এবং জামায়াত নেতৃবৃন্দ যে সব দোষ করেননি তা জবরদস্তি তাদের ঘাড়ে নিক্ষেপ করতে ব্রতী হয়েছেন?

৬। কেমন করে আপনি জানলেন যে, উল্লিখিত প্রবন্ধটি প্রকাশ করার পেছনে আমার উদ্দেশ্য ছিল পাক-ইরান বন্ধুত্ব সম্পর্কের মূলে কুঠারাঘাত করা? সমগ্র বিশ্বে এটি একটি সর্ববাদী সম্মত নীতি যে, যখন কোন দেশের সরকার সেখানকার জনগণের ওপর নির্যাতনের নীতি অনুসরণ করে এবং জনগণ নিজেদেরকে অসহায় অবস্থায় পায়, তখন আন্তর্জাতিক জনমতের চাপে ঐ সরকার নিজের অনুসৃত নীতির পরিবর্তন ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে সক্ষম হয়। ইরানের অধিবাসীরা আমাদের মুসলমান ভাই এবং স্বাভাবিকভাবেই তাদের প্রতি আমাদের গভীর ভালোবাসা ও সহানুভূতি আছে। ইরান ও ইরাকের প্রখ্যাত আলেমগণের রচনাবলীর মাধ্যমে যখন আমি জানতে পারলাম যে, জনগণের প্রতি অন্যায় করা হচ্ছে, তখন ইনসাফ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ইরান সরকারের ওপর আমাদের নৈতিক শক্তি ব্যবহার করার উদ্দেশ্যেই আমি সেই রচনাবলীর সংক্ষিপ্তসার প্রকাশ করলাম। এই একই উদ্দেশ্যে ইরানের প্রতিবেশী রাষ্ট্র ইরাকের প্রভাবশালী নেতৃবৃন্দ ঐ পুস্তিকাগুলো প্রকাশ করেন– এটি আমি আগেই উল্লেখ করেছি। প্রকৃতপক্ষে আমার বিরুদ্ধে যে উদ্দেশ্যে অভিযোগ করা হয়েছে, তার ছিটে-ফোঁটাও কখনো আমার মনে স্থান পায়নি। এমন কি পাক-ইরান সম্পর্কের 'মূলে কুঠারাঘাত' করার ধারণার সামান্য ছায়াও কোনদিন আমার চিন্তারাজ্যে প্রবেশ করতে পারেনি। কিন্তু হাড়িকাঠে বলি দেয়ার জন্যে সরকার সর্বপ্রথম একটি সর্ববাদীসম্মত আন্তর্জাতিক নীতির চরম অপব্যাখ্যা করলেন এবং তারপর সমগ্র জামায়াতের বিরুদ্ধে লজ্জাকর অভিযোগ উত্থাপন করলেন (১৯৬৪ সালের ৬ই জানুয়ারীর প্রেসনোট থেকে যা অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে)। জামায়াতকে ফাঁসীকাষ্ঠে ঝুলানোর আগে এভাবে তাকে একটা 'অপবাদ' দেয়া হলো। কিন্তু যে কোন ষড়যন্ত্র আমাদের মাথায় চাপিয়ে দেয়া এবং

যে কোন টুপি আমাদের মাথায় পরিয়ে দেয়ার জন্যে আগ্রহশীল হওয়ার ব্যাপারে সরকারের এই অদ্ভুত ব্যবহারই কি যথেষ্ট নয়?

আগের আলোচনায় আমার বিরুদ্ধে যে সাতটি অভিযোগ আপনি এনেছেন, তার সব ক'টিই আমি মিথ্যা প্রমাণ করেছি। আমি দুঃখিত যে, এই আলোচনায় আমাকে এমন অনেক তিক্ত কথা বলতে হয়েছে, যা সরকার অপছন্দ করেন। কিন্তু আমাকে এমন করতে বাধ্য করা হয়েছে। কেননা, মিথ্যা ও মনগড়া অভিযোগ আমি কেমন করে স্বীকার করতে পারি? এ জন্যেই আমি স্পষ্ট বলেছি যে, আমাকে গ্রেফতার করার ও আটক রাখার জন্যে যে সব কারণ দর্শানো হয়েছে, সেগুলো সত্যিকার কারণ নয়। সরকারের এই ব্যবস্থা গ্রহণের পেছনে অন্য কিছু কারণ আছে।

সেগুলো বলতে সরকার লজ্জা পান। এজন্যেই সত্যিকার কারণগুলো ঢাকা দেয়ার জন্যে মনগড়া অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছে।

ডিস্ট্রিক্ট জেল, লাহোর
২৪শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৪।

আপনার বিশ্বস্ত
আবুল আ'লা মওদূদী
৭-৩-৬৪
স্বাক্ষরঃ জি, এ, আলী,
সুপারিন্টেন্ডেন্ট,
ডিস্ট্রিক্ট জেল, লাহোর।

তৃতীয় অভিযোগের অতিরিক্ত জবাব

জনাব বিচারপতি এস, এ, মাহমুদ,
চেয়ারম্যান, রাজবন্দী পুনর্বিবেচনা বোর্ড, লাহোর।

জনাব,

সরকারের ৩ নং অভিযোগের জবাবে ইতঃপূর্বে ১৯৬৪ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারী যে জবাব দিয়েছিলাম, তার সঙ্গে নিম্নোক্ত জবাবগুলোও সংযুক্ত করতে চাই।

যেহেতু আমি বন্দী আছি এবং আমার প্রাইভেট অফিস তালাবদ্ধ করা হয়েছে, সেহেতু আমার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ খণ্ডন করার জন্যে যে সব জিনিসের প্রয়োজন, তার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ লাভ করতে পারলাম না। তবু অনেক কষ্টে আমি একটি পুস্তিকা সংগ্রহ করতে পেরেছি। এটির নাম 'পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর মজলিসে শূরার রোয়েদাদ'। ১৯৫১ সালের ১৫ই থেকে ১৯শে এপ্রিল পর্যন্ত এই শূরা অনুষ্ঠিত হয়। জামায়াতে ইসলামীর সংগঠন বিভাগ কর্তৃক ১৯৫১ সালের এপ্রিল মাসে এটি প্রকাশিত হয়। এই পুস্তিকায় মজুরদের মধ্যে জামায়াতে ইসলামীর কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে (দেখুন ৫৩-৬০ পৃষ্ঠা)। জামায়াতে ইসলামীর পলিসি সম্পর্কিত এই বর্ণনা তার বিরুদ্ধে আনীত এই অভিযোগ পূর্ণরূপে বাতিল করে যে, সে শ্রমিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে অনুপ্রবেশ করে তাদেরকে "হাঙ্গামা সৃষ্টির জন্যে উৎসাহিত করে"।

১৯৫১ সালের এপ্রিল মাসে মজলিসে শূরা প্রথমবার সিদ্ধান্ত করে যে, মজুরদের সমস্যার ব্যাপারে জামায়াতকে আগ্রহশীল হওয়া উচিত এবং এ ব্যাপারে একটি কর্মপদ্ধতি নিরূপণ করার জন্যে জামায়াতের আমীর হিসাবে আমাকে ক্ষমতা অর্পণ করা হয়। আমাকে যে ক্ষমতা প্রদান করা হয়, তার পরিপ্রেক্ষিতে আমি নিম্নলিখিত নির্দেশ দেইঃ

"আমরা শ্রমিকদের সংগঠিত করব এবং নেতৃত্ব দান করব, এ ইচ্ছা যদি কোন শ্রমিক দল প্রকাশ করে থাকে, তাহলে তাকে প্রথমেই সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে

দেয়া উচিত যে, আমরা কেবল মাত্র এই শর্তে তাদেরকে সংগঠিত করতে এবং তাদের দাবি আদায়ের জন্যে আন্দোলনকে পরিচালিত করতে পারি যদি–

(ক) দাবিসমূহ আইনানুগ ও ন্যায়সঙ্গত হয় এবং তাদের অভিযোগসমূহ সত্য ও ন্যায়সঙ্গত থাকে। তাদের অন্যায় ও বে-আইনী দাবি সমর্থন এবং অবৈধ অভিযোগসমূহ আমরা কখনো সমর্থন করতে পারি না।

(খ) তাদের দাবিসমূহ পূরণ করবার জন্য তাদের আন্দোলনকে শান্তিপূর্ণ, ন্যায়সঙ্গত ও মর্যাদাপূর্ণ কর্মপদ্ধতির বন্ধনে আবদ্ধ করবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। আমরা কোন রকমের বিক্ষোভ, হাঙ্গামা ও গুণ্ডামি পছন্দ করি না।

(গ) নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির মধ্যে তারা নিজেদের কার্যাবলী সীমাবদ্ধ রাখতে পারবে না, বরং একই সঙ্গে তাদের নিজেদের নৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থা উন্নত করার জন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে।"

ঐ একই নির্দেশে কর্মপদ্ধতি এবং এই ধরনের মজুর ইউনিট সংগঠন রীতি সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে আমি লিখেছিলাম ঃ সর্বপ্রথম কর্মীদের মধ্যে নৈতিক ধর্মীয় চেতনা জাগ্রত করা উচিত। অতঃপর নিম্নলিখিত ধারণাগুলো ধীরে ধীরে তাদের মনে প্রতিষ্ঠিত করা উচিত ঃ

১। এই দেশের যাবতীয় উপায় উপকরণ ও ধন-সম্পদ, তা যে আকৃতিতেই হোক (জমি, শিল্প, সম্পত্তি, প্রভৃতি) এবং যারই কর্তৃত্বাধীন হোক না কেন, এগুলো আসলে একটি জাতীয় সম্পদ ও ট্রাস্ট এবং জাতির এই সম্পদের সংরক্ষণ, সমৃদ্ধি ও উন্নয়ন দেশের প্রতিটি নাগরিকের নৈতিক ও জাতীয় কর্তব্য।

২। সেই সমস্ত লোক হলো শত্রু (শুধু নিজেদের শত্রু নয় বরং দেশ এবং জাতির শত্রু), যারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ধ্বংসাত্মক এবং অরাজকতার পথ ধরে জাতীয় সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত ও ধ্বংস করতে প্রস্তুত হয়।

৩। মুসলমান হিসাবে আমরা খোদার প্রজা, হযরত মুহম্মদের (সাঃ) অনুসারী এবং কোরআনের আইনের অনুগত। আমাদের প্রয়োজন যতই জরুরী এবং আমাদের দাবি যতই ন্যায়সঙ্গত হোক না কেন, যে কোন পরিস্থিতিতে খোদা ও তাঁর রাসূল (সাঃ) কর্তৃক নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করা মুসলিম হিসাবে আমাদের জন্যে সঙ্গত নয়। যতক্ষণ আমরা মুসলিম আছি, ততক্ষণ আমরা বল্গাহারা অশ্বের মত ছুটে চলতে পারি না।

৪। মুসলমান হিসাবে আমাদের সমস্যা সমাধানের জন্যে ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দর্শন বা মতবাদ আমরা গ্রহণ করতে পারি না। এমন করার কোন প্রয়োজনও নেই। কেননা, সম্ভাব্য সর্বোত্তম পন্থায় আমাদের যাবতীয় সমস্যা সমাধান করার যোগ্যতা ও ক্ষমতা ইসলামের আছে। (এই প্রসঙ্গে কর্মী ও শ্রমিকদের ইসলামের মৌলিক শিক্ষাসমূহ সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞানলাভ এবং মজুর সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে তাদের বিস্তারিত জ্ঞানলাভ করা উচিত। এভাবে তারা নিজেদের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সজাগ হতে পারবে এবং চাইবার আগেই ইসলাম তাদেরকে যেসব সুযোগ-সুবিধা দান করে, সে সম্পর্কে নির্ভুল অনুমান করতে পারবে।)

৫। সমাজের বিভিন্ন অংশ এবং দল মানব দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ন্যায়। যেমন মানবদেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করে এবং যদি তারা পরস্পরের সঙ্গে বিবাদ এবং যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তাহলে যেমন কোন মানুষ বাঁচতে পারে না, ঠিক তেমনি যে সমাজের বিভিন্ন অঙ্গ পরস্পরের বিরুদ্ধে ঘৃণা, বিদ্বেষ, শত্রুতা পোষণ করে এবং পরস্পরের সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত হয়, সে সমাজ কোনদিন উন্নতি লাভ করতে পারবে না। উন্নতি ও সমৃদ্ধি একমাত্র তখনই আসতে পারে, যখন প্রত্যেকের অধিকারের জন্যে পারস্পরিক ভালোবাসা, ভ্রাতৃত্ববোধ, সহযোগিতা, সহিষ্ণুতা ও সম্মান– পারস্পরিক ঘৃণা, বিদ্বেষ, শত্রুতা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, শ্রেণী সংগ্রাম, দলীয় বিরোধ ও প্রতিশোধ গ্রহণ মনোবৃত্তির স্থান দখল করে। একমাত্র ভালোবাসা, সাহায্য-সহযোগিতা ও ন্যায়নীতির ভিত্তিতেই একটি সুস্থ সমাজ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

৬। কোন ব্যক্তি কেবলমাত্র নিজের অধিকারটি এবং অন্যের কর্তব্যটি বড় করে তুলবে কিন্তু নিজের কর্তব্য ও অন্যের অধিকার পুরোপুরি উপেক্ষা করে যাবে, এ ধরনের মানসিকতা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত, অমানুষিক, নিষ্ঠুরতাপ্রসূত ও অন্যায়। আসলে প্রত্যেককেই খোদার সামনে তার কর্তব্য এবং অন্যের অধিকার সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে।

আজ থেকে তের বছর আগে যখন জামায়াত মজুরদের মধ্যে কাজ শুরু করেছিল, তৎকালীন প্রকাশিত একটি পুস্তিকা থেকে মজুরদের মধ্যে জামায়াতের কার্যধারা সম্পর্কে উপরিউক্ত উদ্ধৃতিগুলো পেশ করা হলো। শুরুতেই আমরা পরিচ্ছন্ন কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করেছিলাম। সরকার বলতে পারেন না যে, তারা এই

রিপোর্ট সম্পর্কে অজ্ঞ এবং জামায়াতের শ্রমিক নীতি অবগত নন। এটা কি দুঃখজনক নয় যে, জামায়াতের এই পরিষ্কার বিবৃতির পরও সরকার অন্ধভাবে ক্ষমতাসীন দলের রাজনৈতিক প্রতিশোধ ও হিংসা চরিতার্থ করেছেন এবং আমাদের উপর একটি মিথ্যা, অযৌক্তিক, ভিত্তিহীন ও অন্যায় অভিযোগ চাপিয়ে দিয়েছেন যে, আমরা মজুরদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি করে ক্ষমতা দখল করতে চাই!

ডিস্ট্রিক্ট জেল, লাহোর
৩রা মার্চ '৬৪

আপনার বিশ্বস্ত
আবুল আ'লা মওদূদী
স্বাক্ষরঃ
জি.এ.মালী,
৭-৩-৬৪
সুপারিন্টেন্ডেন্ট
ডিস্ট্রিক্ট জেল, লাহোর

মাওলানা মওদূদী পশ্চিম পাকিস্তান সরকারের পররাষ্ট্র সচিব এবং রাজবন্দী পুনর্বিবেচনা বোর্ডের চেয়ারম্যান বিচারপতি এস. এ. মাহমুদের কাছে উপরোল্লিখিত যে জবাব দান করেন, তা এতই যুক্তিপূর্ণ, আইনানুগ ও বিজ্ঞতাপূর্ণ যে, অভিযোগকারীর অভিযোগগুলো শুধু ভিত্তিহীন ও দুরভিসন্ধিমূলক প্রমাণিত হয়নি, বরঞ্চ প্রতিপক্ষের বিদ্বেষদুষ্ট মনের প্রকৃত ব্যাধিও পরিস্ফুট হয়ে পড়ে। স্বার্থান্বেষী মহল তথা ক্ষমতাসীন কনভেনশন লীগ পাকিস্তান সরকারের পক্ষ থেকে এরূপ হাস্যকর অভিযোগ উত্থাপন করে একটি প্রতিষ্ঠিত সরকারকে জনগণ, সুধী সমাজ ও আইনবিদদের কাছে এবং বহির্জগতের কাছে হাস্যাস্পদ করেছে।

অভিযোগের উত্তরে কাশ্মীরী নেতৃবৃন্দ

আযাদ জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জনাব সরদার মুহম্মদ ইবরাহীম খান এক বিবৃতিতে বলেন–

"কাশ্মীরের জিহাদ সম্পর্কে মাওলানা মওদূদীর বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ করা হয়েছে তা একেবারে ভিত্তিহীন। ১৯৮৪ সালে মাওলানা মওদূদীকে যখন এই অভিযোগের ভিত্তিতে কারাগারে প্রেরণ করা হয়, তখন আমি এই রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ছিলাম। আমি এসব অভিযোগের তদন্ত করে জানতে পেরেছিলাম যে, তার মধ্যে কোন সত্যতার লেশ মাত্র ছিল না। মাওলানা মওদূদীর দেশপ্রেম, রাষ্ট্রের প্রতি তাঁর আনুগত্য এবং কাশ্মীরের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি তার পূর্ণ সমর্থন সম্পর্কে কোন প্রকার সন্দেহ পোষণ করা যেতে পারে না।"

(এপিপি-দৈনিক কোহিস্তান, রাওয়ালপিন্ডি– ৮ই নভেম্বর, ১৯৬৩)।

আযাদ জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জনাব সাইয়েদ আলী আহমদ শাহ্ বলেন–

"কাশ্মীরের জিহাদকে বিতর্কের বিষয়বস্তুতে পরিণত করা ঠিক নয় এবং পুনঃ পুনঃ এ কথাও ঘোষণা করা ঠিক নয় যে, মাওলানা মওদূদী কাশ্মীর জিহাদের বিরোধী। এতে কাশ্মীরের উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়। কাশ্মীর সম্পর্কে আজ পর্যন্ত দেশের সকল দলই একমত। মাওলানা মওদূদী বরাবর জম্মু ও কাশ্মীর রাষ্ট্রের জনগণের জন্যে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার ও গণভোটের সমর্থন করে আসছেন এবং ইনশাআল্লাহ্ ভবিষতেও সমর্থন করবেন। আমি এও নিশ্চিতরূপে জানি যে মাওলানা মওদূদী কাশ্মীর বিভাগের তীব্র বিরোধী। পৃথিবীর প্রতিটি মুসলিম রাষ্ট্র কাশ্মীর সমস্যা সম্পর্কে এই অভিমতই পোষণ করে। ১৯৪৮ সালে যখন কাশ্মীরে জিহাদ চলছিল, সে সময়ে মাওলানা মওদূদী এবং জামায়াতে ইসলামী আমার অনুমতিক্রমে আযাদ কাশ্মীর সেনাবাহিনীর মধ্যে নগদ টাকা এবং রসদ বিতরণ করেন। মাওলানা মওদূদী কাশ্মীরীদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার ও গণভোটবিরোধী কখনোই ছিলেন না এবং এখনও নন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, যদি এখন কিংবা ভবিষ্যতে জাতিসংঘ অথবা ভারত নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাব লঙ্ঘন করে বা

বাতিল করে, তাহলে মাওলানা মওদূদী অবশ্য অবশ্যই পাকিস্তান এবং অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রকে জিহাদের পরামর্শ ও ফতোয়া দেবেন।"

(আঞ্জাম, পেশোয়ার, ১লা ডিসেম্বর, ১৯৬৩)

কাশ্মীরী নেতা চৌধুরী গোলাম আব্বাসীর বিবৃতি ঃ

"রাওয়ালপিন্ডি, ২রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৪। অদ্য এখানে পাবলিক লাইব্রেরী হলে নিখিল জম্মু ও কাশ্মীর মুসলিম কনফারেন্সের জেনারেল কাউন্সিলের একটি অধিবেশন উক্ত কনফারেন্সের সভাপতি জনাব রাজা মুহাম্মদ হায়দার খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অধিবেশনে আযাদ কাশ্মীর থেকে দু'শ কাউন্সিলর যোগদান করেন। কায়েদে মিল্লাত চৌধুরী গোলাম আব্বাস অধিবেশনে তাঁর প্রদত্ত ভাষণে বলেন, 'মুসলিম কনফারেন্স এর কাউন্সিলরগণের পক্ষ থেকে আমরা এই মর্মে নোটিশ পেয়েছি যে, কাউন্সিল অধিবেশনে জামায়াতে ইসলামীর উপরে বাধা নিষেধ এবং তার নেতৃবৃন্দের গ্রেফতারের বিরুদ্ধে নিন্দাসূচক প্রস্তাব গ্রহণ করা হোক। আমি এ ব্যাপারে জেনারেল কাউন্সিলের সকল সদস্যের সামনে এ কথা স্পষ্ট করে বলে দেয়া আবশ্যক মনে করি যে, পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির সাথে আমাদের কোন সংস্রব নেই। কিন্তু কাশ্মীর সমস্যার সঙ্গে জড়িত ব্যাপার সম্পর্কে আমাদেরকে আমাদের অভিমত ব্যক্ত করতে হচ্ছে।"

"এ এক সর্বজনস্বীকৃত সত্য যে, জামায়াতে ইসলামীর সাথে সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তিই দেশপ্রেমিক। বরং সর্বাপেক্ষা দেশপ্রেমিক। সত্যিকারভাবে দেশের মধ্যে এই একটি দল ছিল, যে দল দেশে ইসলামী গণতন্ত্রের জন্যে আইনানুগ পন্থায় সংগঠিত চেষ্টা করছিল। কাশ্মীর সমস্যা সম্পর্কে এবং কাশ্মীদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার অর্জনের ব্যাপারে মাওলানা মওদূদী একাকী যা করেছেন, আমরা সকলে মিলে- এমন কি, আমাদের সরকারের সকল প্রচেষ্টাসহ আমরা তা করতে পারিনি। মাওলানা মওদূদী ইসলামী রাষ্ট্রগুলোর সমন্বয়ে গঠিত 'রাবেতায়ে আলমে ইসলামী'র মাধ্যমে কাশ্মীর সমস্যাকে বিশ্বের জাতিসমূহের দরবারে পৌছিয়ে দিয়ে আমাদের সপক্ষে আত্মনিয়ন্ত্রণের সমর্থন আদায় করেছেন, যা পাকিস্তানের কাম্য। উপরন্তু মাওলানা মওদূদী কাশ্মীর কমিটির একজন সদস্য ছিলেন। এদিক দিয়েও তিনি একা আমাদের থেকে বেশী কাজ করেছেন। তিনি তাঁর জামায়াতের পক্ষ থেকে সাহায্য সমর্থনের নিশ্চয়তা দিয়ে এক বিবৃতিতে

বলেছিলেন (১৯৬৪ সালের ১লা জানুয়ারী এ বিবৃতি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়), 'কাশ্মীর সমস্যা সম্পর্কে সরকারের একটা বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার।' কিন্তু পাকিস্তান সরকার অপ্রত্যাশিতভাবে এমন এক বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন যে, মাওলানা মওদূদী এবং জামায়াতে ইসলামীর নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করে তাঁর সে আওয়াজ বন্ধ করে দিলেন, যার দ্বারা কাশ্মীরবাসীর অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে।"

"উপরন্তু একথা কারো অবিদিত নেই যে, অধিকৃত কাশ্মীরে বর্তমানে সকল রাজনৈতিক দলের মধ্যে একমাত্র জামায়াতে ইসলামীই একটি সুদৃঢ় দল। গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে এর শাখা বিস্তার লাভ করে আছে। এই কারণে পাকিস্তানের মতো একটি ইসলামী ও গণতান্ত্রিক দেশে জামায়াতে ইসলামীর ন্যায় শান্তিপ্রিয় ও গণতান্ত্রিক দলের উপরে বাধা-নিষেধ আরোপ করার ফলে কাশ্মীরী জনগণের মনে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে অবশ্যই ঘৃণার সঞ্চার হবে।"

"বর্তমানে কাশ্মীরের শান্ত-শীতল পরিবেশ উত্তপ্ত বারুদখানায় পরিণত হয়েছে এবং পাকিস্তান প্রকৃতই কাশ্মীর লাভ করতে চাইলে এর চেয়ে অধিকতর উপযোগী সময় আর কোনদিন আসবে না। এই সময়ে উচিত ছিল গোটা পাকিস্তানী জাতির একনিষ্ঠ ও সমবেত সমর্থন-সহযোগিতা। পাকিস্তান সরকার তা অর্জনও করেছিলেন। কিন্তু আমাদের জন্য পরিতাপের বিষয় এই যে, ঠিক এই সময়ে মাওলানা মওদূদী এবং জামায়াতে ইসলামীর উপরে বাধা নিষেধ আরোপ করে সরকার নিজকে সাহায্য-সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত করেছেন। এ থেকে বোঝা যায় যে, সরকার এ ব্যাপারে কোন কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতেই চান না।"

"যদি পাকিস্তান সরকার কাশ্মীর সমস্যা সম্পর্কে আন্তরিকতা পোষণ করে থাকেন, তাহলে আমাদের দাবি এই যে, মাওলানা মওদূদী এবং জামায়াতে ইসলামীর নেতৃবৃন্দকে বিনা শর্তে মুক্তি দেয়া হোক এবং জামায়াতে ইসলামীর উপর থেকে বিধিনিষেধ প্রত্যাহার করা হোক।"

গোটা পরিষদ কায়েদে মিল্লাতের উপরিউক্ত ভাষণের প্রতি এক বাক্যে সমর্থন জানায় এবং পাকিস্তান সরকার ও প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল মুহাম্মদ আইয়ুব খানের নিকট দাবি জানানো হয় যে, মাওলানা মওদূদী এবং জামায়াত নেতৃবৃন্দকে মুক্তি দেয়া হোক এবং জামায়াতে ইসলামীর উপর থেকে বাধানিষেধ প্রত্যাহার করা হোক।

(সাপ্তাহিক পাক-কাশ্মীর, রাওয়ালপিন্ডি, ৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৪)।

মাওলানা ও জামায়াত নেতাদের মুক্তি

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, ৬ই জানুয়ারী, ১৯৬৪ জামায়াতে ইসলামীকে বেআইনী ঘোষণা করার সাথে সাথে মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (আমীর, জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তান) এবং পশ্চিম পাকিস্তানের ৪৫ জন এবং পূর্ব পাকিস্তানের ১৩ জন জামায়াত নেতাকে গ্রেফতার করা হয়। পূর্ব পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দ ছয়-সাত মাসের মধ্যে মুক্তি লাভ করেন। কিন্তু ২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৯৬৪ মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের সুস্পষ্ট রায়ের পরও মাওলানা মওদূদীসহ পশ্চিম পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দকে অন্যায় ও বেআইনীভাবে কারাগারে আবদ্ধ রাখা হয়। অবশ্য এই অন্যায় আটক আদেশের বিরুদ্ধে পশ্চিম পাকিস্তান হাইকোর্টে 'হেবিয়াস কর্পাস' দায়ের করা হয়।

৯ই অক্টোবর, ১৯৬৪ পশ্চিম পাকিস্তান হাইকোর্ট তাঁদের রায়ে বলেন যে, 'নেতৃবৃন্দের আটক সম্পূর্ণ অন্যায় ও বেআইনী হয়েছে'। মহামান্য হাইকোর্ট অবিলম্বে নেতাদের মুক্তির জন্য সরকারকে নির্দেশ দেন।

হাইকোর্টের নির্দেশে মাওলানা মওদূদীসহ অন্যান্য জামায়াত নেতৃবৃন্দের নয় মাসাধিককাল বিনা দোষে কারদণ্ড ভোগ করার পর দুনিয়ার মুক্ত আবহাওয়ায় ফিরে আসার সুযোগ হলো। লাহোরের জনসাধারণ মাওলানাকে জেল গেটে সাদর অভ্যর্থনা জানানোর জন্যে প্রতীক্ষা করতে থাকে। অবশেষে রাত তিনটার পর জেল ফটক উন্মুক্ত হয়, মাওলানা বাইরে পদার্পণ করেন এবং তাকে নিয়ে বিরাট শোভাযাত্রা হয়। সত্যের জয়ধ্বনি আবার নিনাদিত হলো, মিথ্যার ফানুস বিলীন হলো মহাশূন্যে।

বিগত পাক ভারত যুদ্ধে মাওলানা মওদূদী ও জামায়াতে ইসলামীর ভূমিকা

উনিশ শ' পঁয়ষট্টি সালের ৬ই সেপ্টেম্বর সাম্রাজ্যবাদী ভারত যুদ্ধ ঘোষণা ছাড়াই স্থল ও আকাশ পথে পাকিস্তান আক্রমণ করে। ট্যাংক, আর্মার্ডকার ও ভারী অস্ত্রশস্ত্রসহ লাহোরের পূর্বে ওয়াগাহ্ সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতীয় সৈন্য লাহোরের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। শেষ রাত থেকেই ভারতীয় কামান ও গোলাগুলীর বজ্রনিনাদ শোনা যাচ্ছিল। কিন্তু পরদিন বেলা ন'টার পূর্বে লাহোরবাসী প্রকৃত ঘটনা জানতে পারেনি।

৫ই সেপ্টেম্বর রাওয়ালপিন্ডিতে কাশ্মীরী নেতা চৌধুরী গোলাম আব্বাস সাহেবের বাসভবনে বিরোধী দলীয় কাশ্মীর কমিটির এক বৈঠক হয়। এ বৈঠকে চৌধুরী গোলাম আব্বাস, মাওলানা মওদূদী, মুহাম্মাদ আলী, নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ্ খান ও সরদার শওকত হায়াত খান প্রমুখ নেতৃবৃন্দ মিলিত হন। পরদিন সকালে (৬ই সেপ্টেম্বর) যুদ্ধের সংবাদ পাওয়া মাত্র বেলা আটটায় মাওলানা মওদূদী লাহোর রওয়ানা হন।

দুপুরের কিছু আগে পশ্চিম পাকিস্তান সরকারের ইনফরমেশন বিভাগের সেক্রেটারী জনাব সাইয়েদ মুনীর হুসাইন মাওলানার বাসভবনে টেলিফোন যোগে জানিয়ে দেন যে, পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট তাঁর রাওয়ালপিন্ডিস্থ্ বাস ভবনে সন্ধ্যা সাতটায় বিরোধী দলীয় নেতৃবৃন্দকে মিলিত হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। মাওলানা মওদূদী তখনও লাহোর পৌঁছতে পারেননি। ইনফরমেশন সেক্রেটারী অনুরোধ জানান যে, মাওলানা লাহোর পৌঁছামাত্র তাঁকে জানিয়ে দিলে তিনি পিন্ডি যাওয়ার জন্যে সরকারী যানবাহন পাঠিয়ে দেবেন।

যা হোক, মাওলানা প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সাক্ষাত করে জানিয়ে দেন যে, ঐ চরম জাতীয় সংকট মুহূর্তে তিনি এবং তার জামায়াত যে কোন খেদমত ও ত্যাগের জন্যে প্রতিমুহূর্তে প্রস্তুত আছেন।

বলা বাহুল্য সাম্রাজ্যবাদী ভারত কর্তৃক কাশ্মীরী মুসলমানদের উপর কৃত অত্যাচার নিষ্পেষণ চরমে পৌঁছলে মজলুম মুসলমান জনসাধারণ তাঁদের আত্মরক্ষার জন্যে আগস্ট মাসের শেষভাগে জিহাদ ঘোষণা করেন। মাওলানা মওদূদী ইতঃপূর্বেই কাশ্মীরী মুজাহিদদের সর্বপ্রকার সাহয্যের জন্যে পাকিস্তানের জনগণের কাছে উদাত্ত আহ্বান জানান এবং জামায়াতে ইসলামীর সকল কর্মীকে এ ব্যাপারে এগিয়ে আসার জন্যে নির্দেশ দেন। অতঃপর "জিহাদে কাশ্মীর ফান্ড" নাম দিয়ে জামায়াত কর্মীগণ পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে অর্থ সংগ্রহ অভিযান শুরু করেন। শুধু নগদ অর্থই নয়, বিভিন্ন প্রকার প্রয়োজনীয় দ্রব্যসম্ভারও সংগৃহীত হতে থাকে। জনগণও মুক্ত হস্তে দান করে অভূতপূর্ব ত্যাগ ও কুরবানীর পরিচয় দিতে লাগল।

মাওলানা মওদূদী এতটুকু করেই ক্ষান্ত হলেন না। তিনি সমগ্র মুসলিম জগতের প্রায় একশত আলেম, চিন্তাশীল ব্যক্তি, নেতৃবৃন্দ ও সংবাদপত্র সম্পাদকের কাছে কাশ্মীর জিহাদের জন্যে সর্বপ্রকার সাহায্য প্রার্থনা করে পত্র লিখেন। তার এ আবেদনপত্র মুসলিম জাহানের বহু পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ লাভ করে। তার ফলে সর্বত্র এক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় ও মাওলানার আবেদন অনুযায়ী দ্রুতগতিতে কাজ শুরু হয়।

৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫ সরাসরি পাকিস্তান ভূখণ্ডের উপর ভারত হামলা শুরু করলে মাওলানা পাকিস্তানের জনগণের কাছে নিম্নোক্ত আবেদন জানান ঃ

"আজ ভারতীয় সৈন্য ওয়াগাহ্ সীমান্ত অতিক্রম করে লাহোরের দিকে অগ্রসর হওয়ার যে ধৃষ্টতা প্রদর্শন করেছে, এর পরে যুদ্ধ শুধু জম্মু ও কাশ্মীরেই সীমাবদ্ধ নেই, বরং উভয় দেশের মধ্যে দস্তুরমতো যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। আর এ সূচনা করেছে ঘোষণা না করেই। এখন পাকিস্তানের প্রতিটি নাগরিকের ফরয হচ্ছে মাথায় কাফন বেঁধে মারতে ও মরতে তৈরি হওয়া এবং নিজের জান-মাল দিয়ে এ পবিত্র ভূ-খণ্ডের প্রতিটি ইঞ্চি রক্ষা করা। অবশ্য এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, খোদার ফযলে আমাদের সেনাবাহিনীর লোকেরা অত্যন্ত বাহাদুর এবং তাদের বীরত্বের উপর আমাদের পূর্ণ আস্থা রয়েছে। তথাপি দেশের কোন অংশের উপরে যখন হামালা হয়, তখন তার প্রতিরোধ করা শুধু সেনাবাহিনীর উপরেই ফরয হয়ে পড়ে না, বরং আল্লাহ ও তার রাসূল (সাঃ)-এর নির্দেশ অনুযায়ী প্রত্যেক

মুসলমানের উপরেই তা ফরয হয়ে পড়ে। অতএব আমি পাকিস্তানের সকল মুসলমানের কাছে আহ্বান জানাচ্ছি যে, তারা যেন পরিপূর্ণরূপে একতাবদ্ধ হয়ে এদেশের নিরাপত্তার জন্যে দাঁড়িয়ে যান এবং সর্বপ্রকার ত্যাগের জন্যে তৈরি হন। এর পরেও মাওলানা মওদূদী পাকিস্তান রেডিওর মাধ্যমে জাতিকে জিহাদী অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করার জন্যে পাঁচটি বক্তৃতা করেন। বক্তৃতাগুলো পুস্তিকাকারে ছাপিয়ে পাকিস্তান সরকার জনগণ ও সেনাবাহিনীর মধ্যে বিতরণ করেন। একথা অতিরঞ্জিত হবে না যে, মাওলানার জিহাদী বক্তৃতাগুলো, সেনাবাহিনী, সীমান্তবাসী ও সাধারণভাবে সমগ্র জাতির মধ্যে আল্লাহর পথে জিহাদের জন্যে এক অভূতপূর্ব অদম্য শক্তির সঞ্চার করে। যুদ্ধবিরতির পর ডিসেম্বর মাসের প্রথম দিকে আমরা যুদ্ধফ্রন্টগুলো দেখতে গিয়েছিলাম। ঐতিহাসিক যুদ্ধফ্রন্ট চাবিন্ডা সেক্টরে (যাকে বিদেশী বিশেষজ্ঞগণ Graveyard of Indian Tanks- ভারতীয় ট্যাংকের সমাধিক্ষেত্র বলে অভিহিত করেছেন) আমাদের ফৌজী ভাইদের ব্যারাকে তখনও মাওলানার জিহাদী বক্তৃতার পুস্তিকা দেখতে পাই।

মাওলানা মওদূদীর আযাদ কাশ্মীর সফর

মাওলানা মওদূদী মোযাফ্ফরাবাদ থেকে আযাদ কাশ্মীর রেডিওর মাধ্যমে কাশ্মীর সমস্যার উপরে অকাট্য যুক্তি ও তথ্যপূর্ণ এক বক্তৃতা করেন। অতঃপর তিনি জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারী জেনারেল ও জামায়াতের কেন্দ্রীয় দফতরের কতিপয় দায়িত্বশীল ব্যক্তিসহ আযাদ কাশ্মীরের বিভিন্ন যুদ্ধাঞ্চল পরিদর্শন করেন এবং খোদার সঙ্গে সম্পর্ক মযবুত করে মনোবল দৃঢ় রাখতে সকলকে আবেদন জানান। মাওলানার আযাদ কাশ্মীর ভ্রমণ জনসাধারণ, মুজাহিদীন ও আযাদ কাশ্মীর সরকারকে প্রভূত উৎসাহ-উদ্দীপনা দান করে।

অতঃপর আযাদ কাশ্মীর সরকারের অনুরোধে অধিকৃত কাশ্মীর ও ভারত থেকে আগত হাজার হাজার মুহাজির ও যুদ্ধে আহত সৈনিকদের সেবার ও চিকিৎসার সম্পূর্ণ দায়িত্ব জামায়াতে ইসলামী গ্রহণ করে। এর জন্য পুঞ্চ ও মীরপুর জেলায় আটটি চিকিৎসাকেন্দ্র স্থাপন করে তার সমগ্র ব্যয়ভার জামায়াত বহন করে। এ কাজের জন্য প্রয়োজনীয় মেডিকেল অফিসার ও অন্যান্য কর্মচারী জামায়াতের পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়। এ সেবাকার্য ১৯৬৫ সালের নভেম্বর থেকে ১৯৬৬ সালের জুন মাস পর্যন্ত অব্যাহতভাবে চালু থাকে।

জামায়াতে ইসলামীর সেবাকার্যের জন্য আযাদ কাশ্মীর সরকার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে জামায়াতের রিলিফ বিভাগের পরিচালক জনাব সাইয়েদ সিদ্দীকুল হাসান গিলানী সাহেবের কাছে যে পত্র দেন তার নকল নিম্নে দেয়া হল ঃ

পত্রের নকল

No. INF/519/66
PRESIDENT'S HOUSE
MUZAFFARABAD
DATED THE 5TH APRIL, 1966

SAYED SIDDIQUL HASAN GILANI, ESQ.,
ORGANISER, MEDICAL UNITS.
JAMA'AT- I-ISLAMI PAKISTAN.
ICHHRA, LAHORE

Kindly refer to your letter No... dated 25.2.66 on the subject of winding up the Medical units established by the Jamaat-i-Islami in Azad Kashmir during the last November, 1965.

I am desired by Mr. President, Azad Govt. of the State of Jammu & Kashmir to convey gratitude on his behalf for the invaluable assistance and co-operation rendered by Jamaat-i-Islami in all the matters and particularly in medical field. Undoubtedly the support of Jamaat-i-Islami has been a cause of great relief of the victims of the barbarism of the Indian forces and the Jana Shanghies accross the Cease Fire Line.

I am also desired to request you kindly to communicate the feelings of thankfulness to the doctors and other members of the medical units who worked in Azad Kashmir in extremely difficult conditions and served the refugees at considerable personal sacrifice.

SD. M.., Hashmi
Secretary to Govt.
Azad Govt. of the state of Jammu & Kashmir.

এ সেবা কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণও পাঠকবৃন্দের কাছে পেশ করছি।

উপরে বর্ণিত আটটি মেডিক্যাল ইউনিট থেকে গত আট মাসে মোট ২,০২,৮৩৬ (দুই লক্ষ দুই হাজার আটশত ছত্রিশ) জনের চিকিৎসা করা হয়। প্রকাশ থাকে যে, রিলিফ কাজের জন্যে জামায়াতে ইসলামী মোট ২,৯৫,১৬৯.৬৮ টাকা সংগ্রহ করে। তন্মধ্যে নগদ এক লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা আযাদ কাশ্মীরের প্রেসিডেন্টের হাতে দেয়া হয়। ৭৫,৫১১.০০ টাকা মেডিক্যাল ইউনিটের জন্য বরাদ্দ করা হয়। ছাত্রদেরকে দেয়া হয় ৩,৬৩৭.৮৯ টাকা, যুদ্ধ, উদ্বাস্তুদের জন্য লাহোরে প্রদত্ত ২,১০০.০০ টাকা, হাবিব ব্যাংকে রক্ষিত রিজার্ভ ১৯,০৪৪.৮৫ টাকা, কর্মচারীদের ভাতা বাবদ ৫,৯৮৫.০০ টাকা, প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি যথা– লেপ তোশক, তৈজসপত্র প্রভৃতি খরিদ বাবদ ২৮,৫৫১.২৩ টাকা, যানবাহন, যাতায়াত, প্যাকিং প্রভৃতি বাবদ ৮,৭৩৪.২৬ টাকা, স্বেচ্ছসেবকদের ভাতা বাবদ ১,৮১১.৪৮ টাকা, কাপড় ধোলাই ও জুতা মেরামত ও খরিদ বাবদ ২,৬৩৮.৮০ টাকা এবং অন্যান্য বহুবিধ খরচ বাদে তহবিল ১,১৮৮.৪৪ টাকা জামায়াতের রিলিফ ফান্ডে জমা থাকে।

চিকিৎসা কার্য ছাড়াও লক্ষাধিক মুহাজিরের জন্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে সকল প্রকার নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করে আযাদ কাশ্মীরে পাঠানো হয়। মানুষের এমন কোন প্রয়োজনীয় দ্রব্য ছিল না, যা দেয়া হয়নি। এমন কি মুহাজির বর-কন্যার জন্যে বিবাহের মূল্যবান উপহারাদিতে পরিপূর্ণ কয়েক শত গ্যালভেনাইজড টিনের বাক্সও দেয়া হয়েছে, যাতে বাস্তুহারাদের বিয়েতে কিছুটা আনন্দের হাসি ফুটে উঠতে পারে।

আযাদ কাশ্মীরের চাহিদা মেটানোর পর ১৬ ট্রাক বোঝাই মালপত্র রাওয়ালপিন্ডিস্থ জামায়াত দফতরে ফেরত পাঠানো হয় এবং তা পরে শিয়ালকোট সেক্টরে যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। মুসলমান জনসাধারণের কাছে মাওলানা মওদূদীর উদাত্ত আহ্বানের পর জামায়াত কর্মীগণ যে সাহায্য দ্রব্য সংগ্রহ করেন, তার মূল্য ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ লক্ষ টাকার কম নয়।

এতদ্ব্যতীত "জিহাদ কাশ্মীর ফান্ডে", "পাকিস্তান ডিফেন্স ফান্ডে" এবং গৃহহীনদের সাহায্য বাবদ জামায়াত কর্মীগণ নগদ ৫,৫৮,৬৪৫.৩৮ টাকা (পাঁচ লক্ষ আটান্ন হাজার ছয় শত পঁয়তাল্লিশ টাকা আটত্রিশ পয়সা) সংগ্রহ করেন। বহু

জামায়াত কর্মী যুদ্ধের ময়দানে তাদের খেদমত পেশ করেন। কোন কোন যুদ্ধ-ফ্রন্টে তারা সৈনিকদের পানাহারের ব্যবস্থা করেন এবং রেল লাইন রক্ষার জন্যে রাতে পাহারা দেন। জামায়াতে ইসলামীর জনৈক জেলা আমীর জিহাদে উদ্বুদ্ধ হয়ে ইসলামের প্রথম খলীফা হযরত সিদ্দীক আকবর (রাঃ)-এর দৃষ্টান্তের পুনরাবৃত্তি করেন। তিনি তার গৃহের যাবতীয় আসবাবপত্র ও শেষ কপর্দক পর্যন্ত জিহাদের জন্য অকাতরে দান করেন।*

---

* কিন্তু এ এক মহাসত্য যে, যারাই আল্লাহকে একমাত্র প্রভু মনে করে ও তাঁর পথে জান-মাল কুরবান করে, ইসলাম বিরোধী সমাজ তাকে সহ্য করতে পারে না। এক্ষেত্রেও ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হলো। জেলা কর্তৃপক্ষ একটির পর একটি করে এ মর্দে মুজাহিদকে রাজনৈতিক মামলায় জড়িত করে হাজতবাসের আদেশ শুরু করে দিলেন। উল্লেখ্য যে, ভুট্টো সরকারের আমলে তিনি ছিলেন বিরোধী দলের স্পষ্ট বক্তা। অতএব তিনি ভুট্টো সরকারের ষড়যন্ত্রের শিকারে পরিণত হন এবং আততায়ীর গুলীতে শাহাদাত বরণ করেন। তিনি হলেন ডাঃ নাজির আহমদ, তিনি '৭০ সালে এম.এন. এ নির্বাচিত হয়েছিলেন।

যুদ্ধকালে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান

মাওলানা মওদূদী সর্বপ্রথম সমগ্র বিরোধী দলীয় নেতৃবৃন্দকে একত্র করে সম্মিলিত যুদ্ধ কমিটি গঠন করেন এবং কমিটির যাবতীয় কাজ জামায়াতের কেন্দ্রীয় দফতরেই সম্পাদিত হতো। এ কমিটি যুদ্ধের ব্যাপারে সকল প্রকার শর্তহীন সহযোগিতার কথা সরকারকে জানিয়ে দেন।

বহির্বিশ্বে পাকিস্তানের খেদমত

ভারত কর্তৃক সরাসরি পাকিস্তান আক্রান্ত হওয়ার পর মাওলানা মওদূদী সারা বিশ্বের মুসলিম জাতিগুলোর উদ্দেশ্যে লিখিত একখানা খোলা চিঠি মুসলিম দেশগুলোর বিভিন্ন সংবাদ পত্রে প্রকাশনার জন্যে প্রেরণ করেন। তা প্রায় সকল পত্রিকায় যথা সময়ে প্রকাশ লাভ করে। পত্রখানার নকল নিম্নরূপ ঃ

"সাম্রাজ্যবাদী ভারত শান্তিপ্রিয়তা ও নিরপেক্ষতার মুখোশ খুলে ফেলেছে এবং আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত বহুসংখ্যক সৈন্য দ্বারা চারদিক থেকে পাকিস্তান আক্রমণ করেছে। এ বর্বর হামলার কারণ এ ছাড়া আর কিছু হতে পারে না যে, কাশ্মীরের মজলুম মুসলমানগণ ভারতের পাশবিক অত্যাচার থেকে নিজেদের বাঁচানোর জন্যে জিহাদ ঘোষণা করেছিলেন এবং পাকিস্তান শুধু ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধে অনুপ্রাণিত হয়ে কাশ্মীরীদেরকে সাহায্য করেছিল। কাশ্মীর ও পাকিস্তানী মুজাহিদগণ এক সপ্তাহের মধ্যে অধিকৃত কাশ্মীরের বহু স্থান দখল করে ফেলে। এ অবস্থা দেখে ভারত দিগবিদিক জ্ঞানহারা হয়ে হঠাৎ স্থল, জল ও বিমান পথে পাকিস্তান আক্রমণ করে এবং অপরদিকে ভারতীয় ও কাশ্মীরী মুসলামনদের উপর অকথ্য নির্যাতন শুরু করে। আমাদের সৈন্য বাহিনীর সাথে 'ঈমান বিল্লাহ' ও 'তাওয়াক্কাল আলাল্লাহ'-এর অস্ত্র আছে। এজন্যেই আজ পর্যন্ত যতটা সংঘর্ষ হয়েছে, তাতে পাকিস্তানী সৈন্য অসাধারণ বীরত্বের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। ভারতীয় হামলা প্রতিরোধ করার জন্যে পাকিস্তানের দশ কোটি মুসলমান এক হয়ে সকল প্রকার ত্যাগের জন্যে দৃঢ় সংকল্প। আমি দুনিয়ার সকল মুসলমান ও মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর নিকট আবেদন জানাচ্ছি, তাঁরা যেন ইসলামের ভ্রাতৃত্ববোধে অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁদের পাকিস্তানী ও কাশ্মীরী ভাইদের আর্থিক ও নৈতিক সাহায্যদানের জন্যে এগিয়ে আসেন।"

বলা বাহুল্য, এর ফলে সারা মুসলিম বিশ্বে যে অভূতপুর্ব সাড়া জেগেছিল, তা ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। মক্কার বিশ্ব মুসলিম কংগ্রেস, ইখওয়ানুল মুসলিমুন, মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকার মুসলিম দেশগুলো এবং তথাকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যে প্রকার সাড়া দিয়েছে তা কারো অবিদিত নেই। ইরানের বিখ্যাত ধর্মীয় নেতা আল্লামা মুহাম্মদ আস্‌সাদিকুর রূহানী প্রত্যুত্তরে মাওলানা

মওদূদীকে জানান যে, ভারত কর্তৃক পাকিস্তান আক্রান্ত হওয়ার ফলে ইরানের উলামা, মাশায়িখ এবং সাধারণ মুসলমান অস্থির ও চঞ্চল হয়ে পড়েছেন।

এখানে একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য যে, জামায়াতে ইসলামী সরকার কর্তৃক বেআইনী ঘোষিত হওয়ার পূর্বেই মাওলানা মওদূদীর আন্তর্জাতিক পাসপোর্ট কারণ না জানিয়েই বাজেয়াপ্ত করা হয়। মক্কার বিশ্ব মুসলিম কংগ্রেসের (রাবিতায়ে আলমে ইসলামী) কেন্দ্রীয় দফতর স্থাপিত। মাওলানা মওদূদী তার কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির সদস্য। মদীনায় স্থাপিত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের গভর্নিং বডিরও আজীবন সদস্য। হজ্জের সময় এ উভয় প্রতিষ্ঠানের জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হয়, যাতে শাহ্ ফয়সলও যোগদান করে থাকেন। মাওলানার পাসপোর্ট সরকার কর্তৃক বাজয়াপ্ত হওয়ার পর কয়েক বছর তিনি মক্কায় যেতে পারেননি। পাক-ভারত যুদ্ধের পর মাওলানার পাসপোর্ট ফেরত দেয়া হয় এবং পরবর্তী হজ্জের সময় তিনি মক্কা গমন করেন। তিনি কাশ্মীর সমস্যা সম্পর্কে ইংরেজী ও আরবী ভাষায় মূল্যবান তথ্যবহুল একখানি পুস্তিকা প্রণয়ন করে তার প্রায় পঞ্চাশ হাজার কপি সঙ্গে নিয়ে যান। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে আগত শিক্ষিত হাজীদের মধ্যে সেগুলো বিতরণ করা হয়। পুস্তিকাগুলো এত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও ঐতিহাসিক ঘটনায় পরিপূর্ণ যে, কাশ্মীর সমস্যার মূল কারণ, এর পশ্চাৎ পটভূমি ও কাশ্মীরী মুলমানদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, দ্বীনী ও তামাদ্দুনিক ইতিহাস এত নিখুঁত ও মর্মস্পর্শী ভাষায় লিখিত যে, সরকারী কোন বিভাগের পক্ষ থেকে এ ধরনের উচ্চাঙ্গের কোন পুস্তিকা, ইতিহাস অথবা বিবৃতি আজ পর্যন্ত জনসমক্ষে উপস্থাপিত করা সম্ভব হয়নি। এই পুস্তিকায় মাওলানা সুস্পষ্টরূপে একথাই প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, কাশ্মীর সমস্যা শুধু পাকিস্তানের নয়, সমগ্র মুসলিম বিশ্বের। সাম্রাজ্য লোলুপ ভারতের পররাজ্য জয় অভিযানের সামনে যদি পাকিস্তানের প্রতিরোধ প্রাচীর ভেঙ্গে যায়, তাহলে তার যাত্রা মুসলিম জাহানের সুদূর পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। শুধু তাই নয়, পাকিস্তানের সাথে ভারতের সঠিক সম্পর্কও বিশ্বের মুসলানদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে।

উপরন্তু বিগত হজ্জের সময় মাওলানা মওদূদী বিশ্ব মুসলিম কংগ্রেসের উদ্যোগে আয়োজিত বিভিন্ন দেশের নির্বাচিত সাত-আটশত নেতৃস্থানীয় সুধীবৃন্দের সভায় পাক-ভারত যুদ্ধে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বীরত্বের ভূয়সী প্রশংসা করেন। পাকিস্তানী জনসাধারণের অটুট মনোবল, অপূর্ব ত্যাগ, ভারতীয় সেনা বাহিনীর

বর্বর পাশবিক আচরণ, ভারতের দুরভিসন্ধি প্রভৃতি সম্পর্কে তিনি দীর্ঘ বক্তৃতা করেন। মাওলানা স্পষ্ট ভাষায় বলিষ্ঠ যুক্তি দিয়ে শ্রোতাবৃন্দকে একথা বুঝিয়ে দেন যে, মুসলিম দেশগুলোর তেল সম্পদের প্রতি ভারতের লোলুপ দৃষ্টি সুস্পষ্ট। এর জন্যে সে আফ্রো-এশিয়ার মুসলিম দেশগুলোর উপরে হিন্দু ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদ কায়েম করতে চায়। অতঃপর বিশ্ব মুসলিম কংগ্রেসের বৈঠকে শেখ আবদুল্লাহর মুক্তির দাবিতে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

মোটকথা, যুদ্ধের প্রারম্ভ থেকে শুরু করে, যুদ্ধবিরতি ও তাশখন্দ চুক্তির পরবর্তী সময় পর্যন্ত পাকিস্তানের জন্য মাওলানার খেদমত অতুলনীয়। কিন্তু জীব জগতের সঞ্জীবনী শক্তি সূর্যকিরণ বাদুড় মোটেই বরদাশত করতে পারে না বলে সারাদিন অধোমুখী হয়ে সূর্যকে পদাঘাত করতে থাকে। তেমনি পাকিস্তানের একশ্রেণীর লোক মাওলানার প্রতি অহেতুক বিদ্বেষপরবশ হয়ে দেশ-বিদেশে তাঁর সম্পর্কে অমূলক কাহিনী প্রচারে তৎপর। যুদ্ধের পরেও কোন এক মহল থেকে মাওলানার বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অভিযোগ ও বিষোদগার সম্বলিত কয়েক হাজার প্রচার পত্রিকা মক্কায় প্রেরিত হয়েছিল। কিন্তু সেখানকার পরিবেশ লক্ষ্য করে তা বিতরণের সাহস করা হয়নি।

পাক-ভারত যুদ্ধে একটি ফ্রন্টে ভারতীয় সৈন্য চরম মার খেয়ে যখন পশ্চাদপসরণ শুরু করেছিল, নিরাপত্তা পরিষদ ও তার অধীন বড় বড় শক্তিগুলো যুদ্ধবিরতির জন্যে পাকিস্তানকে চাপ দিতে লাগল। এমন সময়ে মাওলানা মওদূদী সুস্পষ্ট ভাষায় এ ব্যাপারে জামায়াতে ইসলামীর অভিমত ব্যক্ত করে বলেন যে, যে পর্যন্ত নিরাপত্তা পরিষদে গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী, যা ভারতও মেনে নিয়েছিল, কাশ্মীরে গণভোটের নিশ্চিত ব্যবস্থা না করা হয়েছে সে পর্যন্ত যুদ্ধবিরতিতে সম্মতি দেয়া পাকিস্তানের জন্যে আত্মহত্যারই শামিল হবে। এরপরও মাওলানা পাকিস্তান সরকারকে বরাবর তাঁর ন্যায়সঙ্গত ও যুক্তিপূর্ণ সৎ পরামর্শ দিয়ে এসেছেন। কিন্তু সবকিছুই অরণ্যে রোদনে পরিণত হয়েছে। তাশখন্দ চুক্তি সব কিছুই ব্যর্থতায় পর্যবসিত করেছে। পাকিস্তানের জাতীয় আশা আকাঙ্ক্ষা চূর্ণ করা হয়েছে, মজলুম কাশ্মীরী মুসলমানদেরকে ক্ষুধার্ত ও হিংস্র নরখাদকের সামনে ঠেলে দেয়া হয়েছে।

চিকিৎসার উদ্দেশ্যে মাওলানার বিদেশগমন- এর আগে পাক-ভারত যুদ্ধের পর থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত

পাক-ভারত যুদ্ধের পর থেকে পাঁচটি বছর মাওলানা মওদূদী পাকিস্তানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অগ্রনায়কের ভূমিকা পালন করেন।

বিনা শর্তে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা এবং অতঃপর জানুয়ারীতে তাশখন্দ চুক্তি পাকিস্তানের ভাবমূর্তি বিনষ্ট করেছে বলে মাওলানা তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেন। তাশখন্দ চুক্তির প্রতিবাদে ১৯৬৬ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারী লাহোরে এক সর্বদলীয় জাতীয় সম্মেলন আহূত হয়, যেখানে মাওলানা মওদূদী এবং বিরোধী দলীয় নেতৃবৃন্দ সরকার ও তাশখন্দ চুক্তির তীব্র সমালোচনা করে বক্তব্য রাখেন। কিন্তু সরকার এ সম্মেলনের বক্তব্য ও প্রস্তাবাদির প্রকাশনা বন্ধ করে দেন। তার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ দেশব্যাপী পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট নামে এক গণ-আন্দোলন শুরু হয়।

মাওলানার গ্রেফতার

যেহেতু মাওলানা মওদূদী ছিলেন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রাণস্বরূপ, তাই তিনি হয়ে পড়েছিলেন শাসকগোষ্ঠির চোখের বালি। তাঁকে গ্রেফতার করে অনির্দিষ্টকালের জন্য তাঁকে আন্দোলনের ময়দান থেকে সরিয়ে দেয়ার নানা বাহানা সরকার তালাশ করছিলেন এবং অবশেষে সে বাহানাও তাঁরা পেয়ে গেলেন।

সাতষট্টির ১০ই জানুয়ারী সন্ধ্যার পর সরকারী রুয়েতে হিলাল কমিটির বরাত দিয়ে রেডিও-টিভির মাধ্যমে ঘোষণা দেওয়া হয় যে, ঈদুল ফিতরের চাঁদ দেখা গিয়েছে এবং পরদিন ১১ই জানুয়ারী সারাদেশে ঈদুল ফিতর পালিত হবে। অথচ পিন্ডি, লাহোর, করাচী, দিল্লী এবং পূর্ব পাকিস্তানের কোথাও চাঁদ দেখা যায়নি। অতএব উলামায়ে কিরাম, রুয়েতে হিলাল কমিটির সাথে দ্বিমত পোষণ করেন। তাঁরা সিদ্ধান্ত নেন যে, ১১ই জানুয়ারীর পরিবর্তে ১২ই জানুয়ারী ঈদ পালন করা হবে এবং একথা সংবাদ পত্রের মাধ্যমে সারাদেশে প্রচারিত হয়। মুসলমান জনসাধারণও চাঁদ না দেখে ১১ই জানুয়ারী ঈদ করতে রাজি ছিলেন না। কারণ ১০ই জানুয়ারী সন্ধ্যায় চাঁদ দেখার কোন খবর কোথাও থেকে পাওয়া যায়নি। ফলে সারাদেশে অতি অল্প সংখ্যক লোক শুধুমাত্র সরকারকে খুশী করার জন্যে ১১ই জানুয়ারী ঈদ করলেও সমগ্র জাতি ১২ই জানুয়ারী শুক্রবার পবিত্র ঈদুল ফিতর পালন করেন।

এতে আইয়ুব খানের মর্যাদায় আঘাত লাগে। অতঃপর সরকারী সিদ্ধান্তের সমর্থনে এবং আলেমগণের বিশেষ করে মাওলানা মওদূদীর প্রতি বিষোদগার করে মন্ত্রীবর্গ ও তোষামোদকারীদের কাছ থেকে বিবৃতির পর বিবৃতি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হতে থাকে। এতে সরকারের কুমতলব কারো বুঝতে বাকী থাকে না। অতএব, ১৯শে জানুয়ারী মাওলানা মওদূদীসহ লাহোরের প্রখ্যাত চারজন আলেমকে গ্রেফতার করে পৃথক পৃথক জেলে পাঠানো হয়। মাওলানা মওদূদীকে লাহোর থেকে কয়েকশ' মাইল দূরে বান্নু জেলে স্থানান্তরিত করা হয় এবং তাঁর গতিবিধি কয়েকদিন যাবত দেশবাসীর কাছে একেবারে গোপন রাখা হয়।

গ্রেফতারের এক মাস পর আইয়ুব খান গভর্নরদের সম্মেলনে দম্ভোক্তি করেন যে, কতিপয় আলেমকে এজন্য গ্রেফতার করা হয়েছে যে, তাঁরা ধর্মকে তাঁদের হাতের পুতুল বানাতে চান।

কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার তার সম্পূর্ণ বিপরীত। আইয়ুব খান নিজে ধর্ম-এর অধীনে না হয়ে ধর্মকে তথা ইসলামকে তাঁর অধীন করতে চেয়েছিলেন। পক্ষান্তরে মাওলানা মওদূদী ও সত্যাশ্রয়ী আলেমগণ ইসলামের প্রতি কারো কণামাত্র হস্তক্ষেপ বরদাশত করতে কিছুতেই রাজী ছিলেন না।

জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে চৌধুরী রহমত ইলাহী এ অন্যায় আটকাদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে মামলা দায়ের করলে ১৩ মার্চ শুনানির দিন ধার্য করা হয়।

শুনানি চলাকালে সরকার ১৬ই মার্চ মাওলানাকে মুক্তিদান করতে বাধ্য হন। অতঃপর তাঁকে বান্নু জেল থেকে সসম্মানে লাহোরে তাঁর বাসভবনে পৌছিয়ে দেয়া হয়।

চিকিৎসার উদ্দেশ্যে মাওলানার বিদেশ ভ্রমণ

মূত্রাশয়ে পাথর সঞ্চারিত হওয়ার ফলে মাওলানা দীর্ঘকাল যাবত এ পাথুরে রোগে ভুগছিলেন। এ কারণে অসময়ে তাঁর স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙে পড়েছিলো। দ্বীনের কাজের জন্যে তিনি তাঁর দেহ-মনকেও পাথরের মতো বানিয়ে নিয়েছিলেন। তার ফলে কঠিন রোগের মধ্যেও তিনি দিন রাত কাজ করতেন। রোগের কষ্ট ও বেদনা মুখ দিয়ে প্রকাশ করেননি। আর না তাঁর মুখমণ্ডলে কোনদিন বেদনার ছায়া দেখা গেছে।

প্রথম তাঁর মূত্রাশয় অপারেশন করা হয়েছিলো ১৯৪৬ সালের ১৬ই অক্টোবর, যখন তিনি দারুল ইসলাম পাঠানকোটে অবস্থান করছিলেন। একাধারে ঘণ্টার পর ঘণ্টা এবং রাতে সুখনিদ্রা পরিহার করে ঠায় বসে বসে লেখাপড়ার কাজের জন্য তাঁর এ রোগ হয়। ইউনানী ও এলোপ্যাথিক ঔষধ সেবনে প্রস্রাবের সাথে পাথর বেরিয়ে যেতো এবং আবার হতো। হাকীম মুহাম্মদ শরীফ অমৃতসারী বরাবর তাঁর চিকিৎসা করতে থাকেন, কিন্তু রোগ নিরাময় হয় না। অতএব সকলের অনুরোধে মাওলানা অপারেশনের জন্যে রাজী হলেন।

লাহোরের জাফর ইকবাল মাওলানার বন্ধু এবং তাঁর ভাই ডাঃ রিয়াজ কাদির নাম করা সার্জন ছিলেন। স্থিরীকৃত হয় অক্টোবরে অমৃতসর হাসপাতালে ডাঃ রিয়াজ কাদির মাওলানার অপারেশন করবেন। অপারেশনের প্রস্তুতির জন্যে তিনি কিছু ঔষধের ব্যবস্থা করে মাওলানাকে পূর্ণ বিশ্রামের পরামর্শ দেন। তদনুযায়ী ২৫শে সেপ্টেম্বর মাওলানা শিমলা গমন করেন এবং সূফী আবদুর রহীম সাহেবের গৃহে অবস্থান করতে থাকেন। অতঃপর ১৩ই অক্টোবর তিনি অমৃতসরে আসেন এবং ১৬ই অক্টোবর ডাঃ রিয়াজ কাদির তাঁর অপারেশন করেন। তাঁর মূত্রাশয়ে পাঁচটি পাথর পাওয়া যায়। অপারেশন সফল হয় এবং ১৩ই নভেম্বর মাওলানা হাসপাতাল ত্যাগ করে সন্ধ্যে নাগাদ দারুল ইসলাম

পৌঁছেন। ছ'দিন পর ১৯শে নভেম্বর মাওলানা বিশ্রামের জন্যে শিয়ালকোট যান এবং ডিসেম্বরের শেষে দারুল ইসলাম প্রত্যাবর্তন করেন।

বাইশ বছর পর পুনরায় ডাক্তারদের পরামর্শক্রমে মূত্রাশয় অপারেশনের জন্যে তাঁকে লন্ডন যেতে হচ্ছে। অতি স্বাভাবিকভাবেই মাওলানার অগণিত ভক্ত অনুরক্তগণ উদ্বিগ্ন এবং মাওলানার বিরহ চিন্তায় কাতর হয়ে পড়েছেন। তাঁদের বিরহ কাতর মনের আবেগ উচ্ছ্বাস ভাষায় ও আঁখিজলে ব্যক্ত হয়ে পড়ে ৫/এ যায়লদার পার্কে মাওলানার বাসভবনে এবং তাঁর বিদায় উপলক্ষে আয়োজিত লাহোরের বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদিতে।

আটষট্টির আগস্ট থেকে ডিসেম্বর

বাইশে আগস্টের অপরাহ্নকাল।

লাহোর বিমান বন্দরে জমাট বেঁধে আছে হাজার হাজার মানুষের বেদনাপ্লুত মনের আবেগ-উচ্ছ্বাস। জনতার মধ্যে বিরাজ করছে পূর্ণ শৃঙ্খলা। নেই কোন কোলাহল, কোন হৈ হল্লা। শুধু নীরবে আঁখিজলে ভেসে বিদায় দেয়ার আকুল আকুতি। বিমান বন্দরের দিকে জনতার স্রোত সদা প্রবহমান। লন্ডন রওয়ানা হওয়ার প্রাক্কালে মাওলানাকে এক নজর দেখার জন্যে এ জনসমাবেশ।

বিকেল বেলায় সূর্য বিমান বন্দরে অগ্নিবর্ষণ করছে। মাওলানাকে বিদায়দানকারী জনতা সারিবদ্ধ হয়ে পূর্ণ শৃঙ্খলার সাথে অপেক্ষমান। তাঁদের হাতে বিভিন্ন প্রকার ব্যানার, "পাকিস্তানের বুনিয়াদ কি– ইসলাম, পাকিস্তানকে টিকে রাখবে– ইসলাম, পাকিস্তানের উৎস কি– লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।"

সত্য সুন্দরের দিকে আহ্বানকারী যে পরম শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিকে দেখার জন্যে এ জনসমূদ্র, তিনি এসে পড়েছেন বিমান বন্দরে। অগণিত মানুষের অপলক দৃষ্টি স্থির নিবদ্ধ তাঁর প্রতি। তাঁর মুখ থেকে নিঃসৃত প্রতিটি কথা অপেক্ষমান জনতা হৃদয়ে গেঁথে রাখছে এবং তাঁর বিদায়কালের এ মূল্যবান বাণী তাঁরা পৌঁছে দেবেন লক্ষ লক্ষ নরনারীর কাছে, যাদের সুযোগ-সৌভাগ্য হয়নি এ বিদায় অনুষ্ঠানে যোগদান করার। মাওলানা অশ্রু গদগদ কণ্ঠে জনতার উদ্দেশ্যে বলেন ঃ "আপনাদের সকলের জন্যে আমার অসিয়ত এই যে, আপনারা পূর্ণ আন্তরিকতা ও দৃঢ়তার সাথে পাকিস্তানের যমীনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্যে কাজ করে যাবেন। আমি আপনাদের জন্যে দোয়া করতে থাকব এবং আপনারাও আমার জন্যে দোয়া করতে থাকবেন, যেন আল্লাহ্ তায়ালা আমাদেরকে তাঁর দ্বীনের সাচ্চা খাদেম বানিয়ে দেন। আমরা যা কিছু করতে পারি, তা অধিক দক্ষতা ও নিষ্ঠার সাথে করার তওফিক যেন তিনি দান করেন।"

জনতা কাতর কণ্ঠে বলে উঠল– 'আমীন'।

পঁচিশে আগস্ট।

আজ করাচী বিমান বন্দর দু'দিন আগের লাহোর বিমান বন্দরের রূপ ধারণ করেছে। মাওলানা বিমানের সিঁড়ি বেয়ে উপরে আরোহণ করছেন। বেদনার ছায়ায় আচ্ছাদিত বিমান বন্দরের গোটা পরিবেশটা শান্ত, গুরু-গম্ভীর ও পবিত্র রূপ ধারণ করেছে। বিদায় দানের উদ্দেশ্যে আগত জনতার দোয়া গুঞ্জরিত হচ্ছে বিমান

বন্দরের আকাশে বাতাসে। সিঁড়ির শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে মাওলানা হাত তুলে জনতার উদ্দেশ্যে 'খোদা হাফেয' বললেন।

পিআইএ'র বোয়িং বিমানটি নীল আকাশে তার দু'টি পাখায় ভর করে কত দেশ, কত নদ-নদী, কত সাগর পার হয়ে উড়ে চলেছে তার গন্তব্যের দিকে। যাত্রীদের মধ্যে কেউ পানাসক্তির সাধ মেটাচ্ছেন, কেউ পাশের সহযাত্রীর সাথে আলাপচারিতায় রত, কেউ চিত্ত বিনোদনের জন্যে কোন রস সাহিত্যের রস পানে নিমগ্ন। কিন্তু মাওলানার এ সবের ফুরসৎ কোথায়? তিনি তাঁর সাহিত্যের ইংরেজী তরজমার প্রয়োজনীয় সংশোধনী কাজে লিপ্ত রয়েছেন। বিমান মাঝে মাঝে আকাশ থেকে নেমে আসছে যমীনের উপর তেহরানে, বৈরুতে, ইস্তাম্বুলে। প্রতিটি স্থানে মাওলানার দর্শনপ্রার্থীদের "আল্লাহু আকবার" কণ্ঠে বিদীর্ণ হচ্ছে বিমান বন্দরের আকাশ-বাতাস। দর্শনপ্রার্থীদের মধ্যে রয়েছেন শহরের সুধীবৃন্দ, উলামায়ে কিরাম, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নেতৃবৃন্দ, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকমণ্ডলী এবং ছাত্রবৃন্দ। মাওলানার ব্যক্তিত্ব কোন একটি দেশের মধ্যে সীমিত নয়, বরঞ্চ তা বিশ্বজনীন। তিনি শুধু পাকিস্তানের নন, সারা বিশ্বের। মুসলিম বিশ্বের শ্রদ্ধার পাত্র তিনি, ইসলামের পথে চলার সত্যিকার দিক নির্দেশনা চায় মুসলিম বিশ্ব তাঁর কাছে।

সমাগত জনতার কাছে মাওলানা ব্যক্তিগতভাবে অপরিচিত। কিন্তু মাওলানার প্রতি তাঁদের আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন ও স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ-উচ্ছ্বাস ব্যাহ্যত এ কথারই সাক্ষ্যদান করে যে উভয়ে উভয়ের কাছে সুপরিচিত বহুদিনের, যুগান্তরের, শতাব্দীর। সত্যের দিকে আহ্বানকারী এবং সত্যকে গ্রহণকারীদের মধ্যে সম্পর্ক এতো গভীর ও মজবুত কেন এবং এ ধরনের আরও যত প্রশ্ন আছে, তার জবাব দেয়ার ফুরসত কোথায় এবং প্রয়োজনই বা কি? দু'টি চোখ যে হৃদয়গ্রাহী দৃশ্য অবলোকন করছে, হৃদয় যা অনুভব করছে এই তো তার জবাব।

ইউরোপের সর্ববৃহৎ বিমান বন্দর 'আল্লাহু আকবর' কণ্ঠে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। তার সাথে ধ্বনিত হচ্ছে পাকিস্তান জিন্দাবাদ, ইসলামী নিজাম জিন্দাবাদ। ব্রিটিশ স্ট্যান্ডার্ড টাইম অনুযায়ী অপরাহ্ন সাড়ে পাঁচ ঘটিকা। মাওলানা বিমান থেকে অবতরণ করেছেন। নিউটন, বার্মিংহাম, ম্যানচেস্টার রোচস্টার, ব্রাডফোর্ড এবং অন্যান্য বিশ-বাইশটি শহর থেকে আগত জনতা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অভিনন্দন জানাচ্ছেন মাওলানাকে। তাদের মধ্যে আছেন আরবের লোক, তুরস্কের লোক, এশিয়া ও আফ্রিকার লোক। আছেন বহুসংখ্যক পাকিস্তানী এবং ইউরোপের বিভিন্ন স্থানের নওমুসলিমগণ। ইংরেজী, আরবী, উর্দূ, জাপানী, মালয়েশীয়, এবং

তুর্কী ভাষায় লিখিত বিভিন্ন ব্যানার ও ফেস্টুনগুলো দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। লন্ডন বিমান বন্দরের তেতলা এবং তার গ্যালারী থেকে হাজার হাজার ইউরোপীয় দর্শক অপলক নেত্রে উপভোগ করছেন এ অভূতপূর্ব দৃশ্য। যে কথা বলা হয়েছিল লাহোরে, করাচীতে এবং পথে বিভিন্ন বিমান বন্দরে, তাই বলা হচ্ছে লন্ডন বিমান বন্দরে। এই যে অভূতপূর্ব ও নযীরবিহীন সম্বর্ধনা- এ কোন ব্যক্তিত্বের প্রতি নয়, একটি জীবন দর্শন ও জীবন বিধানের প্রতি পূর্ণ সমর্থনের স্বীকারোক্তি। তার সাথে একটি মিল্লাত ও জাতির পক্ষ থেকে ইসলামের জন্যে সমগ্র জীবন উৎসর্গকারী এবং 'শাহাদাতে হকের' প্রত্যক্ষ সাক্ষ্যদানকারী এক ব্যক্তিকে বক্ষে ধারণ করার এ এক অভিব্যক্তি। সত্যকে গ্রহণ করার এবং মিথ্যাকে প্রত্যাখ্যান করার এ একটি বলিষ্ঠ ঘোষণা।

উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এ শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি তো তিনিই যিনি আজ থেকে আটচল্লিশ বছর আগে মাত্র সতেরো বছর বয়সে কলম হাতে নিয়েছিলেন। তখন দুনিয়া দেখতে পেয়েছিল যে, তাঁর কলমের বিষয়বস্তু ছিল ইসলাম, তাঁর সারা জীবনের ধ্যান-ধারণা ও চেষ্টা চরিত্র ছিল ইসলামের জন্য। তাঁর অতীতের প্রতিটি দিন ও রাত, ঘন্টা ও মুহূর্ত এ সাক্ষ্যই বহন করেছে যে, যে কাজের জন্যে তিনি এ সময়কাল ব্যয় করেছেন তা হলো দ্বীনে হক, অর্থাৎ দ্বীনে হকের প্রতিষ্ঠা। এক সময়ে এই দ্বীনে হকের জন্যে মৃত্যুকেও বরণ করে নিতে তাঁকে দেখা গেছে। লক্ষ লক্ষ মানুষ তাঁর জীবনের প্রতি মুহূর্তকে দেখেছে। তাদের কাছে এ কথা গোপন নেই যে, তিনি গোটা জাতির কাছে এ সত্য তুলে ধরেছেন যে, মুসলমানদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হলো ইসলামকে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান হিসেবে বিজয়ী ও সমুন্নত করা। তিনি তাঁর জীবন দিয়ে এ কথার প্রমাণ দিয়েছেন যে, কাজ যদি ইসলামের করতে হয়, তাহলে চরিত্র ও আচার-আচরণ হতে হবে একজন সত্যিকার মুসলমানের। দাওয়াত যদি দেয়া হয় ইসলামের, তাহলে প্রতি মুহূর্তে অন্তরে থাকতে হবে খোদার ভয়। নাম কোরআন ও সুন্নাহর নিতে হলে, যাবতীয় শিক্ষা-দীক্ষা হতে হবে কোরআন ও সুন্নাহ থেকেই। সত্যের ঝান্ডা যদি বুলন্দ করতে হয়, তাহলে এমনভাবেই করতে হবে যেন সত্য মিথ্যার জন্যে এক বিরাট আশঙ্কা হয়ে পড়ে।

লন্ডনের দিনগুলো

মাওলানা লন্ডন এসেছেন চিকিৎসার জন্যে- তাঁর মূত্রাশয়ের অপারেশনের জন্যে। একদিকে চলছে এ অপারেশনের সকল প্রকার প্রস্তুতি। অপরদিকে দুনিয়ার বিভিন্ন স্থান থেকে আগত ও ইংল্যান্ডে বসবাসরত মুসলমান ও তাদের সংগঠনগুলো অনুভব করছেন যে, মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী তাঁদেরই মধ্যে বিদ্যমান। দূর ও নিকটের ইউরোপীয়গণ এবং ইংরেজ নওমুসলিমগণ মাওলানার সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁদের বিভিন্ন প্রশ্নের সন্তোষজনক জবাব লাভ করছেন। মুসলমান ছাত্রদের আন্তর্জাতিক সংস্থা FOSIS মাওলানার সম্মানে ডিনারের আয়োজন করে একত্রে বহু লোকের সাক্ষাতের সুযোগ করে দিচ্ছে। সাক্ষাতকারীদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন মাওলানা। বিবিসি এবং অন্যান্য সংবাদ সংস্থারও সাক্ষাৎকার চলছে মাওলানার সাথে।

ইউকে ইসলামিক মিশনের সম্মেলনে

লন্ডনে ইউকে ইসলামিক মিশনের তিনদিনব্যাপী এক আন্তর্জাতিক সম্মেলন ৩১শে আগস্ট শুরু হয়। এ সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে মাওলানা যোগদান করেন। মুসলিম বিশ্বের সকল দেশের প্রতিনিধি এ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। মাওলানা তাঁর ভাষণে বলেন ঃ

"আপনারা এদেশে ইসলামের রাষ্ট্রদূত। আপনারা চান বা না চান এখানকার অমুলমানগণ আপনাদেরকে ইসলামের প্রতিনিধিই মনে করে। অতএব আপনাদের এবং এখানে বসবাসকারী সকল মুসলমানের উপর স্বাভাবিকভাবেই এ বিরাট দায়িত্ব এসে পড়ে যে, আপনারা এখানে যা কিছুই করবেন এবং নিজেদের আচার-আচরণের যে চিত্রই পরিস্ফুট করবেন, তা সবই তারা ইসলামের উপরই আরোপ করবে। আপনাদের হাবভাব ও চরিত্র থেকে তারা যে অভিমত পোষণ করবে, তার জন্যে আপনারাই দায়ী হবেন। ভালোভাবে চিন্তা করে দেখুন– এ কত বড় দায়িত্ব, যার জন্য আমাদেরকে কিয়ামতের দিনে জবাবদিহি করতে হবে।"

পরিপূর্ণ নীরব ও নিস্তব্ধ পরিবেশে উক্ত ভাষণের এক একটি শব্দ শ্রোতাদের অন্তরের অন্তঃস্থলে আঘাত করছে। এ আঘাত অনুভব করছে প্রতিটি হৃদয়। মাওলানার এ উদাত্ত আহ্বান প্রতিটি বিবেকের কাছে। আর এই হলো তার সমগ্র জীবনব্যাপী ইসলামী দাওয়াতের বুনিয়াদী আকর্ষণ। উক্ত সম্মেলনের তৃতীয় দিনে ভাষণ প্রসঙ্গে মাওলানা বলেন ঃ

"আমার পূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে, পৃথিবীর যেখানেই মানুষ বাস করে, সেখানেই ইসলামের প্রসার লাভ সম্ভব। আপনারা যদি নিজেদের আচার-আচরণের মাধ্যমে ইসলামের সত্যতার প্রমাণ পেশ করেন, তাহলে ইনশাআল্লাহ এখানকার অমুসলিম জনপদেও ইসলাম বিস্তার লাভ করবে। সত্যি কথা বলতে কি, আপনারা ভাগ্যবান যে আল্লাহ্ তায়ালা আপনাদেরকে ইংরেজ জাতিকে জয় করার সুযোগ দান করেছেন।"

ইসলামিক কালচারাল সেন্টারে ৬ই সেপ্টেম্বর মাওলানা জুমার ভাষণ (খুতবা) দান করেন। পরদিন মাওলানার বাসস্থানে দর্শনপ্রার্থীর সংখ্যা খুব বেড়ে

যায়। কারণ ৮ই সেপ্টেম্বর মাওলানাকে অপারেশনের জন্যে হাসপাতালে যেতে হবে। সাত তারিখের সাক্ষাৎকারীদের মধ্যে ছিলেন সুদানের ছাত্রগণ, নাইজেরিয়ার সুধীবৃন্দ এবং অন্যান্য দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ। লন্ডন ক্লিনিকে ৯ই সেপ্টেম্বর অপারেশনের উদ্দেশ্যে আগের দিন সন্ধ্যায় মাওলানা ক্লিনিকে গমন করেন। মাওলানার সাথে যান অধ্যাপক খুরশিদ আহমদ এবং মাওলানার পুত্র ডাঃ আহমদ ফারুক মওদূদী।

পরদিন অর্থাৎ ৯ই সেপ্টেম্বর ব্রিটিশ স্ট্যান্ডার্ড টাইম বেলা দু'টো বিশ মিনিটে অপারেশন শুরু হয় এবং ২৪ গ্রাম ওজনের পাথর মূত্রাশয় থেকে অপসারণ করা হয়। বেলা চারটায় অজ্ঞান অবস্থায় মাওলানাকে অপারেশন থিয়েটার থেকে বাইরে আনা হয়। বেলা সাড়ে পাঁচটায় মাওলানা জ্ঞান ফিরে পান। রাত আরামে কাটে। পরদিন বেলা বারোটায় তিনি ধীরে ধীরে বিছানায় উঠে বসেন এবং সাক্ষাতের জন্যে আগমনকারীদের সালামের জবাব দেন।

ডাঃ আলেকজান্ডার বেডনুকের ক্লিনিক থেকে ২৪শে সেপ্টেম্বর মাওলানা তার বাসস্থানে ফিরে আসেন। লন্ডনে তিনি জনাব রশিদ আহমদ সিদ্দিকীর মেহমান ছিলেন। সিদ্দিকী সাহেবের বাড়ীতে সে সময়ে সারা দুনিয়া থেকে মাওলানার অবস্থা জানার জন্যে অবিরাম টেলিগ্রাম, টেলিফোন ও চিঠিপত্র এসে স্তূপীকৃত হচ্ছিল। তা ছাড়া সর্বদা বিভিন্ন দেশের সুধীজনের গমনাগমন তো ছিলই।

একুশে অক্টোবর পুনরায় মাওলানাকে ক্লিনিকে যেতে হয়। এবার অপারেশন করে তার একটি মূত্রাশয় অপসারণ করতে হবে। এ অপারেশন ছিল বেশ কিছুটা বিপজ্জনক। পরদিন দু'ঘন্টা ধরে অপারেশন করে অকেজো মূত্রাশয়টি অপসারণ করা হয়। পরদিন মাওলানা জ্ঞান ফিরে পান।

ডাঃ বেডনুক এবং মেডিক্যাল বোর্ডের অন্যান্য ডাক্তারগণ মাওলানার দ্রুত আরোগ্য লাভ দেখে একাধারে বিস্ময় ও সন্তোষ প্রকাশ করেন। এ ধরনের রোগীকে এত অল্প সময়ের মধ্যে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে তারা কখনো দেখেননি। এ আল্লাহ্ তায়ালারই বিশেষ রহমত বলতে হবে।

বারোই নভেম্বর পূর্ণ আরোগ্য লাভের পর মাওলানা ক্লিনিক ত্যাগ করেন। অতঃপর তিনি সত্বর পাকিস্তানে প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছা প্রকাশ করলে ডাক্তারগণ এক্ষুণি দীর্ঘ সফরের ঝুঁকি না নিয়ে কিছুদিন লন্ডনে অবস্থানের পরামর্শ

দেন। আঠারোই নভেম্বর মাওলানা সাদেকাবাদের (পাকিস্তান) হাকীম নূরুদ্দীনের কাছে লিখিত পত্রে জানান ঃ

আল্লাহর ফযলে এখন আমার শরীর ক্রমশ ভালোর দিকে। সাতাশ বছর পর এই প্রথম সকালে ঘুম থেকে উঠে আরাম বোধ করছি। বছরের পর বছর ধরে আমার শরীরের অবস্থা এই ছিল যে, সকালে ঘুম থেকে উঠলে মনে হতো সমস্ত শরীর ক্লান্তিতে ভরে আছে। পনেরোই ডিসেম্বর লন্ডনের একটি সুউচ্চ ও সুরম্য হোটেল লন্ডন হিল্টনে ইংল্যান্ডে বসবাসকারী মুসলমানদের পক্ষ থেকে মাওলানার সম্মানে এক সম্বর্ধনার আয়োজন করা হয়। মুসলিম দেশগুলোর রাষ্ট্রদূতগণ, প্রখ্যাত প্রাচ্যবিদগণ, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকবৃন্দ, বিভিন্ন বিভাগের বিশেষজ্ঞগণ, অন্যান্য সুধীবৃন্দ এবং বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ এ অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

কোরআন পাক থেকে তেলাওয়াতের পর মিসরের ডাঃ সালাহ্ শাহীন অভিনন্দন বাণী পাঠ করেন। দু'ডজনেরও বেশী টেলিভিশন ও মুভী ক্যামেরা তৎপর হয়ে পড়ে। সমস্ত হলঘরটি ফ্লাসলাইটের পুনঃপুনঃ আলোক বিক্ষেপণে ঝলসে উঠে।

মুসলমান-অমুসলমান নির্বিশেষে বিভিন্ন দেশের সুধী জ্ঞানীগুণী, পণ্ডিত ও বিশেষজ্ঞ এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের ঐতিহাসিক সমাবেশে মাওলানা পাশ্চাত্যবাসীকে সকল প্রকার বিদ্বেষ ও কুধারণা থেকে মুক্ত হয়ে স্বচ্ছ ও সত্যানুসন্ধিৎসু মন নিয়ে ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান লাভের আহ্বান জানান। তিনি বলেন, "সত্যানুসন্ধান মানব জাতির সকলেরই সমান ও সাধারণ কামনা-বাসনা। আপনাদের সমাজে ইসলাম থেকে দিগদর্শন লাভ করতে প্রতিবন্ধতার কোন কারণ থাকতে পারে না। এ ব্যাপারে আপনারা যতটুকু সুযোগ পান, তার সদ্ব্যবহার করুন, ইসলামের সত্যতা উপলব্ধি করতে পারলে মঙ্গল আপনাদেরই হবে।"

পাশ্চাত্যের বিভিন্ন স্থানে বসবাসকারী মুসলমানদের উদ্দেশ্যে মাওলানা বলেন ঃ

"পাশ্চাত্যের জ্ঞান বিজ্ঞান ও টেকনোলজি সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান লাভ করুন এবং এর সুফল প্রাণভরে উপভোগ করুন। কিন্তু ইসলামের নির্দেশ অনুযায়ী জীবন যাপন করুন। একমাত্র এভাবেই আপনারা পাশ্চাত্যবাসীর সামনে একটি

ভারসাম্যমূলক মানব দরদী এবং সুবিচারপূর্ণ সমাজের দৃষ্টান্ত পেশ করতে পারবেন। সব সময় মনে রাখবেন, আপনাদের ভবিষ্যৎ ইসলামের উপরই নির্ভরশীল। ইসলামী জীবন পদ্ধতিই আপনাদের দুনিয়ায় টিকে থাকবার নিশ্চয়তা দান করতে পারে। অন্যথায় এতটুকু তো নিশ্চয়ই হবে যে, কয়েক বছর পর এখানকার ইংরেজ সমাজে কিছু নতুন ইংরেজের সংযোজন হবে। কিন্তু এতে না আপনাদের মান সম্মান বাড়বে আর না এতে ইসলামের সাথে আপনাদের আনুগত্যের কোন লেশ থাকবে।"

এখন দু'এক দিনের মধ্যে মাওলানাকে দেশে ফিরতে হচ্ছে।

উনিশ শ' আটষট্টির ২৬শে ডিসেম্বর।

মাওলানাকে বিদায় দেয়ার জন্যে আজ আবার লন্ডন বিমান বন্দরে জনতার ভিড় জমেছে। বিভিন্ন শহর থেকে আগত মাওলানার বন্ধু-বান্ধব, ভক্ত-অনুরক্ত, ইসলামী আন্দোলনের কর্মী, সুধী, মধ্যপ্রাচ্যের গণ্যমান্য ব্যক্তি শীতবস্ত্রে আবৃত হয়ে বিমান বন্দরে জমায়েত হয়েছেন। অশ্রুকাতর কণ্ঠে তাঁরা মাওলানাকে বিদায় অভিবাদন জানান। বোয়িং ৭০৮ মাওলানাকে নিয়ে তার দু'খানি পাখা বিস্তার করে তুষারাচ্ছন্ন আকাশে দৃষ্টির আড়াল হয়ে গেল। সাথে সাথে ইংল্যান্ডের ইতিহাসের একটি উজ্জ্বল অধ্যায়ের যবনিকাপাত হলো।

মাওলানাকে বহনকারী বোয়িং ৭০৮ ইস্তাম্বুল বিমান বন্দরে অবতরণের জন্যে আকাশে চক্কর দিচ্ছে। আংকারা থেকে প্রকাশিত মাসিক 'হিলাল' পত্রিকার সম্পাদক, দৈনিক 'বোগান' ও 'ইত্তিহাদের' সম্পাদকদ্বয় এবং তুরস্কের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি মাওলানাকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপনের জন্যে অধীর আগ্রহে অপেক্ষমান। বিমান অবতরণের পর 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনিতে বিমান বন্দর প্রকম্পিত করে দর্শনপ্রার্থীগণ মাওলানার সাথে মিলিত হন।

সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদের শাসনামলে যিনি ছিলেন তুরস্কের শায়খুল ইসলাম, তাঁর পৌত্র এসেছেন মাওলানাকে অভ্যর্থনা জানাতে। অতি বার্ধক্যও তাঁকে বিমান বন্দরে আসা থেকে নিবৃত্ত রাখতে পারেনি। তিনি মাওলানাকে আবেগভরা কণ্ঠে বলেন, মাওলানা! আপনি যদি আমাদের মধ্যে থাকতেন, তাহলে এ দেশের ইসলামী আন্দোলন পঞ্চাশ বছর এগিয়ে যেত। আমরা আপনার মত ব্যক্তিত্বের নেতৃত্ব থেকে বঞ্চিত রয়েছি। তবে আমাদের

সৌভাগ্য যে, আপনার সাহিত্যের মাধ্যমে আপনার চিন্তাধারার সাথে পরিচিত হতে পারছি।"

পাকিস্তানের পথে কুয়েত ও দাহরান বিমান বন্দরেও অনুরূপ দর্শনপ্রার্থীদের বিরাট সমাগম ঘটে। তাঁরাও মাওলানাকে তাঁদের প্রাণঢালা ভক্তি-শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

মাওলানা ২৭শে ডিসেম্বর করাচী এবং ২৯শে ডিসেম্বর লাহোর বিমান বন্দরে অবতরণ করেন। উভয় বিমান বন্দরে হাজার হাজার মানুষের জনসমাগম হয়। লাহোর থেকে মোটর গাড়ি ও স্কুটারের মিছিল সহকারে মাওলানাকে তাঁর বাসভবনে নিয়ে যাওয়া হয়।

মাওলানার বাসভবন ৫/এ যায়লদার পার্ক কয়েকমাস পর আবার জমজমাট হয়ে পড়ে। যেন বসন্তের নব আগমনে ফুল বাগিচার ফুলকুঁড়িগুলো তাদের ঘোমটা খুলে বেরিয়ে এসেছে তাদের প্রাণ মাতানো সৌরভ ছড়ানোর জন্যে। দেশ-বিদেশের জ্ঞান-পিপাসুগণ আবার এখানে জমায়েত হতে শুরু করেছেন।

এই হলো ঐতিহাসিক ৫/এ যায়লাদার পার্ক, ইছরা, লাহোর, যেখান থেকে ইসলামী আন্দোলনের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে পড়ে বিশ্বের চারিদিকে।*

---

*৫/এ যায়লদার পার্কে ১৯৬৭ সাল থেকে প্রতিদিন বৈকালে মাওলানাকে নিয়ে যে আসর বসত, যেখানে বিশ্বের বিভিন্ন স্থান থেকে মাওলানার দর্শনার্থীগণ জমায়েত হতেন এবং বিভিন্ন প্রশ্ন করে জবাব পেতেন, সে সম্পর্কে জানতে হলে পড়ুন বিকালের আসর- গ্রন্থকার।

গোল টেবিল বৈঠক

আইয়ুব খানের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে গণ-আন্দোলনের ফলে দেশের রাজনৈতিক অবস্থা যখন এক ভয়াবহ রূপ ধারণ করে, তখন বিরোধী দলীয় নেতৃবৃন্দের সাথে আলাপ-আলোচনার জন্যে আইয়ুব খান ১৯৬৯ সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারী এক গোল টেবিল বৈঠকের অনুষ্ঠান করেন। সেখানে মাওলানা মওদূদী সহ প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর প্রধানগণ সমবেত হন, দ্বিতীয় বৈঠক হয় ১০ই মার্চ। কিন্তু বহু আলাপ-আলোচনার পর আইয়ুব খান তাঁর অনমনীয় মনোভাব ব্যক্ত করেন বলে গোল টেবিল বৈঠক ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

তারপর গণ-আন্দোলন এক তীব্র আকার ধারণ করে এবং আইন-শৃঙ্খলার চরম অবনতি ঘটতে থাকে। গণ-আন্দোলন ও বিক্ষোভের মুখে আইয়ুব খান ক্ষমতা হস্তান্তর করতে বাধ্য হন। তিনি ২৩ মার্চ জেনারেল ইয়াহিয়া খানের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে রাজনীতির দৃশ্যপট থেকে সরে পড়েন।

ইয়াহিয়া খান দেশে সামরিক আইন জারি করেন। রাজনৈতিক দলগুলো নিষিদ্ধ ঘোষণা না করলেও তৎপরতা সীমিত করেন। পরবর্তী বছর অর্থাৎ ১৯৭০ সালের ডিসেম্বর মাসে জাতীয় এবং প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য যে, সত্তরের জানুয়ারি মাসে মাওলানা শেষবারের মত ঢাকা সফরে আসেন। তিনি অনুভব করেন যে পাকিস্তানের ঐক্য ও অখণ্ডতা (Solidarity Sand Integrity) বিপন্ন হয়ে পড়েছে।

এই সময়ে রাজনীতির গতিধারা ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হয়। ফলে দুটি দল আওয়ামী লীগ এবং পাকিস্তান পিপলস পার্টি আঞ্চলিকতার ভিত্তিতে নির্বাচনে প্রতিযোগিতা করে বিজয়ী হয়। অর্থাৎ আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানে এবং পিপিপি পশ্চিম পাকিস্তানে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে বিজয় লাভ করে।

নির্বাচনের পরপরই মাওলানা মওদূদী মন্তব্য করেন যে, এখন কোন অলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ডই দেশকে অখণ্ড রাখতে পারে। অর্থাৎ পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে এ এক অবধারিত সত্য।

শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর দল আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেন এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুযায়ী তাঁরই দেশের

প্রধানমন্ত্রী হওয়ার কথা। ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করা হয়। কিন্তু পিপিপি নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো ভীতি প্রদর্শন করে পশ্চিম পাকিস্তানী সদস্যদের পরিষদ অধিবেশনে যোগদান করা থেকে বিরত রাখেন। ফলে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে অবিশ্বাস, অসন্তোষ ও দূরত্ব এতো বেড়ে যায় যে, তার পরিণতিতে অনেক রক্তক্ষয়ের পর একাত্তরের ১৬ই ডিসেম্বর পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন বাংলাদেশ হিসাবে অস্তিত্ব লাভ করে।

মাওলানা মওদূদী একে তো বহুদিন যাবত রোগে ভুগছিলেন, পূর্ব পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন ও স্বাধীন হওয়ার পর তিনি হৃদয়ে এতো বড়ো আঘাত পান যে, তাঁর দেহ এবং মন উভয়ই একেবারে ভেঙ্গে পড়ে।

একদিকে পরম আনন্দ ও সৌভাগ্যের বিষয় যে, ১৯৭২ সালে মাওলানার জীবনের অক্লান্ত শ্রম ও সাধনার ফল তাফহীমুল কোরআন সমাপ্ত হয় এবং অপরদিকে তিনি তাঁর ভগ্ন স্বাস্থ্যের জন্যে জামায়াতের আমীরের পদ থেকে অব্যাহতি গ্রহণ করেন। মিয়া তোফায়েল মুহম্মদ জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানের আমীর নির্বাচিত হন।

আটাত্তর সালের এপ্রিল ও জুলাই মাসে আমি মাওলানার সাথে দু'বার সাক্ষাৎ করি। তখন তাঁকে এমন অবস্থায় দেখেছিলাম যে, অশ্রু সংবরণ করা বড় কঠিন হয়ে পড়েছিল। মনে হয়েছিল তাঁকে যেন পুঁটুলি বেঁধে চেয়ারের উপর রেখে দেয়া হয়েছে। এ অবস্থাতেও তিনি লোকজনের সাথে কথা বলতেন, লেখাপড়ার কাজও করতেন, বিভিন্ন বিষয়ে মূল্যবান পরামর্শও দিতেন।

এক প্রশ্নের জবাবে মাওলানা বলেন–

"আল্লাহ্‌র শোকর যে, তিনি আমাকে এমন কোন রোগ দেননি যাতে আমি তাঁর দ্বীনের কাজ করতে পারি না। আমার এমন রোগ যা আমার ব্যক্তি সত্তাকেই কষ্ট দেয় এবং আমি মনে করি এতে আমার গোনাহ্ মাফ হয়ে যাবে। যেমন ধরুন, এখন আমি বসে বসেই লেখাপড়ার কাজ করছি। তাতে আমার কোন কষ্ট বা ক্লান্তি হয় না। কিন্তু দাঁড়ালে অথবা হাঁটা শুরু করলে ধাপে ধাপে কষ্ট অনুভব করি। দেড় মিনিটের বেশী দাঁড়িয়ে থাকতে পারি না।"

এমন অবস্থাতেও ১৯৭৫ সালে রেডিও পাকিস্তান দু'ঘন্টার অধিক সময়ের মাওলানার এক সাক্ষাৎকার রেকর্ড করে । সে সাক্ষাৎকার তাঁর মৃত্যুর এক বছর পর লিপিবদ্ধ করা হয় এবং তর্জুমানুল কোরআনে প্রকাশিত হয়।

সাক্ষাৎকারটি 'একটি ঐতিহাসিক সাক্ষাৎকার' নামে পুস্তকাকারে বাংলায় প্রকাশিত হয়, অত্র গ্রন্থকার তা বাংলায় অনুবাদ করেন।

এ সাক্ষাৎকারে যে সব প্রশ্নের অবতারণা হয় তার মধ্যে ছিল পাকিস্তান আন্দোলন, তার পশ্চাৎ পটভূমি, বিভাগপূর্ব ভারত উপমহাদেশে মুসলমানদের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক অবস্থা, ভারতে পার্লামেন্টারী শাসন প্রবর্তন, মুসলমান ও অমুসলমান নির্বিশেষে একজাতীয়তার যাঁতাকলে থেকে একটি মাত্র ভৌগোলিক জাতীয়তার এক অদ্ভুত মিক্সচার তৈরি করে তার উপরে এক আধুনিক গণতান্ত্রিক শাসন কাঠামো তৈরির ষড়যন্ত্র, মুসলমানদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিণামের আশঙ্কা, অতঃপর মুসলমানদের পৃথক ও স্বতন্ত্র জাতীয়তার প্রেরণা, তাদের পৃথক আবাসভূমি, তথা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দাবি, তাদের নিজস্ব জীবন দর্শন ও আকীদাহ-বিশ্বাসের ভিত্তিতে সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার দাবি ও তার যৌক্তিকতা প্রভৃতি বহু বিষয়। এসবের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব মাওলানা দেন। বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে যে মূল্যবান ঐতিহাসিক তথ্য তিনি পরিবেশন করেন তার ভিত্তিতে এ কথা দ্বিধাহীন চিত্তে বলা যায় যে, কোন নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক পাকিস্তান আন্দোলন ও তার পটভূমির সঠিক ইতিহাস রচনা করতে বসলে আল্লামা মওদূদীর ব্যক্তিত্ব ও তাঁর অমূল্য অবদান কিছুতেই উপেক্ষা করতে পারবে না।

উপরন্তু এ সাক্ষাৎকারে আল্লামা মওদূদী এমন বহু কিছু বলেছেন এবং এমন অনেক কিছু স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যা একমাত্র দ্বীনের আন্দোলনকারীদের বিরাট কাজে লাগবে। তাই ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের এবং বিশেষ করে আমাদের যুব সমাজের এ ঐতিহাসিক সাক্ষাৎকারটি পাঠ করার বিশেষ প্রয়োজন আছে বলে মনে করি।

মাওলানার ইন্তিকাল

মাওলানা সারা জীবন যে কঠোর শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম করেন, তার জন্যে তাঁর স্বাস্থ্য অকালেই ভেঙ্গে পড়েছিলো। তিনি দীর্ঘদিন যাবত মূত্রাশয়ের পীড়ায় ভোগেন। তার ফলে হাঁটু ও কোমরের বেদনা বলতে গেলে চিরস্থায়ী হয়ে পড়েছিলো। আটষট্টি সালে লন্ডনে মূত্রাশয় অপারেশন করা হয়। কিন্তু রোগ নিরাময় হয় না। তাই আজীবন তাঁকে রোগ যন্ত্রণায় ভুগতে হয়। এর ভেতরেই তিনি সব কাজ করতে থাকেন। আল্লাহর প্রিয় বান্দাহর চোখে মুখে কোনদিনই রোগ-যন্ত্রণার কোন বহিঃপ্রকাশ, কোন আলামত দেখা যায়নি।

বাহাত্তর সালে তাঁর বিপ্লবী তাফসীর 'তাফহীমুল কোরআন' লেখা সমাপ্ত হয়। তার বহু আগে থেকে তিনি বলতেন, আয়ু ফুরিয়ে এসেছে, দোয়া করুন যেন তাফহীম খতম করে যেতে পারি।

তাফহীম লেখা খতম হওয়ারপরও আল্লাহ তাঁকে জীবিত রাখলেন। তাঁর জীবনের বড় আকাঙ্ক্ষা ছিল বিশ্ব নবীর জীবন-চরিত রচনা করার। তিনি কলম ধরলেন। সাত বছরে নবীর মক্কী জীবন লেখা শেষ করলেন। তা দু'খণ্ডে প্রকাশিত হলো। জীবন-চরিতের নাম রাখলেন 'সীরাতে সারওয়ারে আলম'। মাদানী জীবনের উপরেও প্রয়োজনীয় নোট লেখা শেষ করলেন। কিন্তু তার উপরে কলম ধরার আগেই দীন-দুনিয়ার প্রভু তাঁকে আপন সন্নিধানে ডেকে নিলেন।

বাইশে সেপ্টেম্বর আমেরিকার বাফেলো শহরের এক হাসপাতালে আধুনিক জগতের শ্রেষ্ঠ মনীষী সাইয়েদ মওদূদী শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর জানাযা হলো বাফেলোতে, লন্ডনে, করাচীতে, লাহোরে। শরীক হলো মুসলিম বিশ্বের মনীষীগণ, লক্ষ লক্ষ ভক্তবৃন্দ, জনসাধারণ, যুব সমাজ। তাঁর জানাযা অনুষ্ঠানের বর্ণনা নিম্নে সংযোজিত হলো।

মাওলানার জানাযার অভিজ্ঞতার আলোকে

মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী ১৯৭৯ সালের ২২শে সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের বাফেলো শহরের হাসপাতালে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। ২৬শে সেপ্টেম্বর লাহোরে জানাযার পর তাঁর দাফন কার্য সমাপন করা হয়। তাঁর জানাযায় শরীক হওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছিলো। এ সম্পর্কে আমার বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে কিছু পরিবেশন করতে চাই প্রিয় পাঠক সমাজের কাছে।

২৩শে সেপ্টেম্বর বিকেল বেলা মফস্বল থেকে ঢাকায় ফিরে দুঃসংবাদ পেলাম মাওলানা মওদূদী ইন্তিকাল করেছেন। স্বতঃপ্রণোদিতভাবে মুখ থেকে ইন্না লিল্লাহ .... বেরিয়ে এলো বটে। কিন্তু মনে হলো মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়লো। জানাযার জন্যে আমাকেই যেতে হবে এবং যতো শিগগির পারি। পরদিন ভিসা বিমানের সীট এবং অন্যান্য সব ঝামেলা চুকিয়ে পঁচিশ তারিখে পিআইএ-র বিমানে করাচী পৌঁছলাম। বন্ধুরা এসেছিলেন বিমান বন্দরে। তাঁরা বুকে জড়িয়ে ধরে ভেঙ্গে পড়েছিলেন। আমার অবস্থাও ছিলো অনুরূপ। ঐদিনই বেলা সাড়ে দশটায় লন্ডন থেকে মাওলানা মরহুমের মাইয়েত (কফিন) করাচী পৌঁছে এবং জানাযার পর লাহোর রওয়ানা হয়ে যায়।

জনৈক বন্ধুর বাড়িতে রাত কাটালাম। রাত সাড়ে ন'টায় মাওলানার জানাযাসহ তাঁর জীবনের উপরে কিছু ফিচার দেখানো হলো পাকিস্তান টেলিভিশনে। প্রবল অশ্রুধারা টিভি দেখতে ব্যাঘাত সৃষ্টি করছিলো।

বড় আশা ছিলো মাওলানার শেষ দীদার লাভের। কিন্তু তা অপূর্ণই রয়ে গেল। রাতে লাহোরগামী বিমানের কোন সীট পাওয়া যায়নি। পাওয়া গেছে পরদিন সকালের। সকাল সাড়ে দশটায় লাহোরে জানাযা হবে। বিমান লেট হলে জানাযাও ভাগ্যে জুটবে না। এমন এক দুশ্চিন্তায় রাত কাটালাম।

পরদিন সকাল সাতটায় লাহোর রওয়ানা হলাম। হঠাৎ ঢাকা থেকে আমার এক সাথী ছুটে গিয়েছিল। আমি যখন ঢাকা বিমান বন্দরে বিমানে উঠতে যাচ্ছি, তখন পেছন থেকে শ্রান্ত-ক্লান্ত কণ্ঠে আওয়াজ এলো, খান সাব, আল্লাহর শোকরিয়া শেষ পর্যন্ত এসে পড়লাম। পেছন ফিরে দেখি ডাঃ আজিজুল হক চৌধুরী। শুকনো মুখ, উস্কো খুস্কো চেহারা যেন উদ্ভ্রান্ত প্রেমিক। প্রেমিকই বটে।

বিমানে উঠার পর একটু জিরিয়ে নেয়ার পর আমার কাছে এসে বললেন, মাওলানাকে তাঁর জীবদ্দশায় দেখার সৌভাগ্য হয়নি। তাই বড় সাধ মরণের পর একবার দীদার লাভের।

বললাম বলুন, আল্লাহ্ আমাদের আশা পূরণ করুন।

করাচী থেকে লাহোরের পথেও কয়েকজন বন্ধু জুটে গেল। তাদের মধ্যে ছিলেন লন্ডন থেকে প্রকাশিত 'ইমপ্যাকট' পত্রিকার সম্পাদক জনাব হাশের ফারুকী এবং করাচীর 'জং' পত্রিকার সাংবাদিক জনাব আরিফুল হক। নটায় লাহোর বিমান বন্দরে নামলাম। জীবনে বহুবার এ বিমান বন্দরে উঠানামা করেছি। কিন্তু আজ তার এক ভিন্ন রূপ দেখলাম। যেখানে হর হামেশা মানুষ গিজগিজ করে, সে স্থানটি বলতে গেলে একবারে জনমানবহীন। বিমান বন্দরের বাইরে এক শোকাচ্ছন্ন পরিবেশ– একটা মর্মন্তুদ বিচ্ছেদ বেদনার মূর্ত প্রকাশ। নিশ্চিত ছিলাম যে বিমান বন্দরে কেউ আসবে নিয়ে যাবার জন্যে। কিন্তু কোথাও কাউকে দেখছি না। হয়তো করাচীর বন্ধুরা শোকের আতিশয্যে খবর দিতে ভুলে গেছেন অথবা অন্য কোন কারণ ঘটেছে।

জনাব ফারুকীর বন্ধু গাড়ি নিয়ে এসেছেন তাকে নেয়ার জন্যে। আমাদের সকলের গন্তব্যস্থল একই। তাই তারা আমাদের দু'জনকে তাদের গাড়িতেই উঠালেন। বললাম, ভাই সোজা ইছড়া চলুন, যদি আখেরী দীদার হয়ে যায়।

নতুন ফিয়াট গাড়ি শাঁ শাঁ করে ছুটছে, লেজ আকাশে তুলে যেমন ধারা উর্ধ্বশ্বাসে ছোটে একলা মাঠে ফেলে আসা গো-শাবক তার মায়ের কাছে। মিনিট পনেরোর মধ্যে আমরা মুজাং চুঙ্গী হয়ে ফিরোজপুর রোডে এসে পড়েছি। একটু দূরে দক্ষিণে ইছড়া মোড় ঘুরে বামে ঢুকতে হবে যায়লদার পার্ক লেনে। ৫/এ যায়লদার পার্ক মাওলানার বাসভবন। আমাদের গাড়ি ইছড়া মোড়ে পৌঁছতেই জনৈক শোকাকুল পথচারী বলে দিলেন– ঐ দেখুন দক্ষিণ দিকে জানাযার মিছিল চলছে।

সামনে জনসমুদ্র নজরে পড়ল। প্রশস্ত ফিরোজপুর রোডে মানুষ থৈ থৈ করছে। তার মধ্যে প্রাইভেট কার, বাস, পিকআপ, রিজার্ভ করা ট্রাক-অটোরিকশা, স্কুটার, সাইকেল, শোকাকুল গণমিছিল। মুখে উচ্চৈঃস্বরে কালেমায়ে শাহাদাত এবং 'আল্লাহু আকবার'।

সামনে অর্ধ মাইল দূরে 'মাইয়েত' বলে মনে হয়। ভিড়ের মধ্যে গাড়ি চলতে পারে কই? কখনো কখনো এগুচ্ছে ধীরে ধীরে কচ্ছপ গতিতে। অগত্যা খানিকটা এগিয়ে গিয়ে ফিরোজপুর রোড থেকে বাম দিকে কেটে পড়ে অন্য পথে দ্রুত পৌঁছে গেলাম গাদাফী স্টেডিয়ামে। এখানেই জানাযা হবে বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ইসলামী চিন্তাবিদ, দ্বীনের আলেমকুলশিরোমণি, বিশ্বব্যাপী ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলনের কর্ণধার, বিশ্ববরেণ্য আল-উস্তাজ, আল-মুরশিদুল আম আল্লামা আবুল আ'লা মওদূদীর।

গাদাফী স্টেডিয়াম পাকিস্তানে সর্ববৃহৎ। মাইয়েত পৌঁছুবার আগেই বিরাট বিশাল স্টেডিয়ামের আধখানা ভরে গেছে। স্টেডিয়ামের আটটি ফটক দিয়ে ক্রন্দনরত মানুষের প্রবলস্রোত ভেতরে ঢুকছে। সারা দেশ থেকে আগত ইসলামী আন্দোলনের জন্যে উৎসর্গীকৃত প্রাণ কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের হাজার হাজার তাগড়া নওজোয়ান শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে নিয়োজিত। শৃঙ্খলার কঠিন বেড়াজাল ডিঙিয়ে সামনে এগুবার উপায় নেই। অসহায়ের মত চারদিকে তাকাচ্ছি। চোখের পানিতে রুমালখানা ভিজে জবজবা হয়েছে। সাথীরা কোথায় হারিয়ে গেছেন।

সংবাদপত্রের জনৈক ফটোগ্রাফার আমাকে দূর থেকে চিনে ফেলেছেন। চিৎকার করে বললেন, আসুন মাওলানা! আপনাদের মত বিদেশী মেহমানদের জন্যে প্রথম কাতার। এবার স্বেচ্ছাসেবকদের কড়া বেষ্টনী ভেদ করে সামনের কাতারে গিয়ে স্থান নিলাম। ডাঃ চৌধুরীও এসে গেলেন। খানিক পরে 'মাইয়েত' মাঠে পৌঁছে গেল এবং আমাদের সামনে রাখা হলো। সঙ্গে মাওলানা মরহুমের ছেলেরা, মিয়া তুফাইল মুহাম্মদ, অধ্যাপক খুরশীদ, মাওলানা হামিদী, চৌধুরী জিলানী এবং আরও অনেকে। তাঁদের সাথে বুক মেলাতে গিয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লাম। বহু চেষ্টা করেও নিজেকে সংযত রাখতে পারছিলাম না। মনে হচ্ছিল কলিজাখানা ঝাঁঝরা হয়ে গেছে।

সামনের কাতারে আরও অনেকেই ঢুকতে শুরু করলেন এবং কাতার দু'ধারে প্রসারিত হতে লাগল। প্রথম স্থান থেকে ডান দিকে খানিকটা সরে যেতে হলো।

সামনের কাতারে যেসব বিদেশী মেহমান ছিলেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সউদী রাষ্ট্রদূত রিয়াদ আল খতীব, জর্দান রাষ্ট্রদূত, আয়াতুল্লাহ খুমেনীর বিশেষ প্রতিনিধি ও ইরান সরকারের স্বরাষ্ট্র সচিব, কাতার

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ডঃ ইউসুফ আবদুল্লাহ আল-কারযাবী, বিশ্ব মুসলিম যুব সংসদের সহ-সেক্রেটারী জেনারেল ডঃ মুহাম্মদ তুতুঞ্জী, সিরিয়ার প্রখ্যাত পণ্ডিত ও মনীষী শেখ সাঈদ হাওয়া ও শেখ আদনান সাদুদ্দীন, কুয়েত আওকাফ মন্ত্রণালয়ের ইসলাম সম্পর্কিত বিভাগের ডাইরেক্টর শেখ আবদুল্লাহ আল-আকীল, কুয়েতের প্রখ্যাত আইনবিদ এবং বহুল প্রচারিত 'আল-মুজতামিয়া' পত্রিকার সম্পাদক শেখ মুবারক আল-মুকাওয়া, মাওলানা মরহুমের বিশিষ্ট বন্ধু শেখ আবদুল আজীজ আল-আলী আল-মোতাওয়া, মিশরের বিশিষ্ট ইখওয়ান নেতা ডঃ কামাল, হাসানুল বান্না শহীদের পুত্র আইনজীবী শেখ সাইফুল ইসলাম প্রমুখ মনীষীবৃন্দ। সামনের কাতারে আরো ছিলেন জামায়াতে ইসলামী হিন্দের আমীর মাওলানা ইউসুফ, পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল জিয়াউল হক, পাঞ্জাবের গভর্নর লেঃ জেনারেল সরওয়ার খান, দেবল শরীফের পীর সাহেব এবং সামরিক বাহিনীর কতিপয় উচ্চপদস্থ কর্মচারী।

পি পি পি ব্যতীত পাকিস্তানের সকল রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ, বহু উলামায়ে কেরাম, সুধী ও সরকারী বেসরকারী কর্মচারী স্বতঃস্ফূর্তভাবে জানাযায় শরীক হন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মুফতী মাহমুদ, নবাবজাদা নসরুল্লাহ খান, আযাদ কাশ্মীরের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট সরদার আবদুল কাইয়ুম খান, সরদার শওকাত হায়াত খান, চৌধুরী জহুর এলাহী, খাজা খায়রুদ্দীন, আল্লামা ইহসান ইলাহী জহীর প্রমুখ। ভারত থেকে আগত প্রায় পৌনে দু'শ আলেম ও ইসলামী আন্দোলনের কর্মী জানাযায় শরীক হন।

জানাযার 'কফিন' জড়ানো রয়েছে কালিমায়ে তাইয়্যিবাহ সম্বলিত জামায়াতে ইসলামীর পতাকা ও পাকিস্তানের জাতীয় পতাকায়। প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক সামরিক ইউনিফরমের উপর হাতে কালো ব্যাজ পরেছেন। তিনি নির্দেশ দেন যে, কোন সরকারী কর্মচারী ইচ্ছা করলে মাওলানার জানাযায় শরীক হতে পারে। জানাযার পূর্ব মুহূর্তে স্টেডিয়ামের দৃশ্য হৃদয়বিদারক, বিস্ফোরণোন্মুখ। স্টেডিয়ামের ভেতরে প্রায় দশ লক্ষ মানুষ এবং ভেতরে ঢুকতে না পেরে বাইরে হাজার হাজার মানুষ বুক চাপড়ে মাতম করছে। লক্ষ কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছে কালেমায়ে শাহাদাত, শোকের মর্সিয়া- ইয়া সাইয়্যিদী, মুরশিদী, মওদূদী-মওদূদী। লক্ষ লক্ষ কণ্ঠের হাহাকার ও মর্সিয়া স্টেডিয়ামের চারধারে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে উর্ধ্বাকাশ বিদীর্ণ করে ছুটে চলেছে আরশে পাকের দিকে।

জনতা মাইয়েতকে এক নজর দেখার জন্যে, মাওলানার জাসাদে খাকীর (মাটির দেহ) শেষ দীদার লাভের জন্যে এবং হাত দিয়ে মাইয়েতের একটু পরশ লাভের জন্যে উন্মত্তের মতো সামনে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করছে। নওজোয়ান স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী প্রাণপণ শৃঙ্খলা রক্ষা করার চেষ্টায় নিয়োজিত।

ইমামে কা'বা শেখ মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন সাবিইয়িল জানাযার ইমামতি করবেন বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। কিন্তু মক্কা মুয়াযযামা থেকে রওয়ানা হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে অনিবার্য কারণে তাঁর সফর বিলম্বিত করতে হয়েছে। অতঃপর ইমামতির ভার দেয়া হলো কাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ডঃ ইউসুফ আবদুল্লাহ আল-কারযাবীর উপর। তিনি কায়রো জামিয়া আজহার থেকে ইসলামিয়াত ও দীনিয়াতে ডকটরেট লাভ করেছেন। প্রখ্যাত আলেমে দীন এবং মাওলানার প্রতি পরম শ্রদ্ধা পোষণ করেন। তিনি ইমামতির আগে জনতাকে লক্ষ্য করে বলেন, সাইয়েদ মওদূদী তাঁর বিশ্বজনীন দাওয়াত ও চিন্তাধারার জন্যে চিরঞ্জীব হয়ে থাকবেন। তিনি তাঁর শতাধিক অমূল্য সাহিত্য রেখে গেছেন। আর রেখে গেছেন লক্ষ-কোটি রূহানী আওলাদ। আমি হাজার হাজার মাইল দূর থেকে আসিনি আপনাদেরকে কোন সান্ত্বনার বাণী শুনাতে। বরং এসেছি একথা বলতে যে, দুনিয়ার কোটি কোটি মানুষ তাঁর চিন্তাধারায় আকৃষ্ট হয়ে কাজ শুরু করেছে। আমরা মাওলানার আন্দোলনকে নিয়ে জোর কদমে এগিয়ে চলব। পাকিস্তানের জন্যে একমাত্র এটাই মঙ্গলজনক যে, এখানে সত্যিকার ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করা হোক। আপনারা যারা মাওলানার প্রতি ভালবাসা ও শ্রদ্ধা পোষণ করেন, তারা এর জন্যে সংগ্রাম অব্যাহত রাখুন।

ডঃ কারযাবীর ভাষণের পর লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে ধ্বনিত হলো- সাইয়েদী মুরশিদী- মওদূদী-মওদূদী। স্টেডিয়ামের বাইরে অপেক্ষমান হাজার হাজার কণ্ঠে ধ্বনিত হলো- সাইয়েদী মুরশিদী- মওদূদী-মওদূদী। সে ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হলো আকাশে-বাতাসে, চারধারের বৃক্ষরাজিতে, দালান-কোঠায়, প্রতিটি আনাচে-কানাচে।

জানাযার পর জনসমুদ্রের বাধ ভেঙ্গে গেল। সকলের লক্ষ্য মাইয়েত। শৃঙ্খলা বজায় রাখা অসম্ভব হয়ে পড়ল। বহু কষ্টে ভিড়ের চাপ থেকে বাঁচিয়ে মাইয়েত স্টেডিয়ামের বাইরে নিয়ে ট্রাকে উঠানো হলো। চারদিক থেকে মানুষের অসম্ভব চাপের মধ্যে দম বেরিয়ে যাচ্ছিল। ডাঃ চৌধুরী ও আমি একে অপরকে

চেপে ধরে বাইরে চলেছি। ডাঃ চৌধুরী তাগড়া পালোয়ানের মত। তাই কতকটা ভরসা ছিল নিরাপদে বেরিয়ে যেতে পারব। বাইরে রাস্তায় নামার পর হঠাৎ আমাদের সামনে দু' তিনটি যুবক সংজ্ঞাহীন হয়ে ধরাশায়ী হলো। আমার পালোয়ান সাথীটি আর নিজেকে সামলাতে না পেরে পড়ে গেলেন। আমিও পড়লাম। শুধু পড়েই গেলাম না। অর্ধ ডজন মানুষ আমার উপরে। কি করে বেঁচে গেলাম জানি না। তবে কালেমা পড়ছিলাম নিশ্চয়ই। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই দু' তিন জন আমাকে ধরে তুলে বাইরে বের করে দিলেন। আমার সাথীটি কোথায় হারিয়ে গেলেন। আমার জামাকাপড় ধুলো মলিন। কয়েক স্থানে আঘাতও পেলাম।

তাগড়া যুবকদের সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ার ঘটনা এই একটি নয়- বহু। এমনটি হবেই না বা কেন? মাওলানার জানাযার সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার পর দেশের দূর-দূরান্ত ও প্রত্যন্ত এলাকা থেকে লোক লাহোরের দিকে ছুটেছে উন্মত্তের মত। ট্রেনে, বাসে, বিমানে, স্কুটারে, সাইকেলে- যে যেভাবে পেরেছে এসেছে। কেউ এসেছে পনেরো বিশ মাইল পায়ে হেঁটে। শোক-দুঃখ, ক্ষুধা-তৃষ্ণা, ক্লান্তি ও প্রখর রৌদ্র তাপ উপেক্ষা করে।

সবচেয়ে বড় কারণ হলো, মাওলানার সাহিত্য, তাঁর বিশ্বজনীন ইসলামী দাওয়াত এবং তাঁর আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব লক্ষ লক্ষ যুবককে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করেছে। জাহিলিয়াতের ঘন অন্ধকার থেকে তাদেরকে তাওহীদের উজ্জ্বল আলোকের দিকে টেনে এনেছে। তাদের চিন্তা, ধ্যান-ধারণা, মন-মানসিকতায় এনে দিয়েছে এক বিরাট বিপ্লব। মাওলানার প্রতি তাদের বিরাট আকর্ষণ, শ্রদ্ধা ও প্রগাঢ় ভালবাসার এই একটি মাত্র কারণ। মাওলানার মৃত্যু তাদেরকে পাগল ও দিশেহারা করেছে। এতোবড় এবং এ ধরনের শোক তাদের জীবনে এই প্রথম। তারা সব মাওলানার রূহানী আওলাদ। তাই যুবকবৃন্দ নির্বিশেষে অনেকেই এ শোকের আঘাতে মুষড়ে পড়েছেন এবং সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেছেন।

যাহোক, আধ মাইল দূরে রাখা হাশের ফারুকীর গাড়িখানা বহু কষ্টে খুঁজে বের করলাম। গাড়িতে কেউ নেই। শরীর কাঁপছে। দুটি চোখ দিয়ে পাহাড়ি ঝরনা ছুটছে। মিনিট দশেক পর ডাঃ চৌধুরী এলেন। কাঁদো কাঁদো হয়ে বললেন সর্বনাশ হয়েছে।

বললাম, বেঁচে তো আছেন। এরপর সর্বনাশটা কিসের শুনি?

বললেন, আমি মরে গেলে দুঃখ ছিল না। আমার সাধের ক্যামেরাটি ভেঙে চূর্ণ-বিচূর্ণ। বড় সুন্দর সুন্দর বিশ-বাইশটা স্ন্যাপ নিয়েছিলাম। যা সম্বল করে ঘরে ফিরতাম– তাই আমার চলে গেল। *

একটু পরে হাশের ফারুকী ও তাঁর বন্ধু এসে পড়লেন। মাইয়েতসহ ট্রাক আগেই রওয়ানা হয়েছে। তবে গতি অত্যন্ত মন্থর। ট্রাকে রয়েছেন মাওলানার পুত্রগণ– উমর ফারূক, আহমদ ফারূক, মুহাম্মদ ফারূক ও হুসাইন ফারূক। রয়েছেন মিয়া তুফাইল মুহাম্মদ ও অধ্যাপক খুরশীদ আহমদ। বিদেশীদের মধ্যে ডঃ কারযাবী, ডঃ তুতুঞ্জী এবং শেখ মুবারক আল-মুকাওয়া।

যায়লদার পার্কের সংকীর্ণ গলি দিয়ে মাওলানার বাসভবনে মাইয়েতসহ ট্রাক যাবে যেখানে দাফন কার্য সমাপন করা হবে। লক্ষ লক্ষ মানুষ সেখানে যাবে কি করে? তাই শুধু বিশিষ্ট লোককে গলির মধ্যে ঢুকতে দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিদেশী মেহমান জামায়াত নেতৃবৃন্দ এবং জনাব আলতাফ হাসান কুরায়শীসহ চার-পাঁচ জন সাংবাদিক মাওলানার বাসভবন পর্যন্ত যাওয়ার অনুমতি পেয়েছেন।

মাওলানার খাস কামরার সামনে একটা উঁচু জায়গায় মাইয়েত রাখা হয়েছে। দু'পাশের বাড়ির বারান্দা ও ছাদের উপরে হাজার হাজার শোকার্ত মেয়ে-পুরুষ তাদের সজল দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছে মাইয়েতের উপর। মাওলানার চিরন্তন বাসস্থান তৈরি হতে একটু বাকী। সংকীর্ণ পরিসর হলেও কয়েক হাজার লোক ভিড় করে আছে।

এমন সময় এক অপরূপ অথচ হৃদয়-বিদারক দৃশ্য দেখা গেল। বাড়ির ভেতর থেকে দু'টি কচি শিশু বেরিয়ে মাইয়েতের নিকটে এলো। একজন অপরজনকে বলছে– ওদিকে যেয়ো না দাদাজান ঘুমুচ্ছেন।

অন্যজন বলছে এত লোক এখানে কেন? দাদাজানের যে ঘুম ভেঙ্গে যাবে। এতোগুলো মানুষ রোজ এখানে এলে দাদাজান কাজ করবেন কি করে?

মাসুম বাচ্চাদের মিষ্টি মিষ্টি কথাগুলো যাদের কানে পৌছল, তারা না কেঁদে পারল না। কচি বাচ্চাদের কত দরদ, কত চিন্তা তাদের প্রিয় দাদাজানের জন্যে। কিন্তু দাদাজান যে তাদেরকে ফেলে চলে গেছেন, দূরে-বহুদূরে– ধরা

* জনাব আজিজুল হক চৌধুরী ২০০৩ সালের ৭ই এপ্রিল ঢাকাস্থ নিজ বাসভবনে ইন্তেকাল করেন।

একটু পরেই সাইয়েদ ও মুরশিদ মওদূদীকে শয়ন করানো হলো তাঁর চিরন্তন শয্যায়। মানব ইতিহাসের একটা উজ্জ্বল অধ্যায়ের যবনিকাপাত হলো। হয়তো আমাদের শ্রুতির অগোচরে ধ্বনিত হলো–

يَٰٓأَيَّتُهَا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَئِنَّةُ. ٱرْجِعِىٓ إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً.
فَٱدْخُلِى فِى عِبَٰدِى وَٱدْخُلِى جَنَّتِى.

হে প্রশান্ত আত্মা! ফিরে চলো তোমার রবের দিকে এমন অবস্থায় যে, তুমি তোমার পরিণামের জন্যে তুষ্ট এবং তুমি প্রিয়পাত্র তোমার রবের কাছে। অতএব আমার নেক বান্দাহদের মধ্যে শামিল হয়ে যাও এবং প্রবেশ কর আমার জান্নাতে। (আল-ফজর ঃ ২৭-৩০)

শেষের কথাগুলো কিন্তু পরদিন সত্যি সত্যিই নিজ কানে শুনতে পেয়েছিলাম। সকাল ন'টার দিকে গেস্ট হাউজ থেকে গেলাম ৫/এ যায়লদার পার্ক। এটা কোনদিনই ভাবিনি যে, এ স্থানটিতে আসব আর মাওলানাকে দেখতে পাব না– দেখব তাঁর চিরন্তন শয্যাঘর। বুকখানা অব্যক্ত বেদনায় মোচড় দিল। দেখলাম মাওলানার মাজার ঘিরে বিশ-পঁচিশ জন লোক। তাঁদের মাঝে রয়েছেন দেবল শরীফের পীর সায়েব। সকলের হাত উপরে উঠানো দোয়ার জন্যে। পীর সায়েবের মুখে প্রথমে একথাই শুনলাম–

يَٰٓأَيَّتُهَا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَئِنَّةُ .... وَٱدْخُلِى جَنَّتِى

দোয়ার জন্যে হাত উঠানোই রয়েছে এবং তিনি বলেই চলেছেন ঃ সাইয়েদ মওদূদী সারা জীবন হক কথা বলেছেন, হকের দাওয়াত দিয়েছেন, হকের উপর শেষ পর্যন্ত অটল ছিলেন। মানুষ টেপ রেকর্ডের মতো। আপনারা যে টেপ রেকর্ডার দেখেন তা মানুষের তৈরি। মানুষ টেপ রেকর্ডার আল্লাহর তৈরি। মানুষের তৈরি টেপ হাসে, কাঁদে, গান গায়, কথা বলে। কিন্তু সাইয়েদ মওদূদী আল্লাহর তৈরি এমন এক টেপ, যা দুনিয়াতেও হক কথা বলেছে, কবরেও বলছে এবং আখেরাতেও বলবে।----

পীর সায়েব এমনি সব বলেই চলেছেন আর শ্রোতাদের চোখ দিয়ে টস টস করে অশ্রু ঝরছে।

পীর সায়েব দোয়া শেষ করে মুখ ফেরাতেই তাঁকে সালাম মুসাফাহ করলাম। বড্ডো ভাল লাগল তাঁর কথাগুলো। এ ছিল তাঁর আন্তরিক অনুভূতির অভিব্যক্তি।

আমার প্রিয় পাঠক-পাঠিকাগণ! আপাতত কিছুক্ষণের জন্যে একটু পেছনে ফিরে যাই। লাহোর থেকে চিকিৎসার জন্যে মাওলানার বিদেশ যাত্রা এবং সেখান থেকে পরপারে যাত্রার কিছু বিবরণ জেনে রাখা দরকার মনে করি।

চিকিৎসার জন্যে মাওলানার বিদেশ যাওয়ার ইচ্ছা মোটেই ছিল না। হয়তো তিনি স্পষ্টই বুঝেছিলেন যে, চিকিৎসায় কোন লাভ হবে না। কারণ সময় হয়ে এসেছে। কিন্তু এমন এক ঘটনা ঘটেছিল যা তাঁর বিদেশ যাত্রা তরান্বিত করে।

সউদী আরবের বাদশাহ খালিদ তাঁর বিশেষ চিকিৎসক ডাঃ মারুফ দাওয়ালিবিকে পাঠান মাওলানাকে দেখার জন্যে। তিনি মাওলানার সাথে দু'ঘন্টা পর্যন্ত আলাপ-আলোচনা করেন। আলাপ চলাকালে মাওলানা কাউকে এটা অনুভব করতে দেননি যে, তাঁর স্নায়ুগুলো নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। তারপর যেই মাত্র ডাঃ দাওয়ালিবি মাওলানার কক্ষ ত্যাগ করলেন মাওলানা সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে গেলেন। এ ঘটনাটি সকলকে উদ্বিগ্ন ও ব্যাকুল করে তোলে। ডাঃ আহমদ ফারুক মাওলানাকে চিকিৎসার জন্যে আমেরিকা নিয়ে যাওয়ার জন্যে ব্যাকুল হয়ে পড়েন। কিন্তু বেগম মওদূদী এবং বাড়িসুদ্ধ সকলে মিলেও মাওলানাকে রাজী করানো গেল না। মাওলানা তাঁর পাসপোর্ট গোপনে রেখে দিয়েছেন। সকলেই অতিমাত্রায় দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। অবশেষে মাওলানার হিসাবরক্ষক জনাব বশীর আহমদ বাট ফন্দিফিকির করে মাওলানার নিকট থেকে পাসপোর্ট হস্তগত করেন। তারপর ২৬শে মে লাহোর থেকে ইসলামাবাদ এবং ইসলামাবাদ থেকে আমেরিকার উদ্দেশ্যে মাওলানা লন্ডন রওয়ানা হন। লন্ডন পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে ছিলেন এয়ার মার্শাল আসগর খান। বেগম মওদূদীও মাওলানার সাথে যান এবং শেষ পর্যন্ত মাওলানার পাশেই ছিলেন।

নিউইয়র্ক থেকে সাড়ে চারশ মাইল দূরে বাফেলো শহরে মিলার ফিলমোর হাসপাতালে অপারেশনের জন্যে মাওলানাকে ভর্তি করানো হয়।

মাওলানার দ্বিতীয় পুত্র আহমদ ফারূক মওদূদী একজন প্রখ্যাত ডাক্তার (ব্রেইন স্পেশালিস্ট) এবং তিনিও এখানে থাকেন। হাসপাতালে ৪ঠা সেপ্টেম্বর মাওলানার অপারেশন হয়। নাড়ীতে ক্ষতের কারণে অপারেশন করতে হয়।

ডাক্তার বলেন, এরূপ অবস্থায় রোগী অসহ্য বেদনা অনুভব করে। কিন্তু মাওলানার তা হয়নি। আগের দিন মাওলানা কথাবার্তা বলতে পারেননি। অপারেশনের পর অবস্থা সন্তোষজনক ছিল। ঐদিন বেলা চারটায় মাওলানার জনৈক বন্ধু ডাঃ আমীরুল্লাহ হুসাইনী তাঁকে দেখতে যান। শরীর কেমন জিজ্ঞেস করলে মাওলানা বলেন যে, তিনি ভালো আছেন। ডাক্তার সাহেব দোয়া করতে বললে মাওলানা কোরআনের নিম্ন দোয়া করেন ঃ

تَوَفَّنِيْ مُسْلِمًا وَّاَلْحِقْنِيْ بِالصَّالِحِيْنَ.

তুমি আমাকে মুসলিম হিসাবে মৃত্যু দাও এবং আমাকে সৎ কর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত কর। সূরা ইউসুফ (১০১)

পরদিন ৫ই সেপ্টেম্বর হৃদরোগের আক্রমণ হয়। আবার সাত তারিখ থেকে স্বাস্থ্যের উন্নতি হতে থাকে। উনিশ তারিখ আবার হঠাৎ অবনতি ঘটে এবং হৃৎপিণ্ডের ব্যথা খুব বেড়ে যায়। একুশে দিনগত রাতে বেগম মওদূদী অনেক রাত পর্যন্ত স্বামীর শয্যাপাশে বসে সূরায়ে ইয়াসীন ইত্যাদি এবং দোয়া কালাম পড়ে তাঁকে আল্লাহ তায়ালার উপর সোপর্দ করে আসেন।

পরদিন অধিক সময় মাওলানা সংজ্ঞাহীন অবস্থায় কাটান। কিন্তু সংজ্ঞাহীন অবস্থায় নামাযের সময় তাঁর ডান হাতের শাহাদাত অঙ্গুলি উঠানামা করতো– যা সকলেই লক্ষ্য করেছেন। ২২শে সেপ্টেম্বর (১৯৭৯ ইং) সকাল পৌনে ন'টায় ৭৬ বছর বয়সে মাওলানা তাঁর প্রকৃত মা'বুদের সাথে মিলিত হন– ইন্না লিল্লাহি---।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রচলিত আইন অনুযায়ী ৪৮ ঘন্টার আগে হাসপাতাল থেকে মৃতদেহ অপসারিত করা যায় না। সর্বপ্রথম স্বাস্থ্য বিভাগের পক্ষ থেকে ডেথ সার্টিফিকেট দেয়া হয়। তারপর কফিন বাক্স তৈরি হবে। মৃতদেহ রক্ষণাবেক্ষণের যাবতীয় ব্যবস্থা সম্পন্ন হবে। তারপর মৃতদেহ অপসারণ করা যাবে। এতে অন্তত ৪৮ ঘন্টা সময় লাগে। আবার কোন মৃতদেহ যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে নিতে হলেও সরকারের অনুমতির প্রয়োজন হয়। কিন্তু আল্লাহ তায়ালার বিশেষ রহমত বলতে হবে যে, অতি অল্প সময়ের মধ্যেই আশ্চর্যজনকভাবে এসব কাজ সম্পন্ন করা হয়।

বিকেল চারটায় হাসপাতাল থেকে বাফেলো শহরের উপকণ্ঠে উইলিং রোডে অবস্থিত ডাঃ ফারূক মওদূদীর বাসস্থানে মাইয়েত স্থানান্তরিত করা হয়। তারপর কানাডা এবং যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন স্থান থেকে মাওলানার সাহিত্যের দ্বারা প্রভাবিত দুনিয়ার বিভিন্ন দেশের মুসলিম, নওমুসলিম ও শোকার্ত জনতার ভিড় জমতে থাকে উইলিং রোডে। ২২শে সেপ্টেম্বর বাফেলো শহরে তিনবার নামাযে জানাযা আদায় করা হয়। প্রথমবার নামায পড়ান মাওলানা শরীফ বোখারী, দ্বিতীয়বার টরেন্টোর (কানাডা) কারী সাহেব এবং তৃতীয়বার লাহোর বাগে জিন্নাহ মসজিদের খতীব এবং আঞ্জুমানে খোদ্দামুল কোরআনের সভাপতি ডাঃ ইসরার আহমদ। তাঁরা শিকাগো থেকে বিমান যোগে পৌঁছেন। এই দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত টরেন্টো, নিউইয়র্ক, শিকাগো, ডেট্রয়, মিশিগান, ইন্ডিয়ানা এবং অন্যান্য শহর থেকে অবিরাম লোক আসতে থাকে। ইরানের কাউন্সেল জেনারেল সংবাদ পাওয়া মাত্র বাফেলোয় এসে প্রথম জানাযায় শরীক হন। মাইয়েতকে উইলিং রোডে যখন আনা হয়, তখন ডাঃ আহমদ ফারূক, বেগম মওদূদী, মাওলানার জামাই সাইয়েদ মাসউদ এবং বেগম মওদূদীর ভাই উপস্থিত ছিলেন। ডাঃ আহমদ ফারূক তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে বলেন, "মাওলানা মওদূদী মরহুম যে মিশন নিয়ে সারাজীবন কাটালেন, সে মিশন নিয়ে আমাদের সকলকে সংগ্রাম করে যেতে হবে। আমাদের জন্যে আনন্দের বিষয় এই যে, মাওলানা তাঁর প্রকৃত সম্মানদানকারী আল্লাহ তায়ালার দরবারে হাযির হয়েছেন। আমরা তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে শুধু পাকিস্তানেই নয় বরং সারা বিশ্বে ইনশাআল্লাহ ইসলামের দাওয়াত পৌঁছাব।"

ডাঃ আহমদ ইরানের কাউন্সেল জেনারেলকে বলেন, "মাওলানা বলেছিলেন তাঁর স্বাস্থ্য অনুমতি দিলে তিনি নিশ্চয়ই ইরানে যাত্রা বিরতি করে আসতেন। মাওলানা এ কথাও বলেছিলেন, ইরানের ইসলামী বিপ্লব আমার হৃদয়ের স্পন্দন।"

বাফেলোতে একটি স্মরণীয় সাক্ষাৎকার

মাওলানা ২২শে জুলাই উত্তর আমেরিকার প্রত্যন্ত এলাকা থেকে আগত পঁয়ত্রিশ জনের একটি প্রতিনিধি দলকে সাক্ষাৎ দান করেন। এ সাক্ষাৎকার ডাঃ আহমদ ফারুকের বাসস্থানে হয়। মাওলানা তাঁদের বিভিন্ন প্রশ্নের জওয়াব দেন ও অনেক সমস্যার সমাধান পেশ করেন। এ সময়ে তাঁর শরীরের অবস্থা বাহ্যত ভাল মনে হতো। মেজাযও বেশ হাসিখুশী ছিল। আলাপচারির মধ্যে স্বভাবসুলভ রসিকতাও করেন।

এ সময়ে নিউইয়র্ক থেকে একজন মাওলানার জন্যে পান নিয়ে আসেন। তারপর পান নিয়ে কথা উঠলো। জনৈক আনওয়ার বেগ বললেন, "মাওলানা, মনে হয় আল্লাহ তায়ালা জান্নাতে পান অবশ্যই রেখে থাকবেন।"

তার উত্তরে মাওলানা রসিকতা করে বলেন, "ভাই, আপনার হয়তো জানা নেই যে, পান আসলে জান্নাতেরই পাতা এবং সেখান থেকেই যমীনে এসেছে।"

যুক্তরাষ্ট্রের হাসপাতাল থেকে মৃতদেহ সরানো এবং তা আবার দেশান্তরে নিয়ে যাওয়া এক অতি দুষ্কর ব্যাপার আগে বলেছি। এ সব ব্যবস্থাপনা সুচারুরূপে সমাধা করার ব্যাপারে উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন শহর থেকে আগত মাওলানার ভক্ত অনুরক্তগণ যথেষ্ট সাহায্য করেন। নিউইয়র্কে জানাযার জন্যে সেখান থেকে বারবার টেলিফোনে অনুরোধ আসতে থকে। ব্যবস্থাপনা কতদূর কি হলো এ সম্পর্কেও বিভিন্ন স্থান থেকে উদ্বেগের সাথে টেলিফোনে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছিল। ডাঃ আহমদের বাড়িতে অবিরাম টেলিফোন ক্রিং ক্রিং করছিল।

ওদিকে মাওলানার মৃত্যু সংবাদ শুনামাত্র আল্লামা আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ খুমেনী বলেন, "মিল্লাতে ইসলামিয়া একজন প্রখ্যাত আলেম ও ইসলামী চিন্তাবিদ হারাল"। অতঃপর তিনি সঙ্গে সঙ্গেই বাফেলোতে বেগম মওদূদীকে জানান যে, ইরানের বিমান মাওলানার মাইয়েত বহন করার মত মহান খিদমতের জন্যে প্রস্তুত। মৃত্যু সংবাদে বাদশাহ খালেদ মর্মাহত হয়ে বলেন, "আল-উস্তাজ মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর ইন্তেকাল মুসলিম বিশ্বের জন্যে এক মর্মন্তুদ ঘটনা।" তিনিও জানিয়ে দেন যে, সউদী এয়ার লাইন্সের বিমান

মাওলানার মাইয়েত বহনের সৌভাগ্য লাভের জন্যে প্রস্তুত। অনুরূপভাবে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল জিয়াউল হক মাওলানার মৃত্যু সংবাদে শোকে অধীর হয়ে পড়েন এবং মাওলানার মাইয়েত বহনের জন্যে পি আই এ-র খিদমত পেশ করেন।

বেগম মওদূদী এসব সরকারের প্রতি এবং বিশেষ করে আল্লামা খুমেনী, বাদশাহ খালেদ এবং জেনারেল জিয়াউল হকের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন, " যে ব্যক্তি তাঁর সারা জীবনে কোনদিন একটি বারের জন্যেও কোন বিষয়ে কারও কাছে হাত পাতেননি, তাঁর মৃত্যুর পর এ ধরনের খিদমত গ্রহণে তাঁর প্রতি অশ্রদ্ধাই দেখানো হবে। আমি সকলের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে বলছি, আমরা আমাদের আপন সাধ্যানুযায়ী এ কাজের আঞ্জাম দেব।"

একটা চার্টার্ড বিমানে বাফেলো থেকে ২৩শে সেপ্টেম্বর বৈকাল চারটায় মাইয়েত নিউইয়র্ক রওয়ানা করার এবং নিউইয়র্ক থেকে পানামের বিমানে রাতের বিমানে লন্ডন পাঠাবার যাবতীয় ব্যবস্থা করা হয়।

এক শোকার্ত পরিবেশে অবিরাম অশ্রু বিসর্জনের মধ্য দিয়ে শ্রদ্ধেয় মুরশিদে আ'ম-এর মাইয়েতকে শেষ বিদায় দেয়া হলো। তার আগে বেলা আড়াইটায় চতুর্থ বার বাফেলোতে নামাজে জানাযা পড়া হলো। অতঃপর চার্টার্ড বিমানখানি বাফেলোকে অশ্রুসাগরে ভাসিয়ে নিউইয়র্কের উদ্দেশে আকাশে তার পাখা মেলে উড়ে চলল। নিউইয়র্ক থেকে পানাম বিমান মাইয়েতসহ রাতের আঁধার চিরে লন্ডনের উদ্দেশ্যে আটলান্টিক মহাসাগরের আকাশপথে উড্ডীন হলো।

লন্ডন ও পাকিস্তানে সকলে এ ধারণা পোষণ করতেন যে, আটচল্লিশ ঘন্টার আগে মাইয়েতের উপস্থিতি আশা করা যায় না। কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবে নিউইয়র্ক থেকে বিমান রওয়ানা হওয়ার পর এ সংবাদ লন্ডনে পৌছানো হয়।

জনৈক চৌধুরী মুহাম্মদ ইয়াসীন মাওলানা ও তাঁর পরিবারের ঘনিষ্ট বন্ধু। মাওলানার চিকিৎসার যাবতীয় ব্যবস্থাপনায় তিনিও শরীক ছিলেন। তিনি লন্ডনে ব্যবসা করেন। মাওলানাকে যুক্তরাষ্ট্রে পৌছানোর পর লন্ডন ফিরে আসেন এবং সব সময় ডাঃ আহমদ ফারুকের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেন। তিনি বলেন, "হঠাৎ ২৩ তারিখ রাতে আমরা লন্ডনে খবর পেলাম মাওলানার মাইয়েত

নিউইয়র্ক থেকে রওয়ানা হয়েছে। তখন কোন পত্রিকায় সংবাদ দেয়ার সময় ছিল না। শুধু টেলিফোনের মাধ্যমে সকল স্থানে খবর পৌছানো হলো।"

নিউইয়র্ক থেকে বিমানটি পরদিন অর্থাৎ ২৪শে সেপ্টেম্বর সকাল সাড়ে আটটায় লন্ডন বন্দরে অবতরণ করে। 'আল্লাহু আকবর' লন্ডন বিমান বন্দরের ইতিহাসে এত বড় গণজমায়েত অতীতে কখনো হয়নি। বিমান পৌছুবার পূর্বেই বিমান বন্দর লোকে লোকারণ্য হয়। বিমান বন্দরের দিকে অবিরাম অশ্রুকাতর মানুষের স্রোত দেখা যায়।

বিমান থেকে মাইয়েতের সাথে অবতরণ করেন বেগম মওদূদী, ডাঃ আহমদ ফারূক ও সাইয়েদ মাসউদ। বিমান বন্দরে ক্রন্দনরত হাজার হাজার মানুষের কণ্ঠ থেকে কালেমায়ে শাহাদাত ও আল্লাহু আকবর ধ্বনি গুঞ্জরিত হতে থাকে। বিমান থেকে মাইয়েতকে নামিয়ে পি, আই, এ-র শালিমার লাউঞ্জে রাখা হয় এবং ৪নং টার্মিনালে নামাযে জানাযার ব্যবস্থা করা হয়। প্রথমবার জনাব খুররম জাহ মুরাদ এবং দ্বিতীয়বার অধ্যাপক খুরশীদ আহমদ জানাযার নামাযে ইমামতি করেন। তারপর বার্মিংহাম থেকে কয়েকটি বাসভর্তি লোক এসে হাজির হন। এবার নামাযে ইমামতি করেন ইউ, কে ইসলামিক মিশনের সহ-সভাপতি। তারপরও অবিরাম লোক আসতে থাকে। পিআইএ-র বিমান ছাড়তে বেশ বিলম্ব হয়। তার ফলে আরও দু'বার জানাযার নামায আদায় করা হয়। বিমান বন্দরে দেশ-বিদেশের বহু সাংবাদিক উপস্থিত হন। তাঁরা মন্তব্য করেন, শোকে মুহ্যমান এমন জনসমুদ্র তারা কোনদিন দেখেননি এবং কল্পনাও করেননি।

মাওলানার আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করার জন্যে বিমান বন্দরে উপস্থিত হন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের বিশেষ উপদেষ্টা জনাব মুয়াযযম আলী, ইসলামিক কাউন্সিল অব ইউরোপের সেক্রেটারী জেনারেল জনাব সালিম আযম এবং বহু দেশের কূটনৈতিক প্রতিনিধিগণ।

সন্ধ্যায় বিলম্বে পিআইএ-র বিমান মাইয়েতসহ রওয়ানা হয় এবং আমস্টার্ডাম, দামেশক ও দুবাই হয়ে পরদিন (২৫/৯/৭৯) সকাল দশটায় করাচী বিমান বন্দরে অবতরণ করে।

পঁচিশ তারিখে করাচীর ইতিহাসে এক স্মরণীয় ঘটনা।

সকাল ন'টা থেকে করাচী বিমান বন্দরে লোক জমা হতে শুরু হয়েছে। এ দিন ছিল করাচী মিউনিসিপ্যাল করপোরেশনের নির্বাচনের দিন। অধিকাংশ

যানবাহন নির্বাচনের কাজে নিয়োজিত। তথাপি বহু কষ্টে লোক বিমান বন্দরের দিকে ছুটছে।

সাড়ে ন'টায় জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানের আমীর মিঞা তুফাইল মুহাম্মদ করাচী জামায়াত নেতৃবৃন্দ এবং দশ-বারোজন সাংবাদিক ও ফটোগ্রাফারসহ ভি আই পি লাউঞ্জে প্রবেশ করছেন। চেহারা মলিন ও শোকার্ত। পিয়াসীর স্বেচ্ছাসেবকগণ সারিবদ্ধ হয়ে শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে দণ্ডায়মান। বাইরে বারান্দায় কয়েকজন বোরকা পরিহিতা মহিলা ক্রন্দনরত। হাজার হাজার লোক বিমানের অপেক্ষায়। ঘোষণা হলো বিমান পৌছুতে কিছু বিলম্ব হবে- দশটায় নয়, সাড়ে দশটায়। লাউড স্পীকারে ঘোষণা করা হলো, বিমান পৌছুবার পনেরো মিনিট পরে এক মাইল দূরে বিমান বন্দর স্টেডিয়ামে জানাযার নামায হবে। লোক সেদিকেই দৌড়াতে থাকে।

মিঞা সায়েব ভি আই পি লাউঞ্জে শোকার্ত জনতার মধ্যে নির্বাক বসে আছেন। খানিক পরে সরদার শেরবাজ মাজারী লাউঞ্জে প্রবেশ করে মিঞা সায়েব, জান মুহাম্মদ আব্বাসী এবং অন্যান্যের সাথে গলা মিলিয়ে শোক প্রকাশ করতে থাকেন।

এমন সময় জনৈক উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী মিঞা সায়েবকে সালাম করে বলেন, "আমি আসছি রাশিয়া থেকে। সেখানে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগদান করতে গিয়েছিলাম। যখনই সম্মেলনে মাওলানার মৃত্যু সংবাদ পৌছল, তখন স্বতঃস্ফূর্তভাবে লোকের হাত উপরে উঠল দোয়ার জন্যে।"

তিনি আরও বলেন, "মাওলানার মৃত্যুতে ক্ষতি শুধু তাঁর পরিবার ও জামায়াতে ইসলামীর নয়, বরং গোটা মুসলিম বিশ্বের অপূরণীয় ক্ষতি হলো।"

বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে তিনি কথাগুলো বলেন।

ঠিক দশটায় বিমান রানওয়েতে নেমে পড়ে ভি আই পি লাউঞ্জের সামনে দাঁড়াল। শত শত লোক কান্নায় ভেঙে পড়ল। কয়েকজন শোকে মুহ্যমান হয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলল।

বিমান থেকে প্রথমে নামলেন ডাঃ আহমদ ফারূক। অতঃপর বেগম মওদূদী। তাঁর পেছনে অধ্যাপক খুরশীদ, সাইয়েদ মাসউদ এবং 'ডন ট্রাভেলস লন্ডন'-এর চৌধুরী মুহাম্মদ ইয়াসিন। এ পাঁচজন এলেন মাইয়েতের সাথে।

ভিড়ের মধ্যে বহু কষ্টে মাইয়েতকে ট্রাকে উঠানো হলো। ট্রাকের উপরে মিঞা সায়েব, ডাঃ আহমদ, অধ্যাপক খুরশীদ প্রমুখ নেতাগণ। জনসমুদ্রের মধ্য দিয়ে ট্রাকটি বিমান বন্দর স্টেডিয়ামের দিকে রওয়ানা হলো। এগারোটা পাঁচ মিনিটে জানাযার নামায পড়ালেন মিঞা তুফাইল মুহাম্মদ সায়েব।

নামাযের পর মাইয়েতকে আবার ট্রাকে উঠানো হলো। এবার ট্রাকে অন্যান্যের মধ্যে রয়েছেন সিন্ধুর গভর্নর জেনারেল আব্বাসী। এতক্ষণ পর্যন্ত লোক অসীম ধৈর্যের সাথে নিজেদেরকে সংযত রেখেছিলেন। কিন্তু এবার তাদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেল। অসংখ্য মানুষ সারা শহর থেকে বিমান বন্দরে হাযির হয়েছে। এমন কে আছে যে শেষ বিদায়ের সময় তার প্রিয় নেতার মুখখানা শেষবারের মত দেখে নেবে না? সকলে উন্মাদের মত ট্রাকের পিছনে ছুটছে। সকলেরই বাসনা একবার মাইয়েত স্পর্শ করবে– একবার জ্যোতির্ময় চেহারাখানা প্রাণভরে দেখে নেবে। এ যে শেষ বিদায়ের মুহূর্ত। যিনি তাদের সুপ্ত আত্মাকে জাগিয়ে দিয়েছেন, বিবেকের প্রতি উদাত্ত আহবান জানিয়েছেন, তিনি আজ নিজেই সুপ্ত ও নীরব। তিনি তাঁর কাজ সমাধা করে আপন প্রভুর সান্নিধ্যে চলে গেছেন। বারবার ধ্বনিত হতে লাগল– 'আল্লাহু আকবর' এবং তার সাথে 'সাইয়েদী-মুরশেদী-বিদায়-বিদায়'।

মাইয়েতকে বিমানে উঠানোর দৃশ্য আরও হৃদয়-বিদারক। কতজন একে অপরকে জড়িয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকেন। কতজন সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেন। বেলা একটায় মাইয়েত বিমানে উঠানোর পর বিমানের দরজা বন্ধ করে দেয়া হয়। দেড়টায় বিমান লাহোরের পথে আকাশে তার দু'টি পাখা মেলে উপরে উঠে। বিমানের বিকট শব্দ শোক-সন্তপ্ত প্রতিটি মানুষের হৃদয়ে আঘাত করতে থাকে। যদি তাদেরও দু'খানা করে পাখা থাকত, তাহলে পাখির ঝাঁকের মত বিমানের সাথে উড়ে চলত। তাই হতাশা, দীর্ঘশ্বাস, অশ্রু– এ তিনের সাথে তাদের মুখে ছিল প্রিয় মুরশিদের জন্যে প্রাণভরা দোয়া।

মাইয়েত লাহোরে

লাহোর বিমান বন্দর। আশ্বিনের প্রখর সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়েছে। যে মর্দে মুমিন গত ২৬শে মে এই বিমান বন্দরে দুঃখ ভারাক্রান্ত ইসলামী জনতাকে খোদা হাফেয বলে আমেরিকার উদ্দেশে রওয়ানা হন, কে জানত এ ছিল তাঁর শেষ বিদায়? তিনি আর লাহোরে ফিরে আসতে পারলেন না। আল্লাহ তায়ালা তাঁর যে সব প্রিয় বান্দাহদের সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন, 'রাদিয়াল্লাহু আনহুম ওয়ারাদু আনহু'-- তাঁদের মধ্যে তিনি একজন এবং তিনি সন্তুষ্টচিত্তে তাঁর প্রভুর সান্নিধ্যে চলে গেছেন। শুধু তাঁর অচেতন মাটির দেহখানি লাহোরে আজ ফিরে এসেছে। তাঁর মাইয়েতকে সাদর সম্ভাষণ জানানোর জন্যে জনস্রোত ছুটছে লাহোর বিমান বন্দরের দিকে। মাইয়েতসহ বিমানটি তিনটায় অবতরণ করার কথা।

এর মধ্যে লক্ষাধিক লোক বিমান বন্দরে জমায়েত হয়েছে। যারা বিমান বন্দর পর্যন্ত যেতে পারেনি, তারা বিমান বন্দর থেকে মাওলানার বাসভবন ইছড়া পর্যন্ত পথের দুই পাশে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে মাওলানার মাইয়েতকে শ্রদ্ধা নিবেদন করার জন্যে।

বিমান বন্দরে যাঁরা এসেছেন, তাঁর মধ্যে জামায়াত নেতৃবৃন্দ ছাড়া উল্লেখযোগ্য ছিলেন ইসলামী আদর্শ কাউন্সিলের সভাপতি বিচারপতি আফজাল চীমা, জমায়াতে ইসলামী হিন্দের আমীর মাওলানা ইউসুফের নেতৃত্বে শতাধিক লোকের প্রতিনিধি দল, জর্দান থেকে ডাঃ লতিফের নেতৃত্বে আগত প্রতিনিধি দল এবং মুসলিম দেশগুলোর রাষ্ট্রদূতগণ, জম্মু-কাশ্মীরের প্রতিনিধিবৃন্দ, ইসলামিক স্টুডেন্টস মুভমেন্ট অব ইন্ডিয়ার প্রতিনিধিগণ এবং আফগান মুজাহিদীনের নেতৃবৃন্দ।

রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের মধ্যে ছিলেন চৌধুরী জহুর ইলাহী, মালিক কাসিম, খাজা খায়রুদ্দিন, সাহেবযাদী মাহমুদা বেগম, সরদার শওকাত হায়াত এবং আরও অনেকে। আরও এসেছেন একটি কাল রঙের গাড়িতে মাওলানার পরিবারের মহিলাগণ। নিশ্চল প্রস্তর মূর্তির মত—শোকের মূর্ত প্রতীক। অশ্রু চোখের কোণায় জমাট বেঁধেছে।

ঠিক বেলা তিনটায় প্রতীক্ষিত বিমানখানা যখন বিমান বন্দরের আকাশে চক্কর দিতে থাকে, তখন অধীর জনতা প্রবল শোকাবেগে বিহ্বল হয়ে পড়ে। কান্নাজড়িত কণ্ঠে কালেমায়ে শাহাদাত ও তাকবীর ধ্বনি গুঞ্জরিত হতে থাকে আকাশে বাতাসে।

তিনটা পাঁচ মিনিটে বিমানখানি অবতরণ করে ভি আই পি লাউঞ্জের সামনে এসে দাঁড়িয়ে যায়। বিমানের জানালা ঘেঁষে একখানি পি আই এ-র ট্রাক গিয়ে দাঁড়াল। মাইয়েত নামানোর জন্যে বিমানে উঠে পড়লেন- হুসাইন ফারূক মওদূদী, চৌধুরী জহুর ইলাহী, কাজী হুসাইন আহমদ এবং পিয়াসীর কর্মী মৌলভী রফিক আহমদ।

মাইয়েত ট্রাকে উঠানোর পর ধীর ও মন্থর গতিতে ট্রাকখানি চলল মাওলানার বাসভবনের দিকে। ট্রাকের সাথে লক্ষ লক্ষ মানুষের মিছিল চলেছে। খয়বর থেকে কোয়েটা, আযাদ কাশ্মীর থেকে মুলতান পর্যন্ত প্রতিটি শহর ও জনপদের লোক এসেছে-যুবক বৃদ্ধ নির্বিশেষে। পথের দু'পাশ থেকে দালান কোঠার উপর থেকে অসংখ্য নরনারী এ শোক মিছিল দেখে অশ্রু বিসর্জন করছে এবং মাইয়েতের উপর পুষ্প বর্ষণ করে শ্রদ্ধা জানাচ্ছে। ট্রাকের সাথে প্রাইভেট কার, স্পেশাল বাস, স্টেশন ওয়াগান, স্কুটার, অটোরিকশা, সাইকেল প্রভৃতির মাইলব্যাপী দীর্ঘ সারি চলেছে এবং তার সাথে লক্ষ লক্ষ শোকাতুর মানুষ চলেছে পায়ে হেঁটে। কোথাও বিশৃঙ্খলা নেই, হৈ-চৈ হট্টগোল নেই। যে শৃঙ্খলার প্রশিক্ষণ এতদিন তারা পেয়ে এসেছে, তা পুরোপুরি বজায় রেখে সামনে এগিয়ে চলেছে জনস্রোত। পেছনে একটি গাড়ি থেকে লাউড স্পীকারে কালেমায়ে শাহাদাত ও তাকবীরধ্বনি করা হচ্ছে। সাড়ে তিনটায় এ কাফেলা চলা শুরু করেছে বিমান বন্দর থেকে। শাহেরাহে কায়েদে আযম, চেয়ারিং ক্রস, শাহেরাহে ফাতেমা জিন্নাহ, মুজাং চুঙ্গী হয়ে ফিরোজপুর রোড এবং তারপর ইছড়া মোড় পৌছে সন্ধ্যা ছ'টায়। অতঃপর বহুকষ্টে মাইয়েতসহ ট্রাক মাওলানার বাসভবনে পৌছে। চারদিকের মসজিদের মিম্বর থেকে মাগরিবের আযান ধ্বনিত হচ্ছে। চারপাশের কোন মসজিদে তিল পরিমাণ স্থান নেই লোক দাঁড়ানোর। এদিকে বালক-বৃদ্ধ নির্বিশেষে অনেকেই শোকের আতিশয্যে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলে।

মাগরিবের পর ঘোষণা করা হলো, রাত ন'টা পর্যন্ত শুধু মহিলারা মাইয়েতের শেষ দীদার লাভ করতে পারবে। অতঃপর রাত দশটা থেকে পরদিন সকাল আটটা পর্যন্ত শুধু পুরুষদের জন্যে দীদার লাভের সুযোগ থাকবে।

মাওলানার খাস কামরার সামনে উঁচু স্থানে মাইয়েত রাখা হয়েছে। এক ফটক দিয়ে মানুষ ভিতরে প্রবেশ করবে, এক নজর মাইয়েতকে দেখবে– অন্য ফটক দিয়ে বেরিয়ে যাবে।

সন্ধ্যা ছ'টা থেকে মহিলাদের সারি চলেছে ৫/এ যায়লদার পার্কের ফটকের ভেতর এবং রাত ন'টা পর্যন্ত অবিরাম চলেছে এ স্রোত।

পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীগণ তিনখানি বাস বোঝাই হয়ে এসেছে। তাদের সকলের কণ্ঠে শোকের কান্না। আকাশে বাতাসে যেন শুনা যাচ্ছে কান্নার রোল, কাঁদে আল্লাহর ফেরেশতাগণ, কাঁদে কুল মাখলুকাত।

সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় শেষ দীদারের জন্যে এলেন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল জিয়াউল হক। কিছুক্ষণ মহিলাদের থামিয়ে তাঁর দীদারের সুযোগ করে দেয়া হলো। মিঞা তুফাইল মুহাম্মদ জেনারেল জিয়াউল হককে সাথে করে মাওলানার বাসভবনে প্রবেশ করেন। পাকিস্তান-প্রেসিডেন্টের সাথে ছিলেন পাঞ্জাবের গভর্নর জেনারেল সরওয়ার খান, চীফ সেক্রেটারী এবং অন্যান্য সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তা। তাঁদের সাথে আরও ছিলেন ইসলামী জমিয়তের প্রধান জনাব লিয়াকত বালুচ। জেনারেল জিয়াউল হক মাওলানার দীদার লাভ করার পর কিছুক্ষণ নির্বাক দাঁড়িয়ে থাকেন এবং তাঁর দু'টি গণ্ড বেয়ে প্রবাহিত হয় প্রবল অশ্রুধারা।

জেনারেল জিয়াউল হক বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলেন, "এ যে একেবারে জ্যোতির্ময় মুখমণ্ডল"। তারপর মাওলানার সন্তানদেরকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, "মাওলানার তিরোধান এক অপূরণীয় ক্ষতি। এ ক্ষতি তাঁর পরিবারের নয়, পাকিস্তানের নয় বরং সারা মুসলিম বিশ্বের। তিনি যে মহান খিদমত করে গেলেন, তা আগামী কয়েক শতক পর্যন্ত মুসলমান জাতির পথ নির্দেশ করবে। আমি আশা করি মাওলানা হেদায়েতের যে দীপশিখা জ্বালিয়ে গেলেন, তাঁর সন্তানগণ তা আলোকিত রাখার চেষ্টা করে যাবেন।"

মিনিট দশেক পরে তিনি বিদায় হন।

রাত সাড়ে ন'টা থেকে পরদিন সকাল ৮টা পর্যন্ত হাজার হাজার লোক সারি বেঁধে ক্ষণিকের জন্যে হলেও মাওলানার শেষ দীদার লাভ করেন।

ঠিক বেলা ন'টার ভেতরে লোকের প্রবেশ বন্ধ করে দেয়া হয় এবং জানাযার জন্যে মাইয়েতকে পুনরায় ট্রাকে উঠানো হয়। ঠিক এ সময়ে আমি লাহোর বিমান বন্দরে অবতরণ করি। এর পরের বেদনাদায়ক দৃশ্যগুলো আগেই বর্ণনা করেছি।

সাতাশে সেপ্টেম্বর পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের আঞ্জুমানে ইত্তিহাদে তালাবার উদ্যোগে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের ফয়সল অডিটরিয়ামে এক শোক সভার আয়োজন করা হয়। সভাপতিত্ব করেন মিয়া তুফাইল মুহাম্মদ। এখানে দেশ-বিদেশের বহু মনীষী ও পণ্ডিত মাওলানার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে বক্তৃতা করেন।

কাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর বলেন, সাইয়েদ মওদূদীর জানাযা ছিল একটি গণভোট। পাকিস্তানের জনগণ ইসলামের পক্ষে তাদের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েছে।

বিশ্বমুসলিম যুব সংসদের সহ-সেক্রেটারী জেনারেল ডঃ মুহাম্মদ আহমদ তুতুঞ্জী বলেন, মাওলানার চিন্তাধারা মন-মস্তিষ্ককে কিয়ামত পর্যন্ত আলোকিত করতে থাকবে। কুয়েতের আওকাফ মন্ত্রণালয়ের ইসলাম বিষয়ক বিভাগের ডাইরেক্টর শেখ আবদুল্লাহ আল আকীল বলেন, ইসলামকে মসজিদ-মাদ্রাসার চার দেয়ালের মধ্যে আবদ্ধ রাখার ষড়যন্ত্র মাওলানা মওদূদী নস্যাৎ করে দিয়েছেন। সউদী আরবের সরকারী প্রতিনিধি ডঃ তাহা জাবির বলেন, সাইয়েদ মওদূদী বর্তমান শতকে আল্লাহর দ্বীনকে পুনর্জীবিত করেছেন। কুয়েতের জনৈক মনীষী আবদুল আযীয আল আলী আল মোতাওয়া বলেন, সাইয়েদ মওদূদী এমন এক জামায়াত প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন, যা সারা দুনিয়ায় ইসলামের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে তৎপর। জামায়াতে ইসলামী হিন্দের আমীর মাওলানা ইউসুফ বলেন, আমি আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলছি, মাওলানা মওদূদী তাঁর দায়িত্ব পুরোপুরি পালন করে গেছেন। আমি বলেছিলাম, মাওলানার সাহিত্য ও চিন্তাধারা কোটি কোটি মানুষের মধ্যে মানসিক বিপ্লব এনে দিয়েছে। সিরিয়ার জনৈক মনীষী শেখ সাঈদ হাওয়া বলেন, মাওলানা মওদূদী পাকিস্তানের সুবাস সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিয়েছেন। ইসলামী জমিয়ত সভাপতি লিয়াকত বালুচ বলেন, মাওলানার

সাহিত্য ও চিন্তাধারা এ দেশসহ মুসলিম বিশ্বের কোটি কোটি যুবককে ইসলামের জন্যে উৎসর্গীকৃতপ্রাণ বানিয়েছে। আজ যদি তাদের প্রাণের বিনিময়ে মাওলানাকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হতো, তা হলে তার জন্যে লক্ষ লক্ষ যুবক তাদের জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত ছিল।

ইখওয়ানুল মুসলিমুন- এর প্রতিষ্ঠাতা শেখ হাসানুল বান্না শহীদের পুত্র মিসরের আইনজীবী শেখ সাইফুল ইসলাম বলেন, শেখ হাসানুল বান্না শহীদ হওয়ার পর ইখওয়ানের কর্মীগণ মনে করেছিল তাদের নেতৃত্ব দেয়ার কেউ নেই। কিন্তু তারা অল্পকাল পরেই উপলব্ধি করল যে, এখন আল উস্তাজ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীই তাদের মুরশিদ-ই-আম, তাদের উস্তাদ ও পথ প্রদর্শক।

সভাপতির ভাষণে মিয়া সায়েব বলেন, মাওলানার চিন্তাধারার প্রাধান্য বিস্তারের জন্যে আমরা সর্বশক্তি নিয়োজিত করব।

তারপরেও পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি এবং লাহোরের বিভিন্ন স্থানে মাওলানার মৃত্যুতে কয়েকটি শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এর প্রায় সবগুলোতে আমি আমন্ত্রিত হয়ে যোগদান করেছি।

মাওলানাকে বিগত বাইশ বছর ধরে জানবার চেষ্টা করেছি- জেনেছি এবং দেখেছি। সমগ্র হৃদয় দিয়ে তাঁকে জানবার এবং দেখবার চেষ্টা করেছি। আজ আমি সুস্পষ্ট অনুভব করছি যে, মাওলানাকে তাঁর জীবদ্দশায় যত বড় ও মহান দেখেছিলাম, মৃত্যু তাঁকে তার চেয়ে শত সহস্রগুণে বিরাট ও মহান বানিয়ে দিয়েছে। দেশ-বিদেশে তাঁর জন্যে যে সম্মান ও শ্রদ্ধার আসন ছিল, মৃত্যু তাঁর সে সম্মান-শ্রদ্ধাকে বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়েছে।

আমি এবার পাকিস্তান সফরে গিয়ে করাচী থেকে লাহোর, লাহোর থেকে পিন্ডি এবং পিন্ডি থেকে পেশওয়ার ভ্রমণ করেছি। সর্বত্র আকাশে-বাতাসে পত্র-পল্লবে, সিন্ধু-রাবি-ঝিলাম-আটক নদ-নদীগুলোর কুলকুল নাদে প্রবাহিত তরঙ্গমালায়, পাহাড়ে-পর্বতে শুনেছি শোকের মর্সিয়া। সর্বত্র দেখেছি শোকের মূর্ত ছবি। শুনেছি লক্ষ লক্ষ আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার কণ্ঠ মহররমের মাতমের মত- 'সাইয়েদী, মুরশেদী, মওদূদী, বিদায়-বিদায়'। বাফেলো থেকে নিউইয়র্ক ও লন্ডন, লন্ডন থেকে করাচী এবং করাচী থেকে লাহোর কত নদ-নদী, সমুদ্র, পাহাড়-পর্বত, উপত্যকা-অধিত্যকা, কত শহর, জনপদ ও মরুভূমির উপর দিয়ে সারা বিশ্বকে অশ্রু-সাগরে ভাসিয়ে তাঁর মাটির অচেতন দেহখানি উড়ে এসেছে তাঁর

চিরন্তন শয্যায় শায়িত হওয়ার জন্যে। তাই আজ তাঁর মৃত্যুতে– কাঁদে বিশ্বের মুসলিম আজি, গাহে তাঁরই মর্সিয়া।

আজ আমি উপলব্ধি করলাম জীবনের সবটুকু দিয়ে– জীবিত মওদূদী এবং এ ধূলির ধরা থেকে বিদায় নেয়া মওদূদীর মধ্যে পার্থক্য ঢের– আসমান ও যমীনের। মওদূদী আজ মৃত্যুঞ্জয়ী। তাঁর বিশ্বজনীন ইসলামী দাওয়াত, তাঁর অমূল্য সাহিত্য ভাণ্ডার, তাঁর স্বচ্ছ চিন্তাধারা তাঁকে অমর করে রাখবে চিরদিন। জীবদ্দশায় যাঁরা তাঁকে বাঁকা চোখে দেখেছেন। আজ তারা তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। আজ আইয়ুব আমলের আলতাফ গওহর বিবিসির মাধ্যমে মাওলানার জীবনের বিভিন্ন দিকের উপর আলোকপাত করে তাঁর হৃদয়ের গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন মাওলানার প্রতি। পি এন এ প্রধান মুফতী মাহমুদ বলেছেন, মাওলানা আবুল আ'লা মওদূদী ছিলেন কোরআন ও সুন্নাহর 'সনদ-স্বরূপ'।

মাওলানার ইন্তিকালে গোটা মুসলিম বিশ্ব শোকে অভিভূত। শহরে শহরে, মসজিদে মসজিদে গায়েবানা জানাযা ও শোকসভা হতে থাকে। বিভিন্ন মনীষী, জ্ঞানী-গুণী, সুধী, শিক্ষক, ছাত্র পত্র-পত্রিকায় মাওলানার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে তাঁদের অশ্রুস্নাত ও শোকসন্তপ্ত হৃদয়ের আবেগ-অনুভূতি প্রকাশ করতে থাকেন। এমনি যারা প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন তাঁদের মধ্যে আরও উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন মেজর (অবঃ) মুস্তফা শাহীন, ডাঃ মুহাম্মদ কুতুব, সুদানের রাজধানী খার্তুমের প্রখ্যাত সার্জন ডাঃ আলী আলহাজ্জ, নাইরোবীর ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রাক্তন মন্ত্রী ইউসুফ হাশেম আর রাফায়ী, ফরাসী ভাষাবিদ অধ্যাপক হামীদুল্লাহ, হংকং নিবাসী নাযীর হাসান, আরব জাহানের অন্যতম মনীষী ডাঃ মুস্তাফা আয যারকা, সংযুক্ত আরব আমীরাতের প্রধান বিচারপতি শেখ আবদুল আযীয আল-মুবারক, ইরানের আল্লামা আয়াতুল্লাহ এহিয়া নূরী, তুরস্কের ডাঃ ইবরাহীম আগাহ, আমেরিকার ডাঃ ইসমাইল রাজী আল-ফারুকী, ভারতের মুফতী আতীকুর রহমান, পাকিস্তানের মুফতী সাইয়াহুদ্দীন কাকাখেল, ভারতের মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী, জেদ্দার সাইয়েদ মাসউদ আলী রিজভী, রিয়াদের মুহাম্মদ আমীন, জাপানের হুসাইন খান, ভারতের মাওলানা সাঈদ আহমদ আকবরাবাদী, মদীনা শরীফের আবদুল মুজিব, মাওলানা সদরুদ্দীন রাফায়ী মুজাদ্দেদী, আইনজীবী এ, কে, ব্রোহী, আইন সম্পাদক মুযাফফর বেগ এবং আরব জাহানের সারওত সওলত। এমনি শোকাভিভূত সুধীদের সংখ্যা এত বেশী যে, তা পত্রস্থ করার জন্যে একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনার প্রয়োজন।

মাওলানা মওদূদী

[দ্বিতীয় ভাগ]

মাওলানার মধ্যে লেখনী শক্তির প্রেরণা

মাওলানা যে এক অতি উচ্চাঙ্গের প্রবন্ধকার, সাহিত্যিক ও চিন্তাশীল, তা সাহিত্য জগতের অজানা নেই। একথাও অনস্বীকার্য যে, তিনি উর্দূ ভাষাকে এক নতুন রূপ ও জীবনীশক্তি দান করেছেন। তাঁর লেখনীর ধরন, বাক্য গঠনপদ্ধতি ও প্রকাশভঙ্গি একান্তই তাঁর নিজস্ব। অসাধারণ লেখার প্রেরণা যেন তাঁর জন্মগত এবং এ প্রেরণা প্রকাশ লাভ করে অতি বাল্যকালেই।

এ সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব উক্তি পাঠকবর্গের অবগতির জন্য নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ

"যখন আমার বয়স ছিল ন'বছর, তখন থেকেই প্রবন্ধ লেখার এক স্বাভাবিক প্রেরণা সঞ্চার হয় আমার মধ্যে। সে সময়ে জনাব আশফাক আহমদ জাহিদী নামে আমার এক বন্ধু আওরংগাবাদ আসেন এবং আমাদের বাড়ীতে কিছুদিন অবস্থান করেন। প্রবন্ধ লেখা ও বই পড়ার ভারী ঝোঁক ছিল তাঁর। তিনি আমাদের দুই ভাইয়ের মধ্যে প্রবন্ধ লেখার অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করেন এবং পাঠ্য বই ছাড়াও সাধারণ পত্র পত্রিকা ও সংবাদপত্র পড়ার দিকে তিনি আমাদেরকে আকৃষ্ট করেন। একবার আমাদের যোগ্যতা পরীক্ষা করার জন্যে তিনি বলেন, মনে কর, তোমরা একটি বালিকার প্রেমে পড়েছ। এখন তোমাদের সে কল্পিত প্রেমিকার কাছে এমন একটি প্রেমপত্র লেখ, যার মধ্যে ফুটে উঠবে প্রেমের আবেগ-উচ্ছ্বাস ও বিরহ-বেদনা।"

এ ব্যাপারে তো আমরা ছিলাম একেবারে অনভিজ্ঞ। বিশেষ করে আমার বয়স এমন ছিল যে, প্রেম, প্রেমিকা, বিরহ ইত্যাদি কোন বস্তু, তার কোন ধারণাই আমার মনে জন্ম লাভ করেনি। কিন্তু সে সময়ে গুলিস্তাঁ, বুস্তাঁ আমার পড়া ছিল। তার থেকে আমার এতটুকু জ্ঞান হয়েছিল যে, 'প্রেম এমন এক বিশেষ রোগ যা সৃষ্টি হয় কোন সুশ্রী সুন্দর মুখ দেখে, তারপর সে রোগের ফলে মনের মধ্যে জ্বলতে শুরু হয় আগুন, যা নিভে যায় একমাত্র সে মুখখানা দেখলেই। যতক্ষণ তা দেখা যায় না, ততক্ষণ সে আগুন জ্বলতেই থাকে মনের মধ্যে। আর মনের এ অবস্থারই নাম হচ্ছে 'বিরহ'। যা হোক, আমাদের সাধ্যানুযায়ী এ জ্ঞানকে খুব কাজে লাগালাম এবং সে অবস্থার চিত্র অঙ্কন করে লিখলাম দীর্ঘ পত্র। আমরা দুই ভাই এবং আশফাক ভাইয়ের মধ্যে কারও একথা মনে নেই যে, আমরা তখন কি

লিখেছিলাম। কিন্তু এতটুকু অবশ্যই মনে আছে যে, আশফাক ভাই পত্র দু'খানা পড়ে স্তম্ভিত হয়েছিলেন এবং বিশেষ করে আমারটাই তিনি পছন্দ করেছিলেন বেশি। যদিও বড় ভাইয়ের পত্রখানা ছিল আকারে অধিকতর বড়।

মৌলভী পরীক্ষা পাশ করার পর এক অবসর সময়ে বড় ভাইয়ের কথায় আমি কাসিম আমীন বে'র একখানা আরবী বই 'আল মিরআতুল জাদীদ -এর উর্দু তরজমা করেছিলাম। জানি না সে অনুবাদ লিপিগুলো এখন কোথায় আছে। তবে আমার বেশ মনে আছে, এ তরজমার সাবলীলতা, ভাষার সরলতা ও শ্রুতিমধুর বাক্যগঠন পদ্ধতিতে আব্বা মরহুম অত্যন্ত প্রীত হয়েছিলেন এবং বড় ভাইও প্রশংসা করেছিলেন বিস্তর।

এ ছিল আমার প্রাথমিক প্রচেষ্টা। তারপর ১৯১৭ সালে ভূপালে চলে যাওয়ার পরে সাধারণ পড়াশুনার সাথে প্রবন্ধ লেখার ঝোঁক এত বদ্ধমূল হলো যে, মনে হলো মৃত্যুর আগে এর সমাপ্তি ঘটবে না। প্রাথমিক তিন-চার বছর ছিল নকল নবীশীর অবস্থা। যার লিখার ধরন পছন্দ হতো তারই নকল করার চেষ্টা করতাম। কিন্তু পড়াশুনা যতোই বাড়তে লাগলো, ততোই অনুভব করলাম যে, প্রবন্ধের সৌন্দর্য অন্যের পদ্ধতি অনুকরণে বিকশিত হয় না, বরঞ্চ হয় নিজস্ব প্রকাশভঙ্গিতে। ১৯২১ সাল থেকে নিজস্ব এক স্থায়ী ধরন পদ্ধতি অবলম্বন করেছি, যার মধ্যে কারো অনুসরণ করি না।

আমি এ ধারণা পোষণ করি যে, প্রত্যেক চিন্তা-ধারণার সাথে কিছু ভাষাও উদ্গত হয়। আর প্রতিটি চিন্তা-ধারণা প্রকাশের জন্যে সবচেয়ে সঠিক ও সঙ্গত ভাষা তাই, যা চিন্তা-ধারণার সাথে আপনা আপনি বেরিয়ে আসে। অতএব শুধু প্রবন্ধ সম্পর্কে চিন্তা করা উচিত। এখন রইল ভাষার কথা। তা নির্বাচনের জন্যে ব্যতিব্যস্ত হওয়ার দরকার নেই। তা প্রবন্ধের সাথে আপনা আপনিই চলে আসবে।

এই হচ্ছে কারণ যার জন্যে আমাকে যখন কিছু লিখতে হয়, তখন আমার সকল চেষ্টা-চরিত্র শুধু চিন্তাধারা গুছিয়ে নিতে এবং মাল-মসলা ও যুক্তি-প্রমাণাদি সংগ্রহ করতেই ব্যয়িত হয়। তারপর একবার মনের মধ্যে বিষয়বস্তু সংকলিত হয়ে গেলে তাকে কাগজে রূপান্তরিত করতে আমার বেশী সময় লাগে না। লেখার জন্যে শব্দ চয়নের ব্যাপারে এতটা নিশ্চিন্ত থাকি যে, বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছাড়া প্রায় সব ব্যাপারে একবার লেখার পর দ্বিতীয়বার দেখার দরকার হয় না।"

মাওলানার বিপ্লবী সাহিত্য

গত অর্ধ শতাব্দীকাল যাবত মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর বলিষ্ঠ ও বিপ্লবী সাহিত্য লক্ষ কোটি মানব সন্তানের মন-মস্তিষ্কে বিপ্লব এনে দিয়েছে। অসংখ্য নর-নারীর মনে খোদা-রাসূলের প্রতি নিবিড় ভালোবাসার সঞ্চার করে তাদের জীবনের মোড় পরিবর্তন করে দিয়েছে। তাঁর সাহিত্য ও চিন্তাধারা কোটি কোটি মানুষের মধ্য থেকে কত জনকে ছাঁটাই-বাছাই করে বাতিলের বিরুদ্ধে বিরামহীন সংগ্রামে নিয়োজিত করেছে। মুসলমানদের চিন্তার জগতে শতাব্দীর যে স্থবিরতা দানা বেঁধেছিল, মাওলানার সাহিত্য তা দূর করে এক ব্যাপক সুদূর প্রসারী স্বচ্ছ নির্মল চিন্তাধারার সঞ্চার করেছে। তাঁর সাহিত্যের প্রভাব কত জনকে পার্থিব লোভ-লালসা ও ভয়-ভীতি থেকে মুক্ত করে অনাবিল মজবুত চরিত্রের অধিকারী করে দিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই।

তাঁর সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য

মাওলানা মওদূদীর সাহিত্যের প্রথম বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি ইসলামকে একটা স্থবির ও প্রাচীন গতানুগতিক বা বংশ পারম্পরিক ধর্মের পরিবর্তে একটা বিপ্লবী জীবন দর্শন ও আন্দোলন হিসাবে পেশ করছেন। এর সবচেয়ে বলিষ্ঠ যুক্তি তিনি ইসলামী চিন্তাধারার অভ্যন্তর থেকে অভ্যন্তরীণ প্রমাণাদি হিসাবে উপস্থাপিত করেছেন। দ্বীনের এই বিপ্লবী মতবাদের সাক্ষ্য বহন করে কোরআন পাকের উৎসাহ-উদ্দীপনাব্যঞ্জক আয়াতসমূহ, নবী পাকের তেইশ বছরের সংগ্রামী জীবন, সাহাবায়ে কেরামের চিরন্তন সংগ্রাম সাধনা এবং খিলাফতে রাশেদার গৌরবোজ্জ্বল যুগ। মাওলানা তাঁর প্রকাশভঙ্গির শক্তি দিয়ে কথার জাল বুনে কোন কিছু প্রমাণ করার চেষ্টা করেননি, বরঞ্চ যে সব তত্ত্ব ও তথ্য শতাব্দীর অনুশীলনহীন স্থবির চিন্তাধারার কারণে মানুষের গোচর থেকে লুক্কায়িত ছিল, তিনি তা ঝেড়ে-মুছে ঝকঝকে পরিচ্ছন্ন করে মিল্লাতে ইসলামিয়ার সামনে তুলে ধরেছেন।

তাঁর সাহিত্য ও চিন্তাধারার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি ইসলামের প্রতিটি দিক ও বিভাগকে উজ্জ্বল করে তুলে ধরে প্রত্যেকটিকে বর্তমান যুগের উপযোগী করে বর্ণনা করেছেন। ধর্মের প্রতি আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগের যত প্রকারের অভিযোগ তা তিনি যুক্তি-প্রমাণাদির দ্বারা খণ্ডন করেছেন। ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার পূর্ণাঙ্গ অট্টালিকার একটা চিত্র তিনি অঙ্কিত করেছেন। সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, আইন ও শিক্ষা বিষয়ক, কৃষি ও শিল্প বিষয়ক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক– মোটকথা জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগে ইসলামের নীতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে যুক্তি-প্রমাণাদির দ্বারা বর্ণনা করেছেন। ইসলামের আধুনিক দাবি কি এবং আধুনিক জগৎ ইসলামের কাছে কি দাবি করে, তা তিনি বলে দিয়েছেন। কমিউনিজমকে তিনি ভ্রান্ত প্রমাণ করেছেন। পুঁজিবাদকেও তিনি একটা ধ্বংসকারী মতবাদ হিসাবে প্রমাণ করেছেন। ফ্যাসিজম, সোশ্যালিজম, লিবারালিজম প্রভৃতি যাবতীয় ইজমকে তিনি মানব জাতির জন্যে মারাত্মক মতবাদ মনে করেন।

এগুলোকে তিনি কোন 'কাটমোল্লার' ন্যায় 'অমন্দ' মনে করেন না। বরঞ্চ এ সবের ত্রুটি-বিচ্যুতি বিশ্লেষণ করে তা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন।

তৃতীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, মাওলানা মওদূদী একথা প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, ইসলাম নিছক কোন পূজা-পার্বনের ধর্ম নয় যে এটি রাজনীতির সাথে কোন সম্পর্ক রাখে না। বরঞ্চ জীবনের এমন কোন বিভাগ নেই যা ইসলাম থেকে স্বাধীন হয়ে থাকতে পারে। ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা এবং রাজনীতি এ জীবনের একটি বিভাগ। যতক্ষণ পর্যন্ত জীবনের এই রাজনৈতিক বিভাগটিকে ইসলামের অধীন করে দেয়া না হয়েছে, ততক্ষণ এর দাবি পূরণ হয় না।

মাওলানার কয়েকটি গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

তাফহীমুল কোরআন

"কোরআন মজীদের অনুবাদ ও তাফসীর বিষয়ে আমাদের ভাষায় এতো বেশী গ্রন্থ রচনার কাজ হয়েছে যে, কোন ব্যক্তির নিছক বরকত ও আশীর্বাদের জন্যে আর একটা অনুবাদ অথবা তাফসীর লিখে প্রকাশ করলে সময় ও শ্রমের সদ্ব্যবহার হবে বলে মনে হয় না। ....আমি বহু দিন থেকে অনুভব করছিলাম যে, কোরআনের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য এবং তার সত্যিকার উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করার জন্যে আমাদের সুধী মহলে যে ক্রমবর্ধমান পিপাসা পরিলক্ষিত হচ্ছে, অনুবাদক ও তফসীরকারগণের প্রশংসনীয় উদ্যোগ সত্ত্বেও তা নিবারণ করা মোটেও সম্ভব হয়নি। আমি মনে করলাম যে, এ পিপাসা মেটানোর জন্যে আমিও কোন না কোন চেষ্টা করে দেখিনা কেন।"

উপরিউক্ত কথাগুলো মাওলানা তাঁর প্রণীত তাফহীমুল কোরআনের ভূমিকায় ব্যক্ত করেছেন। কোরআনের অনুবাদ করতে গিয়ে তাই তিনি শাব্দিক অনুবাদের চিরাচরিত প্রথা পরিহার করে আরবী পরিভাষাগুলোকে সহজ, সাবলীল ও প্রাঞ্জল উর্দূ ভাষায় রূপান্তরিত করেছেন। এ তাঁর এক অনন্যসাধারণ ও সুনিপুণ রচনা শিল্প। তিনি বলেন ঃ

প্রথম কথা এই যে, শাব্দিক অনুবাদ পড়লে মনে হয় যে মূলবচনের ধারাবাহিকতা, ভাষার মাধুর্য ও ভাষণের প্রভাব মোটেই অনুভূত হয় না। কোরআনের অনুবাদের ছত্রে ছত্রে এক নিষ্প্রাণ বক্তব্য দেখা যায় যা পড়ার পর পাঠকের মনে কোন প্রেরণার সঞ্চার করে না, শরীর রোমাঞ্চিত হয় না, চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরে না এবং তার মনে কোন বিপ্লবাত্মক ভাবধারার সৃষ্টি হয় না। সে এতটুকুও অনুভব করতে পারে না যে, কোন কিছু তার জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেককে প্রভাবিত করে মনের গভীরে প্রবেশ করছে। অথচ কোরআনের পবিত্র শিক্ষা ও উচ্চাঙ্গের বিষয়বস্তুর যতখানি প্রভাব আছে, তার সাহিত্যের প্রভাব তার চেয়ে কিছু কম নয়। আর এই কারণেই কোরআনের পবিত্র বাণী শ্রবণ করার পর প্রস্তর-কঠিন হৃদয়ও বিগলিত হয়েছে, সে বাণীর বজ্রনির্ঘোষে সমগ্র আরব প্রকম্পিত হয়েছে। তার প্রভাবশক্তি বিরোধীরাও স্বীকার করত এবং তারা ভয় করত যে, এ

বাণীতে এমন এক ঐন্দ্রজালিক শক্তি আছে যে, তা শুনলেই মানুষ তার বশীভূত হয়ে পড়বে। এতটুকু শক্তি যদি কোরআনের ভাষায় না থাকত এবং তার অনুবাদে যে ভাষা আমরা দেখতে পাই সেই ধরনের ভাষায়ই যদি কোরআন নাযিল হতো, তাহলে সে কোরআন সমগ্র আরব জাতির মধ্যে অদম্য প্রাণ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করতে এবং তাদের হৃদয় মন জয় করতে কিছুতেই পারতো না।

(তাফহীমুল কোরআন-ভূমিকা)।

অতঃপর কোরআন পাঠ করতে গিয়ে পাঠকের মনে বার বার এ খটকা ও প্রশ্ন জাগে যে, কোরআন আমাদের সাধারণ গ্রন্থাবলী থেকে এত স্বতন্ত্র কেন, এর আলোচ্য বিষয়বস্তুই বা কি, এতে ক্রমবিন্যাস ও ধারাবাহিকতাই বা নেই কেন, এ অবতীর্ণ হওয়ার পর কিরূপে সংকলিত ও সঞ্চয়িত হলো– এ ধরনের যাবতীয় সংশয়-সন্দেহ মাওলানা তাফহীমুল কোরআনের ভূমিকায় খণ্ডন করেছেন। এ ধরনের যাবতীয় প্রশ্নের সন্তোষজনক জবাব তিনি প্রারম্ভেই পেশ করেছেন। তাঁর এ ভূমিকাকে প্রকৃতপক্ষে কোরআন পাক হৃদয়ঙ্গম করার বুনিয়াদী মূলনীতি বলা যেতে পারে, যা পৃথকভাবে পুস্তিকাকারেও প্রকাশিত হয়েছে।

মাওলানা তাঁর মাসিক পত্রিকা তর্জুমানুল কোরআনের মাধ্যমে ১৯৪৩ সাল থেকে ধারাবাহিকভাবে তাফহীমুল কোরআন লেখার সূচনা করেন এবং ত্রিশ বছরে তা শেষ করেন। বলতে গেলে তিনি তাঁর জীবনের অধিকাংশ কাল অতিবাহিত করেন এই অমূল্য গ্রন্থ রচনায়। ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্যে এ হলো তাঁর শ্রেষ্ঠ অবদান।

তিনি একদা তাঁর বৈকালের আসরে (আসর থেকে মাগরিব পর্যন্ত বৈঠক) মন্তব্য করেন ঃ

"আমি আমার দিন রাতের সময় তিন অংশে ভাগ করে রেখেছি। এক অংশ দেশ ও সংগঠনের দৈনন্দিন কাজকর্মে, এক অংশ বর্তমান বংশধরদের জন্যে এবং এক অংশ ভবিষ্যত বংশধরদের জন্যে। আর তাফহীমুল কোরআন লেখার কাজ আমার উপরে ভবিষ্যত বংশধরদের হক বলে মনে করি। এ হক আমি বর্তমান বংশধরদের খাতিরে নষ্ট করতে পারি না।"

ভবিষ্যত বংশধরদের জন্যে গ্রন্থখানি অধিকতর উপযোগী, প্রামাণ্য ও তথ্যবহুল করার জন্যে তিনি তাঁর সমগ্র শক্তি ব্যয় করেছেন। মধ্যপ্রাচ্য আরদুল

কোরআন' (কোরআনে বর্ণিত ঐতিহাসিক স্থানগুলি) স্বচক্ষে ঘুরে ফিরে দেখেছেন এবং সে সব ঐতিহাসিক স্থানের আলোকচিত্র তাঁর গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেছেন।

মাওলানা তাফহীমুল কোরআনে কালামে ইলাহীর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কোন মনগড়া কথার অবতারণা করেননি। অতীতের মুসলিম মনীষী বা সালফে সালেহীনের অভিমত, সহীহ্ হাদীস ও সীরাত পাক অনুসরণ করেছেন। তাফসীর লেখার সময় বিশেষভাবে যেসব তাফসীরের সাহায্য নিয়েছেন তাদের মধ্যে আল্লামা জারুল্লাহ্ যমখশরীর 'কাশশাফ আন হাকায়িকি তানযীল, আল্লামা ইবনে কাছিরের 'তাফসীরুল কোরআনিল আলিম', আল্লামা ইবনে জারির তাবারীর 'জামিউল বায়ান', ইমাম রাযীর 'মাফাতিহুল গায়ব', অর্থাৎ 'তাফসীরুল কবীর', আল্লামা আলুসীর 'রূহুল মায়ানী', আবু বকর জাসসাসের 'আহকামুল কোরআন' এবং ইবনুল আরাবী মালিকীর 'আহকামুল কোরআন' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

কোরআনের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ফিকাহ্ সম্পর্কিত প্রশ্নের সম্মুখীন হলে মাওলানা ফিকাহ্ শাস্ত্রের ইমাম চতুষ্টয়– হানাফী, মালিকী, শাফিয়ী ও হাম্বলীর মূল গ্রন্থাবলী আলোচনা করতেন। কারণ মাওলানার চিরাচরিত অভ্যাস হলো কোন বিষয়ে সত্যাসত্য নির্ণয়ের জন্যে সর্বদা মূল উৎস গ্রন্থ অধ্যয়ন করা। তাঁর টেবিলের উপরে বিভিন্ন তাফসীর, হাদীস, ফিকাহ্র মূল গ্রন্থাদি, সীরাত ও ইসলামের ইতিহাস প্রভৃতি পুস্তক ছড়িয়ে থাকতো। তাফহীমুল কোরআনের কিছু লিপিবদ্ধ করার আগে তিনি এসব গ্রন্থ থেকে তাঁর প্রয়োজনীয় তথ্যাদি পৃথক কাগজে টুকে রাখতেন। বিশেষ বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও অনুসন্ধান কার্যে কখনো কখনো তাঁর দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ কেটে যেত।

তাফহীমুল কোরআনের বৈশিষ্ট্য এই যে, আধুনিক মন মানসিকতাকে সামনে রেখে মাওলানা এর টীকায় বিভিন্ন বিষয়ের ব্যাখ্যা দান করেছেন। আরবী অভিধান, ব্যাকরণ ও তর্কশাস্ত্রের জটিল তত্ত্বের কোন প্রকার অবতারণা না করে সহজ সরল ভাষায় আধুনিক যুগের সমস্যাগুলোর সমাধান পেশ করেছেন। কোরআন পাঠকালে পাঠকের মনে যেসব সন্দেহ-সংশয় ও প্রশ্নের উদ্রেক হতে পারে, সে সবের উপর মনোজ্ঞ আলোকপাত করেছেন।

তাফহীমুল কোরআনের আরও একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে, প্রত্যেকটি সূরার প্রারম্ভে তার একটি পরিচিতি, উপক্রমণিকা বা মুখবন্ধ সন্নিবেশিত করা হয়েছে। সূরাটির কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয়বস্তু, তার পশ্চাৎ

পটভূমিকা, শানে নুযূল, যে সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে সূরাটির অবতারণা, তার পূর্ণ বিবরণ প্রথমেই উল্লেখ করা হয়েছে। ফলে সূরাটির অন্তর্নিহিত মর্মসহ তার আলোচ্য বিষয়বস্তু পাঠকের মনে পূর্বাহ্নেই পরিস্ফুট হয়ে যায়। কোরআন অনুধাবন করার এ এক অভিনব পন্থা, যা মাওলানা পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন।

তাফহীমুল কোরআনের আর একটি উল্লেখ্য দিক এই যে, এর মাধ্যমে মাওলানা নবী মুস্তাফা (সাঃ)-এর সীরাত পাকের উপরে প্রশংসনীয় কাজ করেছেন। কোরআন পাকের ধারক ও বাহক নবী মুস্তাফা (সাঃ) এর সত্যিকার পরিচয় দান করে তাঁর প্রতি পাঠকের অগাধ প্রেম ও ভালোবাসার সঞ্চার করেছেন। নবী পাকের মক্কী ও মাদানী জীবনকে পৃথক পৃথক স্তরে বিভক্ত করে সীরাতুন্নবীর বিভিন্ন দিক সুস্পষ্ট করেছেনে। পদে পদে নবুয়তের অকাট্য প্রমাণাদি পেশ করে রিসালাতের প্রতি পাঠকের দৃঢ় প্রত্যয় সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর পাঠক স্পষ্টত অনুভব করতে পারে যে, ওহী, নবী-রাসূল, কিতাব ও সুন্নাত পরস্পর ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাফহীমুল কোরআনের টীকায় সীরাতের পূর্ণাঙ্গ আলোচনা সত্ত্বেও এ সম্পর্কে পৃথক গ্রন্থ রচনার বাসনা মাওলানার ছিল। আল্লাহ তায়ালার অসীম অনুগ্রহে এ বিরাট কাজও তিনি সম্পন্ন করেছেন। এ গ্রন্থ (সীরাতে সারওয়ারে আলম) কয়েক খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে।

মাওলানার বিপ্লবী সাহিত্যগুলোর মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করে আছে তাঁর তাফহীমুল কোরআন এবং তাঁর সাহিত্য সাধনার ভিত্তিপ্রস্তর 'আল জিহাদু ফিল ইসলাম'। ভবিষ্যত মানব জাতির জন্যে এ যে তাঁর শ্রেষ্ঠ অবদান, সে কথা দ্বিধাহীন চিত্তে বলা যেতে পারে।

তাফহীমুল কোরআন এবং মাওলানার অন্য গ্রন্থাবলীর উপরে দেশ-বিদেশে বিক্ষিপ্তভাবে গবেষণার কাজ শুরু হয়েছে। তবে তাফহীম থেকে ভবিষ্যত বংশধরদের জন্যে স্থায়ী সুফল লাভ করতে হলে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে একটি রিসার্চ একাডেমী বা উচ্চ পর্যায়ের গবেষণাগার স্থাপিত হওয়ার প্রয়োজন আছে। এ কাজের পথও আল্লাহ সুগম করে দেবেন বলে আশা রাখি।

কোরআনের চারটি মৌলিক পরিভাষা

কোরআনকে সঠিকভাবে হৃদয়ঙ্গম করার জন্যে এ গ্রন্থখানি পাঠকের মনের দুয়ার উন্মুক্ত করে দেয়। এজন্যে এর গুরুত্ব অপরিসীম। এ গ্রন্থে মাওলানা যে চারটি পরিভাষার উপরে সম্যক আলোকপাত করেছেন তা হলো, ইলাহ, রব, ইবাদত ও দ্বীন। এ চারটি বিষয় সম্পর্কে পাঠকের ধারণা সুস্পষ্ট না হলে কোরআন অনুধাবন করা মোটেই সম্ভব হবে না। পাঠকের মনে যদি এ ধারণা হয় যে, ইলাহ অর্থ কোন উপাস্য দেবতা, দ্বীন অর্থ কোন ধর্ম, রব অর্থ প্রতিপালক এবং ইবাদত অর্থ স্তব-স্তুতি ও পূজা-পার্বন বুঝায়, তাহলে কোরআনের মর্মকথা উপলব্ধি করা তার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়। এ কারণেই এ পরিভাষা চতুষ্টয়ের সঠিক ব্যাখ্যা দান মাওলানা অপরিহার্য মনে করে এ গ্রন্থখানি রচনা করেছেন।

অবশ্য তাফহীমুল কোরআনে প্রসঙ্গক্রমে এ চারটি পরিভাষার ব্যাখ্যা দান করা হয়নি, তা নয়। তবে এর গুরুত্ব উপলব্ধি করে এর উপরে স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছে।

ইসলামী সংস্কৃতির মর্মকথা

ইসলামী সংস্কৃতি সম্পর্কে বর্তমানে মুসলমানদের মধ্যে এক মানসিক বিভ্রান্তি ও নৈরাজ্য বিরাজ করছে। মুসলমান যা কিছুই করে অথবা বংশানুক্রমে করে আসছে তাকেই ইসলামী বা মুসলিম সংস্কৃতি বলে আখ্যায়িত করা হচ্ছে। মুসলমান যা করবে তাই ইসলামী এবং তার প্রতি ইসলামের সমর্থন থাকা উচিত। চিত্তবিনোদনের নামে ললিতকলা ও সঙ্গীতানুষ্ঠানকে ইসলামী সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত করার প্রচেষ্টা পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবেরই ফলশ্রুতি। এখন প্রশ্ন হলো, ইসলাম দুনিয়ার সামনে কোন সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ উপস্থাপন করে কিনা এবং সংস্কৃতির অঙ্গনে ইসলামের কোন মৌলিক নীতিমালা আছে কি না, সংস্কৃতি বলতে কি বুঝায় এবং ইসলামী সভ্যতা সংস্কৃতি কোন্ বুনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস কোন সাংস্কৃতিক ধ্যান ধারণা স্বীকার করে কি না ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়ের বিশদ আলোচনা ও তার সঠিক সমাধান ও নীতিমালা বর্ণনা করা হয়েছে উপরিউক্ত গ্রন্থে। রুচিবান সংস্কৃতিসেবী লোকের জন্যে এ গ্রন্থখানি দিগদর্শনের কাজ করবে সন্দেহ নেই।

আল-জিহাদু ফিল-ইসলাম

এ সম্পর্কে গ্রন্থের প্রারম্ভেই আলোচনা করা হয়েছে।

ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলন

ইসলাম একটি প্রাণবন্ত জীবন দর্শন, যা বিশ্বস্রষ্টা মানব জাতির জন্যে এ উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছেন যে, মানুষ এ জীবন দর্শন অনুযায়ী তার গোটা জীবন পরিচালিত করবে। এ জীবন দর্শনের পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন ঘটেছিল শেষ নবী মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)-এর জীবদ্দশায়। খিলাফতে রাশেদার যুগেও তা ছিল অক্ষুণ্ন, অমলিন ও নির্ভেজাল। কিন্তু পরবর্তীকালে খিলাফত রাজতন্ত্রে পরিবর্তিত হওয়ার ফলে ইসলামের মধ্যে ধীরে ধীরে জাহিলিয়াতের অনুপ্রবেশ শুরু হয়। অতঃপর সাধারণ মানুষের কাছে এ এক কঠিন সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়– এ সবের মধ্যে কোনটি ইসলাম ও কোনটি জাহিলিয়াত। ইসলামকে জাহিলিয়াতের আবর্জনামুক্ত করে তাকে নির্ভেজাল ও প্রকৃত রূপে পেতে হলে প্রয়োজন কোন সংস্কারকের, যাকে ইসলামী পরিভাষায় বলা হয় 'মুজাদ্দিদ'। মুসলিম জাতি যখনই ইসলামকে ক্লেদমুক্ত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছে, তখনই ইসলামের ইতিহাসে আবির্ভাব হয়েছে একজন মুজাদ্দিদের।

মাওলানা তাঁর এ গ্রন্থে ইসলাম ও জাহিলিয়াতের আদর্শিক দ্বন্দ্ব প্রসঙ্গে জীবন সম্পর্কে চারটি মতবাদের বিশ্লেষণ করে একমাত্র ইসলামকেই মানব জাতির গ্রহণযোগ্য মতবাদ বলে প্রমাণিত করেছেন। তারপর মুজাদ্দিদের সংজ্ঞা, মুজাদ্দিদ ও নবীর মধ্যে মৌলিক পার্থক্য, ইমাম মাহদী প্রভৃতির বর্ণনা দান করেছেন। তারপর মুসলিম জাতির কতিপয় বড় বড় মুজাদ্দিদ ও তাঁদের কার্যাবলীর আলোচনা করেছেন।

ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দ্ব

ভারত উপমহাদেশে ইংরেজদের রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তারের পর মুসলমানরা শুধু শাসন ক্ষমতাচ্যুতই হয়নি, বরঞ্চ আধুনিক সভ্যতা তাদের আত্মবিশ্বাস, মানসিক নিশ্চিন্ততা, ঈমান ও আকীদাহ-বিশ্বাস পর্যন্ত নষ্ট করে দেয়। অতঃপর পাশ্চাত্য সভ্যতা মুসলমানদের যে যে জিনিসের প্রতি ঘৃণায় ভ্রূকুঞ্চিত করল, মুসলমানরা সে সবের জন্যে অনুতপ্ত হয়ে তা পরিহার করা শুরু করল। তা সে সব তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ হোক, চালচলন হোক, ভাষা হোক অথবা তাদের ঈমান আকীদাহ হোক। অর্থাৎ পাশ্চাত্যের দৃষ্টিতে প্রতিটি অবাঞ্ছিত বস্তু তারা এক একটি করে পরিহার করা শুরু করল। অবশেষে মুসলমানদের মধ্য থেকে একশ্রেণী এতদূর অগ্রসর হলো যে, ইউরোপ থেকে আমদানীকৃত প্রতিটি বিষয়কে তারা অহীর ন্যায় বিশ্বাস্য মনে করে বসল এবং সত্যিকার 'ওহী' তাদের কাছে হয়ে পড়ল সন্দেহযুক্ত। বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কারে তারা মুগ্ধ ও আকৃষ্ট হয়ে তার নানা মনগড়া ব্যাখ্যা দিতে লাগল। এ ধরনের মানসিক দাসত্ব যে জাতিকে পেয়ে বসে, তারা অতঃপর স্বহস্তেই নিজেদের সমাধি রচনা করে। মাওলানা এই জাতির মধ্যে জন্মগ্রহণ করেও এ মানসিক দাসত্বের তীব্র সমালোচনা করেন এবং ক্ষুরধার লেখনীর মাধ্যমে মুসলমানদেরকে এ আত্মহত্যার পথ থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করেন।

মাওলানা তাঁর উপরিউক্ত গ্রন্থে মানসিক দাসত্ব ও তার কারণ, ইসলামী সভ্যতার বিপর্যয় আধুনিক সভ্যতার ব্যাধি, প্রগতিবাদীদের ফাঁকা বুলি প্রভৃতির উপরে আলোকপাত করে আধুনিক সভ্যতার ব্যাধির প্রতিকার সম্পর্কে মনোজ্ঞ আলোচনা করেন। এ গ্রন্থের দ্বারা তিনি আত্মবিস্মৃত জাতির মধ্যে আত্মচেতনার সঞ্চার করেন।

ইসলাম পরিচিতি

ইসলাম সম্পর্কে মৌলিক জ্ঞানলাভের জন্যে এ বইখানি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও ফলপ্রসূ। এর দ্বারা পাঠক ইসলামের প্রকৃত অর্থ ও মর্ম অনুধাবন করতে পারে। মাওলানা তাঁর সহজ, সরল ও হৃদয়গ্রাহী ভাষায় এই বইখানিতে ইসলাম, ঈমান, নবুয়ত, দীন ও শরীয়ত এবং শরীয়তের বিধি-বিধান সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করেন।

ইসলামের বুনিয়াদী শিক্ষা

(খুতবাত বা হাকিকত সিরিজ)

এই বইখানিতে ঈমান, ইসলাম, নামায-রোযা, যাকাত, হজ্জ ও জিহাদের মর্মকথা বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। ভাষা যেমন সরল, তেমনি সাধারণের বোধগম্য। তিনি জুমার খুতবায় এসব বিষয়ের উপর যে ধারাবাহিক ভাষণ দেন, বইখানি সে সব ভাষণেরই সংকলন।

ইসলামী জীবন পদ্ধতি

এই বইখানিতে ইসলামের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক ও নৈতিক বিধি-পদ্ধতির উপরে আলোকপাত করা হয়েছে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরপরই মাওলানা উক্ত বিষয়গুলির উপর যে পরপর বেতার ভাষণ দেন, সেগুলোকে একত্রে সঙ্কলিত করে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা হয়েছে। ইসলাম যে মানব জাতির জন্যে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন-বিধান, গ্রন্থখানি তারই সাক্ষ্য বহন করে।

পর্দা ও ইসলাম

গ্রন্থখানি মাওলানার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক অবদান। গ্রন্থখানিতে আধুনিক কালের একটি বিতর্কিত বিষয়ের উপর শক্ত করে কলম ধরেছেন বিশ্বের অন্যতম ইসলামী চিন্তাবিদ মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী। গ্রন্থের প্রারম্ভেই তিনি মানব সমাজের মৌলিক সমস্যা আলোচনা করতে গিয়ে বলেন ঃ

"মানবীয় তামাদ্দুনের প্রধানতম ও জটিলতম সমস্যা দু'টি। এ দু'টি সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের উপর নির্ভরশীল মানবজাতির উন্নতি ও সার্বিক কল্যাণ। তাই এর সমাধানের জন্যে জগতের চিন্তাশীল সুধী সমাজ বিব্রত ও চিন্তান্বিত রয়েছেন।

প্রথম সমস্যাটি এই যে, সামাজিক জীবনে নারী-পুরুষের সম্পর্ক কিভাবে স্থাপিত হতে পারে। প্রকৃতপক্ষে এ হচ্ছে তামাদ্দুনের ভিত্তিপ্রস্তর এবং এতে যদি বক্রতার কোন অবকাশ থাকে, তাহলে তাকে অবলম্বন করে যে তামাদ্দুনিক প্রাসাদ গড়ে উঠবে, তা অবশ্যই বক্র হবে।

দ্বিতীয় সমস্যাটি হচ্ছে, মানবজাতির ব্যাষ্টি ও সমষ্টিগত সম্পর্ক। এ দু'য়ের সামঞ্জস্য বিধানে যদি সামান্যতম অসঙ্গতিও রয়ে যায় তাহলে এর তিক্ততা মানব জাতিকে ভোগ করতে হবে দীর্ঘকাল ধরে।" অতঃপর মাওলানা প্রাচীন গ্রীস, রোম, খ্রিস্টীয় ইউরোপ দেশগুলোর সমাজ ব্যবস্থার এক অতি বেদনাদায়ক চিত্র অঙ্কন করেছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর স্বাধীনতার ধারণা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ যৌন অনাচার, (Sexual Anarchy) সংক্রামক যৌনব্যাধি, লাম্পট্য ও অশ্লীলতার ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন। সমাজে নারী-পুরুষের সঠিক স্থান নির্ণয় করতে ব্যর্থ হয়ে পাশ্চাত্য সমাজ কিভাবে জাতীয় আত্মহত্যার দিকে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে, ঐতিহাসিক তথ্যের ভিত্তিতে তা প্রমাণ করা হয়েছে। সমাজে নারী পুরুষের সম্পর্কে দার্শনিক, প্রাকৃতিক, বৈজ্ঞানিক ও মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ দেয়ার পর তার সুষ্ঠু ও স্থায়ী সমাধানের জন্যে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার বিশদ বিবরণ দান করা হয়েছে। গ্রন্থখানি চিন্তার জগতে বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।

উপরিউক্ত গ্রন্থসমূহ ছাড়াও তাঁর লিখিত 'ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন ও মুসলমান', 'ইসলামী রাষ্ট্র', 'Islamic Law and Constitution', 'ইসলাম ও জন্মনিয়ন্ত্রণ', খিলাফত ও রাজতন্ত্র', প্রভৃতি গ্রন্থও অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া মাওলানার অন্যান্য অর্ধ শতাধিক বই-পুস্তক সারা বিশ্বে ছড়িয়ে আছে এবং এ যাবত অধিকাংশ গ্রন্থই দুনিয়ার প্রায় চল্লিশটি ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

মাওলানা ও তাঁর সাহিত্যের প্রভাব অন্যান্য দেশে

ভারত

পাকিস্তানের বাইরে যে সব দেশে মাওলানা মওদূদীর বাণী ও মিশন প্রভাব বিস্তার করেছে, তার মধ্যে ভারত বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । মাওলানা তাঁর কাজ অবিভক্ত ভারতেই শুরু করেন এবং বিভাগের পর মাওলানার চিন্তাধারা ও কর্মসূচির দ্বারা প্রভাবিত ব্যক্তিগণ ভারতীয় জামায়াতে ইসলামী সংগঠনের মাধ্যমে কাজ করে যাচ্ছেন। বর্তমানে তাঁরা নিম্নোক্ত চার দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে কাজ করছেন ঃ

• সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বের বিলোপ সাধন।

• ইসলামী নীতিতে মুসলিম সমাজের সংস্কার ও তাদের মধ্যে দ্বীনী ইলমের ব্যাপক প্রচার ও প্রসার।

• শিক্ষিত মেধাবী শ্রেণীকে প্রভাবিত করে তাঁদের প্রতিভা বিকাশ ও গঠনমূলক কাজে নিয়োগ। বিশেষ করে নাস্তিকতা, সাম্প্রদায়িকতা, সোশ্যালিজম ও কমিউনিজমের প্রবল স্রোত বৈজ্ঞানিক যুক্তি-প্রমাণের দ্বারা রোধ করা।

• হিন্দী এবং অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষায় প্রবন্ধ লিখন ও বক্তৃতার যোগ্যতা লাভ করা, যাতে এসব ভাষায় ইসলামের মহান বাণী প্রচার করা যায় .

তাঁদের কাজ ব্যাপক আকার নিয়েছে এবং অত্যন্ত আশাপ্রদ।

সিংহল

সিংহলের শিক্ষিত মুসলমান বিশেষ করে শিক্ষাবিদ ও শিক্ষার্থীগণ মাওলানা মওদূদীর সাহিত্য ও ইসলামী আন্দোলনের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে MUSLIM BROTHERHOOD MOVEMENT সংগঠনের মাধ্যমে কাজ করছেন। তাঁরা সাপ্তাহিক বৈঠক ও দু'টি পত্রিকার দ্বারা আদর্শের প্রচার করছেন। এখানকার ব্যবসায়ী শ্রেণীও এ ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহশীল। মাওলানার বেশ কয়েকটি গ্রন্থ তাঁরা সিংহলী ভাষায় অনুবাদ করেন। এই সংস্থাটি বর্তমানে 'জামায়াতে ইসলামী সিংহল' নামে কাজ করছে।

আমেরিকা

সম্প্রতি কয়েক বছর যাবত আমেরিকায় মাওলানার সাহিত্য সমাদরে পঠিত হচ্ছে। ফিলাডেলফিয়ার মুসলমানদের 'মুসলিম লীগ' নামে সংগঠনটি দস্তুরমত মাওলানার সাহিত্য চেয়ে পাঠাচ্ছেন। অন্যান্য স্থান থেকেও মাওলানার সাহিত্যের জন্যে অর্ডার পাঠানো হয়।

বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, মাওলানা মওদূদীর চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গির উপর দস্তুরমত রিসার্চ চলছে কানাডার ম্যাকগীল বিশ্ববিদ্যালয়ে। এ কাজ করছেন ডঃ অধ্যাপক চার্লস জে এডমস। রকফেলার ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে এ কাজের জন্য তাঁকে ছ'হাজার ডলার ভাতা দেয়া হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধীনে এ কাজ চলছে। এ প্রতিষ্ঠানটির অধীনে মাওলানা মওদূদীর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি, জামায়াতে ইসলামীর সংগঠন ও কর্মসূচীর উপর রিসার্চ হচ্ছে।

অধ্যাপক এডমস পাকিস্তানে দু'বছর অবস্থান করে মাওলানা এবং তাঁর সহকর্মীদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। তিনি রীতিমত উর্দূ ভাষাও শিক্ষা করেন।

তাঁর গবেষণার জন্যে মাওলানার যাবতীয় গ্রন্থমালা ও তর্জুমানুল কোরআনের সমস্ত ফাইল সংগ্রহ করা হয়েছে।

কিছুকাল পূর্বে ডঃ এডমস করাচীর "ভয়েস অব ইসলাম" পত্রিকায় নিম্নোক্ত পত্রটি প্রেরণ করেন।

"গত বছর আমেরিকার একটি প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে আমাকে একটি প্রবন্ধ লিখতে বলা হয়। প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে সম্পর্ক-সম্বন্ধ স্থাপনে আগ্রহশীল। যা হোক, আমি আমার প্রবন্ধে মাওলানা মওদূদী সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করি। যে সমাবেশে আমি আমার প্রবন্ধ পাঠ করি, সেখানে রকফেলার ফাউন্ডেশনের জনৈক প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। প্রবন্ধ পাঠের পর তিনি আমার সঙ্গে দেখা করেন এবং মাওলানা মওদূদীর রাজনৈতিক চিন্তাধারার উপর গবেষণা করতে অনুরোধ করেন। এখন আমি এক বছর ধরে মাওলানা মওদূদী সম্পর্কে একখানা পুস্তক লিখব। এতে তাঁর ইসলামী রাষ্ট্রগঠন সম্পর্কে চিন্তাধারার বিশেষ আলোচনা করব।"

ম্যাকগীল বিশ্ববিদ্যালয়ের দৈনিক পত্রিকা 'ম্যাকগীল ডেইলী' নিম্নোক্ত মন্তব্য করেন ঃ

"আধুনিক বিশ্বের যে তিন-চারজন চিন্তাশীল ব্যক্তি একটি আধুনিক রাষ্ট্রকে ইসলামের প্রচলিত দৃষ্টিকোণের আলোকে স্থাপন করতে চেষ্টা করেছেন, মাওলানা মওদূদী তাঁদের মধ্যে অন্যতম। এদিক দিয়ে মাওলানার জীবন অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

মাওলানার সাহিত্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে জনৈক উচ্চশিক্ষিত নওমুসলিম যুবক পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর অনুসরণে The Islamic party of North America নামে ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে একটি ইসলামী দল গঠন করেন। দলটির কাজ অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক। দলটির দু'টি সংসদ আছে। প্রথম Central Guidance Council (কেন্দ্রীয় মজলিশে শূরা) এবং দ্বিতীয় General Council (সাধারণ সংসদ)। দলের পক্ষ থেকে ইসলামের মুখপত্র হিসাবে মাসিক আল ইসলাম(ইংরেজী) এবং পাক্ষিক New trend নামে দু'টি পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে।

এ দলের প্রতিষ্ঠাতা ও বর্তমান সভাপতি ইউসুফ মুজাফফরুদ্দীন হামিদ বলেন ঃ "ইসলামী বিপ্লবের প্রাণশক্তি উপলব্ধি করতে হলে ওস্তাদ মাওলানা মওদূদীর 'তাফহীমুল কোরআন' এবং সাইয়েদ কুতুব শহীদের 'ফী যিলালিল কোরআন' এক সাথে অধ্যয়ন করা একান্ত প্রয়োজন।

বলা বাহুল্য, মাওলানার সাহিত্যাবলী ইউসুফ মুজাফফরুদ্দীনকে ইসলামী আন্দোলনের এক অতি দুর্গম পথে টেনে এনেছে। তিনি বলেন ঃ

"আমরা আমাদের জামায়াতকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সংগঠিত করেছি। দলের বিভিন্ন বিভাগ আছে, যথা– শিক্ষা, রাজনীতি, বৈদেশিক বিভাগ, সাহিত্য প্রকাশনা ইত্যাদি। প্রত্যেক বিভাগে শিক্ষিত দায়িত্বশীল এবং উৎসর্গীকৃতপ্রাণ কর্মীগণ নিঃস্বার্থভাবে দায়িত্ব পালনে নিয়োজিত। কর্মীদের প্রশিক্ষণ এবং ভবিষ্যৎ বংশধরদের শিক্ষার প্রতিও আমরা বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকি। ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার জন্যে একটি বিশেষ সংস্থা কায়েম করা হয়েছে। প্রচলিত পাঠ্য তালিকার সাথে যাতে দ্বীন ইসলামের সঠিক জ্ঞান লাভ করা যায়, তার ব্যবস্থাও আমরা করেছি। আমরা আমেরিকার বাইশটি রাষ্ট্রে কাজ করি।"

উল্লেখযোগ্য যে, গত ১৯৬৯ সালে ইউসুফ মুজাফফরুদ্দিন পাকিস্তানে আগমন করে মাওলানার মেহমান হিসাবে এক সপ্তাহ তাঁর সান্নিধ্যে অতিবাহিত করেন। মাওলানার সঙ্গে ক'দিন ধরে দীর্ঘ আলাপ-আলোচনা হয় এবং মাওলানা তাঁর বিভিন্ন প্রশ্নের সন্তোষজনক জবাব দেন। মাওলানার গ্রন্থাবলী, জামায়াতে ইসলামীর গঠনতন্ত্র, কর্মপদ্ধতি ও সংগঠন তাঁকে এতোটা মুগ্ধ করে যে, তিনি জামায়াতের সদস্য হওয়ার বাসনা ব্যক্ত করেন। কিন্তু বিদেশী নাগরিকের জন্যে সদস্য পদ নিষিদ্ধ বলে তিনি দেশে প্রত্যাবর্তন করে ১৯৭১ সালে উক্ত ইসলামী পার্টি গঠন করেন।

ইংল্যান্ড

ইংল্যান্ডের কয়েকটি স্থান থেকে মাওলানার সাহিত্যের জন্যে অর্ডার পাওয়া যায়। মুসলিম ছাত্রদের মধ্যে এর খুবই চাহিদা। তারা মাওলানার কাছে বিভিন্ন প্রকার দ্বীনী জটিল প্রশ্ন করে থাকেন। লন্ডনে থাকাকালীন তাদেরকে যেসব অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়, মাওলানার নিকট সে সবের সমাধান তারা চেয়ে পাঠান।

মাওলানার বই পুস্তক পাঠ করার পর ইসলামী আদর্শে অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ হয়ে লন্ডনে অবস্থানকারী কিছু সংখ্যক মুসলমান সে দেশে ইসলামী তাবলীগের উদ্দেশ্যে 'ইউকে ইসলামিক মিশন' নামে এক ইসলাম প্রচার সংস্থা সম্প্রতি কায়েম করেছেন। লন্ডনে প্রবাসী মুসলমানদের ঐকান্তিক বাসনা, তাঁরা একবার মাওলানাকে তাঁদের মধ্যে দেখতে চান। এ উদ্দেশ্যে মাওলানাকে লন্ডনে আমন্ত্রণ জানিয়েও তাদের আশা পূর্ণ হয়নি। নানাবিধ অসুবিধার কারণে মাওলানার এ সফরের জন্যে সময় দেয়া সম্ভব হয়নি।

সত্তরের দশকে মাওলানার চিন্তাধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে লন্ডনের বাংলাভাষী মুসলমানগণ 'দাওয়াতুল ইসলাম' নামে একটি সংস্থা কায়েম করে ইসলামী দাওয়াত প্রসারের কাজ করে যাচ্ছেন। বিভিন্ন শহরে দাওয়াতুল ইসলামের শাখাও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

বিভিন্ন শহরে প্রাথমিক স্কুল কায়েমের মাধ্যমে বাংলাভাষীদের সন্তানগণকে ইসলামী শিক্ষাদানের ব্যবস্থা এ সংস্থাটির একটি প্রশংসনীয় কাজ।

লিস্টার শহরে মাওলানার সাহিত্য ও চিন্তাধারাকে কেন্দ্র করে 'ইসলামিক ফাউন্ডেশন' নামে একটি ইসলামী গবেষণাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিভিন্ন দেশের ইসলামী চিন্তাবিদ ও রিসার্চ স্কলার ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে পূর্ণোদ্যমে তাদের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন।

জার্মানী

জার্মানীতেও মাওলানা মওদূদীর বাণী ও মিশনের প্রভাব ভালোভাবে অনুভূত হচ্ছে। হেমবার্গের ইসলামী কমিউনিটির সহ-সভাপতি জনাব এরিক আবদুর রহমান রুসলার মাওলানার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে তাঁর বই পুস্তক চেয়ে পাঠান।

তিনি মাওলানাকে জানান যে, সেখানকার লোকেরা বর্তমান চার প্রকারের ব্যাধিতে ভুগছে, যথা– মানসিক অশান্তি, পূর্ণ নৈরাশ্য, ত্রাস এবং চিন্তা রাজ্যে চরম অরাজকতা।

মাওলানা তাঁর কাছে ইংরেজী ভাষায় অনূদিত তাঁর সবগুলি বই পাঠিয়ে দেন। জনাব আবদুর রহমানের প্রচেষ্টায় জার্মানীতে এখন বেশ ইসলামী দাওয়াতের কাজ চলছে।

জেনেভায় প্রতিষ্ঠিত ইসলামিক সেন্টার থেকেও ইসলামী তাবলীগের কাজ চলছে এবং সেখানেও মাওলানার বই অনুবাদ করা হয়েছে। কতিপয় নও-মুসলিম জার্মান মনীষীও মাওলানার গ্রন্থ অনুবাদের কাজে হাত দিয়েছেন।

মারিশাস

মাওলানার জনৈক সহকর্মী মারিশাসে অবস্থান করে দাওয়াতের কাজ চালাচ্ছেন। তিনি সেখানে একটি স্কুলে হেড মাস্টারের পদে কাজ করেন, একটি মসজিদে খতিবেরও কাজ করেন, কোরআন-হাদীসের দারস দেন এবং একটি পত্রিকা সম্পাদনা করেন। তাঁর কাজের অগ্রগতি আশাব্যঞ্জক।

সিভিল কোরিয়া

এখানকার নওজোয়ান দল আগ্রহ সহকারে মাওলানার সাহিত্য অধ্যয়ন করছেন।

উপরন্তু বার্মা, লাওস. ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ব্রিটিশ গিনি, দক্ষিণ আমেরিকা, প্রিটোরিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, কানু, নাইজেরিয়া, মরক্কো, জোহান্সবার্গ প্রভৃতি স্থানে উর্দূ, আরবী ও ইংরেজী ভাষায় মাওলানার সাহিত্য বেশ চলছে।

প্রিটোরিয়ার ইসলামিক সোসাইটি মাওলানার সাহিত্য ইংরেজীতে অনুবাদ করার অনুমতি লাভ করে।

মারিশাস সরকার তাঁদের অধীনে স্কুলগুলোতে মাওলানার কিছু বই পাঠ্য হিসাবে মনোনীত করেছে।

আরব দেশগুলোতে মাওলানার সাহিত্য অতি সমাদর লাভ করেছে তা আগেই বলা হয়েছে। তাঁরা মাওলানার সাহিত্য আরবী, ইংরেজী ও অন্যান্য ইউরোপীয় ভাষায় অনুবাদ করার পরিকল্পনা করেছেন।

আজ পর্যন্ত প্রায় চল্লিশটি ভাষায় মাওলানার সাহিত্য অনূদিত হয়েছে।

জাপান

এশিয়ার অমুসলিম জাতিসমূহের মধ্যে জাপান জাতি ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণের জন্যে আকুল আগ্রহ প্রকাশ করছে। আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদ ও আধিপত্যবাদকে তারা ঘৃণার চোখে দেখে। খ্রিষ্টধর্মের প্রতি তাদের কণামাত্র আকর্ষণ নেই। শিন্টু ধর্মের মোহ তাদের কেটে গেছে। বৈষয়িক দিক দিয়ে তারা খুবই সচ্ছল। কিন্তু আধ্যাত্মিক দিক তাদেরকে অধীর ও অতিষ্ঠ করে তুলছে। আজ পর্যন্ত পঁচিশ হাজার জাপানী ইসলাম গ্রহণ করেছে।

বলা বাহুল্য, এ সব মাওলানার সাহিত্যেরই প্রভাব। বিগত ষাটের দশকে পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর জনৈক প্রতিভাসম্পন্ন কর্মী ইসলামী দাওয়াত সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে জাপান গমন করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় টোকিওতে একটি ইসলামী সেন্টার প্রতিষ্ঠিত হয়। দাওয়াতী কাজ এবং মাওলানার সাহিত্যের

জাপানী ভাষায় অনুবাদ কার্য শুরু হয়। আজকাল জাপান জাতির মধ্যে যে ইসলামী প্রাণ- চাঞ্চল্য দেখা যাচ্ছে, তা মাওলানার হৃদয়স্পর্শী সাহিত্য ও ইসলামী সেন্টারের প্রচেষ্টারই ফল। জাপানী ভাষায় মাওলানার তাফহীমুল কোরআনের অনুবাদও চলছে। হুসাইন খান নামক জনৈক পাকিস্তানী এ সেন্টারের পরিচালক।

সুদান

সুদানে বিগত তিন দশক থেকে ইসলাম ও কুফর, হক ও বাতিলের একটানা সংগ্রাম চলে আসছে। সেখানকার ইসলামী আন্দোলন বিভিন্ন ঘাত প্রতিঘাত এবং উত্থান ও পতনের ভেতর দিয়ে এখনও একটি উল্লেখযোগ্য শক্তি হিসাবে টিকে আছে।

উনিশ শ' পঞ্চাশ সালে সুদানের খার্তুম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ সর্বপ্রথম কমিউনিস্ট আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং অধিকাংশ শিক্ষকও তাতে যোগদান করেন। কিন্তু 'ইখওয়ানুল মুসলিমুন' ও মাওলানার সাহিত্যাবলী ছাত্রদের মধ্যে এক নতুন চেতনার সৃষ্টি করে এবং কমিউনিজমের বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী ফ্রন্ট গঠন করে। ১৯৫৬ সালে সুদান স্বাধীনতা লাভ করে এবং সারাদেশে ইসলামী আন্দোলন ছড়িয়ে পড়লে জনগণ ইসলামী শাসনতন্ত্রের দাবিতে মুখর হয়ে উঠে। ১৯৬৭ সালে ইসলামী শাসনতন্ত্র পাস হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে বৈদেশিক চক্রান্তে দেশে সামরিক বিপ্লব হয় এবং সর্বত্র রাশিয়ার প্রভাব বিস্তার লাভ করতে থাকে। ইসলামী আন্দোলনের নেতা ও কর্মীদের উপর নির্যাতন নিষ্পেষণ শুরু হয়।

কিন্তু এতদসত্ত্বেও ইসলামী আন্দোলনের প্রভাব জনগণের মন-মস্তিষ্ক থেকে মুছে ফেলা সম্ভব হয়নি। আন্দোলনের অন্যতম নেতা ডঃ হাসান তোরাবী দীর্ঘদিন কারাভোগ করার পর মুক্তিলাভ করেছেন এবং ইসলামী আন্দোলন ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে উঠছে।*

মাওলানা মওদূদী একটি আন্তর্জাতিক মিশনের আহ্বায়ক। তাঁর কর্মসূচী একটি ব্যক্তির সংস্কার সংশোধন থেকে একটি রাষ্ট্র পর্যন্ত এবং রাষ্ট্র থেকে গোটা মানবজাতির সংস্কার, মুক্তি ও মঙ্গলের জন্যে। তাই তাঁর উদাত্ত বাণী আন্তর্জাতিক-বিশ্বব্যাপী।

---

* সুদানে এখন ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠিত। তাঁরা সেখানে ক্রমশ শরীয়তের আইন জারির কাজ শুরু করেছেন। যুব সমাজ ইসলামের জন্যে জীবন দিতে প্রস্তুত। – গ্রন্থকার

আধুনিক জগতে যে সব ব্যবস্থা মানব সমাজে চালু আছে, সে সবেরতুলনায় মাওলানা মওদূদী ইসলামকে একটা সার্বিক জীবন ব্যবস্থা হিসাবে প্রতীয়মান করেছেন। অন্যান্য যে কোন ব্যবস্থা থেকে ইসলামকে শ্রেষ্ঠতর করেও প্রমাণ করেছেন। তাঁর চিন্তাধারা বিশ্বের বহু অমুসলিম দেশেও বেশ প্রভাব বিস্তার করছে। সে জন্যে তাঁর গ্রন্থাদির সে সব দেশে অনুবাদ শুরু হয়েছে। এ নিয়ে চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ গভীর গবেষণাও শুরু করেছেন।

দ্বিতীয়ত, তিনি রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে ইসলামের নীতিভিত্তিক করে গড়ে তোলার জন্যে ইসলামী শাসনতন্ত্রের একটা পূর্ণাঙ্গ চিত্র অঙ্কিত করেছেন। তাঁর অমূল্য গ্রন্থ 'Islamic Law and Constitution' দেশ-বিদেশের সুধী সমাজের দ্বারা উচ্চ প্রশংসিত হয়েছে। একটা পূর্ণ ইসলামী শাসনতন্ত্রের জন্যে পাকিস্তানে তিনি আট বছরকাল গণআন্দোলন চালিয়েছেন এবং বহু জটিল ও খুঁটিনাটি বিষয়ের উপরে আলোকপাত করেছেন। বহু অভিযোগ ও অমূলক সন্দেহ-ভয়-ভীতির সন্তোষজনক জবাব দিয়েছেন। ফলে গণমনে ইসলামী শাসনতন্ত্র সম্পর্কে পূর্ণ অনুভূতির সঞ্চার হয়েছে। তার ফল এই হয়েছে যে, ইসলামী শাসনতন্ত্র বললেই তার অর্থ দাঁড়াবে এমন এক ব্যবস্থা যা হবে কোরআন ও সুন্নাহ্ ভিত্তিক। ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের প্রতিধ্বনি আমরা শুনতে পাই অন্যান্য মুসলিম দেশেও, যেখানে চেষ্টা চলছে এটি কায়েম করার জন্যে। বর্তমান জগতে যে সকল মুসলিম মনীষীকে ইসলামী আইন-কানুন সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ বলা হয়, তাঁদের মধ্যে মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর স্থান সকলের উচ্চে।

তাঁর ব্যক্তিত্ব আজ আন্তর্জাতিক। বিশেষ করে ইসলামী জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তাশীল তিনি। উপরে তাঁর মধ্যপ্রাচ্য ভ্রমণের যে সংক্ষিপ্ত বিবরণী দেয়া হয়েছে, তার দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামী জগতের আশার আলোক বহন করছেন তিনি এবং তাঁর আধুনিক চিন্তাধারা মুসলিম জগতের এক বিরাট সম্পদ।

মাওলানা মওদূদী ও তাসাওউফ

আমাদের দেশে এখনও বেশ কিছু লোক আছেন যাঁরা মাওলানা মওদূদীকে এই বলে সমালোচনা ও বিরোধিতা করেন যে, তিনি তাসাওউফ বিরোধী।

এঁদের মধ্যে কিছু লোক মাওলানার প্রতি অহেতুক বিদ্বেষ পোষণ করে উক্ত সমালোচনার অস্ত্রে তাঁকে ঘায়েল করতে চান, আর কিছু লোক নেহায়েত অজ্ঞতার কারণে এ সব বলে থাকেন।

মাওলানা মওদূদী তাঁর সারা জীবন ইকামতে দ্বীনের সংগ্রামের জন্য উৎসর্গ করে গেছেন। এ পথে তাঁকে কত নির্যাতন-নিষ্পেষণ যে ভোগ করতে হয়েছে, তার কোন শেষ নেই। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তিনি মুহূর্তের জন্যেও বাতিলের সামনে নতি স্বীকার করেননি। তাসাওউফ বিরোধী বলে মাওলানার যাঁরা বিরোধিতা করেন, তাঁদের মধ্যে ইকামাতে দ্বীনের সংগ্রামী মনোভাব কোন দিনই দেখতে পাওয়া যায়নি। বরঞ্চ পীর-মুরীদীর ঠাট জমিয়ে বাতিল শক্তির সাথেই তাঁরা হাত মিলিয়েছেন। তাঁদের অনেকেই আবার একদিকে যেমন 'তাসাওউফ, মা'রিফাত' বা 'ইলমে বাতিনের' দীক্ষাগুরু হিসাবে নিজেদেরকে জাহির করেন, অপরদিকে এমন রাজনৈতিক দলের সমর্থক ও কর্মী হিসাবে কাজ করেন, যার সকল চেষ্টা-চরিত্রই ইসলামের বিপক্ষে ব্যয়িত হয়। এটাকে তাঁরা দূষণীয় মনে করেন না এ জন্যে যে, তাঁদের মতে রাজনীতি ও ইসলাম দু'টি পৃথক জিনিস। এ থেকে বুঝা যায়, ইসলাম সম্পর্কে মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গিই তাঁদের ভ্রান্ত। একজন মুসলমান তো তার জীবনের সর্বক্ষেত্রে সকল সময় একমাত্র আল্লাহ্‌রই নির্দেশ মেনে চলবে। তার পক্ষে এ ধারণা করাও সম্ভব নয় যে, মসজিদের চার দেয়ালের মধ্যে সে এক খোদার নির্দেশ মানবে এবং রাজনীতির ক্ষেত্রে, ব্যবসা-বাণিজ্যে, শিল্পকলায় নির্দেশ মেনে চলবে অন্য খোদার।

পীরানে পীর হযরত আবদুল কাদির জিলানী (রঃ) বলেছেন ঃ তাসাওউফ মুসাফাত (مصافات) শব্দ থেকে উদ্ভূত। তার অর্থ হলো মন-মস্তিষ্ককে যাবতীয় ইসলাম বিরোধী মতবাদ, ভাবধারা, চিন্তাধারা থেকে মুক্ত করা। আল্লাহ্ ব্যতীত সকল কিছুর প্রেম-ভালবাসা, ভয়-ভীতি, দাসত্ব, আনুগত্য

থেকে নিজকে পবিত্র করা। প্রবৃত্তির পূজা, হিংসা-বিদ্বেষ, পার্থিব লোভ-লালসা, পরনিন্দা, পরচর্চা, গর্ব-অহঙ্কার প্রভৃতি থেকে নিজকে বাঁচিয়ে রাখাও তাসাওউফের উদ্দেশ্য। সমালোচক মহাত্মাগণ এ সব থেকে নিজেদেরকে কতখানি উর্ধ্বে রাখতে পেরেছেন, সে সম্পর্কে তাঁদের চিন্তা করে দেখা উচিত।

তাসাওউফ সম্পর্কে মাওলানা মওদূদী স্পষ্ট ভাষায় নিম্নোক্ত উক্তি করেছেন ঃ তাসাওউফ কোন একটি মাত্র বস্তুর নাম নয়। বরঞ্চ বিভিন্ন বস্তু বা বিষয় এই নামে অভিহিত হয়েছে। আমরা যে তাসাওউফকে মানি তা এক বস্তু, আর যে তাসাওউফকে মানি না, তা দ্বিতীয় এক বস্তু। যে তাসাওউফের আমরা সংস্কার সংশোধন চাই, তা আবার তৃতীয় আর এক বস্তু।

এক প্রকার তাসাওউফ হচ্ছে, যা ইসলামের প্রাথমিক যুগের সূফী। যথা- ফুযাইল বিন ইয়ায, ইবরাহীম বিন আদহাম, মারূফ করখী (রহঃ) প্রভৃতির মধ্যে ছিল। এর কোন পৃথক দর্শন ছিল না এবং এর কোন পৃথক কর্মপদ্ধতিও ছিল না। তাঁদের চিন্তাধারা ও কাজকর্ম এমন ছিল, যার উৎস ছিল কোরআন ও সুন্নাহ এবং এ সবের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল তাই, যা ছিল ইসলামের উদ্দেশ্য। অর্থাৎ আল্লাহর জন্যে ঐকান্তিকতা ও নিষ্ঠা।

وَمَآ اُمِرُوْٓا اِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۵ حُنَفَآءَ

তাদেরকে একমাত্র এ জন্যে আদেশ করা হয়েছে যে, তারা আল্লাহর দাসত্ব করবে এবং অন্য সকল দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে দ্বীনের প্রতি একনিষ্ঠ হয়ে থাকবে। - (বাইয়্যেনাহ – ৫)

এ তাসাওউফের সত্যতা আমরা স্বীকার করি। শুধু তাই নয়, একে আমরা পুনরুজ্জীবিত ও প্রচারিত করতে চাই।

দ্বিতীয় প্রকার তাসাওউফ এই যে, এর মধ্যে গ্রীসীয় আধ্যাত্মবাদ, প্লেটোর কাম-গন্ধহীন মতবাদ, যরদস্‌তী ও বেদান্ত দর্শনের সংমিশ্রণ হয়ে পড়েছে। এর মধ্যে খ্রিষ্টিয় পুরোহিত এবং হিন্দু সন্ন্যাসীদের পদ্ধতি শামিল করা হয়েছে। এর মধ্যে মুশরিকী ধারণা ও কার্যকলাপ অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে। শরীয়ত, তরীকত, মা'রিফত পৃথক পৃথক হয়ে পড়েছে। এমন কি একটি অপরটি থেকে সংস্রবহীন ও পরিপূর্ণ বিপরীত হয়ে পড়েছে। দুনিয়াতে আল্লাহ্‌র খলীফা হিসাবে দায়িত্ব পালনের জন্যে মানুষকে তৈরি করার পরিবর্তে তাকে সম্পূর্ণ অন্য কাজের জন্যে তৈরি করা হয়। এ তাসাওউফের আমরা খণ্ডন করতে চাই। আমাদের

মতে খোদার দ্বীন কায়েম করার জন্যে এ তাসাওউফের মূলোৎপাটন ততখানি আবশ্যক, যতখানি আধুনিক জাহিলিয়াতের মূলোৎপাটন আবশ্যক।

এ দু'প্রকারের তাসাওউফ ব্যতীতও আর এক প্রকার তাসাওউফ আছে যার মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকারের বৈশিষ্টগুলো মিশ্রিত হয়ে আছে বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। এ তাসাওউফের পদ্ধতি লিপিবদ্ধ করেছেন এমন বিভিন্ন বুযুর্গানে দ্বীন, যাঁরা বিজ্ঞ ছিলেন এবং যাঁদের নিয়তও ছিল সৎ। কিন্তু তাঁরা নিজেদের সময়ের বৈশিষ্ট্য ও অতীত যুগের প্রভাব থেকে মুক্ত ছিলেন না। ইসলামের সঠিক তাসাওউফ বুঝতে এবং তার ক্রিয়া পদ্ধতিকে জাহিলী তাসাওউফের কলুষ থেকে পবিত্র করার পূর্ণ চেষ্টা তাঁরা করেছেন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গিতে কিছু না কিছু জাহিলী তাসাওউফ দর্শনের প্রভাব এবং তাদের কার্য পদ্ধতিতে কিছু না কিছু বাইরের কার্য পদ্ধতির প্রভাব ছিল। এসব সম্পর্কে তাঁদের এই ধারণা ছিল যে, এগুলো কোরআন ও সুন্নাহর শিক্ষার পরিপন্থী নয়। অথবা নিতান্ত পক্ষে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের দ্বারা সেগুলোকে অপরিপন্থী মনে করা যেতো। এতদ্ব্যতীত এ তাসাওউফের উদ্দেশ্য ও পরিণাম ইসলামের উদ্দেশ্য ও বাঞ্ছিত পরিণাম থেকে কমবেশী পৃথক। সুস্পষ্টরূপে প্রতিটি মানুষকে নৈতিক দায়িত্ব পালনের জন্যে তৈরি করা এর উদ্দেশ্য নয় এবং কোরআন لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ.

অর্থ ঃ যেন তোমরা মানুষের জন্য সাক্ষী হও। - (বাকারা - ১৪৩)

শব্দগুলোর দ্বারা যা নির্দেশ করেছে তা শিক্ষা দেয়াও এর উদ্দেশ্য নয। এমন কি এ তাসাওউফের পরিণামও এমন হতে পারেনি, যার দ্বারা এমন লোক তৈরি হতে পারতো যারা দ্বীনের পরিপূর্ণ ধারণা হৃদয়ঙ্গম করতে পারত, ইকামাতে দ্বীনের চিন্তায় অধীর হতো এবং এ কাজের যোগ্য হতে পারত। এই তৃতীয় প্রকারের তাসাওউফকে আমরা সম্পূর্ণরূপে মানি না এবং সম্পূর্ণরূপে একে খণ্ডনও করতে চাই না। বরং এর অনুসারী ও সমর্থকবৃন্দের কাছে আমাদের আবেদন এই যে, তাঁরা যেন অনুগ্রহ করে বড় বড় ব্যক্তিত্বের প্রতি বিশ্বাস-শ্রদ্ধা অক্ষুণ্ন রেখে কোরআন ও সুন্নাহর আলোকে এই তাসাওউফের প্রতি সমালোচনার দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন এবং তাকে সংশোধন করার চেষ্টা করেন। উপরন্তু যদি কোন ব্যক্তি এ তাসাওউফের কোন বিষয় কোরআন ও সুন্নাহর বিপরীত দেখে তার সমালোচনা করে, তা হলে তার অভিমত মেনে নেয়া হোক বা না হোক, অন্তত তার সমালোচনার অধিকার অস্বীকার করে তাকে অযথা যেন তিরস্কার করা না হয়।

মাওলানা কি তাসাওউফ বিরোধী ছিলেন?

এ সম্পর্কে কিছু কথা বলেছেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক সাংবাদিক আবেদ নিযামী। তিনি বলেন ঃ

বিগত পঞ্চাশ সালের কথা। মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী লাহোর হোস্টেলের পেছনে (ফতেহ মুহাম্মদ রোড) একটি মসজিদে তখন প্রতি রোববার বেলা ন'টা থেকে দারসে কোরআন পেশ করতেন। সেখানে বহু লোক সমাগম হতো। আমার বয়স তখন পনেরো-ষোল। আমার পারিবারিক পরিবেশ ছিল একেবারে তাসাওউফ প্রভাবিত। শুনতাম মাওলানা মওদূদী তাসাওউফ ও সূফীদের বিরোধী ছিলেন। এমন লোকের প্রতি আমার কোন আকর্ষণ-অনুরাগ মোটেই থাকার কথা নয়।

একদিন কি মনে করে তাঁর দারসে হাযির হলাম। এক টুকরা কাগজে বাড়ি থেকে এ প্রশ্ন লিখে নিয়ে গিয়েছিলাম– দয়া করে বলুন, আপনি তাসাওউফের বিরোধিতা করেন কেন?

কাগজের টুকরোটি কয়েক জনের হাত বদল হয়ে মাওলানার হাতে গিয়ে পৌঁছল। মাওলানা জওয়াবে বলেন, আসলে এ আমার উপরে একটা বিরাট অপবাদ যে, আমি তাসাওউফ বিরোধী। আমি আমার বিভিন্ন প্রবন্ধে বারবার এ কথা বলেছি যে, আমার তাসাওউফের অর্থ হলো আত্মশুদ্ধি এবং এ হলো দ্বীনের রূহ বা প্রাণ শক্তি। কোরআন পাকে একেই বলা হয়েছে 'তাযকিয়া' এবং 'হিকমত'। হাদীসে এর নাম দেয়া হয়েছে 'ইহসান'। এখন যে জিনিস কোরআন ও হাদীস থেকে প্রমাণিত, তার বিরোধিতা একজন মুসলমান কিভাবে করতে পারে? অবশ্য এমন তাসাওউফ আমি কিছুতেই সমর্থন করি না, ইসলামী শরীয়তের সাথে যার কোন সম্পর্ক নেই। ইসলামের সূফীগণও এ ধরনের তাসাওউফের বিরোধিতা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে খাঁটি নিয়ত এবং পরিপূর্ণ মহব্বতের সাথে রাসূলের 'উসওয়ায়ে হাসানা'র অনুসরণ করার নামই হলো 'তাসাওউফ'।

মাওলানার এ সুস্পষ্ট জওয়াবে আমি অনুভব করলাম যে, সহজ ও সরল ভাষায় তাঁর তাসাওউফের ব্যাখ্যা আমার মনের উপর বিরাট প্রভাব বিস্তার করল।

তারপর থেকে তার দারসে হাযির হতে থাকলাম। ৫/এ যায়লদার পার্কে তাঁর বাড়ি সংলগ্ন উঠোনটিতে আসরের পর যে বৈঠক হতো তাতেও হাযির হতাম। একদিন মাওলানাকে বললাম, মাওলানা স্বপ্নে দেখেছি যে, আপনি আমাকে 'যবতে বেলাদাত' (জন্ম নিয়ন্ত্রণ) বইখানি দিয়ে পড়তে বলছেন।

মাওলানা বললেন– বইখানি পড়েছেন?

বললাম– জি হ্যাঁ।

মাওলানা বললেন– তাহলে বিয়ের পর তার উপরে আমল করতে থাকবেন।

সাতষট্টিতে বদলী হয়ে রাওয়ালপিন্ডি গেলাম। একদিন সন্ধ্যায় ছ'সাত মাসের রুগ্ন শিশুকে নিয়ে মারী রোডে অবস্থিত হামদার্দ দাওয়াখানায় গেলাম। সড়ক পার হয়ে দাওয়াখানায় যাওয়ার আগেই দেখলাম চাঁদনীচকে মাগরিব পড়ার পর মাওলানা বেরিয়ে আসছেন। এগিয়ে গিয়ে সালাম করলাম। বললেন, কি ব্যাপার, এখানে যে? বললাম, মাওলানা, বদলী হয়ে এখানে এসেছি। বাচ্চাটির ভয়ানক অসুখ, তাই দাওয়া নিতে এসেছি।

মাওলানা বাচ্চাকে আদর করলেন। তারপর বড্ডো স্নেহের সাথে কিছু পড়ে বাচ্চার উপর ফুঁক দিলেন।

একটু রসিকতা করে বললাম, মাওলানা, ঝাড়-ফুঁকের কাজও করেন নাকি?

মাওলানা বললেন, জি হাঁ, করি বই কি। আপনার মতো সূফী সায়েবরা তো খামোখাই আমাকে 'ওহাবী' বলে প্রচার করেন।

যা হোক ওখান থেকে সোজা ঘরে ফিরে এলাম। বিবি বললেন, দাওয়াই কোথায়? তাঁকে সব ঘটনা বলে শুনিয়ে দিলাম, এখন ইনশাআল্লাহ দাওয়াই ছাড়াই সে সেরে উঠবে এবং সত্যি হলোও তাই।

তারপর থেকে, মাওলানার সাথে আমার সম্পর্ক গভীর থেকে গভীরতর হতে থাকে।

সত্তরের একটি ঘটনা। ৫/এ যায়লদার পার্কে বিকেলের আসর চলছে। মাওলানা এক ব্যক্তির প্রশ্নের জওয়াব দিচ্ছেন। এমন সময় একটি যুবক একটা ধারালো ছোরা হাতে দাঁড়ালো এবং মাওলানার সামনে টেবিলের উপর তা রেখে দিয়ে কাঁদো কাঁদো স্বরে মাওলানার কাছে মাফ চাইতে লাগল। জানা গেল,

যুবকটি লায়ালপুরে (বর্তমান ফয়সালাবাদ) এক মৌলভীর মুখে মাওলানার বিরুদ্ধে ভয়ানক উস্কানিমূলক বক্তৃতা শুনে মাওলানাকে হত্যা করতে এসেছিল। মাওলানার নূরানী চেহারা দেখে এবং তাঁর মনোমুগ্ধকর আলাপ-আলোচনা শুনে সে এতোটা আকৃষ্ট হয়ে পড়ে যে, উল্টো সেই মৌলভীকেই গালাগালি করতে লাগলো।

আসরের সকলেই হতবাক, বিস্ময়-বিস্ফারিত। মাওলানা তাকে খুশী মনে মাফ করে দেন। যুবকটি অনুতপ্ত ও পরিবর্তিত মন নিয়ে আসর ত্যাগ করে।

একবার একজন জিজ্ঞেস করল, মাওলানা, রোজ হাশরে যখন আপনি মালিকের দরবারে দাঁড়াবেন, তখন আপনার কোন্ কৃতিত্বপূর্ণ ভূমিকা সেখানে পেশ করবেন?

মাওলানা কম্পিত কণ্ঠে বললেন, কৃতিত্বপূর্ণ ভূমিকা? না-না, আমি তো সে দিন তাঁর খাস রহমতের আশায় বুক বেঁধে থাকব। তিনি তাঁর অশেষ রহমতে আমার কোন আমল যদি কবুল করে নেন, তাহলে সেটা হবে তাঁর বিশেষ মেহেরবানী।

এই বিকালের আসরে একদিন একটি যুবক খুব উত্তেজিত হয়ে বলে, মাওলানা! কিছু লোক আপনার বিরুদ্ধে এমন সব অপবাদ রটায় যে শরীর রোমাঞ্চিত হয়। এমন কি কিছু মৌলভী মসজিদের মেম্বর-মেহরাব থেকে আপনার পরিবারের লোকদেরও অপবাদ করে। এ সব লোকের বিরুদ্ধে আপনি আদালতে মানহানির মামলা করেন না কেন?

মাওলানা জওয়াবে বলেন, নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি এমন এক উচ্চ আদালতে তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে রেখেছি যে, তারা কিছুতেই বাঁচতে পারবে না। সে দিন খুব বেশী দূরে নয়, যে দিন তাদের নামায-রোযা আমার ভাগেই এসে পড়বে।

আধ্যাত্মিক সংস্কার-সংশোধন

মাওলানা মওদূদী আধ্যাত্মিক সংস্কার সম্পর্কে তর্জুমানুল কোরআনে নিম্নোক্ত মন্তব্য করেন ঃ

'.... এ কথা ভালো করে বুঝে রাখুন যে, আধ্যাত্মিক সংস্কার-সংশোধনের উপরে বাহ্যিক সংশোধনের কিছুতেই প্রাধান্য দেয়া চলবে না। সর্বপ্রথম নিজেকে কোরআনের কষ্টিপাথরে প্রকৃত মুসলমান বানানোর চেষ্টা করুন। অতঃপর বাইরের পরিবর্তন ঠিক তত পরিমাণে করতে থাকুন, যত পরিমাণে অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন হতে থাকবে। নতুবা আপনি যদি নিছক নিয়ম-পদ্ধতি সম্মুখে রেখে বাহ্যিক দিকটাকে রূপ দান করেন যা হাদীস ও ফিকাহ্ গ্রন্থে একটি মুত্তাকী লোকের বাহ্যিক চিত্র হিসাবে পেশ করা হয়েছে, অথচ প্রকৃত তাকওয়া সৃষ্টি হয়নি, তাহলে আপনার দৃষ্টান্ত এমন একটি তাম্র মুদ্রার ন্যায় হবে যার উপরে স্বর্ণমুদ্রার ছাপ দেয়া হয়েছে। স্বর্ণমুদ্রার ছাপ দেওয়া কঠিন কাজ নয়। যেমন ইচ্ছা তেমন সস্তা ধাতুর উপরে অতি সহজেই এ কাজ করতে পারেন। কিন্তু খাঁটি মুদ্রা সরবরাহ করা কঠিন কাজ। বহুদিন ধরে রাসায়নিকের কাজ করার ফলে এ বস্তু অর্জন করা যায়। দুর্ভাগ্যবশত আমাদের এ দেশে কিছুকাল যাবত বাহ্যিক দিকের উপরে অসাধারণ গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। তার ফল এই যে, স্বর্ণমুদ্রার ছাপসহ তামা, লোহা, সীসা এবং সর্বপ্রকার নিকৃষ্ট ধাতুমুদ্রার প্রচলন হয়ে পড়েছে। ব্যবহারিক জগতের বাজার মহাজনী কারবারে এতোটা তৎপর যে, বেশী দিন এ জাল মুদ্রার প্রবঞ্চনা চলবে না। কিছুকাল ধরে জাল স্বর্ণ মুদ্রা চলেছে, কিন্তু এখন বাজারে তার কানাকড়িও দাম নেই। অতএব আমাদের মধ্যে যে ধরনের দ্বীনদারী সৃষ্টি করতে হবে, তার দাবি এই যে, স্বর্ণমুদ্রার ছাপ লাগানোর পরিবর্তে আমাদের খাঁটি স্বর্ণমুদ্রা হওয়ার চেষ্টা করতে হবে।

বহির্জগতে খোদাদ্রোহীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার পরিবর্তে সেই বিদ্রোহীকে বশ করুন যে আপনার ভিতরে বিরাজমান থেকে সর্বদা খোদার আইন ও তাঁর মর্জির বিরুদ্ধে চলবার জন্যে পীড়াপীড়ি করে। এ বিদ্রোহী আপনার মধ্যে প্রতিপালিত হয়ে যদি আপনার উপর এতখানি প্রভাবশীল হয় যে, আল্লাহর সন্তুষ্টির বিরুদ্ধে তার দাবি মানাতে সক্ষম হয়, তাহলে বহিঃশত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা অর্থহীন হয়ে পড়বে। এর দৃষ্টান্ত ঠিক এমন যে, ঘরের মধ্যে মদের বোতল পড়ে আছে, আর যুদ্ধ চলছে বাইরের মদ্যপায়ীদের সঙ্গে। এই বৈষম্য আমাদের আন্দোলনের জন্যে অতি মারাত্মক। প্রথমে নিজে খোদার সামনে মাথা নত করুন। অতঃপর অপরের নিকটে আনুগত্যের দাবি করুন।'

আল্লাহর সাথে সম্পর্ক

মাওলানা মওদূদী তাঁর সহকর্মীদের উদ্দেশ্যে যে উপদেশ বাণী দান করেন, তার মধ্যে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপন সম্পর্কে তিনি নিম্নরূপ উপদেশ দেন–

আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপনের তাৎপর্য সম্পর্কে কালামে পাকের বর্ণনা অনুযায়ী দেখা যায় যে, মানুষের জীবন, মরণ, ইবাদত, বন্দেগী, কোরবানী ইত্যাদি সব কিছু একমাত্র আল্লাহর জন্যেই থাকবে সীমাবদ্ধ।

اِنَّ صَلوَاتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِى لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

"পূর্ণ একাগ্রতার সাথে নিজের জীবন ব্যবস্থা বা দ্বীনকে আল্লাহ তায়ালার জন্যেই নির্দিষ্ট করে একমাত্র তাঁরই আনুগত্য করবে।" - (আনয়াম - ১৬২)

وَمَآ اُمِرُوْا اِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ حُنَفَآءَ.

হযরত রসূলে করীম (সাঃ) একাধিকবার এ বিষয়ে এমনভাবে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছেন যে, এর অর্থ, তাৎপর্য ইত্যাদি কোনটাই অস্পষ্ট রয়ে যায়নি।

হুযুর আকরাম (সাঃ)-এর বাণীসমূহ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপনের অর্থ خَشْيَةَ اللّٰهِ فِىْ السِّرِّ وَالْعَلاَنِيَةِ. গোপনে কিংবা প্রকাশ্যে সকল কাজেই আল্লাহকে ভয় করে চলা - (আল হাদীস)। এতদ্ব্যতীত নিজের সহায় সঙ্গতির তুলনায় আল্লাহর মহান শক্তির উপরেই অধিক ভরসা করা।

اَنْ تَكُوْنَ بِمَا فِىْ يَدِى اللّٰهِ اُولٰئِكَ بِمَا فِىْ يَدِكَ.

এবং আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্যে লোকের বিরাগভাজন হওয়া

مَنْ اِلْتَمَسَ رِضَى اللّٰهِ بِسَخَطِ النَّاسِ.

(আল হাদীস)

এর সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থা হচ্ছে লোকের সন্তুষ্টি লাভের জন্যে আল্লাহ তায়ালার অসন্তোষ অর্জন করা।

পরে যখন এ সংযোগ-সম্পর্ক ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়ে এমন অবস্থায় উপনীত হবে, যখন কারো সাথে বন্ধুত্ব, শত্রুতা, লেন-দেন ইত্যাদি সবকিছুই একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যেই সম্পন্ন হবে, নিজের ইচ্ছা, প্রবণতা, আগ্রহ অথবা ঘৃণা ইত্যাদির প্রভাব বিন্দু পরিমাণও থাকবে না, তখনই বুঝতে হবে যে, আল্লাহর সাথে সম্পর্ক পরিপূর্ণ হয়েছে।

مَنْ اَحَبَّ لِلّٰهِ وَاَبْغَضَ لِلّٰهِ وَاَعْطَى لِلّٰهِ وَمَنَعَ لِلّٰهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الاِيْمَانَ.

যে ব্যক্তি কেবল আল্লাহরই জন্যে ভালবাসলো, আল্লাহরই জন্যে শত্রুতা করলো, আল্লাহরই জন্যে কাউকে কিছু দিল এবং আল্লাহরই জন্যে কাউকে কিছু দেয়া বন্ধ করলো, সে তার ঈমান পূর্ণ করলো। (আবু দাউদ)

আল্লাহ্ তায়ালার সাথে সম্পর্ক নিরূপণের উপায়

মাওলানা মওদূদী তাঁর উপদেশ বাণীতে একথাও সুস্পষ্টরূপে বলে দিয়েছেন কিভাবে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক পরিমাপ করা যায়। তিনি বলেন ঃ

আমাদের সাথে আল্লাহ্ তায়ালার সংযোগ-সম্পর্ক বাড়ছে না কমছে, তাই বা আমরা বুঝব কিভাবে? এর সমাধানস্বরূপ আমি আপনাদেরকে বলতে চাই যে, এ অনুভব করার জন্যে স্বপ্নযোগে 'সুসংবাদ' অথবা কাশফ-কারামতের প্রয়োজন নেই। অন্ধকার কক্ষে পড়ে থেকে 'আলোকপ্রাপ্তির' অপেক্ষা করার কোন আবশ্যকতা নেই। এ সংযোগ-সম্পর্ক পরিমাপ করার জন্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা আল্লাহ্ তায়ালা নিজেই প্রতিটি মুমিন ব্যক্তির অন্তরে করে রেখেছেন। আপনি জাগ্রত অবস্থায় দিনের বেলায় যখন খুশী তা পরিমাপ ও পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। নিজের জীবন, কর্মপ্রচেষ্টা এবং যাবতীয় চিন্তা, মতবাদ ও ভাবধারা সম্পর্কে পর্যালোচনা করে দেখুন। নিজের হিসাব-নিকাশ ঠিক করার পরে আপনি আল্লাহর সাথে যে চুক্তিতে আবদ্ধ আছেন, তার সাথে মিলিয়ে দেখুন, আপনি তা কতখানি পালন করেছেন। আল্লাহ্ তায়ালার আমানতসমূহে আপনার অধিকার মাত্র একজন আমানতদার হিসাবেই। সুতরাং আপনাকে অবশ্যই হিসাব করতে হবে যে, আপনি তার মধ্যে কোন প্রকার খিয়ানত করেননি তো? আপনার সময়, শ্রম, দক্ষতা, যোগ্যতা, ধন-সম্পদ ইত্যাদির কতটুকু আল্লাহ্ তায়ালার বিধান অনুসারে ব্যয়িত হচ্ছে? আবার কতটুকু অন্য পথে নিয়োজিত হয়েছে? আপনার স্বার্থ কিংবা মনোভাবের উপরে আঘাত লাগলে আপনি কতখানি বিরক্ত ও রাগান্বিত হন? এ অবস্থাটির প্রতি লক্ষ্য করে দেখুন– আল্লাহ্ তায়ালার বিরুদ্ধে যখন বিদ্রোহ ঘোষণা করা হয়, তখন আপনারও ক্রোধ, মর্মপীড়া, উদ্বেগ-অশান্তি কিরূপ ও কতখানি হয়? এছাড়া আপনি আরো অনেক প্রশ্ন নিজের মনের কাছে, বিবেকের কাছে জিজ্ঞাসা করতে পারেন। এ সব প্রশ্নের যে উত্তর সংগৃহীত হবে, তার উপর ভিত্তি করে প্রত্যহ আপনি বুঝতে পারবেন যে, আল্লাহ্ তায়ালার সাথে আপনার সম্পর্ক ও যোগাযোগ আছে কি না। থাকলে তা কতখানি এবং তা বাড়ছে না ক্রমশ কমে যাচ্ছে? বাশারাত, কাশফ-কারামাত, আনওয়ার কিংবা তাজাল্লিয়াত প্রভৃতি অতিপ্রাকৃতিক উপায় অবলম্বনের চেষ্টা থেকে আপনি বিরত

থাকুন। প্রকৃতপক্ষে এ জড় জগতের প্রবঞ্চনামূলক বৈচিত্রের মধ্যে অবস্থান করে তাওহীদের প্রকৃত তত্ত্ব-অনুধাবনের তুলনায় বড় কাশফ আর দ্বিতীয়টি নেই। শয়তান ও তার চেলা-চামুণ্ডাগণ যে প্রলোভন দিচ্ছে ও ভীতি প্রদর্শন করছে, তার মুকাবিলায় সরল সত্য পথে মযবুতভাবে কায়েম থাকা অপেক্ষা কারামত আর কিছু নেই। কুফরী, ফাসেকী ও গোমরাহীর ঘন অন্ধকারাচ্ছন্ন অবস্থায় সত্যের আলো দেখতে পাওয়া এবং তা অনুসরণের জন্যে কোন 'নূর' দেখা তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। বিশ্বাসী মুমিনদের জন্যে সর্বোৎকৃষ্ট সুসংবাদ লাভের উপায় আল্লাহ তায়ালাকে নিজের প্রভু ও পালনকর্তা হিসাবে গ্রহণ করে সুদৃঢ়ভাবে এই মতবাদের উপর অবিচল থাকা এবং তাঁর নির্দেশ পালন করা।

اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰئِكَةُ
أَلاَّ تَخَافُوْا وَلاَ تَحْزَنُوْا وَاَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِىْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ.

নিশ্চয়ই যারা বলেছে আল্লাহ আমাদের রব, এরপর এ কথার উপর দৃঢ় থেকেছে, তাদের উপরই ফেরেশতা নাযিল হয় এবং তোমরা ভয় পেয়োনা, চিন্তিত হয়োনা, তোমরা সেই জান্নাতের সুসংবাদ শোন, যার ওয়াদা তোমাদেরকে করা হয়েছে। (হা-মীম আসসাজদা - ৩০)

উপরে যা বলা হয়েছে তা যদি প্রকৃত তাসাওউফ না হয়, তো তাসাওউফ আর কাকে বলে? মাওলানা মওদূদী তাঁর সহকর্মীদেরকে এ সব উপদেশ দিয়েই ক্ষান্ত হননি। তাঁর অমূল্য উপদেশবাণীর প্রতিটি তিনি তাঁর জীবনে প্রতিফলিত করেছেন।

আধ্যাত্মিক সংস্কার, সংশোধন সম্পর্কে মাওলানা মওদূদীর অমূল্য উপদেশ বাণী লিপিবদ্ধ আছে 'হেদায়াত' নামক গ্রন্থে।

মাওলানা মওদূদীর পয়গাম

মুসলমানদের কাছে আমার পয়গাম এই যে, মুসলমান হওয়ার কারণে তাঁদের উপর যে দায়িত্ব আরোপ করা হয়েছে, তা যেন তাঁরা হৃদয়ঙ্গম করে পালন করে। 'আমরা মুসলমান, খোদা ও তাঁর দ্বীনকে আমরা মেনে নিয়েছি'– শুধু এতটুকু বললেই আপনারা রেহাই পাবেন না। বরং যখন আপনারা খোদাকে নিজেদের খোদা এবং তাঁর দ্বীনকে নিজেদের দ্বীন বলে মেনে নিয়েছেন, তখন তার সাথে সাথে কিছু দায়িত্বও এসে পড়ে, যার অনুভূতি আপনাদের থাকা দরকার এবং তা পালন করার জন্যে চিন্তা ভাবনাও থাকা দরকার। তা যদি আপনারা পালন না করেন, তাহলে এর ভয়াবহ পরিণাম থেকে না এ দুনিয়াতে পরিত্রাণ পাবেন, না আখেরাতে। সে দায়িত্বগুলো কি? তা শুধু এ নয় যে, আপনারা খোদা, তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ, নবীগণ ও আখেরাতের উপর ঈমান এনে ফেলবেন। তা শুধু এটুকুও নয় যে, আপনারা নামায পড়বেন, রোযা রাখবেন, হজ্জ করবেন এবং যাকাত আদায় করবেন। তা এতটুকুও নয় যে, আপনারা বিবাহ, তালাক, উত্তরাধিকার প্রভৃতি ব্যাপারে ইসলামের নির্ধারিত নিয়ম-নীতি মেনে চলবেন। বরং এসব ছাড়াও একটা বিরাট এবং অতি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব আপনাদের উপরে রয়েছে। তা হচ্ছে এই যে, আপনাদের সমগ্র দুনিয়ার সামনে সেই সত্যের সাক্ষ্য নিয়ে দাঁড়াতে হবে, যার উপরে আপনারা ঈমান এনেছেন। কোরআন পাকে মুসলমান নামে একটি স্থায়ী মিল্লাত সৃষ্টির যে একমাত্র উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়েছে তা হচ্ছে এই যে, আপনারা মানব সন্তানের কাছে সত্যের সাক্ষ্য পরিপূর্ণরূপে তুলে ধরবেন।

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا.

'এবং আমি তোমাদেরকে বানিয়েছি মধ্যবর্তী উম্মত হিসেবে, যাতে তোমরা লোকের কাছে আল্লাহর দ্বীনের সাক্ষ্য দিতে পার এবং রসূল (সঃ) তোমাদের কাছে আল্লাহর দ্বীনের সাক্ষ্য দিতে পারেন।' (বাকারা– ১৪৩)

এটা হচ্ছে আপনাদের উম্মত হিসেবে স্থায়ী থাকার প্রকৃত উদ্দেশ্য। এ যদি পূরণ না করেন, তাহলে জীবনটাই ব্যর্থ হয়ে যাবে। এই হচ্ছে আপনাদের উপরে খোদার নির্ধারিত ফরয। কারণ তাঁর আদেশ –

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّامِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ.

'হে ঈমানদারগণ, তোমরা হয়ে যাও খোদার জন্যে দণ্ডায়মানকারী এবং সত্যের সাক্ষ্যদাতা।' (আন নিসা– ১৩৫)

আল্লাহ তায়ালার এ একটা সাধারণ আদেশ মাত্র নয়, বরং এর জন্যে তাকিদ করা হয়েছে।

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهٗ مِنَ اللّٰهِ.

"ঐ ব্যক্তির চেয়ে বড় জালেম আর কে হতে পারে, যার নিকটে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন সাক্ষ্য আছে এবং সে তা গোপন করে?' (বাকারা– ১৪০)

অতঃপর আল্লাহ তায়ালা আপনাদেরকে এ কথাও বলে দিয়েছেন যে, এ কর্তব্য পালন না করার কি পরিণাম হতে পারে। আপনাদের পূর্বে এ সাক্ষীর কাঠগড়ায় ইহুদীদের দাঁড় করানো হয়েছিল। কিন্তু তারা কিছুটা সত্য গোপন করল এবং কিছুটা সত্যের বিপরীত সাক্ষ্য দিল। মোটকথা, সত্যের পরিবর্তে বাতিলের সাক্ষ্যদাতা হয়ে রইল। তার ফল এই হলো যে, আল্লাহ তাদেরকে লাঞ্ছিত ও অভিশপ্ত করলেন।

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَآءُوْا بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ.

'তারা লাঞ্ছনা ও দারিদ্র্যের দ্বারা নিষ্পেষিত হলো এবং আল্লাহর ক্রোধবহ্নির শিকার হয়ে পড়ল।' (বাকারা– ৬১)

যে সাক্ষ্যদানের দায়িত্ব আপনাদের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে, তার অর্থ এই যে, যে সত্য আপনাদের কাছে এসেছে এবং যা উদঘাটিত করা হয়েছে, মানবের মঙ্গল ও পরিত্রাণের যে পথ দেখানো হয়েছে, তার সত্যতা সম্পর্কে দুনিয়ার সামনে আপনাদেরকে সাক্ষ্য দিতে হবে। এমন সাক্ষ্য যে, তার সত্যতা যেন পরিস্ফুট হয়ে যায় এবং দুনিয়ার লোকের সামনে দ্বীনের যথার্থতা পরিপূর্ণরূপে প্রমাণিত হয়ে পড়ে। এই সাক্ষ্য মাত্র দুই প্রকারের হতে পারে।

একটি মৌখিক এবং অন্যটি ব্যবহারিক। মৌখিক সাক্ষ্যের পন্থা এই যে, আমরা বক্তৃতা ও লেখনীর সাহায্যে সেই সত্যকে পরিস্ফুট করে তুলব, যা নবীদের (আঃ) মাধ্যমে আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে। লোককে বুঝানোর জন্যে এবং তাদের অন্তরে বদ্ধমূল করে দেয়ার জন্যে যত প্রকার পন্থা আছে তা অবলম্বন করব। তাবলীগ, দাওয়াত ও প্রচার কার্যে যত সম্ভাব্য উপায় আছে তা অবলম্বন করব। জ্ঞান-বিজ্ঞান যত প্রকার উপায়-উপাদান সংগৃহীত করে দিয়েছে, সে সবের সাহায্যে দুনিয়ার কাছে আল্লাহর নির্ধারিত দ্বীনের শিক্ষাকে সমুজ্জ্বল করে তুলব। চিন্তাধারা ও বিশ্বাসে, নৈতিকতা, তামাদ্দুন ও সমাজ ব্যবস্থায়, জীবিকার্জন ও লেনদেনে, আইন-কানুন ও বিচার ব্যবস্থায়, রাজনীতি ও রাষ্ট্র পরিচালনায় এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক-সম্বন্ধের বিভিন্ন দিকে এই 'দ্বীন' মানুষের পথ-নির্দেশের জন্যে যা কিছুই পেশ করেছে, তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করব। যুক্তি-তর্ক ও সাক্ষ্য-প্রমাণাদির দ্বারা তার সত্যতা প্রমাণ করব এবং যা কিছু তার বিপরীত তার যুক্তিযুক্ত সমালোচনা করে বলে দেব যে, তার মধ্যে অমঙ্গল কতটা রয়েছে। এই মৌখিক সাক্ষ্যদান কখনই সার্থক হতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সমগ্র উম্মত সমষ্টিগতভাবে মানবতার পথ প্রদর্শনের জন্যে এমনভাবে চিন্তান্বিত হয়ে না পড়ে, যেমন নবীগণ ব্যক্তিগতভাবে চিন্তান্বিত হতেন। একে সার্থক করবার জন্যে প্রয়োজন যে, এ কাজকে আমাদের সামগ্রিক চেষ্টা-চরিত্র ও জাতীয় সংগ্রাম সাধনার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু করে ফেলতে হবে। আমাদের মন-মস্তিষ্কের সমগ্র শক্তি এবং যাবতীয় উপায়-উপাদান এ কাজে নিয়োজিত করতে হবে। আমাদের সকল কাজকর্ম এই উদ্দেশ্যে অবধারিত হবে এবং সত্যের বিরুদ্ধে সাক্ষ্যদানকারী কোন কিছু আমাদের মধ্যে প্রকাশ পেলে, তা কিছুতেই বরদাশত করব না।

এখন রইল ব্যবহারিক সাক্ষ্য। তার অর্থ এই যে, যে সকল আদর্শ আমরা সত্য বলে স্বীকার করে নিয়েছি, তা বাস্তব জীবনে কার্যকর করতে হবে। দুনিয়া শুধু আমাদের মুখ থেকে এ সবের সত্যতার বড় বড় বুলি শুনবে, তা নয়। বরং সে স্বচক্ষে আমাদের বাস্তব জীবনে এ সবের সৌন্দর্য ও বরকত যেন দেখতে পায়। ঈমানের দ্বারা মানুষের চারিত্রিক ব্যবহারে যে মধুরতা সৃষ্টি হয়, আমাদের আচার-ব্যবহারে তার স্বাদ যেন সে গ্রহণ করতে পারে। সে যেন স্বয়ং দেখতে পায় যে, দ্বীনের পরিচালনায় কেমন সৎ লোক তৈরি হতে পারে, কত পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন তামাদ্দুন জন্মলাভ করতে পারে, কত সুষ্ঠুভাবে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও

সাহিত্যকলার পরিস্ফূরণ হতে পারে, কত ন্যায়পরায়ণ, সহানুভূতিসম্পন্ন ও সর্বসম্মত অর্থনৈতিক সহযোগিতা পরিস্ফুট হয়ে পড়ে এবং ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনের প্রতিটি দিক কিভাবে সংশোধিত, সুবিন্যস্ত ও মঙ্গলময় হয়। এই সাক্ষ্যদান শুধুমাত্র তখনই সার্থক হতে পারে, যখন আমরা ব্যক্তিগতভাবে এবং জাতীয় পর্যায়ে আমাদের দ্বীনের সত্যতার মূর্তিমান সাক্ষ্য হয়ে পড়ব। আমাদের প্রতিটি ব্যক্তির চরিত্র তার সাক্ষ্যের প্রমাণ দেবে, আমাদের গৃহ তার সুরভিতে ভরপুর হবে, আমাদের দোকান-পাট, কল-কারখানা তার আলোকে আলোকিত হবে। আমাদের প্রতিষ্ঠান ও আমাদের শিক্ষাগার তার জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হবে। সাহিত্য ও সাংবাদিকতা তার সৌন্দর্যের সনদ বহন করবে। আমাদের জাতীয় পলিসি ও সামগ্রিক চেষ্টা-চরিত্র তার সত্যতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হবে। মোটকথা, আমরা যেখানেই এবং যেভাবেই কোন ব্যক্তি বা জাতির সংস্পর্শে আসি না কেন, আমাদের ব্যক্তিগত এবং জাতীয় চরিত্র যেন এ বিষয়ে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, যে সকল আদর্শকে আমরা সত্য বলে প্রচার করি, তা প্রকৃতপক্ষেই সত্য এবং তার দ্বারাই সত্যিকারভাবে মানব জীবন সর্বাঙ্গ সুন্দর, সর্বোৎকৃষ্ট ও উন্নততম হয়। অতঃপর আরো বলতে চাই যে, এই সাক্ষ্যদান পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে শুধুমাত্র তখনই যখন একটি রাষ্ট্র এই আদর্শের ভিত্তিতে স্থাপিত হবে। অতঃপর সে রাষ্ট্র পরিপূর্ণ দ্বীনকে কার্যকর করে ন্যায়বিচার দ্বারা স্বীয় সংস্কারমূলক কর্মসূচী গ্রহণ করবে। স্বীয় সুষ্ঠু পরিচালনা দ্বারা, শান্তি ও নিরাপত্তা দ্বারা, জনগণের মঙ্গল ও উন্নতি দ্বারা, শাসকবৃন্দের পূত চরিত্রের দ্বারা, মহৎ অভ্যন্তরীণ রাজনীতি দ্বারা, ন্যায়নিষ্ঠ বৈদেশিক নীতি দ্বারা, মহত্ত্বপূর্ণ যুদ্ধ এবং নির্ভরযোগ্য সন্ধিসূত্র দ্বারা দুনিয়ার সামনে এ কথার প্রমাণ দিবে যে, যে 'দ্বীন' এ রাষ্ট্রের জন্ম দিয়েছে তা প্রকৃতই মানবীয় মঙ্গলের প্রতীক এবং তা প্রতিপালন করার মধ্যেই মানব জাতির মঙ্গল নিহিত রয়েছে। এই সাক্ষ্য যখন মৌখিক সাক্ষ্যের সাথে মিলে যাবে, মুসলিম জাতির উপরে ন্যস্ত দায়িত্ব পরিপূর্ণ হবে, তখনই মানব জাতির উপরে হয়ে যাবে যুক্তি-প্রমাণাদির পরিসমাপ্তি এবং সমগ্র মুসলিম জাতি এতটা যোগ্যতা অর্জন করতে পারবে যে, আখেরাতের আদালতে নবী করীম (সাঃ)-এর পরে দণ্ডায়মান হয়ে সাক্ষ্য দিতে পারবে যে, নবী (সাঃ) আমাদের কাছে যে বাণী পৌঁছে দিয়েছিলেন, তা আমরা অন্যদের নিকটেও পৌছিয়ে দিয়েছি। এরপরেও যদি তারা সৎ পথে এসে না থাকে তো এর জন্যে তারাই দায়ী।

অতএব আমার পয়গাম ঠিক তাই, যা আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর নবী (সাঃ)-এর মুখ দিয়ে পাঠিয়েছিলেন ঃ

تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَاءٍۢ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلاَّ نَعْبُدَ اِلاَّ اللّٰهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهٖ شَيْئًا وَّلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ.

"এস, আমরা এমন একটি বস্তু গ্রহণ করি, যা তোমাদের ও আমাদের কাছে এক। তা হচ্ছে এই যে, আমরা আল্লাহ্ ব্যতীত আর কারও দাসত্ব, আনুগত্য করব না, তার সাথে কোন কিছুর শরীক করব না এবং আমাদের মধ্যে কেউ কাউকেও, আল্লাহকে বাদ দিয়ে প্রভু হিসাবে মানব না। (আলে ইমরান-৬৪)

আমরা সকলে এক খোদার বান্দাহ্, একই রাসূলের অনুসারী, একই কিতাবে বিশ্বাসী এবং একই কেবলা আমাদের কেন্দ্র ও প্রত্যাবর্তনের মূল। আসুন আমরা এ কথার উপরে একমত হই যে, আল্লাহ্ ব্যতীত এ দুনিয়ায় আমরা আর কারো দাসত্ব করব না, তাঁর আইন ব্যতীত অন্য কোন আইন মানব না এবং তাঁর নির্দেশ ব্যতীত অন্য কারো নির্দেশ এ দুনিয়ায় চলতে দেব না।

শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে মাওলানা মওদূদীর চিন্তাধারা

আমাদের ইতিহাসে সময়ের দাবির প্রেক্ষিতে স্যার সাইয়েদ আহমদ একটি শিক্ষা পরিকল্পনাসহ আবির্ভূত হন। অতঃপর সে পরিকল্পনার যা কিছু সাময়িক উদ্দেশ্য ছিল, তার ভাল এবং মন্দ ফলাফলও প্রকাশ পায়। কিন্তু ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পর পাকিস্তান একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। অতঃপর একটি স্বাধীন জাতি ও রাষ্ট্রের জন্যে সে পরিকল্পনার সকল প্রয়োজন শেষ হয়ে গেছে। তা একটি স্বাধীন জাতির জন্যে এখন আর মোটেও উপযোগী নয়।

এ উপমহাদেশের স্বাধীনতা লাভের কিছু পূর্বে ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে সর্বপ্রথম একটি পরিপূর্ণ শিক্ষা বিপ্লবের বলিষ্ঠ আওয়াজ শ্রুতিগোচর হয়। এ ছিল মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর আওয়াজ। এ শুধু একটি আওয়াজই ছিল না, বরঞ্চ এর সাথে মাওলানা মওদূদী ক্রমাগত তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধ ও ভাষণের মাধ্যমে একটি সার্বিক শিক্ষা পরিকল্পনা, তা কার্যকর করার বাস্তব কর্মসূচী, পাঠ্য তালিকা প্রভৃতি বিষয়সমূহের প্রচুর মাল-মসলা আমাদের জন্যে রেখে দিয়েছেন।

মাওলানা একটি সত্যিকার ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার বিষয়ে এত বেশী মসি চালনা করেছেন যে, সে সব আলোচনার অবকাশ এখানে নেই। তবে এখানে তার কেন্দ্রীয় দৃষ্টিকোণ সংক্ষেপে পেশ করা হচ্ছে। তিনি বলেন ঃ

"এখন এটা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে যে, এখন পর্যন্ত আমাদের এখানে যে দু'টি বিপরীতমুখী শিক্ষাব্যবস্থা চালু আছে, তার উভয়টিকেই রহিত করতে হবে। অর্থাৎ ইংরেজদের কর্তৃত্বাধীন যে প্রাচীন ধর্মীয় শিক্ষা এবং আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা চালু আছে, তার বিলোপ সাধন করতে হবে। এ উভয় শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তে এমন এক নতুন শিক্ষাব্যবস্থার প্রয়োজন, যা একদিকে যেন অতীতের সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে মুক্ত হয় এবং অপরদিকে ঐ সকল প্রয়োজন পূরণ করতে পারে, যা একটি মুসলমান জাতি, একটি স্বাধীন জাতি এবং একটি উন্নয়নকামী জাতি হিসাবে এ সময়ে আমাদের জন্যে অপরিহার্য।"

শিক্ষা বিপ্লবের এ আহবান জানাতে গিয়ে মাওলানা তাঁর একাধিক প্রবন্ধে ঈপ্সিত ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার কাঠামো এবং তার বুনিয়াদী মূলনীতি সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করেছেন। তবে ইসলামী শিক্ষানীতি সম্পর্কে আলোকপাত করার পূর্বে মাওলানা মানব, মানবের জীবন দর্শন, বিশ্বপ্রকৃতি প্রভৃতি সম্পর্কে সঠিক ও সুস্পষ্ট ধারণা পেশ করেছেন, যে সুস্পষ্ট ও সঠিক ধারণার উপরেই ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হতে পারে। অতঃপর শিক্ষা দর্শনের বর্ণনা প্রসঙ্গে জ্ঞানের প্রকৃত সংজ্ঞা ও তার প্রকৃত উৎসের ব্যাখ্যা দান করেন।

শিক্ষার উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি চরিত্র গঠনের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, শিক্ষার উদ্দেশ্য আত্মশুদ্ধি। মানুষের চরিত্র মহৎ না হলে সমাজে সঠিক ভারসাম্য স্থাপিত হতে পারে না। মানুষ যেহেতু খোদার প্রতিনিধি, সে জন্যে এ গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থাকার উৎকৃষ্ট পন্থা এই যে, সে তার চরিত্র ও আচার-আচরণে সে সব গুণাবলী সৃষ্টি করবে যার প্রকৃত অধিকারী স্বয়ং তার প্রভু ও স্রষ্টা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। তার চরিত্রের মধ্যে অবশ্যই থাকতে হবে স্নেহ-মমতা, দয়া-দাক্ষিণ্য, ন্যায়-নীতি, সুবিচার প্রভৃতি গুণাবলী।

মাওলানা তাঁর 'তালীমাত' (শিক্ষা ব্যবস্থা ঃ ইসলামী দৃষ্টিকোণ) গ্রন্থে বলেন ঃ "আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় মানসিক প্রশিক্ষণ অপেক্ষা অধিকতর গুরুত্ব দিতে হবে নৈতিক প্রশিক্ষণের উপর।

লুপ্ত যোগ্যতা ও প্রতিভার বিকাশকেও তিনি শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য বলে অভিহিত করেন। তিনি আরও বলেন, শিক্ষার প্রাথমিক উদ্দেশ্য হলো খোদার প্রকৃত পরিচয় লাভ করা। অতঃপর তার যোগ্যতা ও প্রতিভার বিকাশ এমন হওয়া উচিত যাতে সে সমাজের একটি মঙ্গলকর সম্পদ হিসাবে বিবেচিত হতে পারে।

মাওলানা বলেন, শিক্ষার মাধ্যমে কোন একটি সভ্যতা-সংস্কৃতির বহিঃপ্রকাশ ঘটে। শিক্ষার উদ্দেশ্য শুধু সংস্কৃতিকে জীবন্ত রাখা নয়, বরং তাকে ভবিষ্যত বংশধর পর্যন্ত এগিয়ে দেয়া।

তিনি বলেন, আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার উদ্দেশ্য এই হওয়া উচিত যে, যে মতবাদ ও লক্ষ্যের অধীন জীবন পরিচালিত হচ্ছে, তার ভিত্তিতেই তার উন্নতি সাধন করতে হবে। জীবন্ত জাতিসমূহ এহেন উদ্দেশ্যেই তাদের নিজস্ব ভবিষ্যত শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করে থাকে।

নেতৃত্বের প্রশিক্ষণ

মাওলানা বলেন, শিক্ষার উদ্দেশ্য এমন ব্যক্তিবর্গ তৈরি করা, যারা আধুনিক যুগে দ্বীনে হকের মূলনীতি অনুযায়ী সঠিকভাবে দুনিয়ার নেতৃত্ব দেয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে পারে। অর্থাৎ শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হলো উৎকৃষ্ট নাগরিক সৃষ্টি করা যাতে তারা দুনিয়ায় নেতৃত্ব দানের যোগ্য হতে পারে। দুনিয়ার নেতৃত্বদান করা যে জাতির উদ্দেশ্য, তারা তাদের শিক্ষাব্যবস্থা এমনভাবে গড়ে তোলে যার দ্বারা এ উদ্দেশ্য পূরণ হয়।

মাওলানা মওদূদীর শিক্ষানীতির উপরে বিভিন্ন মহল থেকে গবেষণা শুরু হয়েছে। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের "শিক্ষা ও গবেষণা" সংস্থার অধ্যাপক মুহাম্মদ হুসাইন "মাওলানার শিক্ষা সম্পর্কিত চিন্তাধারা" শীর্ষক এক দীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করেন, যা লাহোর গবেষণা ও প্রকাশনা সংস্থা থেকে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে। শিক্ষা বিশেষজ্ঞ ও শিক্ষামোদী সুধীগণের দ্বারা উচ্চ প্রশংসিত হয়েছে এ জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধটি।

পাকিস্তানের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে মাওলানা

পাকিস্তান একটি আদর্শভিত্তিক স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে অস্তিত্ব লাভ করার কয়েক বছর পরও এর শিক্ষাব্যবস্থা ঠিক তেমনি রইল যেমনটি ছিল ইংরেজদের আমলে গোলামীর যুগে। বৈদেশিক ও বিজাতীয় শাসকদের রচিত শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তে পাকিস্তানের আদর্শভিত্তিক একটা শিক্ষাব্যবস্থার কোন চেষ্টা-চরিত্রই হলো না। যদিও গোটা জাতি হাড়ে হাড়ে অনুভব করেছিল যে, তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার বাস্তব রূপায়ণের জন্যে যত কিছুর আয়োজন করতে হবে, তার মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে নিজস্ব জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থাকে। কিন্তু শাসকগণ চলে যাওয়া প্রভুর ফেলে যাওয়া স্মৃতিকে আঁকড়ে ধরে রইলেন। শিক্ষাব্যবস্থার কাঠামো যেমন ছিল, হুবহু তেমনি রইল, বরং এর কিছুটা সংস্কার করতে গিয়ে আরও করা হলো জরাজীর্ণ, করা হলো জাতীয় আদর্শের একেবারে পরিপন্থী।

১৯৫২ সালের ২৫শে ডিসেম্বর লাহোরে অনুষ্ঠিত নিখিল পাকিস্তান ইসলামী জমিয়তে তালাবার বার্ষিক সম্মেলনে মাওলানা মওদূদী শিক্ষাব্যবস্থা

সম্পর্কে এক অতি গুরুত্বপূর্ণ ও জ্ঞানগর্ভ ভাষণ দেন। প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার দোষ-ত্রুটি, এর ভয়াবহতা ও বিষময় পরিণাম সম্পর্কে যুক্তিপূর্ণ আলোচনা করেন এবং পাকিস্তানের উপযোগী একটা শিক্ষাব্যবস্থার কাঠামোও সংক্ষেপে পেশ করেন। তাঁর সে ঐতিহাসিক ভাষণ পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়। তার থেকে কিছুটা নিম্নে উদ্ধৃত করছি–

খোদাহীন শিক্ষাব্যবস্থা

আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা অনুসারে যে সব বিষয় শিক্ষাদান করা হয়, তাতে ইসলামের কোন চিহ্ন নেই। আর তা থাকতেও পারে না। ইউরোপে এসব বিষয় যতখানি বিকাশ লাভ করেছে, তাতে খোদাদ্রোহী ব্যক্তিগণ নেতৃত্ব দিয়ে আসছে। ইউরোপে তখন নামমাত্র যে ধর্মপন্থীরা ছিল, চিন্তা ও সাধনার ময়দান থেকে তাদেরকে বহুদিন পূর্বেই বেদখল করা হয়েছিল। এজন্যেই দর্শন, ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে এ ধরনের লোক নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিল। তারা নাস্তিক না হলেও নিজেদের বাস্তব জীবনে খোদার আনুগত্য স্বীকারের কোন প্রয়োজন অনুভব করত না। ইংরেজরা যে সব শাস্ত্র ও পুস্তকাদি আমদানি করে এ দেশে চালু করেছিল, আমাদের দেশে আজ পর্যন্ত তাই পড়ানো হচ্ছে। যারা এই আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা অনুসারে লেখাপড়া করছে, স্বাভাবিকভাবেই তাদের মস্তিষ্ক অজ্ঞাতসারে দ্বীন-ইসলাম, ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি ও রীতিনীতি থেকে ক্রমশ দূরে চলে গেছে। এ ব্যাপারে তাদের ইচ্ছা-আগ্রহ কিংবা চেষ্টা-চরিত্রের আদৌ কোন দখল নেই। সুতরাং যে ব্যক্তি শিক্ষা-জীবনের প্রথম দিন থেকে শেষ মুহূর্তটি পর্যন্ত যত শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছে, দুনিয়ার যত বিদ্যাই সে অর্জন করেছে, তার আগাগোড়া কোথাও যদি ধর্মীয় বা খোদায়ী দৃষ্টিভঙ্গি না থাকে, তবে তার মনে খোদার প্রতি বিশ্বাস জন্মাবে কি করে? তার পাঠ্য পুস্তকের কোথাও যদি খোদার কোন উল্লেখ আদৌ না থাকে, সে ইতিহাস পড়বে অথচ তাতে মানব-জীবনের ভাগ্য নির্ধারক সে নিজেই, অন্য কেউ নয়, যে দর্শন সে অধ্যয়ন করবে তাতে বিশ্বপ্রকৃতির রহস্য উদঘাটনে বিশ্বজগতের যিনি সৃষ্টিকর্তা তাঁর কোনই প্রয়োজন নেই, বিজ্ঞান অধ্যয়ন করবে, গোটা বিশ্বের কোথাও সুকৌশলী সৃষ্টিকর্তা এবং শ্রেষ্ঠতম পরিচালক ও ব্যবস্থাপকের কোন অস্তিত্বের উল্লেখ তাতে নেই। আইন-কানুন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান-অর্থনীতি প্রভৃতি যত শাস্ত্রই সে অধ্যয়ন করুক না কেন, কোথাও এ কথার উল্লেখ নেই যে, মানব জাতির সৃষ্টিকর্তা তাদের জীবন যাপনের জন্যে

কোন পন্থা নির্দেশ করেছেন কি না। বরং সকল শাস্ত্রের মূলনীতিই এই যে, মানুষ নিজেই তার জীবন পদ্ধতি নির্ধারণের অধিকারী, অন্য কারো তেমন কোন অধিকার বা ক্ষমতা নেই।

এ ধরনের শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকের নিকট এ কথা বলার কোন আবশ্যক নেই যে, তুমি খোদাকে অস্বীকার কর। সে নিজের অজ্ঞাতসারেই যে খোদা সম্পর্কে সম্পূর্ণ বেপরোয়া এবং উদাসীন হবে তাতে আর বাধা কোথায়?

নীতিবর্জিত শিক্ষা

ধর্ম ও ইসলামের সাথে এ আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার কোন সম্পর্ক তো নেই-ই, বরং ভাগ্যের বিড়ম্বনা এই যে, এ আমাদের তরুণদের মধ্যে মৌলিক নীতিবোধটুকুও জাগ্রত করে না। অথচ এ কথা সকলেই জানেন যে, নীতিভ্রষ্ট চরিত্রহীন কোন জাতির পক্ষে উন্নতি লাভ করা তো দূরের কথা, এ দুনিয়ার বুকে জাতি হিসাবে টিকে থাকাই একবারে অসম্ভব। এ কারণেই আধুনিক পন্থায় শিক্ষালাভের পরে যারা কর্মজীবনে প্রবেশ করছেন, তাদের মধ্যে পাশ্চাত্য জাতিগুলোর দোষত্রুটি বা বদ-অভ্যাস বলতে যা কিছু আছে তা সবই পাওয়া যায়। কিন্তু তাদের মধ্যে পাশ্চাত্য জাতিসমূহের গুণাবলীর লেশমাত্রও দেখা যায় না। তথাকথিত আধুনিক শিক্ষিতদের মধ্যে দায়িত্ববোধ, তিতিক্ষা, সাহস, সংযম এবং চরিত্রের দৃঢ়তা ও নিজের সত্তা ব্যতীত অন্য কারো আনুগত্য, বিশ্বস্ততা ইত্যাদি কোন কিছুই নেই। এরা যেন পরগাছা, শূন্যলতা। এদের আচার-ব্যবহার দেখে মনে হয় না যে, জাতীয় চরিত্র এবং বৈশিষ্ট্য বলতে এদের নিকটে কিছু আছে। বিশেষ সম্মানজনক পদে সমাসীন হওয়ার পরেও এরা স্বচ্ছন্দে অত্যন্ত জঘন্য ধরনের বিশ্বাসঘাতকতা এবং অপরাধ করতে পশ্চাদপদ হয় না। এদের মধ্যে ঘুষখোর, স্বজনপরায়ণ, অন্যায়-অনুরোধকারী, কালোবাজারী, চোরাকারবারী, বিচার ও ন্যায়-নীতির কণ্ঠরোধকারী, জনসাধারণের ন্যায্য অধিকার হরণকারী, সামান্য ব্যক্তিগত স্বার্থের বিনিময়ে গোটা জাতির ভাগ্য বিনাশকারী এবং কাজে ফাঁকি দেয়ার মতো লোক এক আধজন নয় বরং হাজার হাজার মিলবে, সমাজের সর্বত্র এরা অবাধে বিচরণ করছে। ইংরেজদের চলে যাওয়ার পরে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব এদের উপরে ন্যস্ত রয়েছে। ফলে মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই এ চরিত্রহীনদের পাল্লায় পড়ে দেশের যে দুর্গতি হয়েছে তা

সকলেই অনুভব করছে। বর্তমানে আমাদের যে সব তরুণ তথাকথিত এ আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা অনুসারে বিদ্যা অর্জন করছে, তাদের চরিত্র ও আচার-আচরণ প্রত্যক্ষ করতে হলে যে কোন সময়ে ছাত্রাবাস, প্রমোদকেন্দ্র ও জাতীয় অনুষ্ঠান উপলক্ষে হাট-বাজারে গেলেই দেখা যাবে।

পূর্বতন শিক্ষাব্যবস্থার সাথে দীনিয়াত সংযোজন

বর্তমানে যারা আমাদের দণ্ডমুণ্ডের মালিক, আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা যাদের মুঠোর মধ্যে রয়েছে, যারা মাঝে মধ্যে ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের খোশখবর শুনিয়ে থাকেন, তারাও যেন ভুলের পুনরাবৃত্তি করতে উদ্যত হয়েছেন বলে মনে হয়। ইংরেজ আমলে প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থাই পূর্ববৎ চালু থাকবে এবং তাতে শুধু দীনিয়াতের মাত্রাটা একটু বাড়িয়ে দিলেই চলবে। প্রকৃতপক্ষে তাদের সামনে যে শিক্ষা পরিকল্পনা রয়েছে, তাতে এর বেশী তেমন কিছু নেই। এ কারণেই কয়েক বছর পূর্বেই আমি যে কথা বলেছিলাম এখনও তাই বলছি। কারণ আমার বিবেচনায় পরস্পর বিরোধী ও বিপরীতমুখী দু'টি বস্তুর সমন্বয়ে শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়নের ন্যায় মারাত্মক ভুল আর দ্বিতী.়টি নেই। তাও আবার পরস্পর সংঘর্ষশীল দু'টি ধারা, যার একটি অপরটিকে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত বলে সাব্যস্ত করে। এ ধরনের মিক্সচার ব্যবহারে মানসিক বিশৃঙ্খলা ছাড়া অন্য কিছু সৃষ্টি হতে পারে না।

মনে করুন, এ সংমিশ্রণের শতকরা পঞ্চাশ ভাগ* দ্বীনী শাস্ত্রই রাখলেন। আর বাকী অর্ধেক ইংরেজ আমলে প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থার বুনিয়াদের উপরেই রাখলেন। ফলে প্রত্যেকটি শিক্ষার্থীর মানসিক পরিবেশ একটি যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হতে বাধ্য।

গোটা পরিবেশ যদি পূর্ববৎ ফিরিঙ্গীপনায় আচ্ছন্ন থাকে, যেমন ইংরেজ আমলে ছিল এবং আমাদের রাষ্ট্রও যদি সাবেক নীতি অনুসারে পরিচালিত হয়, যেমনটি ইংরেজ আমলে হয়েছিল, তাহলে এর স্বাভাবিক পরিণতি হিসাবে তিন শ্রেণীর লোক আমাদের দেশে পয়দা হবে।

এক শ্রেণীর লোক– যারা দীনিয়াত পাঠের পরেও খোদাদ্রোহী সাব্যস্ত হবে। কারণ তাদের পাঠ্য তালিকার মধ্যে দ্বীনের খেলাফ অনেক বিষয়বস্তুও যে

* অবশ্য বর্তমানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে দীনিয়াত শতকরা পঞ্চাশ ভাগ তো দূরের কথা, কোথাও শূণ্যের কোঠায় এবং কোথাও থাকলে ছিটেফোঁটা আছে। উপরন্তু রয়েছে সহশিক্ষা, ছাত্র-ছাত্রীর অবাধ মেলামেশা, নৃত্যগীত – গ্রন্থকার।

শামিল রয়েছে। তার উপর আবার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গোটা পরিবেশ এ খোদাদ্রোহিতার পৃষ্ঠপোষকতা করতে থাকবে। অধিকন্তু রাষ্ট্রীয় পরিবেশও তাদের অনুকূল সাব্যস্ত হবে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক– যারা দীনিয়াতের প্রভাব অনুযায়ী ইসলামকেই নিজেদের জীবন ব্যবস্থা হিসাবে মনে করবে।

তৃতীয় শ্রেণীর লোক– যারা কুফর এবং ইসলামের মাঝামাঝি এমন এক পন্থা অনুসরণ করবে, যা সম্পূর্ণ কুফরও নয়, আবার সম্পূর্ণ ইসলামও নয়।

এ হচ্ছে উপরিউক্ত মিশ্রচার পরিবেশনের স্বাভাবিক পরিণতি। আপনারা যদি এর অনুশীলন করেন, তবে দেখতে পাবেন দেশে তিনটি পরস্পর বিরোধী শ্রেণী সৃষ্টি হয়েছে যারা কোন সভ্যতা, জীবনব্যবস্থার উন্নতি ও ক্রমবিকাশের দায়িত্ব পালনে একাগ্রতার সাথে পরস্পর সহযোগিতা করতে সক্ষম হবে না।

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, কোন দেশের শিক্ষাব্যবস্থা কি এ জন্যেই রচিত হয় যে, সেখানে একটি মানসিক ও নৈতিক আস্তাকুঁড় সৃষ্টি করা হোক।

শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণ

অনেকের মতে শুধু বিদ্যা অর্জন করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য। তাঁরা বলেন যে, জনগণকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবেই শিক্ষা দেয়া উচিত, যেন তারা ব্যক্তিগত ও সমাজ জীবনের সমস্যাসমূহ, লেনদেন এবং যাবতীয় রহস্যাবলীর "বিষয়মুখ পর্যবেক্ষণ" (Objective Study) দ্বারা নিজেদের মতামত স্বাধীনভাবেই নির্ধারণ করতে পারে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে আমি বলতে চাই যে, এ ধরনের বিষয়মুখ পর্যবেক্ষণ শুধু ক্যামেরার পক্ষে সম্ভব, মানুষ তা পারে না। মানুষের চোখ দু'টির পেছনে একটি মস্তিষ্ক আছে। সকল অবস্থাতেই তার একটি স্বকীয় দৃষ্টিভঙ্গি আছে। সমস্যাবলী ও বিচার বিশ্লেষণ করার একটি নির্দিষ্ট ধারণাও আছে। মানুষ যা কিছু দেখে, শুনে, যেসব জ্ঞান সে অর্জন করে তা সে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারেই গড়ে তোলে। এ চিন্তাধারার ভিত্তিতেই তার জীবনব্যবস্থা কায়েম হয়। একেই আমরা কৃষ্টি বা কালচার নামে আখ্যা দেই। এখন আমাদের যদি নিজস্ব কোনও কৃষ্টি ও কালচার থাকে, আমরা যদি এমন জাতির লোক হয়ে থাকি, যার নিজস্ব মতবাদ, বিশ্বাস, জীবন-দর্শন, উদ্দেশ্য ও কর্মজীবনের ধারা বলতে কিছু আছে, তবে আমাদেরকে বাধ্য হয়ে এমন পন্থা অনুসরণ করতে হবে, আমাদের

ভবিষ্যত বংশধরগণের শিক্ষা-দীক্ষার জন্যে এমন ব্যবস্থা করতে হবে, যেন তারা আমাদের তাহযীব-তামাদ্দুনকে বাঁচিয়ে রাখতে সক্ষম হয়। শুধু তাই নয়, মূলভিত্তির উপরে কায়েম রেখে তার উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি সাধনে যেন সক্ষম হয়। দুনিয়ার প্রত্যেকটি জাতি এ উদ্দেশ্য নিয়ে তার জন্যে একটি স্বাধীন শিক্ষাব্যবস্থা রচনা করে। এমন একটি জাতির নামও আমি জানি না, যে শুধু 'বিষয়মুখ পর্যবেক্ষণের' (Objective Study) ভিত্তিতে স্বীয় শিক্ষাব্যবস্থা রচনা করেছে। আমি এমন কোন জাতির নামও জানি না, যে ভিন্ন জাতির শিক্ষাব্যবস্থা হুবহু গ্রহণ করেছে। কিংবা তাতে স্বকীয় ভাবধারার সংযোগ সাধন না করে বিজাতীয় আদর্শেই নিজের ভবিষ্যত বংশধরগণকে গড়ে তুলতে অগ্রসর হয়েছে। এ ধরনের নির্বুদ্ধিতা যদি আমরা দুর্বলতা এবং অসহায় অবস্থার জন্যে পূর্বে একবার করেও থাকি, তবে এখনও তা পূর্ববৎ বহাল রাখার কোনই অর্থ হয় না।

দ্বীন ও দুনিয়ার পার্থক্য বিলুপ্তিকরণ

আর একটি বিষয়কে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার মূলনীতি হিসাবে গ্রহণ করা উচিত এবং যে বুনিয়াদের উপরে আমাদের গোটা মিল্লাতের জন্যে একটি মাত্র শিক্ষাব্যবস্থা রচিত হওয়া আবশ্যক তা এই যে, দ্বীন ও দুনিয়ার বর্তমান পার্থক্য আমরা খতম করব। কারণ দ্বীন ও দুনিয়ার পার্থক্য সৃষ্টির কথা খ্রিষ্টান মতবাদই সমর্থন করে, বৌদ্ধ, হিন্দু এবং যোগী সন্ন্যাসীরাই তা বলে। কিন্তু এ ব্যাপারে ইসলামের ধারণা সম্পূর্ণ বিপরীত। শিক্ষা, রাষ্ট্র এবং সভ্যতার ক্ষেত্রে ধর্ম ও রাজনীতি, অন্য কথায় দ্বীন ও দুনিয়ার মধ্যে পার্থক্য স্বীকারের ন্যায় মারাত্মক ভুল দ্বিতীয়টি হতে পারে না। আমরা একথা মোটেই স্বীকার করি না যে, আমাদের জন্যে দ্বীনী ও বৈষয়িক দু'টি আলাদা শিক্ষাব্যবস্থা থাকবে। বরং আমরা তো এই স্বীকার করব যে, আমাদের গোটা শিক্ষাব্যবস্থা একই সঙ্গে যেমন দ্বীনী বলে গণ্য হবে, তেমনি আমাদের পার্থিব প্রয়োজন মিটাতেও সক্ষম হবে।

পার্থিব এ হিসাবে যে, আমরা দুনিয়াটাকে জানতে পারব এবং দুনিয়ার কাজ আমরা দক্ষতার সাথে চালাতে পারব। অপরদিকে দ্বীনী এ হিসাবে যে, দুনিয়াটাকে আমরা ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিতেই বুঝতে পারব এবং দ্বীনের নির্দেশ অনুসারেই এ ব্যাপারে যাবতীয় কর্তব্য সম্পাদন করতে পারব। ইসলাম তেমন কোন ধর্ম নয় যে, আপনাকে যাবতীয় কাজ নিজের ইচ্ছা অনুসারে করবার

অনুমতি দেবে এবং এর সঙ্গে শুধু কয়েকটি মতবিশ্বাস বা আকীদা ও ইবাদতের পরিশিষ্ট জুড়ে দিলেই চলবে। ইসলাম কখনো মানব জীবনের পরিশিষ্ট হিসাবে ভূমিকা গ্রহণ করে সন্তুষ্ট থাকতে পারে না, কখনো ছিল না এবং এখনো এতে রাজী নয়। সে তো আপনাদের সমগ্র জীবনের নেতৃত্ব করতে চায়। সে গোটা জীবনের কর্মসূচি হিসাবেই সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণের জন্যেই প্রস্তুত। দুনিয়ার সাথে সম্পর্কহীন শুধু উর্ধ্বলোকের কথাই সে বলে না। বরং দুনিয়ার যাবতীয় বিষয়ে পূর্ণরূপে ব্যাপকভাবেই সে আলোচনা করে। ইসলাম আপনাকে বলছে যে, এ দুনিয়ার প্রকৃত রহস্য কি, কোন উদ্দেশ্যে আপনাকে এখানে পাঠানো হয়েছে এবং আপনার জীবনের উদ্দেশ্যই বা কি, এ বিশ্বজগতে আপনার আসল স্থান কোথায়, আপনার মর্যাদা কতখানি, দুনিযার বুকে পার্থিব জীবনে কিভাবে কোন নীতিতে কাজ করতে হবে, তাও সে বলছে। সে আরও বলছে যে, এ দুনিয়াটা আসলে পারলৌকিক জীবনের জন্যে ক্ষেতখামারের মতোই। পরকালে যা কিছু লাভ করবেন, তা সম্পূর্ণরূপে এর উপরেই নির্ভর করছে যে, আপনি কোন ধরনের বীজ এ ক্ষেতে বপন করলেন। এ ক্ষেত কিভাবে চাষ-আবাদ করতে হবে, তাও সে আপনাকে স্পষ্ট ভাষায় বলে দিচ্ছে। সে আপনাকে পরিষ্কাররূপে বলে দিচ্ছে যে, সমগ্র পার্থিব জীবনে আপনার কর্মপন্থা কি হওয়া উচিত– যার ফল আপনি আখেরাতে লাভ করতে সক্ষম হবেন। এ ধরনের একটি দ্বীন এ কথা কিভাবে স্বীকার করতে পারে যে, আপনাদের একটি শিক্ষাব্যবস্থা থাকবে পার্থিব, অন্যটি হবে ধর্মীয়? অথবা একটি পার্থিব শিক্ষাব্যবস্থায় ধর্মীয় পরিশিষ্ট সংযুক্ত করলেই চলবে? সে তো এই-ই চায় যে, আপনাদের গোটা শিক্ষাব্যবস্থাই যেন একমাত্র 'দ্বীনের' আদর্শেই রচিত হয়।

দেশরক্ষা সম্পর্কে মাওলানার মূল্যবান পরামর্শ

মাওলানা একজন সূক্ষ্মদর্শী রাজনীতিবিদ হিসাবে পাকিস্তানের দেশরক্ষা সম্পর্কে যে সুপরামর্শ দিয়েছেন, তা শুধু পাকিস্তান কেন, যে কোন মুসলিম দেশ ও রাষ্ট্রের জন্যে অতীব মূল্যবান। মাওলানা বলেন ঃ

"আপনাদের জানা আছে যে, গোটা পাকিস্তানই সীমান্ত অর্থাৎ বৈদেশিক রাষ্ট্রের সীমান্ত পাকিস্তানের সীমান্তে এসে মিশেছে। এমন একটি বড় শহর নেই, যা সীমান্তে অবস্থিত নয়। এজন্যে প্রয়োজন প্রতিটি নাগরিকের দায়িত্ব উপলব্ধি করা এবং প্রতিটি বিপদের মুকাবিলা করার জন্যে সদা প্রস্তুত থাকা। এমতাবস্থায় যে বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তা হলো, জাতির নৈতিক মনোবল (Morale)। অর্থাৎ জাতির নৈতিক মনোবল না থাকলে যুদ্ধের উপকরণও অর্থহীন হয়ে পড়ে। অস্ত্রশস্ত্র যতই অধিক হোক না কেন, তা নৈতিক শক্তি বা মনোবলের অভাব পূরণ করতে পারে না। বরং নৈতিক শক্তির অভাবে সে সব অস্ত্রশস্ত্র শত্রুর হস্তগত হতে পারে। আমরা নৈতিক শক্তিকে উৎসাহ-উদ্দীপনা, সাহসিকতা ও দেশরক্ষার প্রেরণার মধ্যে সীমিত বলে মনে করি না। বরং এ নৈতিক শক্তি অর্জন করতে হবে সমগ্র জীবনে। কারণ আল্লাহর কাছ থেকে সাহায্য পেতে হলে গোটা জীবনকেই তাঁরই মরযীর অধীন করে দিতে হবে। কোন ব্যক্তি অথবা জাতি একদিকে আল্লাহর নাফরমানীতে লিপ্ত থাকবে এবং অপরদিকে তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করবে, এ এক অযৌক্তিক কথা। যে জাতি খোদাকে মোটেই স্বীকার করে না তারা তাঁর নাফরমানী করেও কিছুকাল টিকে থাকতে পারে। কারণ তার জন্যে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে অবসর প্রদানের আলাদা লাইন রয়েছে। কিন্তু যে জাতি খোদাপুরস্তির আহ্বায়ক, আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ মহাগ্রন্থের ধারক ও বাহক এবং দ্বীনে হকের প্রতিনিধিত্বকারী বলে পরিচিত, তারা যদি খোদার নির্দেশাবলীর প্রতি বিদ্রূপাত্মক ভূমিকা পালন করে, তাহলে দুনিয়ার কোন শক্তি তাদেরকে খোদার শাস্তি থেকে অব্যাহতি দিতে পারবে না। তাদের এহেন ভূমিকা খোদার রহমতের পরিবর্তে অভিশাপ ও শাস্তির আহ্বান জানায়।

নৈতিক মনোবল অক্ষুণ্ন রাখার জন্যে প্রেরণামূলক বক্তৃতা এবং বড় বড় বুলি ও ঘোষণা অর্থহীন হয়ে পড়ে। এসব কথার দ্বারা সাময়িক মনোবল সৃষ্টি

করা হলেও তা স্থায়ী হয় না। কথার পরিবর্তে বাস্তব কাজের মাধ্যমে আমাদের নৈতিক মনোবল বাড়াতে হবে।

"আমাদের আপামর জনসাধারণকে এ নির্দেশ দিতে হবে যে, শত্রুর হামলার সময় যে যেখানেই থাক, তাকে সেখানেই অবিচল থাকতে হবে। পলায়নের চেষ্টা কিছুতেই করা চলবে না। তাদেরকে একথা বুঝিয়ে দিতে হবে যে, মৃত্যু থেকে তারা পালিয়ে থাকতে পারবে না। মৃত্যুর নির্ধারিত সময় এসে গেলে সুদৃঢ় দুর্গের মধ্যে অবস্থান করেও মৃত্যু থেকে আত্মরক্ষা করা যাবে না। যুদ্ধক্ষেত্রে বোমা বর্ষণের সময়েও যদি মৃত্যুর সময় নির্ধারিত হয়ে না থাকে, তাহলে মৃত্যু কিছুতেই আসবে না। আর মুসলমানদের আকীদা-বিশ্বাসই এই যে, মৃত্যু থেকে বেঁচে থাকা কিছুতেই সম্ভব নয়। অতএব এ ধরনের পরিস্থিতিতে আত্মক্ষার জন্যে পলায়ন করা এবং সন্তান-সন্ততিকে বাঁচানোর চেষ্টা করা সব দিক দিয়েই অবাঞ্ছনীয়। লোকদেরকে বলে দেয়া উচিত যে, আমাদের জন্যে এমন নিরাপদ স্থানই বা কোথায় আছে, যেখানে পালিয়ে গিয়ে আমরা বাঁচতে পারি। আসল ব্যাপার এই যে, এসব কাপুরুষ যে কোন জনপদেই যাক না কেন, তারা সেখানকার লোকদের নৈতিক মনোবলও ভেঙ্গে দিবে। শত্রুর তো আত্মরক্ষার যথেষ্ট স্থান আছে। তারা বহুদূর পর্যন্ত পশ্চাদপসরণ করতে পারে। কিন্তু আমাদের জন্যে কোথাও এতটুকু ঠাঁই নেই যেখানে পালিয়ে গিয়ে আমরা নিরাপদে থাকতে পারি। অতএব, আমাদের উচিত যেখানেই থাকি না কেন, অচল অটল থেকে যে কোন পরিস্থিতির জন্যে প্রস্তুত থাকা।

"আর একটি বিষয় যা দেশরক্ষার ব্যাপারে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য তাহলো এই যে, দেশের অভ্যন্তরে অত্যাচার, অবিচার ও অপরের অধিকার হরণ চিরতরে বন্ধ হওয়া উচিত। যদিও এসব সমাজে কোন অবস্থাতেই চলতে থাকা উচিত নয়, কিন্তু বিশেষ করে যুদ্ধের সময় যদি এ ধরনের আচরণ করা হয়, তাহলে আমাদের আত্মরক্ষার দুর্গে ফাটল সৃষ্টি হবে এবং তা শত্রুকে দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে সাহায্য করবে।

"এ এক সাধারণ জ্ঞানের কথা যে, কারো মনে যদি দেশরক্ষার প্রেরণা জাগ্রত হয়, তাহলে এজন্যে হতে পারে যদি সে অনুভব করে যে, সে এমন এক দেশে বাস করে যেখানে তার সকল প্রকার অধিকার ও মানসম্ভ্রম সংরক্ষিত এবং তার আশা-আকাঙ্খার বাস্তবায়ন সম্ভব। কিন্তু তার জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা যদি

এ হয় যে, এ দেশে না তার মানসম্ভ্রম সংরক্ষিত আর না তার ব্যক্তি-অধিকার, তাহলে এমন কোন কারণ থাকতে পারে না যার জন্যে এ দেশের নিরাপত্তার জন্যে তার মধ্যে কোন প্রেরণা সৃষ্টি হতে পারে। যেখানে জনসাধারণ ন্যায় বিচার থেকে বঞ্চিত হয়, অর্থনৈতিক অবিচারে মানুষ অভুক্ত থাকতে বাধ্য হয়, ক্ষমতাসীনদের দ্বারা ক্ষমতাহীনদের ইযযত-আবরু লুণ্ঠিত হয়, সেখানে বৈদেশিক হামলার সময় জনগণের মধ্যে দেশরক্ষার প্রেরণা সৃষ্টি হতে পারে না। কারণ তাদের এমন জিনিস সংরক্ষিত নয় যা তাদের জীবনের চেয়ে অধিকতর প্রিয় এবং যা রক্ষা করা তারা সবচেয়ে প্রয়োজন মনে করে। ইতিহাসে বারবার এ ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়েছে যে, এমন অবস্থায় জনসাধারণ বহিঃশত্রুর আক্রমণের সময় উদাসীনতা অবলম্বন করেছে এবং অনেক সময় উৎপীড়িত জনগণ প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে বৈদেশিক আক্রমণকে স্বাগত জানিয়েছে যাতে যারা তাদের যাবতীয় অধিকার হরণ করেছে স্বচক্ষে তাদের ধ্বংস দেখতে পায়। ইতিহাসের এসব দৃষ্টান্ত থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। অতঃপর আমরা যেন একে অপরের অধিকার সংরক্ষণ করি। আমাদের দেশে যেন পরিপূর্ণ ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হয়। অত্যাচার-অবিচার দেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থা দুর্বল করে দেয়। যে ব্যক্তি আপন ব্যক্তিস্বার্থের জন্যে জনগণের আত্মসম্মানে আঘাত করে, সে প্রকৃতপক্ষে শত্রুর আগমন পথ সুগম করে দেয়।

"আমরা মনে করি এ ভূখণ্ড আমাদের নয়, বরং ইসলামের 'ঘর'। কয়েক শতাব্দীর পর আমাদের এ সুযোগ এসেছে 'দ্বীনে হক'কে তার প্রকৃতরূপে রূপায়িত করার এবং দুনিয়ার সামনে তার সত্যতার সাক্ষ্য প্রদান করার। এ আমাদের জন্যে এক বিরাট দান এবং যে কোন মূল্যে তার রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে আমরা প্রস্তুত। আমরা চাই প্রতিটি মুসলমানের মনে এ দানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার প্রবণতা সৃষ্টি করতে। প্রত্যেকের মন-মস্তিষ্কে এ ধারণা বদ্ধমূল করে দিতে চাই যে, এ দানের সংরক্ষণের জন্যে কোন প্রকার ত্যাগ স্বীকার করতে সে পশ্চাৎপদ হবে না। মনে রাখবেন, আপন বাড়িঘর, ধনসম্পদ, মানসম্মান রক্ষার জন্যে জীবন বিসর্জন অপেক্ষা খোদা ও তার দ্বীনের জন্যে জীবন দান অনেকগুণে শ্রেয়। এই প্রেরণাসহ জীবন দান (শাহাদাত) অতি উচ্চমানের জীবন দান সন্দেহ নেই।"

অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

অর্থনৈতিক প্রচেষ্টায় সমান অধিকার

ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে পৃথিবী ও তন্মধ্যস্থ যাবতীয় বস্তু আল্লাহ তায়ালা মানুষের জন্যেই সৃষ্টি করেছেন। অতএব এ যমীন থেকে আপন জীবিকা অর্জনের চেষ্টা মানুষের জন্মগত অধিকার। সকল মানুষই সমানভাবে এ অধিকারের অংশীদার। এ অধিকার থেকে কাউকে বঞ্চিত করা যেতে পারে না। আর না এ ব্যাপারে কেউ অন্যের চেয়ে প্রাধান্য লাভ করতে পারে। ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে কোন ব্যক্তি, বংশ বা শ্রেণীর প্রতি এ বিধি নিষেধ আরোপিত হতে পারে না যে, জীবিকার উপাদানসমূহের মধ্যে কিছু ব্যবহার করার অধিকার তার থাকবে না অথবা কোন পেশা অবলম্বনের পথ তার জন্যে বন্ধ করে দেয়া হবে। অনুরূপভাবে শরীয়ত অনুযায়ী এ ধরনের পার্থক্যকরণও করা যেতে পারে না, যার ভিত্তিতে জীবিকার উপায় অথবা ধন-দৌলতের দুয়ার বিশেষ শ্রেণী, বংশ অথবা পরিবারের জন্যে একচেটিয়া হয়ে যাবে। খোদার সৃষ্ট যমীনে তাঁরই সৃষ্ট উপায়-উপাদানে স্বীয় অধিকার আদায়ের প্রচেষ্টায় প্রত্যেকের সমান অধিকার রয়েছে এবং এর পথ সকলের জন্যে সমভাবে উন্মুক্ত।

(ইসলামী অর্থনীতির মূলনীতি)

অর্থনৈতিক সমস্যা ও ইসলাম

ইসলাম প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধন সঞ্চিত রাখাকে দূষণীয় মনে করেছে। তার দাবি এই যে, যা কিছু ধন তোমার আছে তা তোমার প্রয়োজন পূরণে ব্যয় কর অথবা অন্যকে দান কর যাতে সে তার প্রয়োজনে ব্যয় করতে পারে। এভাবে সমগ্র ধন সমাজের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে আবর্তিত হতে থাকবে। কিন্তু এমন করা না হলে এবং একত্রে সঞ্চিত করার জেদ করা হলে এ সঞ্চিত ধনের শতকরা আড়াই ভাগ তার থেকে বের করে তা এমন লোককে দিতে হবে যারা জীবিকা অর্জনে সক্ষম নয় অথবা জীবিকা অর্জনের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও প্রয়োজন পূরণ করতে পারে না। এই হলো 'যাকাত ব্যবস্থা'। যাকাত ব্যবস্থাপনার যে পরামর্শ ইসলাম দেয় তা হলো এই যে, তাকে জনসাধারণের ধনভাণ্ডারে (Public Exchequer)

জমা দিতে হবে, যেখান থেকে সকল অভাবগ্রস্তের প্রয়োজন পূরণ করা হবে। এ হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে সমাজের জন্যে আর্থিক নিরাপত্তার (Social Insurance) সর্বোত্তম পন্থা এবং সামাজিক সাহায্য বিতরণের কোন সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা না থাকার কারণে যে অনাচার হয়ে থাকে, এ যাকাত ব্যবস্থা তার মূলোৎপাটন করে।

কোরআন-হাদীসে এ সবের বিস্তারিত বিধি ব্যবস্থা দেয়া হয়েছে। মাওলানা তাঁর 'যাকাতের হাকীকত' গ্রন্থে এ সবের যুক্তিপূর্ণ ও মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন।

মাওলানা বলেন ঃ

'বায়তুল মাল' সর্বদা আপনার সাহায্যদাতা হিসাবে বিদ্যমান থাকে, যার জন্যে আপনার চিন্তার কোন কারণ থাকতে পারে না। আপনি অভাবগ্রস্ত হলে বায়তুলমালের সাহায্যপ্রার্থী হোন এবং স্বীয় হক আদায় করুন। এর পরে ব্যাংক ড্রাফট ও ইনসিউরেন্স পলিসির কোন প্রয়োজন নেই। আপনি পুত্র পরিজন ছেড়ে নিশ্চিন্ত মনে দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করুন। সমাজের ধনভাণ্ডার আপনার মৃত্যুর পর তাদের ভরণপোষণের জন্যে দায়ী। বার্ধক্য ও সকল প্রকার বিপদে আপদে বায়তুল মাল আপনার সকল সময়ের সাহায্যকারী যেখানে আপনি সাহায্য চাইতে পারেন। পুঁজিপতি আপনাকে বাধ্য করতে পারবে না যে, তারই শর্তাধীন আপনাকে কাজ করতে হবে। বায়তুলমাল বিদ্যমান থাকতে অভুক্ত ও বিবস্ত্র হয়ে অসহায় অবস্থায় জীবন যাপন করার কোন আশংকা থাকতে পারে না।

[অর্থনৈতিক সমস্যা ও তার সমাধান (উর্দূ) পৃঃ ৪০, ৪৩]

অর্থনীতির বিশদ বিশ্লেষণ করে মাওলানা 'সূদ' ও 'ইসলাম ও আধুনিক অর্থনৈতিক মতবাদ' নামে দু'খানি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন। অর্থনীতির উপরে প্রামাণ্য মূল্যবান গ্রন্থ এ দু'খানি।

'সূদ' গ্রন্থে সূদভিত্তিক অর্থনীতি ও সূদহীন ইসলামী অর্থনীতির বিশদ আলোচনার পর ইসলামী অর্থনীতিকেই মানব জাতির জন্যে একমাত্র মঙ্গলকর অর্থব্যবস্থা হিসাবে প্রমাণ করেছেন।

দ্বিতীয় গ্রন্থে পুঁজিবাদ, কমিউনিজম ও ইসলামের তুলনামূলক আলোচনা করে প্রথম দুটি ব্যবস্থার অন্তঃসারশূন্যতা প্রমাণ করেছেন। জায়গীরদারী সামন্তবাদী ব্যবস্থা, ইউরোপীয় রেনেসাঁ, মধ্যযুগের লিবারেলিজম, শিল্প বিপ্লব ও আধুনিক লিবারেলিজমের ক্রটি-বিচ্যুতি তুলে ধরেছেন। অতঃপর আধুনিক অর্থ সমস্যার ইসলামী সমাধানও পেশ করেছেন।

অন্যান্যের দৃষ্টিতে মাওলানা মওদূদী

মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী সম্পর্কে অনেক বিজ্ঞ ও মনীষীগণের মন্তব্য রয়েছে, রয়েছে তার ঘনিষ্ঠজনের অনুভূতি যা অনেক শিক্ষনীয় এবং অনুসরনীয়। তার কিছু নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ

বেগম মওদূদী

মওদূদী সাহেব একজন সাধারণ মানুষ। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাঁকে কোরআন এবং নবী চরিত্রের যে মাহাত্ম্য দান করেছেন, তাতে বিনা দ্বিধায় একথা বলা যায় যে, তাঁর প্রতিটি কার্যকলাপ কোরআন সম্মত।

"আমি ছিলাম গুমরাহ। মওদূদী সাহেব আমার সামনে উদিত হন 'সিরাতুল মুস্তাকীমের' রাহবার হিসাবে। তিনি ছিলেন নির্বাক, কিন্তু তাঁর কার্যকলাপই প্রতিমুহূর্তে সত্য পথের দিকে অনুপ্রেরণা যোগাতো। যদি তিনি মুখ খুলতেন, আমার প্রত্যেক কাজে বাধা দিতেন এবং প্রতিটি বিষয়ে অঙ্গুলি নির্দেশ করতেন, তাহলে আমার সংশোধন তো দূরের কথা, তাঁর সাথে জীবন যাপন করাও আমার পক্ষে হয়তো সম্ভব হতো না। কিন্তু তা তিনি করেননি কোনদিন। এটাই ছিল তাঁর ইসলাম প্রচারের বিজ্ঞানসম্মত পন্থা, যা তিনি শিক্ষা করেছিলেন কোরআন পাক থেকে।

"তিনি ছিলেন দূরদৃষ্টি সম্পন্ন, ধৈর্যশীল ও স্নেহশীল। আমার স্মরণ নেই যে, তিনি বিগত পনেরো বিশ বছর 'আমর-বিল মারূফ' ও 'নাহী আনিল মুনকার' সম্পর্কে আমার প্রতি কোন কঠোর আদেশ করেছেন কি না। তাঁর চরিত্রের মাধুর্যই এই যে, কিছুকাল তাঁর সংস্পর্শে থাকলেই তাঁর মনঃপূত হওয়া যায়।"

"মওদূদী সাহেব বাহ্যিক সংশোধন অপেক্ষা আধ্যাত্মিক সংশোধনের প্রতি অধিকতর দৃষ্টি রাখেন। একবার তিনি কোথা হতে এসে শ্রান্ত-ক্লান্ত দেহে শুয়ে পড়েন। এমন সময় আগন্তুক তাঁর সাথে দেখা করতে চাইলেন। আমি বললাম যে, তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন। একথা শুনে মওদূদী সাহেব শুধু এতটুকু বললেন, 'তুমি মিথ্যা কথা বলে ফেললে'?"

“একবার আমরা সবাই এক সঙ্গে খেতে বসেছি। আমি বড় ছেলেকে বলছিলাম, ‘ব্যাটা, নামায পড়ো। নতুবা লোকে বলবে মওদূদী সাহেবের ছেলে নামায পড়ে না’।”

“তিনি বললেন, দেখ ব্যাটা, যখন নামায পড়বে, তখন একমাত্র আল্লাহর জন্যেই পড়বে, পিতার জন্যে না।”

“সন্তানের প্রতি এত স্নেহশীল যে, এমনটি আর কাউকে দেখিনি। যখনই তিনি বাড়িতে আসেন, প্রত্যেকের নাম ধরে ধরে ডাকতেন। দারুল ইসলামে আমাদের একটা টাঙা ছিল। তিনি নিজেই আমাকে এবং ছেলেদের নিয়ে সন্ধ্যার আগে বেড়াতে যেতেন। অন্য কারো সঙ্গে তাদের কখনো কোন স্থানে পাঠাতেন না, পাছে কেউ হঠাৎ টাঙা থেকে পড়ে যায়। একবার কি কারণে কোচওয়ানের সঙ্গে ছেলেদের পাঠানকোট পাঠিয়েছিলেন। অতঃপর তিনি নদীর ধারে বেড়াতে যান। মাগরিবের আগেই নদীর ধার থেকে ফিরে এসে জানতে পারলেন যে, ছেলেরা তখনও ফিরেনি। তখন তিনি বাড়ির ভিতরে না এসে বাইরেই ঘন্টার পর ঘন্টা বসে রইলেন। ছেলেরা ফিরে এলে, তবে তাদের নিয়ে তিনি ভেতরে এলেন।”

“সতেরো বছর বয়সে মওদূদী সাহেব পিতৃহীন হন। আল্লাহর অনুগ্রহে মা এখনও বেঁচে আছেন।” *

“তিনি মায়ের এতদূর খেদমত করেন যে, এমন পুত্র সত্যিই বিরল। মায়ের কোন কিছু তাঁর মনঃপূত না হলে নীরব থাকেন। কোনরূপ বিরক্তিও প্রকাশ করেননি। তাঁকে কোন মন্দ বললেও তিনি মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখেন না। প্রতি মুহূর্তে তাঁর খেদমতের জন্যে প্রস্তুত থাকেন।

“আমার পূর্ব পুরুষ বাদশাহ শাহজাহানের আমলে বোখারা থেকে দিল্লী আসেন। তখন থেকে পুরুষানুক্রমে দিল্লীতে বসবাস করার ফলে আমরা শহুরে জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ি। মাওলানা মওদূদী হায়দারাবাদ থেকে দারুল ইসলামে আসার পর আমার জীবনের এক নতুন অধ্যায় শুরু হয়।”

“আমাদের পরিবারসহ মাত্র তিনটি পরিবার নিয়ে দারুল ইসলামের বসতি শুরু হয়। সাদাসিধে গ্রাম্য ঘরবাড়ি। না সেখানে বৈদ্যুতিক আলো আছে,

* বেগম মওদূদীর উপরোক্ত উক্তির পর ১৯৫৭ সালে মাওলানা মওদূদীর মাতা জান্নাতবাসী হন।

না পানির কল এবং না জীবন যাপনের অন্যান্য সহজ উপায়-উপাদান। এটা ছিল আমার জীবনে ধৈর্য্যশীলতার প্রাথমিক স্তর।"

"একবার আমাদের ঘরে জ্বালানী কাঠ ছিল না। মাওলানা সকালে নাশতা করে অফিসে চলে যান। তখন আমি বসে বসে ভাবতে লাগলাম কি করি। এমন সময়ে মাওলানা অন্দরে এসে বললেন, 'ব্যাপার কি, এমন চুপচাপ বসে রয়েছ যে?'

বললাম, 'জ্বালানী কাঠ নেই, পাচিকা বসে আছে।' তিনি বললেন, ব্যাস এতটুকুতেই অধীর হয়ে পড়েছ? এই বলে একটা কুঠার হাতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। ঘরের বাইরে কতকগুলি কাষ্ঠখণ্ড পড়েছিল। তা নিজ হাতেই ফাড়তে শুরু করলেন। কুঠারের দু'এক ঘা মারতেই চারদিক থেকে লোকজন ছুটে এলো এবং অল্পক্ষণের মধ্যে জ্বালানি কাঠের স্তূপ হয়ে গেল।"

"এমনি একদিন কি কারণে ভিস্তিওয়ালা পানি দেয়নি। সেদিন ছিল আবার ভয়ানক গরম। আমি তো মাথায় হাত দিয়ে বসে রইলাম। মাওলানা জানতে পেরে দু'টি বালতি হাতে কূপে চলে গেলেন এবং নিজ হাতেই পানি তুলে বালতি ভরতে লাগলেন। লোকজন তা দেখতে পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে পানিতে বাড়ি-ঘর ভরে দিল।"

মাহিরুল কাদিরী

পাক-ভারতের বিখ্যাত কবি ও সাহিত্যিক এবং মাসিক পত্রিকা 'ফারান'র সম্পাদক জনাব মাহিরুল কাদিরী বলেন ঃ

"আমি মাওলানার প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করি। আমার বিশ্বাস, লেখনী ও বক্তৃতার মাধ্যমে তিনি দ্বীনের যে খেদমত করছেন, বর্তমান যুগে তার তুলনা বিরল। এমন কি আরব দেশগুলিতেও তার তুলনা নেই।"

মাওলানা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি বলেন ঃ

"তিনি ইসলামী জগতের শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ। তিনি মুসলমানদের মধ্যে সত্যিকার ইসলামী গবেষণার সূত্রপাত করেছেন এবং মানুষের চিন্তাধারায় পরিবর্তন আনয়ন করেছেন– যিনি কোরআন ও সুন্নাহর ভাষ্যকার, সত্যের সহায়ক, সত্যবাদিতার

বেগম মওদূদী মাহমুদা খাতুন ২০০৩ সালের ৪ এপ্রিল ইন্তেকাল করেন।

মূর্ত প্রতীক– ইসলামী ঐতিহ্যের অস্পষ্ট চিত্রাবলীর রূপদানকারী, আল্লাহ্‌র দ্বীনের একনিষ্ঠ সেবক, যাঁর কথা ও কাজে পূর্ণ বিশ্বাস করা যায়, যাঁর সমগ্র যৌবনকাল দীনের কাজে উৎসর্গীকৃত এবং তাঁরই চিন্তা গবেষণায়, শ্রম ও সাধনায় যিনি অকালবৃদ্ধ– যাঁর কথা ও লেখা শতাব্দীর এক-চতুর্থাংশ কাল যাবত সত্যের আহ্বান জানিয়ে আসছে, এত বড় বিজ্ঞ আলিম– যিনি একই সময়ে কোরআন-হাদীস, ফিকাহ্, ইলমে কালাম, দর্শন, ইতিহাস, অর্থনীতি, শাসনতন্ত্র, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে গবেষণামূলক আলোচনা করতে পারেন– যিনি যুক্তির সম্রাট এবং জ্ঞানের সাগর, শুধু প্রাচ্যেরই নন পাশ্চাত্যের চিন্তাধারার সাথেও যিনি শুধু পরিচিতই নন বরং তাকে পরীক্ষা ও যাচাই করে দেখেছেন, যিনি আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপন এবং রাসূল (সাঃ)-এর আনুগত্য পালনের আহ্বায়ক, মুলতান জেলের প্রাচীর চতুষ্টয় ও লাহোর দুর্গের অন্ধকার ফাঁসিকক্ষ যাঁর আন্দোলন স্তব্ধ করতে পারেনি, কুফরের ফতোয়াবাজি যাঁর কণ্ঠরোধ করতে পারেনি, যিনি কোরআন ও সুন্নাহর কষ্টিপাথরে প্রত্যেক কথা ও কাজকে যাচাই-পর্যালোচনাকারী এবং কষ্টিপাথরে যা কিছুই ধরা পড়ুক তা যত বড় বিদ্বান পণ্ডিতের বেলায় হোক না কেন, নির্ভয়ে প্রকাশকারী, দ্বীনের প্রতিষ্ঠা যাঁর ব্রত, সত্যের আহবান যাঁর কর্মসূচী এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি যাঁর লক্ষ্য– সত্য প্রচারের জন্যে যিনি সমগ্র জগতের রোষানলে ভীত শঙ্কিত নন এবং স্বীয় সুনাম নষ্টের ভয়ও যার নেই– অজ্ঞ-অর্বাচীনরা তাঁর প্রতি নানা প্রকারের অপবাদ করলেও যিনি সবকিছুই ধৈর্য সহকারে উপেক্ষা করেছেন, যাঁর লেখনী উর্দূ সাহিত্যকে সমৃদ্ধ ও পবিত্র করেছে এবং উর্দূ ভাষার অমূল্য অবদান হয়ে রয়েছে– বক্তৃতায় এক অভিনব প্রকাশ ভঙ্গিমার যিনি উদ্ভাবক এবং বক্তৃতাকালে মনে হয় যেন থমথমে আকাশ থেকে ঝটিকাপ্রবাহ ও বিদ্যুতমালার স্ফূরণ– যাঁর নামে 'কাদিয়ানীবাদ' প্রকম্পিত ও হাদীস অবিশ্বাসকারীদের শ্বাসরোধ শুরু হয়, যিনি সুন্নাতের পরিপোষক ও শির্ক-বিদয়াতের মূলোৎপাটক, যিনি জ্ঞান গরিমা ও অসাধারণ খ্যাতি থাকা সত্ত্বেও সাধারণ লোকের সঙ্গে বিনা-লৌকিকতায়, সরলতা ও মিষ্ট মধুর ভাষায় এমনভাবে মিশতে পারেন যেন অপরের সঙ্গে তাঁর কোন পার্থক্যই থাকে না, যিনি শুধু একজন আলিম, চিন্তাবিদ, বাগ্মী এবং গ্রন্থকারই নন, বরং এমন এক মর্দে মুজাহিদ মৃত্যুদণ্ডাদেশ শ্রবণেও যাঁর কোন প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় না– তিনি ইতিহাস-সৃষ্ট নন, বরং ইতিহাস-স্রষ্টা।"

বশীরুল ইবরাহিমী

আলজিরিয়ার জননেতা এবং তথাকার জমিয়তে উলামায়ে মুসলিমীনের সভাপতি আল্লামা মুহাম্মদ আল-বশীরুল ইবরাহিমী বলেন–

“তাঁর মত (সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী) মানুষ আমি খুব কমই দেখেছি। বিশেষ করে তাঁর মত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও গুণসম্পন্ন ব্যক্তি, যিনি আলেম সমাজে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন– আমি অতি অল্পই দেখেছি। তাঁর গুণপনার মধ্যে বিশেষ গুণ এই যে, তিনি সত্যের উপর অচল-অটল, সত্যপথে ধৈর্যশীল এবং শাসকশ্রেণীর তোষামোদ করা তো দূরের কথা, তাঁদের সাহায্য লাভেরও বিরোধী।

“পাকিস্তান ও হিন্দুস্তানে আমি যাঁদেরকে দেখেছি এবং যাঁদের সম্পর্কে জানতে পেরেছি, ইসলামী শরীয়ত ও ইসলামী ইতিহাসের তথ্যাদি সম্পর্কে তিনি সকলের চেয়ে অধিক জ্ঞান রাখেন। তাঁর অধ্যয়ন অত্যন্ত ব্যাপক ও গভীর। তিনি সূক্ষ্ম বোধশক্তি, উচ্চতম মস্তিস্ক, স্বচ্ছ চিন্তাশক্তি ও গভীর জ্ঞানের অধিকারী।

“আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতা সম্পর্কে মাওলানা মওদূদী যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করেছেন। সকলকে তিনি ন্যায়ের কষ্টিপাথরে যাচাই করেন।

“বিগত মাসে পাকিস্তানে বিশেষ উত্তেজনার সৃষ্টি হয় এবং কিছু খুন-খারাবীও হয়। আরব দেশের সংবাদপত্রগুলো এ সম্পর্কে কোন বিস্তারিত সংবাদ পরিবেশন করেনি বলে আমি এর কারণ ও গুঢ় রহস্য বুঝতে পারিনি। তবে আমার সুস্পষ্ট ধারণা এই যে, ইসলামী শাসনতন্ত্রের দাবিই এ সবের মূলীভূত কারণ। সম্ভবত গভর্নমেন্ট দেশের মধ্যে মাওলানা মওদূদী এবং তাঁর সহকর্মীগণের ক্রমবর্ধমান প্রভাব লক্ষ্য করে অধিকাংশ সহকর্মীকে কারারুদ্ধ করেছেন। অতঃপর লাহোরে সামরিক আইন জারি করে সামরিক বাহিনীর উপরই সকল ভার ন্যস্ত করা হয়। সামরিক আদালত মাওলানাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করে। পরে জানতে পারলাম মৃত্যুদণ্ড রহিত করে চৌদ্দ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেয়া হয়। পাকিস্তানের মুসলমানগণ এই জুলুমশাহীর সিদ্ধান্তে বিক্ষুব্ধ হয়ে পড়েন এবং সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও শোভাযাত্রার তুমুল ঝড় উত্থিত হয়। দেশময় বিক্ষোভের ফলেই যে মৃত্যুদণ্ড মওকুফ করা হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই।

ওদিকে মিসর, সিরিয়া, ইরাক, কুয়েত প্রভৃতি স্থানের সুসংগঠিত ইসলামী প্রতিষ্ঠান ও আনজুমানগুলোর পক্ষ থেকেও প্রতিবাদ উত্থিত হয় এবং পাকিস্তান সরকারের প্রতি তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়। আমি যখন কুয়েতে ছিলাম, তখনই এসব সংবাদের সত্যতা জানতে পারি। এসব প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকার কারণে এবং জমিয়তে উলামা ও এদের মধ্যে পারস্পরিক সম্মানবোধের ভিত্তিতে আমিও বিক্ষুব্ধ ও ব্যথিত হয়ে পড়েছি। কারণ মাওলানা মওদূদীর ব্যক্তিত্ব কোন এক বিশেষ অঞ্চলে সীমাবদ্ধ নয়। বরং তাঁর ব্যক্তিত্ব মুসলিম জাহানের অনুসরণযোগ্য। আমাদের প্রতি তাঁর যে হক আছে, তার মধ্যে একটি এই যে, গভর্নমেন্ট যখন তাঁকে মৃত্যুদণ্ডের পরিবর্তে সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন, তখন তাঁর মুক্তির জন্যে আন্দোলন করা আমাদের কর্তব্য। ---"

"মাওলানা মওদূদী আল্লাহর পথে যে জিহাদের অভিযান শুরু করেছেন, তার জন্যে এ জগতে এতটুকু প্রতিদানই যথেষ্ট যে, দুনিয়ার মুসলমান তাঁর সাহায্য-সহযোগিতার জন্যে একতাবদ্ধ হয়েছেন। এর চেয়ে বিরাট ও চিরস্থায়ী প্রতিদান তাঁর জন্যে আল্লাহর নিকট গচ্ছিত আছে।"

ডাঃ মুহম্মদ আতাউর রহমান নদভী

'এতো ইবনে তাইমিয়ারই রঙ।'

আজ থেকে পনেরো বছর আগে একখানি পবিত্র মুখ থেকে আমি উক্ত কয়েকটি কথা শুনতে পেয়েছিলাম। যে মর্মস্পর্শী ভঙ্গিমায় কথাগুলো শুনেছিলাম, সে দৃশ্য অবিকল সুরক্ষিত অবস্থায় আমার চোখের সামনে ভাসমান রয়েছে। মনে হয় যেন এখনও সেই মুখমণ্ডল আমি দেখতে পাচ্ছি এবং সেই মর্মস্পর্শী কথাগুলো আজো আমার কর্ণকুহরে ঝংকৃত হচ্ছে।

সব কথা খুলে বলাই শ্রেয় মনে করি।

আমি ১৯৩০ সাল থেকে ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসায় পাঠাভ্যাস করছিলাম। ১৯৩৫ সালে দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামায় (লাখনো) ভর্তি হই। এ সময়ে 'তর্জুমানুল কোরআন দেখার আমার সুযোগ হয়েছিল। আমার মনের অবস্থা এমন হয়েছিল যে, তর্জুমানুল কোরআন' পাঠ করা আমার এক স্বাভাবিক চাহিদা হয়ে পড়েছিল।

গ্রীষ্মের বন্ধে যখন আমি বাড়ি যাই (মৌজা– পাহাড়পুর বাজার, পোঃ বড় হরিয়া, সারন) তখন তর্জুমানুল কোরআন সঙ্গে করে নিয়ে যাই। অতঃপর অতি আগ্রহে আমি আমার মুহতারাম পিতার নিকটে উক্ত পত্রিকার বিষয় উত্থাপন করি। তিনি তা দেখার আগ্রহ প্রকাশ করেন।

আমার পিতা জনাব মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ জামিল আনসারী (রহঃ) একজন সত্যনিষ্ঠ দ্বীনের আলেম ছিলেন। তিনি সমগ্র জীবন অধ্যাপনায় কাটিয়ে দেন। তিনি শুধু অধ্যাপকই ছিলেন না বরং একজন মুফতীও ছিলেন। তিনি ১৯১৭ সাল থেকে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসার অধ্যাপক এবং এর দারুল ইফতার মুফতী ছিলেন।

"তর্জুমানুল কোরআনের" যতগুলি সংখ্যা আমার কাছে ছিল, তার সবই পিতার খেদমতে হাযির করলাম। এসব দেখে তিনি সর্বপ্রথম যে মন্তব্য করেন তা হচ্ছে এই– মিঞা, এসবই কোরআন এবং সুন্নায় আছে। এখন শুধু তার আমলের প্রয়োজন। সাধারণ ইংরেজী শিক্ষিত লোকে এসব বিষয়ে তাঁদের পত্র-পত্রিকায় লিখে থাকেন, কিন্তু নিজেরা তা মেনে চলেন না।"

'উনিশ শ' ছত্রিশ সালের ছুটিতে যখন বাড়ি আসি, তখন 'তর্জুমানুল কোরআনের' সদ্য প্রকাশিত সংখ্যা এনে পিতাকে দিলাম। তিনি তা বেশ মনোযোগ সহকারে পাঠ করে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'আমার বিরাট ভুল ধারণা ছিল। এ ব্যক্তি (মওদূদী) শুধু ইংরেজী শিক্ষিতই নন, বরং আরবী ভাষায়ও মহাপণ্ডিত। আচ্ছা, তাঁর বয়স কত?'

আমি বললাম, 'খুব সম্ভব ত্রিশ-বত্রিশ হবে।'

তিনি অবাক হয়ে বললেন, 'এত অল্প বয়সে এতখানি পাণ্ডিত্য ও যোগ্যতা? তাঁর পত্রিকা পাঠ করলে অবাক হতে হয়।'

"আমি মাওলানা মওদূদী সাহেবকে সবকিছু জানিয়ে দিলাম। তিনি তখন পাঠানকোটে এসে পড়েছিলেন। মাওলানা প্রত্যুত্তরের সঙ্গে 'সিয়াসী কাশ্‌মকাশ্‌, 'দীনিয়াত' প্রভৃতি গ্রন্থাবলী পাঠিয়ে দিলেন। আমার বুযুর্গ পিতা মরহুম এসব গ্রন্থ বারবার পাঠ করেন এবং বলেন, 'এ ব্যক্তি সম্পর্কে আমার ভ্রান্ত ধারণা ছিল। আল্লাহ আমাকে মাফ করুন। এত অবিকল আল্লামা ইবনে তাইমিয়ারই রঙ। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এমন এক কালে যখন প্রকৃত প্রতিভাবান ব্যক্তি বিরল এবং বিশেষ করে এই হিন্দুস্তানে, এই ব্যক্তির কেমন

করে আবির্ভাব হলো? ইনি যখন এর আদর্শ কার্যকর করতে থাকবেন, তখন তাঁর সাথে চরম বিরোধিতা শুরু হবে। কারণ পৃথিবীতে সত্যনিষ্ঠ ও সত্যাশ্রয়ী ব্যক্তির সাথে এরূপ ব্যবহারই হয়ে থাকে। এমনও হতে পারে যে, তঁকে শহীদ করা হবে।'

এ সময় হতে 'তর্জুমানুল কোরআন' পাহাড়পুর বাজার, আনসারী কুতুবখানার ঠিকানায় নিয়মিত আসতে লাগলো। পিতা ছুটিতে কলকাতা থেকে বাড়ি এলে তা অবসর সময় মনোযোগ দিয়ে পড়তেন। অবশেষে একটি আদর্শবাদী দল গঠনের আবশ্যকতা সম্পর্কে যখন 'তর্জুমানুল কোরআনের' সম্পাদকীয় প্রবন্ধে মাওলানা মওদূদী ইঙ্গিত করতে আরম্ভ করেন, তখন আমার বযুর্গ পিতা বলেন–

'যদি এ দল গঠিত হয়, তাহলে এর প্রথম সদস্য আমি হবো।'

কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয়, উক্ত দল (জামায়াতে ইসলামী) কায়েম হবার মাত্র দশ দিন পূর্বে (১৬ই আগস্ট, ১৯৪১ সাল) আমার পিতা জান্নাতবাসী হন। আল্লাহ তাঁকে রহম করুন।

এ সময়ে আল্লামা সাইয়েদ সোলায়মান নদভী (রহঃ) এক বিরাট জনসভায় মাওলানা মওদূদীর বিরাট ব্যক্তিত্বের কথা ঘোষণা করেন।

উনিশ শ' চল্লিশ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষে দারুল উলুমের প্রক্তন ছাত্রদের "নদভী সম্মেলন" হয়। আমি ১৯৩৯ সালে নদওয়ার দারুল উলুম থেকে সনদপ্রাপ্ত হয়েছিলাম। অতএব "নদভী সম্মেলনে" যোগদান করার জন্যে আমিও লাখ্‌নো গিয়েছিলাম। এ সম্মেলনে যোগদানের ব্যাপারে যা আমাকে বিশেষ অনুপ্রেরণা দিয়েছিল তা এই যে, ঠিক ঐ সময়ে মাওলানা মওদূদীরও লাখ্‌নো আসার কথা ছিল। আমার মত নদওয়ার অন্যান্য প্রাক্তন ছাত্রদেরও মাওলানার সাথে আলাপ করার বিশেষ আগ্রহ ছিল। সম্মেলন শেষে মাওলানা মওদূদী নদওয়ার মেহমানখানায় তাশরীফ আনেন। সকল শিক্ষক এবং প্রাক্তন ছাত্র তাঁর সাথে আলাপ-আলোচনা শুরু করেন। নদওয়ার কতৃপক্ষ সুধীবৃন্দ এবং ছাত্রদের সম্মুখে বক্তৃতা করারজন্যে মাওলানা মওদূদীকে অনুরোধ করেন। লাখ্‌নোর আঞ্জুমানে ইত্তেহাদ তোলাবার পক্ষ থেকে সভার আয়োজন করা হয়। এই আঞ্জুমানটি ছিল লাখনো বিশ্ববিদ্যালয় এবং নদওয়ার ছাত্র প্রতিষ্ঠানগুলির দ্বারা গঠিত। মাওলানা মওদূদী 'নতুন শিক্ষা ব্যবস্থা' সম্পর্কে তাঁর বিশিষ্ট ভঙ্গিমায়

বক্তৃতা করেন। মাওলানা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী সভাপতিত্ব করেন এবং আল্লামা সাইয়িদ সোলায়মান নদভী মাওলানার পরিচয় করিয়ে দেন। যে কথা ও যে ভাষায় জনাব সাইয়েদ সাহেব মাওলানার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন তা আজো আমার কর্ণকুহরে ঝংকৃত হয়। তিনি বলেছিলেন--

আমি আপনাদের সামনে একটি যুবক অথচ এক জ্ঞান সমুদ্রের পরিচয় করিয়ে দিতে দাঁড়িয়েছি। আজ সমগ্র শিক্ষিত জগত মাওলানা মওদূদীর পরিচয় লাভ করেছে। তিনি বর্তমান যুগে ইসলামের একজন মুখপাত্র এবং দীনের একজন বিরাট আলেম। ইউরোপ থেকে ধর্মদ্রোহিতা এবং নাস্তিক্যবাদের যে প্রবল বন্যা ভারত পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে, তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলবার দায়িত্ব আল্লাহ্ তায়ালা এই পবিত্র হস্তেই ন্যস্ত করেছেন। তিনি ইউরোপের প্রাচীন ও আধুনিক চিন্তাধারা সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান লাভ করেছেন। শুধু তাই নয়, কোরআন এবং সুন্নাহ সম্পর্কেও তিনি এমন গভীর জ্ঞানের অধিকারী যে, তারই পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান যুগের সকল সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান তিনি পেশ করতে পারেন। এ জন্যেই বড় বড় নাস্তিক ও খোদাদ্রোহী তাঁর অকাট্য যুক্তি-তর্কের সম্মুখে নতি স্বীকার করেছে। একথা দ্বিধাহীন চিত্তে স্পষ্ট ভাষায় বলা যেতে পারে যে, ভারত এবং ইসলামী জগতের মুসলমানগণ দীনের ব্যাপারে মাওলানা মওদূদীর কাছে বিরাট কিছু আশা করতে পারে।

আগা সুরেশ কাশমীরী

মাওলানা মওদূদীই একমাত্র ব্যক্তি যিনি পাকিস্তানের মানসিক প্রতিভাকে জ্ঞানের রাজপথ প্রদর্শন করেছেন।

যে সময়ে আমাদের ইসলামী ভাবধারা দু'শত বছরের পরাধীনতার নাগপাশে পরিত্যক্ত হয়েছিল, সে সময়ে তিনিই ইসলামকে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন দর্শন হিসাবে পেশ করেছেন।

তাঁর আন্দোলন এমন একটি শক্তি, যা আধুনিক ইউরোপীয় দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিরোধ করতে সক্ষম।

তাঁর চিন্তাধারার মধ্যে ইসলামের এতখানি প্রাণশক্তি বিদ্যমান যে, বর্তমান যুগের নব্য যুবকদল তা মনেপ্রাণে গ্রহণ করতে উদ্যোগী হতে পারে।

দেশের নিত্য পরিবর্তনশীল শাসনযন্ত্র আইনের বলে দেশের স্থূল দেহিক বিপ্লব কিছুকালের জন্যে দমন করতে পারে। কিন্তু মানসিক বিপ্লব দমন করার কোন শক্তি অথবা অস্ত্রশস্ত্রাদি তার নেই। আমাদের সমাজ জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে কতিপয় বিশেষ কারণে ইসলামের বিপক্ষে এক মানসিক বিপ্লব গড়ে তুলেছে। এর গতিরোধ করার যদি কারো সাধ্য থাকে, তা একমাত্র মাওলানা মওদূদী এবং তাঁর আদর্শভিত্তিক দলেরই আছে।

মাওলানা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী

পাঠকদের কাছে তর্জুমানুল কোরআন সম্পাদকের পরিচয় দান নিষ্প্রয়োজন। তাঁর প্রশস্ত দৃষ্টিভঙ্গি এবং বিরাট দ্বীনী খেদমতের কথা তর্জুমানুল কোরআনের পৃষ্ঠায় বারবার আলোচনা করা হয়েছে। বর্তমান যুগের অশান্তি-অনাসৃষ্টি প্রতিরোধের জন্যে আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর বক্ষকে বিশেষভাবে প্রশস্ত ও উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। তাঁর লেখা প্রতিটি ছত্র আধুনিক শিক্ষিতদের জন্যে অমৃতস্বরূপ। এ ব্যাপারে উলামা সমাজে মাওলানার স্থান অতি উচ্চে। তিনি প্রকৃতপক্ষে মিল্লাতের চিন্তাশীল পুরুষ।

মাওলানা মানাযের আহ্সান গিলানী

মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী সাহেবের সুস্থ প্রকৃতি, সুষ্ঠু চিন্তাশক্তি এবং গভীর অন্তর্দৃষ্টির প্রতি আমার চিরদিনই আস্থা রয়েছে। তাঁর আচার-আচরণ খোদা প্রদত্ত। সমস্যাবলীর প্রতি তাঁর দৃষ্টি সূক্ষ্ম, গভীর ও সর্বব্যাপী। তাঁর সমালোচনা এত পুঙ্খানুপুঙ্খ যে, কোন বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। তাঁর কার্যপদ্ধতি মনোমুগ্ধকর, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ হৃদয়গ্রাহী। এতদসহ তাঁর মহৎ প্রকৃতির সাক্ষ্য ত আমি বারংবার দিয়েছি। স্বয়ং এ অধম মাওলানা আবদুল বারীর সাহচর্যে উসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার কার্য গ্রহণের জন্য মাওলানাকে অনুরোধ জানিয়েছি। কিন্তু তাঁর আর্থিক অবস্থা অতীব শোচনীয় থাকা সত্ত্বেও তিনি সন্তুষ্টচিত্তে আমাদের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেছেন। যাঁর আত্মা এত বিরাট ও ঐশ্বর্যশালী, মননশীল ও চিন্তাশীল, প্রবন্ধকার হিসাবে যিনি খোদাপ্রদত্ত গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী, তাঁকে বেশী কিছু বলার ধৃষ্টতা ত

ছিল না। কিন্তু এতটুকু বলতে চাই যে, আল্লাহ্ তায়ালা মাওলানা মওদূদীর উপরে অসাধারণ কৃপা বর্ষণ করেছেন। ঈমানের জ্যোতিতে তাঁর অন্তর উদ্ভাসিত দেখতে পাই। নবী মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)-এর প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা ও আস্থা দিয়ে তাঁর অন্তর সমৃদ্ধ করা হয়েছে। এতদসহ নানাবিধ যোগ্যতায় তাঁকে ভূষিত করা হয়েছে। এই সমুদয় সাহিত্য, মন ও ঈমানের শক্তি দিয়ে আল্লাহর পথে আহবানকে জীবনের লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করে যদি তিনি দণ্ডায়মান হন এবং উর্দূ, ইংরেজী, হিন্দী প্রভৃতি ভাষায় যদি কিছুদিন এ কাজ করা যায়, তা হলে হয়ত হতে পারে যে, লোকে সহসা তা গ্রহণ করবে না, কিন্তু ইসলাম যে সব স্বাভাবিক জিজ্ঞাসার উত্তর দেয়, অন্তত মনের মধ্যে সে সব জিজ্ঞাসার স্ফুলিঙ্গ প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠবে।

মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী

তাঁর লেখার পদ্ধতি, অকাট্য যুক্তি, মৌলিক ও বুনিয়াদি আলোচনা পদ্ধতি এবং সর্বোপরি তাঁর সুষ্ঠু চিন্তাধারা ছিল আমাদের প্রকৃতি ও মানসিকতার অত্যন্ত উপযোগী। এমন মনে হচ্ছিল যে, তাঁর খোদাপ্রদত্ত লেখনীশক্তি আমাদের মূক প্রতিভা ও রুচিরই মুখপাত্র। যেদিন নদ্ওয়ার দারুল উলুমের মসজিদ সংলগ্ন মেহমানখানায় বসে আমরা কয়েক বন্ধুতে হিজরী ১৩৫৬ সালের মহররম মাসের তর্জুমানুল কোরআনের সম্পাদকীয় প্রবন্ধ পড়ছিলাম, যাতে একটি প্রলয়ের ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল– তা কখনো ভুলবার নয়। এ মাওলানার এমন এক উদ্দীপনাপূর্ণ প্রবন্ধ ছিল যার প্রতিধ্বনি শুনা যেতো বহুদিন ধরে। আমরা সকলে মাওলানার বিচক্ষণতা, অন্তর্দৃষ্টি, সংকটের প্রতি অংগুলি নির্দেশ এবং তাঁর অসাধারণ লেখনীশক্তির অন্তর দিয়ে প্রশংসা করেছি। এরপর মাওলানার যেসব প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, তা আমরা আনন্দের সাথে পড়তাম।

মাওলানা মুহাম্মদ মনযুর নো'মানী

মাওলানা মওদূদী এবং জামায়াতে ইসলামীর কাজের মধ্যে যা আমার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে তা হচ্ছে এই যে, হাজার হাজার তরুণ যুবক যে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও শিক্ষায়তনের নাস্তিকতাপূর্ণ পরিবেশের প্রভাবে

ইসলামের প্রতি সন্দিহান হয়ে তা একেবারে পরিত্যাগ করেছিল অথবা করার উপক্রম করেছিল, মাওলানা মওদূদীর প্রবন্ধাদি এবং জামায়াতে ইসলামীর কর্মতৎপরতা তাদেরকে শুধু যে ইসলামের দিকে পুনরায় ফিরিয়ে এনেছে তা নয়, বরং তাদের ব্যবহারিক জীবনে এমন এক ইসলামী বিপ্লব সাধিত হয়েছে যে, অনেক বংশানুক্রমিক দ্বীনদারদের জন্যে তা ছিল এক শিক্ষণীয় ব্যাপার।

অধ্যাপক আলফ্রেড স্মিথ

মাওলানা মওদূদী বর্তমান যুগের ইসলামী চিন্তাধারার উপরে বিরাট প্রভাব বিস্তার করেছেন এবং তাঁর দল পাকিস্তানের প্রতীয়মান শক্তিগুলোর মধ্যে একটি। এই আন্দোলন যে সাহিত্য সৃষ্টি করেছে তা অতি বিরাট ও ব্যাপক। এই সাহিত্য বেশীর ভাগ উর্দূ ভাষায়। তথাপি এর আরবী ও ইংরেজী অনুবাদ দিন দিন বেড়ে চলেছে। মওদূদী সাহেবের সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি আপন ভাবধারা ধীরে ধীরে এবং অত্যন্ত ধারাবাহিকতার সাথে একটি সঠিক এবং আকর্ষণীয় জীবন ব্যবস্থা হিসাবে পেশ করেছেন। মওদূদী সাহেবকে আধুনিক যুগে ইসলাম সম্পর্কে সংগঠিত ও আদর্শভিত্তিক পদ্ধতিতে একজন চিন্তাশীল পুরুষ বলে মনে হয়। তিনি ইসলামকে একটা শাসন-শৃঙ্খলার ছাঁচে ঢালবার আধুনিক ঝোঁক-প্রবণতাকে সুষমামণ্ডিত করে তুলেছেন। তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি ইসলামী আইন-কানুনকে আধুনিক যুগের একটি সুস্পষ্ট ও কার্যকরী ব্যবস্থা হিসাবে পেশ করেছেন। তিনি ইসলামকে এমন এক জীবন ব্যবস্থা হিসাবে পেশ করেছেন যা বহু শতাব্দী পূর্বেই ভবিষ্যতের সকল যুগের সকল মানবিক সমস্যার সমাধান সংগৃহীত রেখেছে। তাঁর কাছে ইসলাম এমন কোন ধর্ম নয়, যে প্রতিদিন প্রত্যুষে মানুষকে তার সমস্যার সমাধানকল্পে নতুন খোদায়ী জ্ঞান দান করার এক নতুন ঝঞ্ঝাট সৃষ্টি করবে। যে চিন্তা ব্যবস্থাকে তিনি ক্রমশ মজবুত করে তুলেছেন তার উৎস ইসলামের প্রাথমিক যুগ, যেখান থেকে এই ব্যবস্থা-প্রাসাদের মৌলিক ভিত্তি সংগৃহীত হয়। এতদসহ তিনি যথেষ্ট পরিমাণ আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাধারারও সুযোগ গ্রহণ করেছেন।

সত্য কথা এই যে, পাকিস্তানের মানসিক ও রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার সময়ে তিনি বুদ্ধিজীবীদের এবং জনসাধারণেরও একটা বিরাট অংশকে প্রভাবিত

করেছেন। নৈতিক অধঃপতনের প্রবল ঝঞ্ঝায় তিনি আপন সংকল্পিত লক্ষ্যের জন্যে অনুপম ঐকান্তিকতা ও আত্মত্যাগের পরিচয় দিয়েছেন।

মাওলানা আমিন আহ্সান ইসলাহী

'আমি মাওলানা মওদূদী সাহেবকে একজন বিরাট এবং মহান ব্যক্তি মনে করি। এমন লোক অল্পই জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু আজ তিনি এত বড় হয়েছেন যে, এমন বড় তাঁকে আগে মনে করিনি। আমি ভাবতেই পারিনি যে, আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর জন্যে এমন এক সৌভাগ্য সৃষ্টি করে রেখেছেন যে, তিনি দ্বীনের পথে একদিন মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হবেন। আল্লাহ্ তাঁকে হাজারের মধ্যে বেছে নিয়ে এমন উচ্চস্থান দান করেছেন।'

রাজা গজনফর আলী খান

উনিশ শ' উনচল্লিশ থেকে বিয়াল্লিশ সাল পর্যন্ত আমি লাহোর ইসলামিয়া কলেজে পড়াশুনা করতাম। এ সময় মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী হাবিবিয়া হলে ইসলামিয়াতের উপর লেকচার দেয়ার জন্যে প্রতি রোববারে আসতেন। শুক্রবার ছিল কলেজের সাপ্তাহিক ছুটির দিন। কিন্তু রোববার দিনে খেলাধুলা ও অন্যান্য সামাজিক অনুষ্ঠানাদি হতো। মাওলানার লেকচারও ঐদিন হতো। কলেজের সকলেই তাঁর লেকচার ক্লাসে যোগদান করত।

এ এমন এক সময়ের কথা যখন মাওলানার দুধ-আলতা রঙের মুখমণ্ডলের উপরে দাড়ি ছিল কালো বর্ণের। মাথায় কালো টুপি, পরনে ডার্ক-ব্রাউন শিরওয়ানী এবং সাদা পায়জামা, চোখে নীল চশমা। মাওলানার যৌবনকাল তখন। কিন্তু কখনো তাঁর স্বভাবের মধ্যে রুক্ষতা অথবা ভাবাবেগ দেখিনি। কথা বলার ধরন বড়ই শালীনতাপূর্ণ এবং যা বলতেন তা খুবই যুক্তিসঙ্গত।

তাঁর ক্লাসে যোগদানকারী ছেলেরা কাগজ-পেনসিল সাথে করে আনত। লেকচার শেষ হলে কাগজের টুকরোয় প্রশ্ন করা হতো। মাওলানা তার সুন্দর করে জওয়াব দিতেন।

এ সময়ে খাকসার আন্দোলনের দ্বারা ছাত্ররা বিশেষভাবে প্রভাবিত ছিল। চল্লিশের আগ পর্যন্ত আমি খাকসার আন্দোলনের বলতে গেলে একজন কর্মীই ছিলাম। এ আন্দোলন এবং তার নেতা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে মাওলানা যে জওয়াব দিতেন, তা আমার মনঃপূত হতো না বলে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হতে পারিনি। তাঁর সাহিত্যও পড়ার প্রয়োজন বোধ করিনি। সে সময়ে খাকসার আন্দোলন এবং তার মুখপত্র 'আল-ইসলাহ' সারা দেশে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। এ আন্দোলন আমাদের মন-মস্তিষ্ক প্রভাবিত করে রেখেছিল।

চল্লিশের ২৩শে মার্চ লাহোরে অনুষ্ঠিত নিখিল পাকিস্তান মুসলিম লীগ অধিবেশনে কায়েদে আযম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ মরহুমের ব্যক্তিত্বের প্রতি আকৃষ্ট হই। তাঁর বলিষ্ঠ ভূমিকা, চরিত্রের দৃঢ়তা, তাঁর সততা এবং কার্যকলাপে পরিপূর্ণ নিষ্ঠা আমাকে খাকসার আন্দোলন থেকে মুসলিম লীগের মধ্যে টেনে আনে।

আমার জীবনের তৃতীয় পর্যায়ে আমি 'প্রগতিশীল' সাহিত্যের প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়ি। এ সময়ে মার্কস, লেনিন ও স্টালিনের বই পত্র পড়াশুনা করি। তারপর এ মতবাদের লোকদের প্রতি আকৃষ্ট হই। এতদসত্ত্বেও একটি ধর্মীয় পরিবারের সাথেই আমার সম্পর্ক ছিল। কিন্তু সামাজিক পরিবেশ আমাকে কমিউনিজমের দিকে টেনে নিয়ে যায়। বাড়িতে আব্বা মরহুমের সাথে আমার প্রায়ই তর্ক-বিতর্ক হতো। এমন এক জাহিলিয়াতের বেড়াজালে আটকে পড়েছিলাম যে, আল্লাহ্ মাফ করুন, আব্বা মরহুম আমার সাথে কথা বলা বন্ধ করে দেন।

পাকিস্তান হতে তখনও বাকী। একদিন আব্বা মরহুম আমাকে মাওলানা মওদূদীর ইংরেজী বই Towards Understanding Islam পড়তে দেন। বইখানা পড়লাম। তারপর আবার পড়লাম। আমার উপর বইখানির প্রভাব এই হলো যে, আমার মন-মস্তিষ্কের উপরে জমে ওঠা গোমরাহীর অন্ধকার দূর হয়ে গেল। মাওলানার অকাট্য যুক্তি ও বর্ণনাভঙ্গি ছিল বড়ই হৃদয়গ্রাহী, যার ফলে তাঁর অন্যান্য সাহিত্যও পড়াশুনা শুরু করলাম।

পাকিস্তান হওয়ার পর মাওলানা তাঁর ইছরার বাড়ির সামনে সবুজ-শ্যামল ঘাসে-ভরা ছোট্ট বাগানটিতে বিকেলবেলা বৈঠক করতেন। আমি সেখানে গিয়ে বসতাম। তখন অতটা ভিড় জমতো না। আমি মাওলানাকে অনেক আজে-বাজে এবং অসঙ্গত প্রশ্ন করে বসতাম। মাওলানা তাতে কিছুই মনে করতেন না।

প্রত্যেকটি কথার জওয়াব ধীর স্থির ও মিষ্টি ভাষায় দিতেন। বেখাপ্পা প্রশ্নেও কখনো তাঁর চেহারার উপরে বিরক্তি বা রাগের চিহ্ন দেখা যেত না। 'তুলুয়ে ইসলাম' পড়ে যেসব প্রশ্ন মনে জাগত, তা অকাতরে মাওলানাকে বলে ফেলতাম। মাওলানা যুক্তির শাণিত অস্ত্র দিয়ে ভ্রান্ত প্রশ্নের খণ্ডন করতেন। তাঁর জওয়াবের ধরনটাই এমন ছিল যে, প্রশ্নকারী প্রভাবিত না হয়ে পারত না।

যদি আমার মত লোক শুধু যুক্তির ভিত্তিতে কমিউনিজম পরিত্যাগ করে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হতে পারে, তাহলে এরূপ আরো অনেকেই নিশ্চয়ই হয়ে থাকবে, যারা নিশ্চিতরূপে মাওলানার সাহিত্যের প্রভাবে সৎ পথ গ্রহণ করেছে অথবা নিদেনপক্ষে জন্মগত মতবাদ থেকে সরে পড়েনি। মাওলানার এ এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য। আমি ব্যক্তিগতভাবে অগাধ জ্ঞানের দিক দিয়ে মাওলানার মত আর কাউকে দেখিনি। এ জন্যে আমি তাঁকে আলবৎ এ যুগের মুজাদ্দিদই বলব।

আমাকে কেউ যদি জিজ্ঞেস করে, তোমার কাছে বিখ্যাত ব্যক্তি কে, তাহলে বলব, মাত্র তিনজন– আল্লামা ইকবাল, কায়েদে আযম, মাওলানা মওদূদী।

এ কে ব্রোহী

মানুষের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ তার চরিত্র ও ভূমিকা। যদি কোন মানুষের চরিত্র ও ভূমিকাকে পালটে দেয়া এবং তার মধ্যে কোন প্রকার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এনে দেয়া সম্ভব হয়, তাহলে যিনি এ কাজটি করেন তিনিই সে মানুষটির জীবনের স্থপতি বা নির্মাতা। এ দৃষ্টিকোণ থেকে আমার মতে বর্তমানে পাকিস্তানে সবচেয়ে বিরাট ব্যক্তিত্ব হচ্ছেন মাওলানা মওদূদী।

আমি এ কথার সত্যতা স্বীকার করছি যে, যদি এ প্রশ্ন করা হয়, সে ব্যক্তি কে যিনি পাকিস্তানবাসীর চরিত্র ও ভূমিকাকে সবচেয়ে বেশী প্রভাবিত করেছেন, তাহলে আমার উত্তর হবে মাওলানা মওদূদী। আমার দৃঢ় প্রত্যয় রয়েছে যে, আজ আমি যে কথা বলছি আগামীকালও তাই বলব। আর যদি আখেরাতে আল্লাহ তায়ালা আমার সাক্ষ্য গ্রহণ করতে চান, তাহলে সেদিনও এই সাক্ষ্যই দিব যা আজ দিচ্ছি।

শরীফুদ্দীন পীরযাদা

পাকিস্তানের স্বপ্নদ্রষ্টা যাঁরা ছিলেন মাওলানা মওদূদী ছিলেন তাঁদের প্রথম সারির লোক। তিনি এবং অন্যান্যগণ এ বিষয়ে যে সব পরিকল্পনা এবং প্রস্তাব পেশ করেন, পাকিস্তান সংগ্রামে তা দিগদর্শনের কাজ করেছে। মাওলানা মওদূদী একটি পৃথক মুসলিম রাষ্ট্রের জন্যে যে তিনটি বিকল্প প্রস্তাব পেশ করেন, তা ১৯৩৮ সালের অক্টোবর ও ডিসেম্বরের তর্জুমানুল কোরআনে প্রকাশিত হয়। আমার ভালোভাবে মনে আছে, আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ পাকিস্তান আন্দোলন পরিচালনার সময় অন্যান্য সাহিত্যের সাথে তর্জুমানুল কোরআনের সংখ্যাগুলো নিয়মিতভাবে সঙ্গে রাখতেন এবং একজাতীয়তার ধ্বজাধারীদের যুক্তি খণ্ডনের জন্যে তর্জুমানুল কোরআনের পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা পড়ে শুনাতেন।

মাওলানা আমের উসমানী, দেওবন্দ

মাওলানা মওদূদীই একমাত্র ব্যক্তি– যাঁর খোদা প্রদত্ত প্রতিভা, লেখনীশক্তি, দ্বীনের সুস্পষ্ট ধারণা, অতুলনীয় নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা শুধু পাকিস্তানেই নয়, বরং সমগ্র মুসলিম বিশ্বে এমন বিরাট সাহিত্য-ভাণ্ডার সৃষ্টি করেছে যে, তার স্বীকৃতি দিতে গিয়ে বলতে হয়, এ সাহিত্য-ভাণ্ডারের তুলনায় সপ্তরাজ্য তুচ্ছ। আমার মনে হয়, তাঁর প্রণীত সাহিত্যের এক একটি পৃষ্ঠা এক একটি রত্নের সমতূল্য।

মাওলানা কারী মুহাম্মদ তৈয়ব, দারুল উলুম, দেওবন্দ

মাওলানা মওদূদী ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে একান্ত ফলপ্রসূ ও প্রশংসনীয় উপাদান পরিবেশন করেছেন। হক ও বাতিল এবং সত্য-মিথ্যার সংমিশ্রণের এই যুগে পরম সাহসিতার সাথে তিনি যে ইসলামী সমাজ-ব্যবস্থার পর্যালোচনা ও তার ত্রুটি-বিচ্যুতির প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে এতদসম্পর্কিত সমস্যাবলীর সমাধান পেশ করেছেন, তার জন্যে একমাত্র কৃতিত্ব তাঁরই। আমি তাঁকে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্যে একজন মহান ইসলামী নেতা হিসেবে মেনে নিয়ে তাঁর কথাকে শ্রদ্ধা করি।

মাওলানা আবদুল কুদ্দুস বিহারী

আমি আমার মুসলমান ভাইগণ, আলেম সমাজ, বুদ্ধিজীবী ও জাতির সুধীবৃন্দের নিকটে খোদা ও রাসূলের নামে আবেদন জানাচ্ছি যে, এমন অতুলনীয় ইসলামী চিন্তাশীল, অদ্বিতীয় সাহিত্যিক এবং জাতীয় সম্পদকে বাঁচানোর জন্যে যেন এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করেন এবং অবিলম্বে যথাসম্ভব নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সংগ্রাম অক্ষুণ্ন রাখেন।

মাওলানা আবদুল কুদ্দুস বিহারীর সাক্ষ্য

সংবাদপত্রের মাধ্যমে বারবার এ অভিযোগ করা হচ্ছে যে, আল্লামা মওদূদী এবং জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করেছিলেন। আমি বেশ কিছুদিন যাবত অসুস্থ। তাছাড়া আমার উপায়-উপাদানও সীমিত। তথাপি আশা করেছিলাম যে, হকপন্থী আলেমগণ জনগণের কাছে সত্যকে তুলে ধরবেন। কিন্তু দেখছি যে কোন কারণে সত্যের আওয়াজও বন্ধ হয়ে আছে। এ জন্যে এ দায়িত্ব পালন করছি। জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রাক্তন মুসলিম লীগপন্থী হিসাবে আমি জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ও প্রত্যেক মুসলিম লীগপন্থীর অপরিহার্য দায়িত্ব মনে করছি এ বিষয়ে কথা বলার। এমন কি নিজেকে এ সত্যটি তুলে ধরার জন্যে খোদা ও রাসূল (সাঃ)-এর সামনে জওয়াবদিহির জন্যে দায়ী মনে করে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলছি যে, আল্লামা মওদূদী কখনোই পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করেননি। বরং প্রকৃত ব্যাপার এই যে, যখন মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী মরহুম এবং জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ কংগ্রেসকে সমর্থন করতে গিয়ে ঘোষণা করেন যে, জন্মভূমির ভিত্তিতে জাতি গঠিত হয়, তখন আল্লামা মওদূদী বলেন, জাতি ধর্মের ভিত্তিতে হয়, দেশ বা জন্মভূমির ভিত্তিতে নয়। তিনি ইসলামী জাতীয়তা প্রমাণ করে শক্তিশালী সাহিত্য রচনা করেন। হযরত আল্লামা শাব্বীর আহমদ উসমানী কংগ্রেসী জমিয়তের জওয়াবে এবং তার মুকাবেলা করার জন্যে কোলকাতায় জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম কায়েম করেন। আল্লামা শাব্বীর আহমদ উসমানী আল্লামা মওদূদীকে ইসলামের তরবারি বলে অভিহিত করেনে এবং তাঁর প্রথম গ্রেফতারের তীব্র

প্রতিবাদ জানান। বস্তুত আল্লামা শাব্বীর আহমদ উসমানী এবং জামায়াতে ইসলামী রেফারেন্ডামের সপক্ষে জনমত গঠন করেন, যার ফলে সীমান্ত প্রদেশ এবং সিলেট পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। উল্লেখ্য যে, আল্লামা মওদূদী পাকিস্তান ও ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা কখনোই করেননি। তবে ভুল ধারণার সৃষ্টি এর থেকে হয়েছে যে, হযরত আল্লামা মওদূদী কতিপয় মুসলিম লীগ নেতার প্রতি সন্দেহ প্রকাশ করেন যে, তারা ইসলামী আইন বাস্তবায়নের পথে বাধা সৃষ্টি করবেন। তার প্রমাণ এখনও পাওয়া যাচ্ছে যে, বিগত পঁচিশ বছরেও ইসলামী আইন জারি হতে পারল না। নেতৃবৃন্দের প্রতি সন্দেহ পোষণের জন্যে এ অভিযোগ করা যেতে পারে না যে, তিনি ইসলামী রাষ্ট্রের বিরোধিতা করেছেন। তারপর রইল কায়েদে আযমের বিরোধিতার অভিযোগ। আল্লামা মওদূদী তা কোনদিনই করেননি। অবশ্য তিনি বারবার ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠার দাবি জানিয়েছেন। তিনি ইসলামের উপরে অমূল্য সাহিত্য ও বহু সংখ্যক গ্রন্থ রচনা করেছেন। জাতি তার জন্যে কৃতজ্ঞ।

মাওলানা যাফর আহমদ আনসারী

অবিভক্ত ভারতের অল-ইন্ডিয়া মুসলিম লীগের জয়েন্ট সেক্রেটারী মাওলানা যাফর আহমদ আনসারী বলেন–

মাওলানা মওদূদীর সাথে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয় এলাহাবাদে ১৯৩৮ সালে। তখন জামায়াতে ইসলামী হয়নি। মাওলানা উঠেছিলেন ডাঃ নাযীর আলী যায়দীর বাড়িতে। এলাহাবাদ এলে তিনি এখানেই উঠতেন। দ্বিতীয় সাক্ষাৎ হয় ১৯৪১ সালে সেও এলাহাবাদে হারদারায় হাকীম খালিদ সাহেবের বাড়িতে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে। এখানে তিনি ইসলামিয়া কলেজে বক্তৃতাও করেন। মাওলানার গভীর পাণ্ডিত্যের প্রতি আমি আকৃষ্ট হয়েছিলাম।

কিছুকাল পর আমাকে দিল্লী চলে যেতে হয়। মাওলানা দিল্লী এলে অবশ্যই তাঁর সাথে সাক্ষাৎ হতো। তিনি উঠতেন শ্বশুর বাড়িতে। একবার তিনি চৌধুরী মুহাম্মদ আলীর বাসায়ও উঠেছিলেন। তিনি আমার বাসায়ও আসতেন এবং ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে আলাপ-আলোচনা হতো। পাকিস্তান হওয়ার আগেই তর্জুমানুল কোরআনের খণ্ডগুলো কায়েদে আযমের লাইব্রেরীর শোভাবর্ধন করছিলো।

পাকিস্তান হওয়ার পর মাওলানা আমার বাসায় কয়েকবার এসেছেন। মাওলানা অন্য কারো প্রস্তাব বা পরামর্শ মানতেন না এ কথা ঠিক নয়। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এই যে নীতিগত কথা তিনি স্বীকার করে নিতেন। আমার একটা বদনাম আছে যে, আমার সাথে মাওলানার সাক্ষাতের পর তিনি কখনো কখনো জামায়াতের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতেন। মাওলানা প্রত্যেকটি কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতেন। একটা যুক্তি পেশ করলে তা তৎক্ষণাৎ মেনে নিতেন।

মাওলানার ব্যক্তিত্ব ছিল অতি বিরাট। অসীম ধৈর্যসহ এবং হাসিমুখে সমালোচনার সম্মুখীন হওয়া তাঁর অন্যতম বিশিষ্ট গুণ ছিল। এ কথা দিবালোকের মতো সুস্পষ্ট যে, ইসলামের প্রসার ও সমুন্নতির জন্যে যে পথ তিনি সঠিক মনে করতেন তার প্রতি তিনি অটল ও অবিচল থাকতেন।

ডঃ ইবরাহীম আগাহ

তুরস্কের আংকারা বিশ্ববিদ্যালযের অধ্যাপক ডঃ ইবরাহীম বলেন–

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী বিরাট পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। এতো বড় স্কলার যে, সারা দুনিয়ায় তাঁর কথা হৃদয়ঙ্গম করা হয় এবং তাঁর অভিমত মেনে নেয়া হয়। তুরস্কেও মাওলানা মওদূদী সর্বজন স্বীকৃত গ্রন্থকারগণের অন্যতম। তাঁর কয়েকটি গ্রন্থ তুর্কী ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে।

মাওলানা মওদূদীর সাথে আমার সাক্ষাতের সুযোগ হয়নি। তবে তাঁর গ্রন্থের মধ্যেই তাঁর সাক্ষাৎ পাই। তিনি তাঁর গতিশীল ব্যক্তিত্বের দ্বারা যে প্রাণচাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছেন, তা বর্তমান যুগের উপর বিরাট প্রভাব বিস্তার করছে এবং ভবিষ্যতে অধিকতর প্রভাব বিস্তার করতে থাকবে।

ইয়াসিন উমর

সুদান জাতীয় পরিষদ সদস্য ইয়াসিন উমর বলেন–

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী ইসলামী পুনর্জাগরণের আন্দোলন শুরু করেন। আধুনিক যুগে তিনিই প্রথম ব্যক্তি, যিনি পাশ্চাত্য মতবাদ ও চিন্তাধারাকে চ্যালেঞ্জ করেন। তিনি যুক্তির কষ্টিপাথরে সুস্পষ্ট করে দেন যে, পাশ্চাত্য চিন্তাধারা মানবতার জন্যে ক্ষতিকর। তিনি পাশ্চাত্য সভ্যতার মুকাবেলা করেছেন এবং অন্যকেও মুকাবেলার ক্ষেত্রে নিয়োজিত করেছেন। এ বিরাট কাজের সূচনা তিনি

চিন্তার ক্ষেত্র থেকে করেন। তিনি এক নতুন বর্ণনাভঙ্গিতে ইসলামী মতবাদ ও দৃষ্টিভঙ্গির এমন এক চিত্র পরিস্ফুট করেন যে, যে সব মুসলমান পাশ্চাত্য চিন্তাধারার মুকাবেলা করতে না পারার কারণে ইসলাম থেকে সরে পড়েছিলো, তাদের চিন্তাধারার পরিবর্তন হয় এবং যারা দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে ছিলো তারাও ইসলামের দিকে ফিরে আসে। মাওলানা মওদূদীর সাহিত্য তাদের মধ্যে দৃঢ় প্রত্যয় সৃষ্টি করেছে এবং মুসলমানদের মধ্যে ইসলামের জন্যে এক বজ্র-কঠিন সংকল্প সৃষ্টি করে দিয়েছে। ..... সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী শুধু পাকিস্তান ও এশিয়ায় নন বরং আফ্রিকা এবং সারা বিশ্বে মুসলমান যুব সমাজকে তাদের সঠিক পরিচয় সম্পর্কে অবহিত করেন। বিশ্ব যুব মুসলিমকে তিনি ইসলামকে কেন্দ্র করে একত্র করেছেন, ইসলামকে তাদের জীবনের লক্ষ্য বানিয়ে দিয়েছেন।

ইতিহাসে সাইয়েদ মওদূদীর স্থান যে কত উচ্চে তা বলার আগে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলতে চাই যে, তাঁর সাহিত্য অধ্যয়ন করার আগে আমি কমিউনিজমের প্রবক্তা ছিলাম। নিজেকে একজন কমিউনিস্ট ও সোশ্যালিস্ট বলে পরিচয় দিতে আনন্দ পেতাম। একমাত্র সাইয়েদ মওদূদীর সাহিত্য আমাকে কমিউনিজমের অনুসারী হওয়া থেকে ইসলামের আলোকে টেনে এনেছে।

সাইয়েদ মওদূদীকে আমি বলব একজন মহান ব্যক্তি। কিন্তু আমি অনুভব করছি যে, এ শব্দটি তাঁর মহত্ত্ব বর্ণনা করতে অপারগ। সাইয়েদ মওদূদী এমন এক ব্যক্তি, যিনি ইতিহাসের মোড় পরিবর্তন করে দিয়েছেন, তিনি আজ একজন ইতিহাস-স্রষ্টা। তাঁর ক্ষুরধার লেখনী পাশ্চাত্য সভ্যতা, চিন্তাধারা ও সংস্কৃতিকে পরাভূত করেছে। বস্তুত আজ এমন এক বিপ্লব সাধিত হয়েছে যে, মুসলিম যুব সমাজ নিজেদেরকে 'প্রাচ্য ও প্রতীচ্য' বলার পরিবর্তে 'ইসলামী' বলার আওয়াজ তুলেছে। এ এক বিরাট পরিবর্তন বলতে হবে এবং কালের গতির সাথে সাথে এর প্রভাব সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে।

ডঃ সিরাজুল হক (বাংলাদেশ)

মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর অগাধ জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের স্থান বহু উচ্চে। এত উচ্চে যে, শুধু এ কথা বললেই তার সঠিক অনুমান করা যাবে না। তিনি যে জ্ঞান-গবেষণার কাজ করেছেন, তার প্রভাব কয়েক বংশধর পর্যন্ত এবং শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বলবৎ থাকবে। ..... মাওলানা মওদূদীই একমাত্র ব্যক্তি, যিনি কোন বিষয়বস্তুর উপরে কলম ধরলে তারপর আর বলার কিছুই থাকে না। তিনি ঢাকায় গেলে তাঁর সাথে আমার সাক্ষাৎ হতো এবং আমি

এখানে এলেও সাক্ষাৎ হয়। এই শহর রাওয়ালপিণ্ডিতে একবার এমন পরিবেশে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিলো যে, তা কোনদিন ভুলতে পারব না। পিণ্ডিস্থ I DO NOT AGREE CLUB -এ একবার তিনি আমন্ত্রিত হন। আমাকেও আমন্ত্রণ করা হয়েছিলো। মাওলানা তাঁর ভাষণের মাধ্যমে সবাইকেই তাঁর প্রতি আকৃষ্ট ও প্রভাবিত করে ফেলেন। তাঁর

যুক্তিপূর্ণ আলোচনায় এমন কিছু নতুন আলোকের সন্ধান ছিলো যে, তার সামনে আর কারো টিকে থাকা সম্ভব ছিলো না।

সাইয়েদ মওদূদী তাঁর জীবদ্দশাতেই তাঁর যুগের ইতিহাসকে প্রভাবিত করেছেন। আগামীতে যা কিছু ঘটবে তার উপরেও তাঁর প্রভাব বিদ্যমান থাকবে। বরং কালের গতির সাথে সাথে তাঁর প্রভাব তীব্রতর হতে থাকবে। তারপরে তাঁর পদাংক অনুসরণকারীর সংখ্যা বাড়তে থাকবে এবং তিনি অধিকতর শ্রদ্ধার পাত্র হিসাবে পরিগণিত হবেন। তিনি সকলের 'প্রিয়জন' এবং 'প্রিয়জন' হতেই থাকবেন। *

---

* *I DO NOT AGREE CLUB* জাঁদরেল সিএসপি এবং উচ্চ পদস্থ সরকারী কর্মচারীদের একটি বিশেষ ক্লাব। – গ্রন্থকার।

মওদূদীর পত্রাবলী

মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী বিংশ শতাব্দীর একজন বিপ্লবী ইসলামী নেতা। তাঁর গোটা জীবনে আন্দোলনের পথে তাঁকে অসংখ্য বাধা-বিপত্তি, বিদ্রূপ-সমালোচনা, নির্যাতন-নিষ্পেষণের সম্মুখীন হতে হয়েছে। বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন পরিস্থিতিতে তাঁকে বিভিন্ন লোকের নিকট পত্রাদির মাধ্যমে মনের কথা ব্যক্ত করতে হয়েছে। লেখকের ব্যক্তিত্ব, তাঁর সত্যিকার চরিত্র, আদর্শ ও ভাবধারার পরিস্ফূরণ হয় তাঁর পত্রাদির মাধ্যমে। এখানে বিভিন্ন সময়ে লিখিত তাঁর কিছু পত্র সন্নিবেশিত করা হলো– যার ভেতর দিয়ে ফুটে উঠেছে তাঁর জীবন দর্শন, জীবনের আদর্শ ও লক্ষ্য, সত্যিকার ইসলামী চিন্তাধারা, ইসলামী আন্দোলনের গুণাবলী ও কর্মধারা এবং ইসলামী সমাজ-ব্যবস্থার দুশমনদের প্রতি সহনশীলতার মনোভাব। আশা করি পত্রগুলি পাঠকদের জীবনেও আলোকবর্তিকার কাজ করবে।

[১]

জনাব আবদুস সাত্তার সাহেবকে।

পাঠানকোট, পাঞ্জাব।
৭ই জুন, ১৯৪১

আমার শ্রদ্ধেয়–

আসসালামু আলায়কুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

আমি শ্রীনগর গিয়েছিলাম। ফিরে এসে আপনার পত্র পেলাম। আমি হযরত কুতুবুদ্দীন মওদূদ চিশতী (রঃ)-এর বংশধর। এ জন্যে নিজকে মওদূদী লিখি। এ নিজেকে প্রখ্যাত করার কোন প্রচার কার্য নয় এবং এর দ্বারা কোন সুবিধা ভোগ করাও উদ্দেশ্য নয়। পারস্পরিক পরিচয় লাভ ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্যে আল্লাহ তায়ালা মানব জাতিকে বিভিন্ন গোত্র-বংশে বিভক্ত করেছেন। অতএব যে বংশে আমি জন্মগ্রহণ করেছি তাই প্রকাশ করি।

'মওদূদী' কোন মতবাদ অথবা ধর্মীয় সম্প্রদায়ের নাম নয় যে, আমাকে দোষারোপ করা যেতে পারে।

আমার যে সব কথা পড়ে আপনার এরূপ ধারণা জন্মেছে যে, আমি বুযুর্গানে দ্বীনের প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করি, আপনি তার উল্লেখ করেননি। বুযুর্গানে দ্বীনের প্রতি যে ধারণা পোষণ করা আবশ্যক, আপনি তারও ব্যাখ্যা করেননি। দয়া করে এ দু'টি বিষয়ের উপরে কিছু আলোকপাত করলে আমার বক্তব্য পেশ করতে পারি। আমাকে যে দোষে অপরাধী করা হয়েছে তা যে কি, তা আপনার পত্রের দ্বারা বুঝতে পারলাম না। আমার বরং সন্দেহ হয় যে, আমার প্রবন্ধটি ধীরস্থির চিত্তে আপনি মোটেই পড়েননি। এ এক সাধারণ নিয়ম হয়ে পড়েছে যে, কোন ব্যক্তি যদি কোন একটি প্রবন্ধে কিছু তার রুচির বিপরীত দেখতে পায়, তাহলে গোটা প্রবন্ধটাকেই সে ঘৃণা ও সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করে। অতঃপর শান্তমনে চিন্তা করার অবসরই তার হয় না যে প্রবন্ধকার কি বলছে।

সম্ভবত আপনার জানা নেই যে, আমি এমন এক বংশে জন্মগ্রহণ করেছি যার মধ্যে এক হাজার বছর যাবত বায়আত ও দীক্ষাদানের পরম্পরা জারি ছিল। তার সমস্ত ভালমন্দ দিক সরাসরি অধ্যয়ন করার সুযোগ আমার হয়েছিল। বাইরের কোন লোকের ন্যায় বিদ্বেষের মনোভাব নিয়ে আমি এসব লক্ষ্য করিনি বরং স্বাভাবিকভাবে এ সবের প্রতি আমার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল অত্যন্ত সহানুভূতিশীল। তারপর যদি আমি এ সিদ্ধান্তে পৌঁছি যে, ইসলামের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মত এ প্রতিষ্ঠানটিও বিকৃত হয়ে পড়েছে এবং এর মধ্যে বেশ কিছুটা রদবদলের প্রয়োজন, তাহলে একে কোন বাইরের শত্রুর অভিমত বলা হবে না, বরং আপন গৃহের বন্ধুর অভিমতই মনে করা হবে, যা নিছক সত্যের খাতিরে প্রকাশ করা হয়েছে। সত্যের সেবা যদি আমার লক্ষ্য না হতো, তাহলে অতি সহজেই আমি আমার খান্দানী গদি দখল করে বসতাম এবং পীর-মুরীদীর আসর জমিয়ে হস্তপদ চুম্বনকারী, নযর-নিয়ায প্রদানকারী বহু মহাত্মাকে আমার চারপাশে ভীড় জমাতে দেখতাম।

খাকসার

আবুল আ'লা।

[২]

হাফেযাবাদের হাকিম মুহাম্মদ শরীফ সাহেবের নামে।

নতুন সেন্ট্রাল জেল

মুলতান।

১৭ই মার্চ, ১৯৪৯

আমার শ্রদ্ধেয়,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

........আপনি আমার স্বাস্থ্যের জন্যে মোটেই চিন্তা করবেন না। সত্য কথা এই যে, এখন আমার স্বাস্থ্য যেমন আছে, তেমন বহু বছর যাবত আমার ভাগ্যে হয়নি। শরীরের ওজন বেড়ে গেছে, ক্ষুধা বেড়ে গেছে এবং এত সুন্দর ঘুম হয় যে গত পনেরো বছরে এত সুন্দর ঘুম হয়নি। শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম আগে থেকে অনেক বেশী করতে পারি এবং ক্লান্তি খুব কম বোধ করি। তার কারণ এই যে, আজ পৃথিবীতে আমার চেয়ে সুখী ব্যক্তি আর কেউ নেই। ছেলে মেয়ে ও আত্মীয় স্বজনের জন্যে কোন চিন্তা আমার নেই। কারণ তাদেরকে খোদার উপরে সঁপে এসেছি। জাতির জন্যে আমার কোন চিন্তা নেই। কারণ, এ ব্যাপারে খোদার তরফ থেকে আমার উপরে যতটা দায়িত্ব ছিল, তা বর্তমান সরকার তাদের নিজেদের স্কন্ধে নিয়েছেন। জামায়াত এবং ইসলামী দাওয়াতের জন্যেও আমার চিন্তা নেই। কারণ গ্রেফতার হওয়ার সাথে সাথেই দায়িত্বমুক্ত হয়ে পড়েছি। এর সাথে সাথে এ আস্থাও আমার পুরোপুরি রয়েছে যে, আমার কারারুদ্ধ হওয়ার কারণে জামায়াতের কোন ক্ষতি না হয়ে বরং উপকারই হবে। এখন আপনি নিজেই চিন্তা করে দেখুন আমার চেয়ে অধিক সুখী আর কে হতে পারে।

খাকসার

আবুল আ'লা

[৩]

হাফেযাবাদের হাকিম মুহাম্মদ শরীফ সাহেবের নামে।

নতুন সেন্ট্রাল জেল মুলতান
২২শে এপ্রিল, ১৯৪৯

আমার শ্রদ্ধেয়,

আসসালামু আলায়কুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

আমার কারা-জীবনের মেয়াদ বাড়িয়ে দেয়ার জন্যে আপনি যে দুঃখ প্রকাশ করেছেন, তা আমার প্রতি আপনার আন্তরিক ভালবাসারই পরিচায়ক। কিন্তু নীতিগতভাবে একটি বিষয় মনে রাখবেন যে, যে ব্যক্তি খোদা এবং তার সৃষ্টির সঙ্গে ভালো সম্পর্ক রাখে এবং খোদার পথে তাঁর সৃষ্টির মঙ্গলের জন্যে কাজ করে খোদা তার সাথে কোন খারাপ ব্যবহার করেন না। প্রকাশ্যত তার জন্যে যা অমঙ্গলকর মনে হয়, খোদার ফযলে তাই তার জন্যে মঙ্গলকর হয়। এ কথা যদি অন্তরে গ্রহণ করে নিতে পারেন, তাহলে সেই মানসিক আনন্দ লাভ করতে পারবেন যা খোদার ফযলে আমি লাভ করেছি। এ নিছক একটা ভাল ধারণা পোষণ নয়, বরং একটা মহাসত্য। আমি যে সংস্কার-সংশোধনের জন্যে কাজ করছি, তার পথে কোন প্রস্তরময়-পর্বত প্রতিবন্ধক নয়। বরং গগনচুম্বী মল-আবর্জনাই ছিল প্রতিবন্ধক। আমি খোদার সন্তুষ্টির জন্যেই মল-আবর্জনা পরিষ্কার করার কাজ শুরু করেছিলাম। এ কাজ করতে গিয়ে যে মল-আবর্জনার ছিটা আমার উপরে পড়েছিল, তা ধৈর্যসহকারে সহ্য করতাম। কিন্তু আমার খোদা আমার কাছ থেকে মেথরের কাজ নেয়া পছন্দ করেননি। এ জন্যে আমাকে এক নির্জন শান্তির স্থানে এনে ফেলেছেন। এখন যাদের মল, তাদের উপরেই নিক্ষেপ করা হচ্ছে।--- এ কাজ এখনো অসম্পূর্ণ আছে। যখন সম্পূর্ণ হবে, তখন আপনারা আমাকে আপনাদের মধ্যে পাবেন।

খাকসার
আবুল আ'লা

[৪]

সাইয়েদ আবুল খায়ের মওদূদী সাহেবের নামে।

নতুন সেন্ট্রাল জেল, মুলতান
২৩শে নভেম্বর, ১৯৪৯

ভাই সাহেব,

আসসালামু আলায়কুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ।

আমার সারা জীবনের পড়াশুনা থেকে আমি একথা বলতে পারি যে, যে সব শক্তি দুর্গের অভ্যন্তরে আশ্রয় নেয়, তারা কোন দিন এ দুনিয়ায় জীবিত থাকতে পারে না। কারণ মুক্ত মাঠে প্রতিযোগিতা করা থেকে পালিয়ে গিয়ে দুর্গের মধ্যে লুকিয়ে থাকা কাপুরুষতার পরিচায়ক এবং আল্লাহ তায়ালা কাপুরুষদের শাসনের জন্যে এ পৃথিবী সৃষ্টি করেননি। আমার অধ্যয়ন একথাও বলে যে, যাদের কাজকর্ম মিথ্যা, প্রতারণা ও প্রবঞ্চনার ভিত্তিতে চলে, সত্যের আলোকে আসা যারা বিপজ্জনক মনে করে এবং যাদের শাসন ক্ষমতার নিরাপত্তার জন্যে প্রয়োজন হয় নিরাপত্তা আইনের, এমন নৈতিক কাপুরুষদের কাঠের হাঁড়ি বেশীক্ষণ উনুনের উপরে থাকতে পারে না। এ বিবেকের পরিপন্থী, প্রাকৃতিক বিধানের পরিপন্থী এবং এক হাজার বছরের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, এ সবের উপরে নির্ভরকারী ক্ষণকালের জন্যে যতই শক্তিশালী হোক না কেন, বেশী দিন টিকে থাকতে পারে না।

খাকসার
আবুল আ'লা

[৫]
সাইয়েদ আবুল খায়ের মওদূদী সাহেবের নামে।

নতুন সেন্ট্রাল জেল, মুলতান
১৬ই মে, ১৯৪৯

ভাই সাহেব,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

আগামীতে আপনি যখনই আসবেন সাথে করে বড় ছেলে দু'টিকে আনবেন। হাজী মিঞা* আসতে চাইলে তাকেও আনবেন। এখানকার পরিবেশের একটি মন্দ প্রক্রিয়া হতে পারে, এটা মনে করে প্রথমত তাদেরকে আনতে নিষেধ করে দিয়েছিলাম। কিন্তু এখন চিন্তা করে এ সিদ্ধান্তে পৌছেছি যে, তাদেরকে সব জায়গা দেখিয়ে দেয়া উচিত। এমনও হতে পারে যে, বর্তমান বংশধর থেকে ভবিষ্যতের বংশধর অধিকতর পথভ্রষ্ট হবে এবং তাদের মুকাবেলায় তখনকার লোকদের আমাদের চেয়ে কঠিন সংগ্রাম করতে হবে। আমি আমার ছেলেদেরকে বিলাসিতার জন্যে প্রতিপালন করতে চাই না। বরং ভালোর সেবা এবং মন্দের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্যে প্রতিপালন করতে চাই।

খাকসার
আবুল আ'লা

বড় ভাইয়ের ছেলের হাক নাম 'হাজী মিঞা'

[৬]

আহমদ ফারুক মওদূদীর নামে।

নতুন সেন্ট্রাল জেল, মুলতান
৩০শে ডিসেম্বর, ১৯৪৯

প্রিয় পুত্র,

ওয়া 'আলায়কুমুস সালাম।

জানি না আজ তোমাকে যে পত্রখানা লিখছি তা কবে তুমি পাবে। এর জন্যে অবশ্য আমিও চিন্তিত নই এবং তোমাদের চিন্তিত হওয়া উচিত নয়। চিঠি পাও, না পাও এবং কুশল জানতে পার আর না পার সকল অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকবে যে, আল্লাহ যাই করেন, মঙ্গলের জন্যে করেন। শয়তান তো এই চায় যে, আমরা যেন এ অবস্থায় অত্যন্ত ঘাবড়ে যাই এবং অধীর হয়ে পড়ি। কিন্তু খোদার উপর ভরসা করে শয়তানের এ চালবাজি আমাদের পরাস্ত করা উচিত।

তোমরা ভালভাবে চলছ, না মন্দভাবে চলছ, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। তোমাদের ভালো-মন্দ অবস্থার কিছু যদি আমি জানতেও পারি, তো কিছুই করতে পারব না। এ জন্যে আমি তোমাদেরকে খোদার উপরে সোপর্দ করে ধৈর্য ধারণ করেছি। আমি মনে করি আমার মৃত্যুর পর তোমাদের যেভাবে জীবন যাপন করতে হতো, ঠিক সেইভাবে এখনও করবে। খোদার এ এক শান যে, অন্যান্যকে তাদের অভিভাবকের মৃত্যুর পর যে অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়, আমার জীবদ্দশায় তোমাদেরকে সে অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছে। এ অভিজ্ঞতার জন্যে ভেঙে পড়ো না, বরং এ সুযোগ গ্রহণ কর। ইনশাআল্লাহ এ তোমাদের জন্যে মঙ্গলকর প্রমাণিত হবে।

–আবুল আ'লা মওদূদী

[৭]

করাচীর চৌধুরী গোলাম মুহাম্মদ সাহেবের নামে।

নতুন সেন্ট্রাল জেল, মুলতান
৬ই এপ্রিল, ১৯৫০

আসসালামু আলায়কুম ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহ।

বর্তমান কালের বিপ্লবী আন্দোলনের মেযাব থেকে ইসলামের মেযাব পৃথক। বর্তমানে বিপ্লবী আন্দোলনগুলো প্রথমত তাদের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করে। দ্বিতীয়ত তারা একটি সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তে অন্য একটি সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করার জন্যে অতীব হীন পন্থা অবলম্বন করে। এই বিপ্লব-পরিবর্তনের ফলে লক্ষ লক্ষ মানব সন্তান যে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে, তার কোন পরোয়া তারা করে না। পক্ষান্তরে ইসলাম যখন ক্ষমতা লাভ করতে সক্ষম হয়, তখন সে সাধারণত প্রতিশোধ লওয়ার পরিবর্তে ক্ষমার নীতি অবলম্বন করে। অতঃপর পূর্ববর্তী সমাজ ব্যবস্থার ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধন এবং তদস্থলে নিজের সংস্কার-সংশোধনী প্রোগ্রাম কার্যকর করার ব্যাপারে তার সাধারণ নীতি এই হয় যে, সংস্কার-সংশোধন ক্রমশ এবং যতদূর সম্ভব সহজ পদ্ধতিতে করা হবে এবং মানব জীবনকে ঝটিকা বিপ্লব থেকে যথাসম্ভব বাঁচানো হবে।

ইসলামের স্পিরিট সম্পর্কে অজ্ঞ লোক সংস্কার-সংশোধনের অতি আগ্রহ জগতে প্রচলিত বিপ্লবী পদ্ধতির অনুকরণ করে এবং এরূপ অনুকরণ করতে গিয়ে তাতে ইসলামের লেবেল লাগিয়ে দেয়। তাদের ভ্রান্ত কর্মপদ্ধতির বিশ্লেষণ করাই হচ্ছে ইসলামী নীতি বর্ণনার উদ্দেশ্য।

—আবুল আ'লা মওদূদী

[৮]

রাসায়েল ও মাসায়েলে প্রদত্ত চিঠির জবাব

বিরোধিতার তুফান

...... আমার বিরুদ্ধে যে প্রচারণা শুরু করেছে তা আমার অজানা নেই। এ আমার নতুন কোন অভিজ্ঞতা নয়। বারবার এ ধরনের মিথ্যা অপবাদ আমার বিরুদ্ধে ছড়ানোর চেষ্টা করা হয়েছে এবং সব সময়ে আমি ধৈর্য ধারণ করেছি। এখন পর্যন্ত আমার অভিজ্ঞতা এই যে, আল্লাহ তায়ালা মিথ্যাকে প্রসার লাভ করতে দেন না।

সব সময়েই আমার এ নিয়ম ছিল যে, যাদেরকেই সততা, বিশ্বস্ততা এবং খোদার ভয় থেকে বেপরোয়া দেখেছি, তাদের কোন কথার জবাব দেইনি এবং ভবিষ্যতেও দিতে চাই না। আমার মনে হয় তাদের প্রতিশোধ নেয়া আমার সাধ্যের বাইরে। আল্লাহ তায়ালাই তাদের প্রতিশোধ নিতে পারেন। এও আমার ধারণা যে, তাদের মিথ্যার প্রতিবাদ করারও আমার প্রয়োজন নেই। ইনশাআল্লাহ দুনিয়াতেই তাদের গুমোর ফাঁস হয়ে যাবে।

উদ্দেশ্য ও কর্মপদ্ধতি

জামায়াতে ইসলামী গঠনের উদ্দেশ্য ভাল করে বুঝে রাখুন। কোন দেশ অথবা জাতির সাময়িক সমস্যা সামনে রেখে সাময়িক পদ্ধতিতে তার সমাধান করার জন্যে এ জামায়াত গঠিত হয়নি। সমস্যাবলীর সমাধানকল্পে যখন যে নীতি চালু দেখা যাবে, তাই অবলম্বন করা হবে– এমন নীতির ভিত্তিতে এ জামায়াত গঠিত হয়নি। এ জামায়াতের সামনে তো একটি মাত্রই বিশ্বজনীন ও শাশ্বত সমস্যা রয়েছে, যা প্রত্যেক দেশ ও জাতির সমুদয় সমস্যাকে আঁকড়ে ধরে আছে। সে সমস্যাটি হলো এই যে, মানবের পার্থিব উন্নতি ও পারলৌকিক মুক্তি কিসে রয়েছে। অতঃপর এ সমস্যার একটি মাত্র সমাধান এ জামায়াতের নিকটে রয়েছে। তা হচ্ছে এই যে, সমগ্র মানব জাতি সত্যিকারভাবে আল্লাহর দাসত্ব অবলম্বন করুক। অতঃপর তাদের মূলনীতি অনুসরণ করে চলুক যা রয়েছে

আল্লাহর কিতাবে এবং রসূলের সুন্নাতে। এ সমস্যা এবং এর সমাধান ব্যতীত দুনিয়ার অন্য কোন কিছুর প্রতিই আমাদের কোন আকর্ষণ নেই।

দল গঠনের আবশ্যকতা

.... হাদীস থেকে প্রমাণিত আছে যে, জামায়াত বা দল ব্যতীত সত্যিকার ইসলামী জীবন হয় না। জীবন প্রকৃতপক্ষে ইসলামী হতে হলে সবচেয়ে প্রয়োজন যে বস্তুর, তা হচ্ছে এই যে, ইসলামের লক্ষ্য অর্থাৎ ইকামাতে দ্বীনের সাথে হতে হবে সংশ্লিষ্ট। এর দাবি হচ্ছে এই যে, এ লক্ষ্যের জন্যে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে এবং ঐক্যবদ্ধ শক্তি ব্যতীত এ প্রচেষ্টা সম্ভব নয়। অতএব জামায়াত ব্যতিরেকে কোন জীবনকে ইসলামী বলা মারাত্মক ভুল হবে। দ্বিতীয় কথা এই যে, কোন ব্যক্তি আমাদের জামায়াতে শামিল না হোক। কিন্তু সে এমন জামায়াতে শামিল হোক যার লক্ষ্য এই হবে এবং যার দলীয় সংগঠন ও সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানোর পদ্ধতি ইসলামী শিক্ষা অনুযায়ী হবে। এমতাবস্থায় তাকে আমরা সত্য পথগামী বলে স্বীকার করতে দ্বিধা করবো না। কিন্তু ব্যক্তিগত চরিত্র গঠনের যে সব পদ্ধতি শরীয়তে বলা হয়েছে, কোন ব্যক্তি শুধু তারই অনুসরণ করুক এবং ইকামাতে দ্বীনের চেষ্টা-চরিত্রের জন্যে কোন জামায়াতে শামিল না হোক– এ আমাদের কাছে ঠিক নয়। এমন জীবনকে আমরা অর্ধ জাহিলিয়াতের জীবন মনে করি। আমাদের জ্ঞান-বুদ্ধি মতে ইসলামের সর্বনিম্ন দাবি এই যে, যদি কোন ব্যক্তি তার চারপাশে ইসলামী লক্ষ্য অর্জনের জন্যে ইসলামী পদ্ধতিতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টাকারী কোন জামায়াত দেখতে না পায়, তাহলে তার উচিত হবে এরূপ কোন দল গঠনের চেষ্টা করা এবং তাকে এ জন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে যে, যখনই এ ধরনের কোন জামায়াত পাওয়া যাবে, তখন তার সকল আমিত্ব বিসর্জন দিয়ে জামায়াতের মনোভাব নিয়ে তাতে শামিল হতে হবে।

তাবলীগ ও বিপ্লব

আপনার পত্র থেকে যতটুকু বুঝতে পেরেছি তার মর্ম হলো এই যে, বর্তমান সময়ে শুধু মৌখিক তাবলীগ, বক্তৃতা, প্রবন্ধ লিখন ও পত্র-পত্রিকার দ্বারা প্রচার চালানো হোক। এর উপরে নিজের কোন আমল করার দাওয়াত দেয়ার

প্রয়োজন নেই। তারপর যখন সকল মুসলমানের মন-মস্তিষ্ক আমাদের ভাবধারায় প্রভাবিত হবে, তখন হঠাৎ একদিন বিপ্লব ঘটবে।

ধারণাটি বেশ চমৎকার। কিন্তু তাবলীগ এবং বিপ্লবের প্রকৃতি যে এক নয় তার কি করা যাবে? প্রভাবশালী এবং কার্যকরী তাবলীগ কেবল মাত্র তখনই হতে পারে যখন তাবলীগকারী দল তার নীতির উপরে আমল করবে এবং এর উপরে আমলকারীদেরকে সংগঠিত করবে। শুধু ওয়ায-নসীহত তো বহুদিন ধরে চলে আসছে। তার কি ফল হয়েছে?

(রাসায়েল ও মাসায়েল)

কতকগুলো মূল্যবান কথা

[১]

আমি অতীত ও বর্তমানের কারো কাছ থেকে দ্বীনকে বুঝবার চেষ্টা না করে সর্বদা কোরআন ও সুন্নাহ থেকে বুঝবার চেষ্টা করেছি। অতএব খোদার দীন আমার ও প্রত্যেক মুমিনের কাছ থেকে কি দাবি করে– এ কথা জানার জন্যে দেখার চেষ্টা করি না যে, অমুক বুযুর্গ কি বলেন ও কি করেন। বরঞ্চ শুধু দেখার চেষ্টা করি যে, কোরআন কি বলে এবং তার রাসূল (সাঃ) কি করেছেন।

– আবুল আ'লা মওদূদী

[২]

আমরা প্রকৃতপক্ষে এমন একটা দল তৈরি করতে চাই, যারা একদিকে দ্বীনদারী পরহেযগারীতে পারিভাষিক দ্বীনদার মুত্তাকী থেকে হবে অধিকতর অগ্রসর এবং অপরদিকে দুনিয়ার ব্যবস্থাপনা চালানোর জন্যে সাধারণ দুনিয়াদার থেকে হবে অধিকতর যোগ্যতা ও ক্ষমতাসম্পন্ন। সৎ লোকের এমন একটা দল গঠিত হওয়া উচিত, যার লোকগুলো হবে খোদাভীরু, নিষ্ঠাবান ও বিশ্বস্ত। আর তারা ভূষিত হবে খোদার মনঃপূত চরিত্র ও গুণাবলীতে। তার সাথে তারা দুনিয়ার কাজ-কারবার বুঝতে পারবে দুনিয়াদারদের থেকে অধিকতর ভালোভাবে।

–আবুল আ'লা মওদূদী

[৩]

আমার ও আমার সহকর্মী বন্ধুদের কাছে যখনই এ কথা পরিস্কার হয়ে যাবে যে, আমরা চুল বরাবর কোরআন ও সুন্নাহ থেকে সরে পড়েছি, তখন

ইনশাআল্লাহ দেখবেন যে, আমরা হকের দিকে ফিরে যেতে এক মুহূর্তও ইতস্তত করব না। কিন্তু আপনারা যদি হক ও বাতিলের কষ্টিপাথর খোদার কিতাব ও রাসূলের সুন্নাতের পরিবর্তে কোন ব্যক্তিকে করেন, তাহলে আপনারা নিজেদেরকে ও নিজেদের ভবিষ্যতকে ব্যক্তির উপরেই সোপর্দ করুন। এর পূর্ণ অধিকার আপনাদের আছে। অতঃপর খোদার কাছে এরূপ জবাব দিবেন, 'হে খোদা, আমরা আমাদের দ্বীনকে তোমার কিতাব ও তোমার রাসূলের সুন্নাতের পরিবর্তে অমুক ও অমুক লোকের উপরে ছেড়ে দিয়েছিলাম'। আপনাদের এ জবাব যদি আপনাদেরকে খোদার কাছ থেকে বাঁচাতে পারে, তাহলে তা সন্তুষ্ট চিত্তে করতে থাকুন।

—আবুল আ'লা মওদূদী

[৪]

এ কাজ যদি আমরা দোকানদারীর মনোভাব নিয়ে করে থাকি, তাহলে আমাদের উপরে এবং আমাদের এ কারবারের উপরে হাজার হাজার লা'নত। আর যদি এটা ঐকান্তিকতার সাথে খোদার দ্বীনের খেদমত হয়, তাহলে আমাদের উপরে প্রত্যেকের খুশী থাকা উচিত যে, এ কাজ সে শুধু একাই করছে না বরং অন্যান্যরাও এতে লিপ্ত আছেন। আমাদের কাজ হচ্ছে এই যে, আমরা তাকে প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করব না। বারবার আমরা তার কাছে যাব, যাতে আল্লাহ্ তার মনকে ফিরিয়ে দেন।

— আবুল আ'লা মওদূদী

[৫]

ইকামতে দীন একটি অটল ও অপরিহার্য কর্তব্য

প্রত্যেক সত্যানুসন্ধী ব্যক্তির অপরিহার্য কর্তব্য এই যে, সে যেন তার মধ্যে ইকামতে দ্বীনের তীব্র অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করে। অতঃপর সে চেষ্টা করবে যাতে তার মনের মধ্যে এ আগুন জ্বলে উঠে। এ চেষ্টা-চরিত্রের পরিণাম কি হবে, তা আলোচনা বহির্ভূত। এমনও হতে পারে যে, আমাদেরকে করাত দিয়ে চিরা হবে, মাটির উপর দিয়ে টেনে-হেঁচড়ে নেয়া হবে, জ্বলন্ত কয়লার উপরে নিক্ষিপ্ত করা

হবে এবং আমাদের মৃতদেহ কাক-চিলের খাদ্য হবে। এতসব করেও হয়ত আমাদের এ সৌভাগ্য হবে না যে, বর্তমান বাতিল ব্যবস্থাকে আমরা একটা সত্য সুন্দর ব্যবস্থায় পরিবর্তিত করতে পারব। কিন্তু এ ব্যর্থতা কোন ব্যর্থতা নয়। ব্যর্থতার কোন আশঙ্কা অথবা অনিশ্চয়তা আমাদেরকে ঐ দাবি থেকে মুক্তি দান করবে না, যে দাবি ইকামতে দ্বীনের জন্যে আল্লাহ তায়ালা করেছেন। এ একটা অটল অপরিহার্য কর্তব্য, যা আমাদেরকে যে কোন মূল্যে যে কোন অবস্থায় পালন করতে হবে। যদি সকল খানকাহ আপনাদেরকে এ আশ্বাস দেয়ার চেষ্টা করে যে, অমুক অমুক ওযীফা-তপজপ এ দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিতে পারে, তাহলে আমি আপনাদেরকে নিশ্চয়তার সঙ্গে বলব যে, এ শয়তানী প্রবঞ্চনা মাত্র। যতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের ঘাড়ে মাথা রয়েছে আর আল্লাহর দ্বীনের প্রাসাদের একখানা ইটও তার স্থান থেকে বিচ্যুত হয়ে আছে এবং আল্লাহর পৃথিবীর সূচ্যগ্র-ভূমি আল্লাহ ব্যতীত অপরের দাসত্বে নত হয়ে আছে, ততক্ষণ আপনাদের জন্যে শান্তির নিদ্রা হারাম।

– আবুল আ'লা মওদূদী
(জামায়াতে ইসলামীর কার্যবিবরণী – ৩য় খণ্ড)

[৬]

হুকুমতে ইলাহিয়া এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি

ইকামতে দ্বীনের এ প্রচেষ্টা সম্পর্কে কিছু বলতে পারি না যে, এর ফলাফল কি হবে। পরিণাম তো আল্লাহ তায়ালাই জানেন। এ প্রচেষ্টার ফল যদি এ হয় যে, আমরা একটা সৎ সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করতে সক্ষম হয়েছি, তাহলে তা হবে আল্লাহর দান। কিছু সংখ্যক লোক ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে এ কথা বলে যে আমাদের সকল প্রচেষ্টা ক্ষমতা লাভের জন্যে এবং দ্বীনের আসল উদ্দেশ্য যে, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ, তা আমাদের মধ্যে নেই। তাদের এই ধারণা একেবারে ভ্রান্ত। আমাদের সকল প্রচেষ্টা একটা সৎ এবং খেদায়ী ব্যবস্থার জন্যে। এ প্রচেষ্টায় কোন অপরাধ নেই এবং এতে লজ্জারও কিছু নেই। আমরা যখন হুকুমাতে ইলাহিয়ার নাম করি তখন আমরা উপরিউক্ত ব্যবস্থাকেই বুঝাই। আমি বুঝতে পারি না যে, এটা আমাদের আকাঙ্ক্ষিত হলে এত বিতর্কের কি আছে? এবং এটা খোদার সন্তুষ্টির কামনার পরিপন্থীই বা কি করে হবে? খোদার

পৃথিবীতে একমাত্র খোদারই বিধান চলবে– এর চেয়ে অধিক খোদার সন্তুষ্টি লাভ আর কি প্রকারে হতে পারে? তাদের চেয়ে অধিক খোদার সন্তুষ্টি কামনাকারী আর কে হতে পারে, যারা এ কাজের জন্যে জানমাল উৎসর্গ করে এবং ফলাফল যাই হোক না কেন, খোদার পৃথিবীতে খোদা ছাড়া আর কারো প্রভুত্ব কিছুতেই চলতে দিতে চায় না। এ ধরনের সংগ্রাম প্রচেষ্টা যদি দুনিয়াদারী হয়, তাহলে দ্বীনদারী কি একে বলে যে, রাত্রি জেগে জেগে 'আল্লাহ' 'আল্লাহ' যিকির করা হবে, আর দিনের বেলায় শয়তানের সিংহাসন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হবে? যারা এ ধরনের কথা বলে, তাদের মন-মস্তিষ্কে দ্বীন সম্পর্কে অতি নিকৃষ্ট ধারণা রয়েছে।

মাওলানা মওদূদী

(জামায়াতে ইসলামীর কার্যবিবরণী– ৩য় খণ্ড)

[৭]

সত্য পথের দাবি

এ পথের প্রকৃত দাবি এই যে, আমাদের মধ্যে যেন বিরোধিতাকে স্বাগত জানানোর অনুরাগ সৃষ্টি হয়। সত্য পথেই হোক আর ভ্রান্ত পথেই হোক, আল্লাহ্ তায়ালার নীতি এই, যে ব্যক্তি যে পথই অবলম্বন করে সে পথেই তার অগ্নিপরীক্ষা হয়। হক পথের তো বৈশিষ্ট্যই এই যে, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এ অগ্নি পরীক্ষায় পরিপূর্ণ। যেমন অংক শাস্ত্রে কোন মেধাবী ছাত্র কঠিন প্রশ্নে সন্তুষ্ট হয় এ জন্যে যে, তার মেধাশক্তি পরীক্ষার সুযোগ সে লাভ করেছে। ঠিক এইরূপ কোন দৃঢ়-সংকল্প মুমিন কোন নতুন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে আনন্দ পায় এ জন্যে যে, তার আনুগত্য প্রমাণ করার সুযোগ এসেছে। ক্ষীণ প্রদীপ বাতাসের ঝাপটায় নিভে যায়, কিন্তু প্রজ্জ্বলিত উনুনকে বাতাসের ঝাপটা আরো অধিকতর প্রজ্জ্বলিত করে দেয়। আপনারা নিজেদের ভিতর এমন যোগ্যতা সৃষ্টি করুন যে, যেভাবে একটা প্রজ্জ্বলিত উনুন সিক্ত জ্বালানির দ্বারা নিভে না গিয়ে বরং তাকে তার খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে, তেমনি আপনারা বিরোধিতার কাছে নত না হয়ে বরং তা থেকে খাদ্য এবং শক্তি সংগ্রহ করুন। যতদিন না এ যোগ্যতা আমাদের মধ্যে পয়দা হয়েছে, ততদিন এ আশা করা যেতে পারে না যে, আমাদের দ্বারা দ্বীনের কোন ভালো খেদমত হতে পারে।

– মাওলানা মওদূদী

(জামায়াতে ইসলামীর কার্যবিবরণী – ৩য় খণ্ড)

[৮]

দ্বীনকে যেভাবে বিকৃত করা হচ্ছে, তা যদি আমি মেনে নেই এবং কিছু লোক আমাকে যেভাবে দেখতে চায়, আমি যদি তা হয়ে যাই, তাহলে এমন অপরাধে অপরাধী হবো যে, আল্লাহর কাছে আমাকে কঠিন জবাবদিহির সম্মুখীন হতে হবে। সেদিন আমাকে কেউ সাহায্য করতে আসবে না। অতএব, আমি তাদের ঠাট্টা-বিদ্রূপের পাত্র হওয়াকে শ্রেয় মনে করি আখেরাতে নিজেকে বিপন্ন করা থেকে।

–আবুল আ'লা মওদূদী

[৯]

খোদা সাক্ষী আছেন, কোন ব্যক্তি অথবা দলের প্রতি আমার কোন শত্রুতা নেই। আমি শুধু সত্যের বন্ধু এবং মিথ্যার দুশমন। যা আমি সত্য মনে করছি, তার সত্যতার যুক্তিও পেশ করেছি। যা মিথ্যা মনে করেছি, তারও যুক্তি উপস্থাপিত করেছি। যিনি আমার সাথে একমত নন, তিনি যুক্তি দিয়ে আমার ভুল ধরে দিলে, আমি আমার মত পরিবর্তন করতে পারি। এখনো কিছু লোক এমন আছেন, যাঁরা শুধু এ জন্যে ক্রোধান্বিত হয়ে পড়েন যে, তাদের অথবা তাদের প্রিয় নেতার বিরুদ্ধে কিছু বলা হয়েছে। অথচ তাদের বিবেচ্য এটা নয় যে, যা বলা হয়েছে তা সত্য না মিথ্যা। এরূপ লোকের ক্রোধবহ্নিকে আমি কোন পরোয়া করি না। আমি তাদের গালির জবাব দেবো না এবং আমার পথ থেকে বিচ্যুত হবো না।

–আবুল আ'লা মওদূদী

[১০]

আমার স্পষ্টবাদিতা নিশ্চয়ই ঐ সব মহাত্মার কাছে কটু লাগবে, যারা মানুষকে সত্যের দ্বারা যাচাই করার পরিবর্তে সত্যকে মানুষের দ্বারা যাচাই করতে অভ্যস্ত। এর জবাবে আরো কিছু গালি খাবার জন্যে আমি নিজকে প্রস্তুত রেখেছি।

– আবুল আ'লা মওদূদী

[১১]

আমার বড় দুঃখ হয়, মুসলমানদের নৈতিক অধঃপতন বর্তমানে এমন চরমে পৌঁছেছে যে, খোদার আইন-ভঙ্গকারীরা সদর্পে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অপরদিকে যারা রাব্বুল আলামীনের আইন মেনে চলে ও অপরকে চলতে বলে, আজ তারাই হচ্ছে লাঞ্ছিত ও অপমানিত।

– আবুল আ'লা মওদূদী

[১২]

খোদার ফযলে আমি ভাবাবেগে কোন কাজ করিনি। আমার বক্তৃতায় যা কিছু বলেছি, তার প্রতিটি শব্দ পরিমাপ করে বলেছি এ কথা চিন্তা করে যে, এর হিসাব খোদার কাছে দিতে হবে, কোন বান্দার কাছে নয়। আমি নিশ্চিত যে, সত্যের বিপরীত একটি শব্দও আমি বলিনি। যা কিছু বলেছি, তা দ্বীনের খেদমতের জন্যে ছিল একান্ত অপরিহার্য। আমার আশংকা হয়েছিলো যে, এ কথা বলার জন্যে নয়, বরং না বলার জন্যে আমাকে খোদার কাছে দায়ী হতে হবে।

–আবুল আ'লা মওদূদী

[১৩]

আমি তাদের মধ্যে নই, যারা মিথ্যা প্রচারণা, ব্যক্তিগত কোন্দল এবং গালাগালি করাকে নিজেদের পেশা বানিয়ে নিয়েছে। বুযুর্গানে কওমের পাগড়ি বহনকারী এবং রাজনৈতিক মতভেদকে ব্যক্তিগত শত্রুতায় পরিবর্তনকারীদের আচরণ আমি সর্বদাই ঘৃণার চোখে দেখে এসেছি। আমাকে যাঁরা জানেন, তাঁরা এ সত্যটিও জানেন।

–আবুল আ'লা মওদূদী

[১৪]

সিনেমা

প্রশ্ন ঃ কখনো কখনো চিত্ত বিনোদনের জন্যে সিনেমায় যাই। যৌন-অনুরাগে প্রভাবিত হয়ে যাই না। এ বিষয়ে আপনি কি বলেন?

জবাব ঃ সিনেমার দৃশ্যাবলী বরদাশত করতে পারে শুধুমাত্র ঐসব চোখ, যা এখনো পূর্ণ মুসলমান হয়নি। আপনি চোখ দুটোকে মুসলমান বানানোর চেষ্টা করুন। তারপর দেখবেন যে, সিনেমায় আপনার চিত্তবিনোদন হবে না। এমন কষ্ট হবে যে, মনে হবে, কে যেন চোখে সূঁচ ফুটিয়ে দিচ্ছে।

– আবুল আ'লা মওদূদী

একটি সাক্ষাতকার

প্রশ্ন ঃ আপনি আপনার জীবনের অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার কিছু বলবেন কি?

উত্তর ঃ আমার ডাইরী লেখার অভ্যাস নেই এবং এ সব বিষয়ে কোন দিন বসে চিন্তাও করিনি। সুযোগ বুঝে কোন কথা হয়ে যায়। আলাপ-আলোচনা প্রসঙ্গে কোন ঘটনার উল্লেখ করে ফেলি। কিন্তু কোন দিন এ সবের কোন তালিকা প্রস্তুত করিনি এবং এ সব নিয়ে কোন চিন্তাও করিনি। কখনও বা হঠাৎ কোন অসাধারণ কথা এসে পড়ে। নতুবা সাধারণত আমি কোন বিষয়ে অধিক আনন্দও করি না এবং বিমর্ষ হয়েও পড়ি না।

প্রশ্ন ঃ এমন অবস্থা কি আপনার কখনো হয়েছে যাতে খাওয়া-দাওয়ার খুব কষ্ট হয়েছে?

উত্তর ঃ জি না, এমন তো হয়নি। এর জন্যে খোদার শোকর। তবে একবার মাত্র এমন হয়েছিলো যে, আজ বুঝি অনাহারে থাকতে হয়। কিন্তু উপোস থাকবার আগেই আল্লাহ্ তায়ালা কিছু না কিছু ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। খোদার শোকর যে, আজ পর্যন্ত সে অবস্থা হয়নি। তার কারণ এই যে, বহুকাল একাকী বাস করেছি এবং অনেক সময়ে নিজ হাতে রান্নাও করেছি। আবার অনেক সময় কাজে এত ব্যস্ত থাকতে হয়েছে যে, রান্না করার অবসর পাইনি। খাবার সময় হলে কলা এনে খেয়ে নিয়েছি।

প্রশ্ন ঃ আপনি কখন বেশিক্ষণ ধরে বসে কাজ করতেন এবং কত ঘণ্টা?

উত্তর ঃ আমি সব সময় কাজ করতে পারি। কিন্তু যখন দেখি যে, দিনের বেলায় অবসর নেই, তখন রাতেই কাজ করি। এমন এক সময় ছিলো, যখন ইশার নামাযের পর থেকে ফযরের নামায পর্যন্ত কাজ করেছি। এ সময়ের মধ্যেও লোকজন দেখা করতে আসতো, কথাবার্তাও চলতো।

প্রশ্ন ঃ এ আন্দোলনের কাজে এবং এই অবস্থায় আপনি স্বাস্থ্যের প্রতি কিরূপ লক্ষ্য রাখতেন?

উত্তর ঃ স্বাস্থ্য সম্পর্কেও কিছুকাল পর্যন্ত আমি বেপরোয়া ছিলাম। বরং এক সময়ে তো আমি এই চিন্তা করে কাজ করতাম যে আমাকে আমার সকল শক্তি প্রয়োগ করতে হবে, ফলাফল যাই হোক না কেন। সে সময়ে আমি

মরিয়া হয়ে কাজ করতাম। কোনই পরোয়া করতাম না যে শরীর ও স্বাস্থ্যের উপর কি চাপ পড়বে। ১৯৩৯ সাল থেকে ১৯৪২ সাল পর্যন্ত এভাবেই কাজ করে গিয়েছি। একা কাজ করেছি। সাহায্য করার কেউ ছিলো না। আমি অনুভব করছিলাম যে এ কাজ চলুক না চলুক যতটুকু করতে পারি করে ফেলি। অবশ্য ভরসা তো ছিলো না যে কোন সহকর্মী পাওয়া যাবে এবং যে কাজ করছি তা সফল হবে।

প্রশ্ন ঃ সহকর্মী পাওয়াতে এবং আন্দোলনের কাজ বেড়ে চলাতে আপনার আনন্দ হয়েছিলো?

উত্তর ঃ জি হ্যাঁ, এ তো অতি স্বাভাবিক কথা।

প্রশ্ন ঃ প্রথমবার যখন জেলে পাঠানো হয়, তখন আপনার প্রতিক্রিয়া কি হয়েছিলো?

উত্তর ঃ আমি প্রথম থেকেই মনে করে রেখেছিলাম যে, এ পরিস্থিতি অবশ্য অবশ্যই আসবে এবং এ আমার ধারণার অতীত ছিল না। বরং আমি এই ধারণাই করেছিলাম। এতে আমার কোন দুঃখও ছিল না।

প্রশ্ন ঃ প্রথমবার যখন আপনি জেলে গেলেন এবং বিশ মাস জেলে থাকার পর যখন বেরিয়ে এলন, তখন আপনার মনের অবস্থা কি ছিল?

উত্তর ঃ সে সময়ে কোন বিশেষ সুখ অথবা দুঃখ অনুভব করিনি। পরম আরামে জেলে বসে কাজ করতাম। প্রতি ছ'মাস পর গভর্নমেন্ট আমার বন্দী জীবনের মিয়াদ বর্ধিত করত। এমন কখনো হয়নি যে, আমি দিন গুণছিলাম এবং অবশেষে মুক্তির দিন এসে গেছে। আমি স্থির নিশ্চিত ছিলাম যে, তারা আমাকে কিছুতেই মুক্তি দেবে না। আমি প্রথম থেকেই তৈরি থাকতাম যে, ছ'মাস পর আবার মিয়াদ বাড়িয়ে দেয়া হবে। সে সময়ে যাদের হাতে ক্ষমতা ছিল, আমার জানা ছিল তারা কোন ধরনের লোক। এ জন্যে আমি আশাই করতে পারতাম না যে, ছ'মাস পর মিয়াদ বাড়ানো হবে না। প্রতিবার মিয়াদ যে বাড়িয়ে দেয়া হতো, তা আমি ধারণাই করতাম এবং তারপর আবার নিশ্চিন্তে কাজ করতে শুরু করতাম। মুক্তির জন্যে কোন উদ্বেগ হতো না।

প্রশ্ন ঃ আপনি কি মনে করেছিলেন যে, আপনার মৃত্যুদণ্ড হবে? যখন মৃত্যুদণ্ডের সংবাদ পেলেন, তখন মনের অবস্থা কেমন হয়েছিলো?

উত্তর ঃ আসল কথা, এ ঢাক-ঢোল পিটে বলার বিষয় নয়। এ প্রশ্নের জবাবে আজ যা কিছু বলবো, কাল হয়ত তার উল্টো অর্থ করা হবে। মোটকথা, বহুদিন থেকে আমি এ বিষয়ে প্রত্যাশী ছিলাম যে, মৃত্যু যদি আসে তো তার পরের অধ্যায়টাও একবার দেখে নেব। এ জন্যে আমার বেশ আনন্দ হচ্ছিল যে, একে তো মৃত্যুদ্বার অতিক্রম করে পরপারের দৃশ্য দেখার সুযোগ আমার হবে। দ্বিতীয়ত আখেরাতের নাজাত সুনিশ্চিত করার জন্যে যে আমাকে শহীদ করে দেবে আমি তার কাছে কৃতজ্ঞ থাকব। বরং আমি এক ধরনের আনন্দ অনুভব করতাম। অবশ্য আমি এ কথাও ভাবতাম যে, হয়ত এরা আমাকে ফাঁসী দেয়ার সাহসই করবে না। আবার পরক্ষণে এও মনে হতো যে, এদের উপরে বিশ্বাসই বা কোথায়? এরা তো আমা থেকে মুক্তি পেতে চায়। কারণ আমার অস্তিত্ব এদের কাছে অসহনীয় হয়ে পড়েছে। এ জন্যে হতে পারে যে, এবারের সুযোগ তারা গ্রহণ করবে। আমারও ইচ্ছা ছিল যে তাই হোক। সে জন্যে আমি নিশ্চিত এবং আনন্দিত ছিলাম।

প্রশ্ন ঃ আপনার জীবনে এমন কোন বিশেষ ঘটনা ঘটেছিল কি যা আপনার জীবনের মোড় এদিকে ফিরিয়ে দিয়েছে?

উত্তর ঃ আমি এরূপ লোকই নই যে, কোন বিশেষ ঘটনা আমার জীবনের মোড় পরিবর্তন করে দেবে। আমি ধীর-স্থির চিত্তে গবেষণা করে ক্রমশ একদিকে অগ্রসর হই। একটি মাত্র বিশেষ ঘটনা আমাকে অত্যন্ত বিচলিত করেছিল।

হায়দারাবাদে নয় বছর অতিবাহিত করার পর যখন ১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দে আমি দিল্লী পৌঁছি, তখন আমি অনুভব করি যে, এ সময়ের মধ্যে মুসলমানগণ ইসলাম থেকে অতি দ্রুত সরে পড়ছে। দিল্লীতে যা অনুভব করলাম, হায়দারাবাদে সে অবস্থা ছিল না। মুসলমান সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়েরা প্রকাশ্যে বাজারে চলাফেরা শুরু করেছিল, যাদের সম্পর্কে আমি এতটা চিন্তাও করতে পারিনি। এটা আমাকে খুবই বিচলিত করে। দিল্লীর অবস্থা দেখে আমার রাতে ঘুম আসত না যে একি হলো। নয় বছরে এত পরিবর্তন? এ এমন সময়ের অবস্থা যখন কংগ্রেস সরকার স্থাপিত হয়েছিল, যার ফলে চারিদিকে শুধু হিন্দুদের প্রাধান্যই চোখে পড়ত। এ পরিস্থিতি

ছিল অত্যন্ত বেদনাদায়ক। ১৯৩৭ সালে আমি দিল্লী থেকে যখন ট্রেনে হায়দারাবাদ রওয়ানা হই, তখন একজন হিন্দু নেতা আমার সহযাত্রী ছিলেন। কিছু মুসলমান তার সঙ্গে আলাপ করতে লাগল। তাদের আলাপ-আলোচনায় মনে হলো যেন কংগ্রেস নেতারাই এ দেশের কর্তা এবং মুসলমানরাই তাদের প্রজা। যেন এরা ভিখারী এবং তারা দাতা। তাদের আলাপ-আলোচনা নীরবে শুনতে লাগলাম। মুসলমানদের ভবিষ্যত অবস্থা কি হবে তার একটা পূর্ণ চিত্র আমার চোখের সামনে ভেসে উঠলো। এই ঘটনার পর আমি 'সিয়াসী কাশ্‌মকাশ্‌- ১ম খণ্ড' রচনা করি। হায়দারাবাদে বসে সংবাদপত্রের মাধ্যমে যে অবস্থার সঠিক ধারণা আমি করতে পারিনি এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করে এবং চারদিকে ঘুরে ফিরে তা সঠিকভাবে অনুভব করতে পারলাম। এটাই আমাকে সংগঠিত উপায়ে সংগ্রাম-প্রচেষ্টার অনুপ্রেরণা জোগায়।

(চেরাগে রাহ- ইসলামী আন্দোলন সংখ্যা)

কিছু ঐতিহাসিক উক্তি

● এ হচ্ছে মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উম্মতের দেশ– মার্কস এবং মাওসেতুং-এর উম্মতের দেশ নয়। যদি আল্লাহর দ্বীনের জন্যে আমাদের সংগ্রাম করতে হয়, তাহলে দশটি ফ্রন্টে সংগ্রাম করতেও কুণ্ঠিত হবো না। আমরা একই সাথে সংগ্রাম করবো এক-নায়কত্বের বিরুদ্ধে এবং সংগ্রাম করবো ধর্মহীনতার বিরুদ্ধে। যতদিন আমরা জীবিত থাকব এবং যতদিন আমাদের ঘাড়ে মাথা আছে, ততদিন কারো সাহস হবে না এখানে ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ব্যবস্থা কায়েম করার।

● ভাই, আমার মনোভাব তো আপনাদের জানাই আছে। আমার যে অপরাধ কি এটা তাদের ভাল করে জানা আছে। তাদের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী হওয়ার চেয়ে ফাঁসীতে জীবন দেয়াই ভালো।

● আমি যদি বসে পড়ি তাহলে দাঁড়িয়ে থাকবে কে?

● যামানা বড় নির্মম যাচাইকারী। আপনি কোন কৃত্রিম উপায়ে এবং বানোয়াট পদ্ধতিতে তার পরীক্ষা-নিরীক্ষায় খাঁটি বলে বিবেচিত হবেন না। কিন্তু নিশ্চিত থাকুন যে, যদি আপনি আপনার কার্যকলাপের দ্বারা নিজেকে খাঁটি প্রমাণিত করতে পারেন, তাহলে বিপক্ষ শক্তি আপনাকে জাল প্রমাণ করার জন্যে যতই চেষ্টা করুক না কেন, আল্লাহ চাহেন তো তারা ব্যর্থ হবেই। আপনি মিথ্যার প্রাবল্য দেখে ঘাবড়ে যাবেন না। সেতো কখনো ঝড়ের বেগে আসে, আবার কখনো বুদবুদের মতো শূন্যে বিলীন হয়ে যায়। মিথ্যার মুকাবেলা করার কোন চিন্তা আপনার করা ঠিক নয়, বরং চিন্তা আপনার নিজের সততার জন্যে হওয়া উচিত।

● ইসলাম এবং পাশ্চাত্য সভ্যতা এমন দু'টি নৌকার মতো, যা ঠিক দু'টি বিপরীত দিকে চলে। যদি কেউ এ দু'টির একটিতে আরোহণ করে, তাহলে তাকে অবশ্যই দ্বিতীয়টি পরিত্যাগ করতে হবে। আর যদি কেউ একই সাথে দু'টিতে আরোহণ করে, তাহলে সে দ্বিখণ্ডিত হয়ে যাবে।

● এখন সময় এসেছে আমাদের মুসলমান থাকা না থাকার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করার। মুসলমান হয়ে থাকতে হলে আমাদেরকে আমাদের আপন পরিবেশ এবং সারা দুনিয়াকে 'দারুল ইসলাম' বানানোর সংকল্প নিতে হবে। যদি এতটুকু সাহস ও হিম্মত আমাদের না থাকে, তাহলে ইসলামের দাবিদার হওয়ার কথাটা ছেড়ে দিতে হবে। 'ইসলামী বিপ্লব' সম্ভব কি না এ প্রশ্নতো পরের। প্রথম প্রশ্ন এই যে, আপনাদের মধ্যে মুসলমান হয়ে থাকার সংকল্প ও বাসনা আছে কি না। ধরে নিন, ইসলামী বিপ্লব অসম্ভব। ধরে নিন, এ সময়ে কুফরী শক্তির ফ্যাসিবাদী তৎপরতা ও সার্বিক প্রাধান্য দেখার পর যে ব্যক্তি 'দারুল ইসলাম' প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নিয়ে দাঁড়ায়, তাকে আলবৎ পাগল বলা হবে এবং বলা হবে সে আগুন নিয়ে খেলা করতে চায়। এটাও বিশ্বাস করুন যে, এ সময়ে বলতে গেলে আমরা ময়দান প্রায় হারিয়ে ফেলেছি। এ অবস্থার মুকাবেলার জন্যে দাঁড়ানো পাগলের কাজ বলেই মনে হবে। এ কথাও ভাল করে জেনে রাখুন, এর পরিণাম হবে তাই, যা আমাদের দুর্বল ঈমানদার নেতাগণ মনে করেন। অর্থাৎ আসমান-যমীনের প্রতিটি অণু-পরমাণু আপনাদের দুশমন হয়ে পড়বে। তারপর এ কথাও আগে থেকে জেনে রাখুন, ইসলামের-দুশমন শিবিরগুলো এক জোট হয়ে আপনাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে। অপরপক্ষে মুসলমানগণ ঐক্যবদ্ধ হয়ে আপনাদের সাহায্যে এগিয়ে আসবে না। বরং আপনাদের এ 'পাগলামির' জন্যে বিদ্রূপ করবে। এসব জেনে শুনে ভালো করে আপন মনকে জিজ্ঞেস করুন যে, তার মধ্যে মুসলমান হয়ে থাকার আবেগ-অনুভূতি সেই 'পাগলামির' পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে কি না। যাদের মধ্যে এ 'পাগলামি' বিদ্যমান আমাদের প্রয়োজন শুধুমাত্র তাদেরই এবং 'দারুল ইসলামের' আন্দোলন চালাতে পারে একমাত্র তারাই।

● হক বা সত্য সম্পর্কে এ কথা ভালো করে জেনে রাখা দরকার যে, সে স্বয়ং সত্য। সে এমন এক শাশ্বত মূল্যবোধের নাম, যা একেবারে সঠিক ও অভ্রান্ত। সমগ্র দুনিয়া যদি তাকে পরিত্যাগ করে তথাপি সে সত্য। কারণ তার সত্য হওয়াটা এ শর্তের অধীন নয় যে, দুনিয়া তাকে মেনে নেবে। দুনিয়ার মানা না মানা সত্য-মিথ্যা নির্ণয়ের কষ্টিপাথর নয়। দুনিয়া যদি সত্যকে মেনে না নেয়, তাতে সত্য ব্যর্থ হয়ে যায় না। বরং ব্যর্থ হয় সে দুনিয়া, যে তাকে মেনে না নিয়ে মিথ্যাকে মেনে নেয়। বিপদ-আপদ সত্যের উপরে আসে না, আসে সত্যপন্থীর উপর। কিন্তু যারা ভেবে-চিন্তে মনের নিশ্চয়তার সাথে এ সিদ্ধান্ত করে যে, তাদেরকে যে কোন অবস্থাতেই সত্যের উপর অবিচল থাকতে হবে, তার বাণী সমুন্নত করার জন্যে জীবন ও ধন-সম্পদ উৎসর্গ করতে হবে, তাদের উপর বিপদ আসে সত্য, কিন্তু বিফলকাম তারা কখনো হয় না। হাদীসে আছে, এমন কিছু নবী এসেছেন, যাঁরা সত্যের দাওয়াত দিতে দিতে সারা জীবন কাটিয়েছেন। কিন্তু একজনও তাঁদের উপর ঈমান আনেনি। তবে কি আমরা তাঁদেরকে বিফল মনোরথ বলবো? না, বিফল মনোরথ সে জাতিই হয়েছে, যারা হক বা সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে বাতিলপন্থীদের নেতৃত্ব মেনে নিয়েছে।

এতে সন্দেহ নেই যে, দুনিয়াতে তাই চলে যা সাধারণ লোকে মেনে নেয়। আর যা তারা মানে না তা চলতে পারে না। কিন্তু লোকের মানা ও না-মানা সত্য-মিথ্যার মাপকাঠি হতে পারে না। অধিকাংশ লোক যদি আঁধারে হাতড়াতে ও হোঁচট খেতে চায়, তাহলে তারা স্বচ্ছন্দে হাতড়াতে ও হোঁচট খেতে থাক। আমাদের কাজ হচ্ছে আঁধারে প্রদীপ জ্বালানো এবং এ কাজ আমরা আজীবন করতে থাকব। পথভ্রষ্ট বা পথভ্রষ্টকারী হওয়া থেকে খোদার কাছে আশ্রয় চাই। আল্লাহর অসীম অনুগ্রহ যে, তিনি আমাদেরকে আঁধারে প্রদীপ জ্বালাবার তাওফীক দিয়েছেন। এ অনুগ্রহের শোকরিয়া আমরা এভাবে আদায় করব যে, প্রদীপ জ্বালাতে জ্বালাতেই মৃত্যুবরণ করব।

● মসজিদই শুধু খোদার ঘর নয়। বরং এ ঘরের বাইরে দ্বিতীয় একটি মসজিদও আছে যা অনেক অনেক বড় এবং যার নাম দুনিয়া। ঐ ছোট মসজিদটিতে যেভাবে মানুষ তার প্রতিটি কাজ ও পদক্ষেপ আল্লাহ্ তায়ালার

নির্দেশেই সম্পন্ন করে, তেমনি ঐ মসজিদের বাইরেও যাবতীয় কাজকর্ম আল্লাহরই নির্দেশে করলে সেটাই হবে ইবাদত এবং তারই নাম 'দ্বীন'।

- আমার সারা জীবনের অভিজ্ঞতা এ কথাই বলে যে, দুনিয়ায় সে সব শক্তি কিছুতেই টিকে থাকতে পারেনি, যা দুর্গের অভ্যন্তরে আশ্রয় নেয়ার চেষ্টা করেছে। কারণ ময়দানের মুকাবিলায় ভীত হয়ে দুর্গের মধ্যে আত্মগোপন করা কাপুরুষতার সুস্পষ্ট নিদর্শন। আল্লাহ তায়ালা এ যমীনকে কাপুরুষদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্যে তৈরি করেননি।

আমার প্রিয় গ্রন্থ

'আমি জাহিলিয়াতের যুগের অনেক বই-পুস্তক পড়াশুনা করেছি। প্রাচীন ও আধুনিক দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, অর্থনীতি, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে বহু সংখ্যক বই-পুস্তকের আলমারী উজাড় করে পড়াশুনা করেছি। কিন্তু যখন চোখ খুলে কোরআন পাক পড়লাম, তখন সত্যিই মনে হলো যে, এ যাবত যা কিছু পড়াশুনা করেছি তা সবই অতি নগণ্য। জ্ঞানের মূল এখন আমার হস্তগত হয়েছে। কান্ট, হেগেল, নিটশে, মার্কস এবং দুনিয়ার অন্যান্য শ্রেষ্ঠ চিন্তাশীলগণ আমার কাছে একেবারে শিশু মনে হয়েছে। তাদের প্রতি করুণা হয় যে, তারা যে সব সমস্যা সমাধানের জন্যে সারা জীবন কাটিয়ে দিয়েছেন এবং যে সবের উপরে বিরাট গ্রন্থ রচনা করেছেন, সে সবের সমাধান পেশ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। পক্ষান্তরে এ মহাগ্রন্থে (আল কোরআন) এ সব সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান দু'এক কথায় পেশ করা হয়েছে। এ সব বেচারা যদি এ মহাগ্রন্থ সম্পর্কে অজ্ঞ না থাকতেন, তাহলে তারা তাদের জীবন এভাবে ব্যর্থতায় কাটিয়ে দিতেন না। আমার সত্যিকার প্রিয় গ্রন্থ এই একটি। এ আমাকে একেবারে বদলে দিয়েছে। পশু থেকে মানুষ বানিয়েছে। অন্ধকার থেকে টেনে বের করে আলোকে এনেছে। এমন এক প্রদীপ এ আমার হাতে দিয়েছে যে জীবনের যেদিকেই তাকাই না কেন, সত্য আমার কাছে এমনভাবে প্রতিভাত হয়ে পড়ে যে, তার মধ্যে কোন অস্পষ্টতা থাকে না। যে চাবি দিয়ে সব রকমের তালা খোলা যায় ইংরেজীতে তাকে বলে Master Key। কোরআন আমার কাছে Master key। জীবন সমস্যার যে তালাতেই তা আমি লাগাই তা চট করে খুলে যায়। যে খোদা এ মহাগ্রন্থ দান করেছেন, তাঁর শোকরিয়া আদায়ের ভাষা আমার নেই।'

'আন-নাদওয়া' পত্রিকার তৎকালীন সম্পাদক মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভীর একটি পত্রের জওয়াবে মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী ৩১শে মার্চ, ১৯৪০, যে পত্র লিখেন, তার মধ্যে উপরের মূল্যবান কথাগুলো ছিল।

ইউপি মুসলিম লীগ ইসলামী শাসনতন্ত্রের খসড়া প্রণয়নের জন্যে একটি কমিটি তৈরি করেছিলো, যার মধ্যে মাওলানা মওদূদীকেও শামিল করা

হয়েছিলো। 'নাদওয়াতুল উলামায়' অনুষ্ঠিতব্য এই কমিটির বৈঠকে যোগদানের জন্যে ছাতারীর নওয়াব সাহেবের পক্ষ থেকে মাওলানাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। বৈঠকে যোগদানের পূর্বে তিনি সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভীর নিকটে যে পত্রখানি লিখেন, তাও পাঠকগণের সামনে পেশ করছি।

মুবারক পার্ক, পুঞ্জ রোড, লাহোর
২৪শে ডিসেম্বর, ১৯৪০

মুহতারম ও মুকাররম জনাব
আসসালামু আলায়কুম।

আপনার পত্র পেয়েছি। আজ ছাতারীর নওয়াব সাহেবের পত্র পেলাম। পত্রে তিনি ইসলামী শাসনতন্ত্রের খসড়া কমিটির বৈঠকে যোগদান করার জন্যে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। বৈঠক আপনাদের লক্ষ্ণৌতেই হচ্ছে। নওয়াব সাহেবদের এবং তাঁদের কমিটির জন্যে আমার অবশ্য তেমন আগ্রহ-উৎসাহ নেই। নিছক তাদের কমিটির বৈঠকে যোগদান করার ব্যাপার যদি হতো, তাহলে এড়াবার চেষ্টা করতাম। কিন্তু এ বৈঠকে যোগদান করার মাধ্যমে 'নাদওয়া' এবং আপনাদের সাথে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপনের একটা সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এ জন্যে লক্ষ্ণৌ যাওয়ার মনস্থ করেছি। ইনশাআল্লাহ ৩রা জানুয়ারী লক্ষ্ণৌ পৌছব। আমার আহার বাসস্থানের ব্যবস্থাপনা আপনার দায়িত্বে রইলো। এমন স্থানে থাকতে চাই, যেখানে সব ধরণের লোক আসতে পারে এবং স্বাধীনভাবে খোলাখুলি আলাপ-আলোচনা করতে পারে। আলীগড়ে গিয়ে 'ওল্ড বয়েজ লজে' থাকাটাই পছন্দ করেছিলাম। তার ফায়দাটা এই হয়েছিলো যে, সকল দল ও মতের লোক বিনা-দ্বিধায় আমার সাথে দেখা-সাক্ষাত করে। লক্ষ্ণৌতে এ ধরনের কোন একটি জায়গা আমি চাই। কট্টর কমিউনিস্ট এবং নাস্তিক আমার সাথে মিশে, যেমন মিশে মুমেনীন সালেহীন। তাদের সাথে কথা বলতে হলে এমন জায়গা ভালো, যেখানে এমন সব লোক থাকবেন না, যাদের সামনে যেতে তারা ইতস্তত করে।

খাকসার
আবুল আ'লা

মাওলানা মওদূদীর অবদান

আল্লামা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর (রঃ) জীবনী . তাঁর আদর্শ ও চিন্তাধারা, তাঁর মতবাদ ও কর্মপদ্ধতি, তাঁর আচার-আচরণ ও স্বভাব-চরিত্র ছিল পরিপূর্ণ ইসলামী এবং তা ছিল আয়নার মত স্বচ্ছ, নির্মল ও নিষ্কলুষ। স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ মন নিয়ে যারা তাঁকে দূর ও নিকট থেকে দেখেছেন, তারাই মুগ্ধ হয়েছেন তাঁর গগনচুম্বী মানবতায় ও মহত্ত্বে, তাঁর সরলতা ও হৃদ্যতাপূর্ণ অমায়িক ব্যবহারে।

সাহিত্যিক, কবি, রাজনীতিবিদ, আইনবিদ, বিজ্ঞানী অথবা দার্শনিক তাঁর সাথে যে কোন বিষয়ে অনর্গল আলোচনা করে তাঁর পাণ্ডিত্যের কাছে নতি স্বীকার করেছেন। দূর থেকে যারা তাঁকে মনে করেছেন 'সংকীর্ণমনা কাটমোল্লা', আলাপ-আলোচনায় তাঁকে মনে হয়েছে বিশাল উদার সমুদ্রের মত, দেখেছেন তাঁর মধ্যে দূরে নিক্ষেপ করার নয়, কাছে টেনে নেয়ার আকুল আগ্রহ। এতো বড় জ্ঞানী-গুণীর বিনয়-নম্র ও নিরহঙ্কার ব্যবহার অনেকের কাছে এক বিরাট বিস্ময়।

মাওলানা কোন দারুল উলুম অথবা কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের সনদপ্রাপ্ত না হলেও এক জ্ঞানসমুদ্র। তাই তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র না থাকলেও দক্ষতা ও প্রশংসার সাথে বিনা বেতনে শিক্ষকতা করেছেন প্রখ্যাত মহাবিদ্যালয়ে। তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থাবলী পাঠ করে এবং তাঁর সাথে আলাপ-আলোচনা করে নিঃসন্দেহে একথা বলা যায় যে, কোরআন, হাদীস, ফিকাহ-শাস্ত্র থেকে আরম্ভ করে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের কোন কিছুই তাঁর অজানা ছিল না। দুনিয়ার বিভিন্ন জাতির ইতিহাস, তাদের ধর্মীয়, রাজনৈতিক, সামাজিক ও নৈতিক উত্থান-পতনের ইতিবৃত্ত ছিল তাঁর নখদর্পণে। শুধু তাই নয়, পাশ্চাত্য সভ্যতার ধারক, বাহক ও পূজারীদের মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে গভীর জ্ঞান লভের উদ্দেশ্যে ইংরেজী, জার্মান প্রভৃতি বিজাতীয় ভাষায় নাটক উপন্যাস তাঁর পাঠ্য তালিকা থেকে বাদ পড়েনি। তাই তিনি নিঃসন্দেহে ছিলেন জ্ঞানের ইনসাইক্লোপেডিয়া।

আল্লাহ তায়ালা বিংশ শতাব্দীর যুগস্রষ্টা মনীষী আলেমে দীন ও মুজতাহিদ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর উপর তাঁর অসংখ্য রহমত বর্ষণ করুন, যিনি তাঁর গোটা জীবনকে, জীবনের প্রতি মুহূর্তকে দ্বীনে হক সমুন্নত

করার লক্ষ্যে ওয়াক্ফ করে দিয়েছেন, তাঁর দেহ ও মনের সকল শক্তি শরীর, স্বাস্থ্য উপেক্ষা করে এ মহান কাজে নিয়োজিত করেছেন। আল্লাহ্ পাক তাঁকে এ মর্যাদায়ও ভূষিত করেছেন যে, তিনি তাঁর জীবদ্দশায় দেখতে পেয়েছেন যে, তাঁর হৃদয়ের স্পন্দন গোটা ইসলামী দুনিয়ার হৃদয়ের স্পন্দনে পরিণত হয়েছে।

তাঁর গোটা জীবন ছিল তিনটি অধ্যায়ে সমন্বিত– হিজরত, জিহাদ ও শাহাদাত। তিনি নিজেকে খোদার রাহে এমন নিবিষ্ট চিত্তে উৎসর্গিত করেন যে, বাতিল পক্ষের সকল জুলুম-নির্যাতন, কারাদণ্ড এমন কি ফাঁসীর মঞ্চও হাসিমুখে বরণ করেন। তাই তিনি ছিলেন যিন্দাহ শহীদ– মর্দে মুজাহিদ।

তিনি মুসলিম বিশ্বের জন্যে এমন কিছু অতুলনীয় অবদান রেখে গেছেন– যা অন্য কারো পক্ষে সম্ভব হয়নি। তাঁর কয়েকটির উল্লেখ দৃষ্টান্তস্বরূপ করতে চাই।

এক. মুসলমানদের পতন যুগে এত সব ফেতনা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিলো যার ফলে মুসলমান সত্যিকার ইসলাম থেকে দূরে সরে পড়েছিলো। তার একটি দ্বীন ও দুনিয়ার পৃথককরণ। তার ফলে একজন মুসলমান, এমনকি একজন আলেমের মুখেও এ বিদ্রূপবাণী শুনা যেত– শাসন ক্ষমতা? পার্লামেন্ট? বিচার বিভাগ? লেনদেন? এ সবের সাথে ইসলামের কি সম্পর্ক? এতো সব দুনিয়াদারী ব্যাপার। নামায পড়, রোযা রাখ, পারলে হজ্জ কর, যাকাত দাও, কালামে পাক তেলাওয়াত কর, তাসবীহ-তাহলীল কর– এইতো ইসলাম। এ পতন যুগে সর্বপ্রথম মাওলানা মওদূদীর মুখে এ শ্লোগান ধ্বনিত হয়– ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। ভুলে যাওয়া সবক তিনি শিখিয়ে দেন এবং সমগ্র মুসলিম বিশ্বে আজ এ শ্লোগান ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে, ইসলামের মৌল শিক্ষাই এই যে, জীবনের এমন কোন দিক ও বিভাগ নেই, যা ইসলামের আওতার বাইরে।

দুই. ইসলামের বিপক্ষে যতো ফেতনা সৃষ্টি করা হয়েছে, তার একটি তালিকা তৈরি করলে দেখা যাবে যে, এমন কোন ফেতনা নেই, যার সফল মুকাবেলা তিনি করেননি। জড়বাদী পাশ্চাত্য সভ্যতা-সংস্কৃতির

মনভুলানো জৌলুস ঔজ্জ্বল্যে মুসলিম যুব সমাজ খোদাদ্রোহিতার দিকে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছিল।

মাওলানা তাঁর প্রথম কাজ এটাই করেন যে, কিভাবে মুসলিম যুব সমাজ ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে পাশ্চাত্য সভ্যতার যাদু থেকে রক্ষা করা যায়। তিনি তাঁর 'তানকীহাত' গ্রন্থে পাশ্চাত্য সভ্যতার চুলচেরা বিশ্লেষণ করে তার অন্তঃসারশূন্যতা প্রমাণ করেন। তাঁর 'তানকীহাত' ও 'তাফহীমাত' গ্রন্থ দু'টি লেখার ধরন যে কত শালীন ও যাদুমন্ত্রের ন্যায় প্রভাবশালী তা দেখার বস্তু। যে সব মারত্মক রোগে ইউরোপের বস্তুবাদী সভ্যতা আক্রান্ত ছিল মাওলানার লেখনীর অস্ত্র তার অস্ত্রোপচার করে। তিনি গবেষণালব্ধ ও বিজ্ঞানসুলভ ভাবনার দ্বারা ওসব মতবাদের উপরে মরণ-আঘাত হানেন, যা বস্তুবাদ, নাস্তিকতা ও সমাজতন্ত্রের বুনিয়াদ ছিল। এ আঘাতে ইউরোপবাসী বিব্রত হয়ে পড়ে এবং মুসলিম যুব সমাজের মধ্যে চরম উৎসাহ-উদ্যম ও প্রেরণা সৃষ্টি করে। মাওলানার সাহিত্য যুব সমাজের তৃষ্ণা নিবারণ করে। তারা পাগলের মতো নৈতিকতা ও ইসলামের দিকে ছুটে চলে। ইউরোপ থেকে ধর্মহীনতা ও নাস্তিক্যের যে প্লাবন এ উপমহাদেশে এসেছিলো, আল্লাহ তাআলা তার সামনে বাঁধ নির্মাণের ব্যবস্থা মাওলানার পবিত্র হস্তেই করেন। এ কাজ আর কারো দ্বারা হয়নি।

তিন. মাওলানা মওদূদীর সবচেয়ে বড় অবদান এই যে, তিনি মুসলমানদের মধ্যে কুরআন উপলব্ধি করার প্রেরণা সৃষ্টি করেছেন। যে কুরআন আল্লাহ তায়ালার হেদায়েতের সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য ও সংরক্ষিত উৎস আমরা তা ভুলে বসেছিলাম। কতিপয় আলেম কুরআন থেকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পথ-নির্দেশনা লাভ করার পরিবর্তে তাবিজ-তুমার ও ঝাঁড়-ফুঁক পর্যন্ত সীমিত করে রাখেন। অপরদিকে প্রাচ্যবিদগণ কুরআনের প্রতি এমন এমন মারাত্মক আক্রমণ চালায় যে, আধুনিক শিক্ষিত সমাজ দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং কেউ কেউ কুরআনের কোন কোন স্থানের অর্থ একেবারে পরিবর্তন করে ফেলে। এমনও দেখা গেছে যে, কোন কোন তাফসীরকার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এমন সব বিতর্কের অবতারণা করেন যে, তার সাথে না জীবনের আর না কুরআনের কোন সম্পর্ক আছে।

অনেক অনুবাদ এমন জটিলতাপূর্ণ এবং পূর্বাপর বক্তব্য থেকে এমন বিচ্ছিন্ন যে, আল্লাহ তায়ালার মূল বক্তব্য বুঝতে পারা যায় না।

মাওলানা মওদূদী এ ক্ষেত্রে এমন চমৎকার কাজ করছেন যে, পাঠকের অন্তর থেকে স্বতস্ফূর্তভাবে তাঁর জন্যে দোয়া বেরিয়ে আসে। যুব সমাজের প্রতি কুরআন পাকের আগ্রহ বেড়ে চলেছে এবং আল্লাহর কালাম অধ্যয়নে এক স্বর্গীয় স্বাদ অনুভব করতে শুরু করেছে। তাঁর তরজমার ভাষা জনসাধারণের জন্যে এতোটা বোধগম্য যে, এর চেয়ে সহজতর বর্ণনাভঙ্গি সম্ভব নয়।

ভাষার শক্তি ও প্রভাব ছাড়াও তাঁর তাফসীর তাফহীমুল কুরআনে এ বিষয়ের বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে যে, ইসলামী জীবন ব্যবস্থা যেন সুসামঞ্জস্যভাবে পাঠকের সামনে থাকে। কুরআন অধ্যয়নে যদি সে জীবন ব্যবস্থার কাঠামো পাওয়া না যায়, যার জন্যে এ কিতাব নাযিল হয়েছে এবং খোদার নবী পাঠানো হয়েছে, তাহলে সে উদ্দেশ্যই পূর্ণ হয় না। সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রহঃ) সে ব্যবস্থার পূর্ণ চিত্র এবং পরিপূর্ণ প্রাসাদ সংগ্রহ করে দিয়েছেন এবং মানবতার সে পৃষ্ঠপোষকের (হুযুর সাঃ) গোটা জীবনও পরিস্ফুট হয়েছে, যিনি তেইশ বছরে ডিজাইন মুতাবেক প্রাসাদ নির্মাণ সম্পন্ন করেন।

চার. তাঁর আর এটি মূল্যবান অবদান 'সীরাতে সরওয়ারে আলম' (নবী চরিত)। নবী মুহাম্মদ (সাঃ) ছিলেন কুরআনেরই বাস্তব চিত্র এবং চারিত্রিক মহত্ত্ব ও গুণাবলীর শীর্ষস্থানীয়। তেইশ বছরে ধারাবাহিকভাবে নাযিলকৃত কুরআনের সাথে হুবহু মিল রেখে এমন নিখুঁত নবী চরিত প্রণয়ন বিরল। নবী চরিতকে উপেক্ষা করে যেমন কুরআন উপলব্ধি করা সম্ভব নয়, তেমনি কুরআনের সাহায্য ব্যতীত নবীর সঠিক পরিচয় জানাও সম্ভব নয়। সীরাতে সরওয়ারে আলম গ্রন্থে এ উভয় বিষয়ের উপর সুন্দর আলোকপাত করা হয়েছে। নবী মুহাম্মদ (সাঃ) যে নিঃসন্দেহে বিশ্বনবী এবং তিনি যে সর্বকালের ও সর্বযুগের মানব জাতির একমাত্র পথ-প্রদর্শক ও কল্যাণকামী নেতা এ সীরাত গ্রন্থে তার হৃদয়গ্রাহী যুক্তি-প্রমাণ পাওয়া যায়। গ্রন্থকার স্বয়ং নবীপ্রেমেও ছিলেন পাগল এবং গ্রন্থের ছত্রে ছত্রে নবীপ্রেমের ঝলক দেখা যায়। এ নবীপ্রেম

তাঁকে নবীর অনুকরণেই আপন জীবন গড়ার প্রেরণা যোগায়। মাওলানা মওদূদীর অবদান এতো বেশি যে, তার উপরে একটি গ্রন্থ প্রণীত হতে পারে। সে দিকে না গিয়ে এখন তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্যাবলীর কিছু উল্লেখ করতে চাই।

পাঁচ. অনেকে মাওলানার প্রতি এ অভিযোগ করেন যে, তিনি তাসাওউফ বিরোধী এবং পীর মাশায়েখদের নিন্দা করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাসাওউফ কোরআন, হাদীস, সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈনের ব্যবহৃত কোন পরিভাষা নয়। কিন্তু তাসাওউফ বলতে যদি কুরআনের তাযকিয়া ও হাদীসের ইহসান বুঝানো হয়ে থাকে, তাহলে আলবৎ মাওলানা মওদূদী শুধু যে তাসাওউফের সমর্থকই ছিলেন না, বরঞ্চ অতি উচ্চমানের কামেল সূফী ছিলেন। তাঁর গোটা জীবন তার প্রকৃত প্রমাণ। যার দিলে ভয়, ভীতি, ভালবাসা শুধু আল্লাহর জন্যে, তাওয়াক্কাল একমাত্র আল্লাহর উপরে, তায়াল্লুক একমাত্র আল্লাহর সাথে, যার দিল আল্লাহর ইয়াদে পরিপূর্ণ এবং যেখানে গায়রুল্লাহর কোন স্থান নেই, তার চেয়ে বড় সূফী আর কে হতে পারে? এ সবের মূর্ত প্রতীকই মাওলানা মওদূদী। তাঁর অভিযোগকারীগণ নন।

ছয়. মাওলানা হরহামেশা নিজেকে আল্লাহর ভয়ে নতশির এক নগণ্য বান্দাহ মনে করতেন। কেউ তাঁর প্রশংসা করুক এটা তিনি মোটেই পছন্দ করতেন না। সিকিউলার দলের নেতৃবৃন্দ চান যে, তাদের অনুসারীগণ তাদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হোক, যিন্দাবাদ ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত করুক, গলায় ফুলের মালা দিয়ে অথবা বিভিন্ন উপঢৌকনাদি দিয়ে সংবর্ধনা জানাক। এতে তারা বড় আত্মতৃপ্তি লাভ করেন। কিন্তু মাওলানার স্বভাব প্রকৃতি ছিল সম্পূর্ণ এর বিপরীত। মাওলানার মৃত্যুদণ্ড সশ্রম কারাদণ্ডে পরিবর্তিত করা হয়। কিন্তু ২৫ মাস পর তিনি মুক্তি লাভ করেন। তারপর তর্জুমানুল কোরআনের সম্পাদনা ভার পুনরায় গ্রহণ করেন। তাঁর সম্পাদকীয় প্রবন্ধে তিনি সে সব গুণগ্রাহীর শুকরিয়া আদায় করেন, যারা তাঁর অপ্রত্যাশিত মুক্তিতে আনন্দ প্রকাশ করেন। এ প্রবন্ধের এক স্থানে তিনি বলেন, সেই সাথে আমি এ আবেদন না করে পারছি না যে, বন্ধুদের আনন্দ প্রকাশ এবং মহব্বতের আবেগ ও শ্রদ্ধা

প্রদর্শনে এমন রীতি-পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে, যাতে ভারসাম্য রক্ষা করা হয়নি। তাদের নিষেধ করাও আমার জন্যে মুশকিল। কারণ আধ্যাত্মিকতা ও বিনয়-নম্রতার প্রদর্শনী আমি পছন্দ করি না এবং তা মেনে নেয়াও কঠিন। কারণ আমি মনে করি এসব বিষয় ফেতনা সৃষ্টি করতে পারে। কতোই না ভাল হতো যদি আমার বন্ধুগণ আমার জন্যে তাদের আবেগ প্রকাশের ব্যাপারে ভারসাম্যের সীমা থেকে কম করাই যথেষ্ট মনে করতেন। (তর্জুমানুল কুরআন, খণ্ড ৪, সংখ্যা ৪)

আমার এক ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বলে রাখি। ১৯৫৮ সালে মাওলানা তৎকালীন পূর্বপাকিস্তান ভ্রমণে আসেন। এর এক পর্যায়ে তিনি দিনাজপুর থেকে বগুড়া আসবেন। আমি সাথে ছিলাম। দিনাজপুর থেকে বগুড়া আসার রেলপথ পার্বতিপুর-জয়পুরহাট-শান্তাহার হয়ে। বললাম, মাওলানা আমার বাড়ি জয়পুরহাটের উপর দিয়েই তো বগুড়া যাব। জয়পুরহাট এবং শান্তাহারের বহু লোক আপনাকে সংবর্ধনা জানাতে আসবে।

আমার কথায় মাওলানার চেহারায় কিছুটা মলিনতার ছাপ দেখতে পেলাম। তিনি স্পষ্ট করে বললেন, ভাই, আমি তো এটা একেবারে পছন্দ করি না যে, লোক আমাকে দেখে যিন্দাবাদ শ্লোগান দিক, আমার গলায় ফুলের মালা দিক, আমি এ আপদ থেকে বাঁচতে চাই। আমি শান্তাহার হয়ে বগুড়া কিছুতেই যাব না। অন্য পথে চলুন।

মাওলানা কিছুতেই এ পথে যেতে রাজি হলেন না। অগত্যা রংপুর, কাউনিয়া, গাইবান্ধা হয়ে বগুড়া যেতে হলো।

জয়পুরহাট ও শান্তাহারে বহু লোক এসে মাওলানাকে না পেয়ে দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ফিরে যায়। বগুড়া স্টেশনেও লোক মাওলানাকে নিতে এসে না পেয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। সকলের অজ্ঞাতে আমরা বগুড়া নেমে পড়ে গন্তব্যস্থানে পৌঁছে যাই।

সাত. মাওলানা ছিলেন 'যিন্দাহ শহীদ'। তাই মৃত্যুকেও তাঁর থোড়াই পরোয়া। তার জ্বলন্ত প্রমাণ বহুবার পাওয়া গেছে। তেষট্টি সালে লাহোরে অনুষ্ঠিত নিখিল পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামী সম্মেলনে মাওলানার ভাষণ দানকালে জনৈক ভাড়াটিয়া গুণ্ডা দশ-বারো হাত দূর থেকে পর পর

তিনবার মাওলানাকে লক্ষ্য করে পিস্তলের গুলি করে। মাওলানা মৃত্যুকে ভয় করেন না। মৃত্যু যেন ভয় করে মাওলানার কাছেও এলো না। আল্লাহর অসীম কুদরতের খেলা, তঁর প্রিয় বান্দার রক্ষার জন্যে তিন তিন বার পিস্তলের গুলিকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করে দিল। চারদিক থেকে লোকের চিৎকার, মাওলানা, বসে পড়ুন, বসে পড়ুন।

মাওলানা নির্ভীক ও শান্ত কণ্ঠে জবাব দেন, আমি বসে পড়লে দাঁড়িয়ে থাকবে কে?

মৃত্যুর ভয় না করে সিরাতে মুস্তাকিমের উপর দাঁড়িয়ে থাকার ইঙ্গিতই করলেন মাওলানা।

এটাকে মাওলানার কেরামত বলি না, বরঞ্চ আল্লাহ্ তায়ালার মো'জেযা, যা বিস্ময় সৃষ্টি করলো সকলের মনে এবং ঘটনাস্থলে উপস্থিত গ্রন্থকারের মনেও।

কোরআন-হাদীসের জটিল তত্ত্ব ও তথ্য যখন তিনি সহজ, সরল ও খোদা প্রদত্ত এক হৃদয়গ্রাহী প্রকাশ ভঙ্গিমায় বর্ণনা করতেন, তখন তাঁকে মনে হতো আধুনিক মুসলিম বিশ্বের আলেমকুল শিরোমণি, ইসলামের নির্ভরযোগ্য মুখপাত্র এবং ইসলামী জ্ঞান-গবেষণার বিশেষজ্ঞ। বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টিকারী তাঁর 'তাফহীমুল কোরআন' এবং জীবন সায়াহ্নের লেখা 'সীরাতে সরওয়ারে আলম' তাঁর অগাধ ইসলামী জ্ঞান-গবেষণার স্বাক্ষর বহন করে। তাই মুসলিম বিশ্ব তাঁকে ডাকল আল-উস্তাদ আল-মুরশিদ বলে, রাবিতায়ে আলমে ইসলামী তাঁর খেতাব দিল আল-ইমাম মওদূদী বলে।

বর্তমানকালে মুসলিম জাতি ইতিহাসে এক অতীব সংকট সংকুল অবস্থা সৃষ্টি করে রেখেছে। যতো আকীদাহ্, বিশ্বাস ও ক্রিয়াকর্ম, যতো মতবাদ ও ইজম ইসলামের বিপরীত, তাই মুসলিম সমাজ জীবনে চালু করার এক ব্যাপক প্রচেষ্টা চলছে প্রায় সর্বত্র, যার পেছনে রয়েছে কতিপয় রাষ্ট্রীয় শক্তি। সোশ্যালিজম-কমিউনিজম, পুঁজিবাদ, কাদিয়ানী ও পরভেজী আন্দোলন, ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদ, আরব জাতীয়তাবাদ, প্রভৃতি ইজম ও মতবাদগুলো ইসলামের মূল প্রাণশক্তিকে গ্রাস করে ফেলছিল। মাওলানা তাঁর শক্তিশালী লেখনীর মাধ্যমে এ সব মতবাদের কোমর ভেঙ্গে দিয়েছেন। আরব জাতীয়তাবাদেরও সর্বনাশা

পরিণামের কথা মাওলানা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। মধ্যপ্রাচ্যে এর বিরুদ্ধেও অসন্তোষ-বিক্ষোভ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে।

কখনো কোন বার লাইব্রেরীতে আইনবিদ সমাবেশে ভাষণ দানকালে তাঁকে মনে হয়েছে একজন সবজান্তা আইনবিদ। এ. কে. ব্রোহীর মত আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তির মনে হয়েছে তাঁর কাছে আইনের ছাত্র। একটি পরিপূর্ণ ইসলামী রাষ্ট্রের রূপরেখা, তার আইন-কানুন তিনি নিখুঁতভাবে রচনা করেছেন। এ বিষয়ে প্রতিটি আধুনিক জিজ্ঞাসার জবাব দিয়েছেন দক্ষতার সাথে এবং নিরসন করেছেন সকল সন্দেহ-সংশয়।

রাজনৈতিক প্রতিভা ও দূরদর্শিতা তাঁর অসাধারণ। তাই তিনি তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতা থেকে সুদূর ভবিষ্যতের যে চিত্র এঁকে দিতেন, তা বাস্তবে পরিণত হতে দেখা গেছে।

মুসলিম মিল্লাতের প্রতি তাঁর বিরাট অবদান এই যে, মুসলমানদের পতন যুগে পাশ্চাত্যের খোদাহীন মতবাদ ও চিন্তাধারা, পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও আচার-আচরণ যেভাবে মুসলমানদের মন-মস্তিষ্ক আচ্ছন্ন করে তাদেরকে পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক প্রভুদের মানসিক গোলামে পরিণত করেছিল, মাওলানা তাঁর শক্তিশালী লেখনীর সাহায্যে পাশ্চাত্য মতবাদ ও চিন্তাধারার অন্তঃসারশূন্যতা ও ধ্বংসকারিতা প্রমাণ করে তার প্রবল প্লাবন থেকে মুসলিম জাতিকে রক্ষা করেন। শুধু তাই নয়, ইসলামকে একমাত্র গতিশীল, প্রাণবন্ত ও মানব জাতির জন্যে মঙ্গলকর পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসাবে সুস্পষ্ট করে জগতের সামনে তুলে ধরেন। জগতের কোটি কোটি শিক্ষিত যুবক ও সুধী ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসাবে উপলব্ধি করে তার আলোকে নিজেদের মন-মস্তিষ্ক ও চরিত্র গড়ে তুলছে। আজ সমগ্র বিশ্বে ইসলামের যে গুঞ্জরণ শোনা যাচ্ছে, তা মাওলানার সাহিত্য ও বিশ্বজনীন ইসলামী দাওয়াতেরই ফসল।

মাওলানা একজন বাস্তবধর্মী মনীষী। মানব জাতির সার্বিক কল্যাণ, উন্নতি ও প্রগতির জন্যে তাঁর আহবান ছিল বিশ্বজনীন। এ বিষয়ে তাঁর কর্মসূচী ছিল অতি সুস্পষ্ট, স্বাভাবিক ও মানবতাসুলভ। নারী-পুরুষের মধ্যে সুষ্ঠু-সুন্দর, সুসামঞ্জস্য ও সুখকর সম্পর্ক কি হতে পারে, কি তার পদ্ধতি– জীব বিজ্ঞান, যৌন বিজ্ঞান, চিকিৎসা বিজ্ঞান, প্রকৃতি ও সমাজ বিজ্ঞান প্রভৃতির বিশ্লেষণ দ্বারা তা তিনি চিন্তাশীলদের গোচরীভূত করেছেন। মোটকথা, মাওলানা মওদূদী ছিলেন

এক অসাধারণ মনীষী, মুসলিম বিশ্বের তথা মানব সভ্যতার জন্যে এক বিশেষ অবদান।

তিনি ছিলেন এক অনুপম চরিত্রের অধিকারী। তাঁকে কোনদিন কারো প্রতি রাগ করতে অথবা কোন প্রকার কটূভাষা প্রয়োগ করতে দেখা যায়নি। পরিবারস্থ লোকজন, ছেলে-মেয়ে, চাকর-বাকর, সহকর্মী, বন্ধু-বান্ধব কারো প্রতি কোন মন্দ ব্যবহারে তিনি অগ্নিশর্মা হয়ে পড়েননি, মনে কষ্টদায়ক টু শব্দটিও করেননি। এ ছিল তাঁর স্নেহশীল পিতার শৈশবকালীন কঠোর শিক্ষা, যা তিনি সারা জীবন পালন করে চলেছেন। তবে ত্রুটি সংশোধনের জন্যে রসিকতার (Humour) ভেতর দিয়ে সমালোচনা করেছেন।

চরম বিপদে মুহূর্তেও তাঁর মুখমণ্ডলে কোন প্রতিক্রিয়ার ছাপ দেখা যায়নি। স্বভাবিক দুঃখ দৈন্যে, পুলিশের আবেষ্টনীতে, জেলখানার সঙ্কীর্ণ প্রকোষ্ঠে অথবা মৃত্যুদণ্ড শ্রবণে তাঁর স্বভাবসুলভ মিষ্টিমধুর মৃদুহাসি বিলীন হয়ে যায়নি। তাঁর যেন 'থোড়াই পরোয়া' এ সবের জন্যে।

যে সব রাজনৈতিক দল ও তথাকথিত বুযুর্গানে কওমের পক্ষ থেকে তাঁর প্রতি অবিরল গালি বর্ষণ হয়েছে, অমূলক অপবাদ ও ফতোয়াবাজি হয়েছে, তাদের প্রতি তিনি কোন মন্দ ভাষা প্রয়োগ করেননি। বরং ক্ষমা করে দিয়েছেন তাদেরকে চিরদিনের জন্যে। মন তাঁর ছিল স্বচ্ছ-পরিচ্ছন্ন, উদার ও সকল প্রকার কলুষ-কালিমার ঊর্ধে। তথাপি তাদের অপবাদ-গালাগালি বন্ধ হয়নি। এ বিষয়ে বারবার তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে বলেছেন ঃ

"আমি বুঝতে পারছি তারা আমার নেকীর পাল্লা ভারী করার কাজে লেগে আছে। তার জন্যে তাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।"

পরিচ্ছন্ন মনের মত তাঁর পোশাক-পরিচ্ছদও পরিচ্ছন্ন, আধুনিক রুচিসম্মত ও ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতির বাহক। ঘরদোর তকতকে ঝকঝকে, নোংরামির লেশহীন এবং একটা অনাবিল শালীনতাপূর্ণ পরিবেশের অধীন। তাঁর বই-পুস্তক, কাগজ-পত্র, লেখার সাজ-সরঞ্জাম যথাস্থানে সুন্দর ও সুশৃঙ্খলভাবে রক্ষিত যেন নিপুণ শিল্পীর হাতে সাজানো। তাঁর খানাপিনা সহজ-সরল অথচ দিল্লীর অভিজাত সম্প্রদায়ের রুচিমাফিক।

সদাহাস্য নূরানী চেহারা বিশিষ্ট সদালাপী মাওলানার কাছে বসলে সহজে কারো উঠতে ইচ্ছা হতো না। এটা তাঁর ব্যক্তিত্বের এক বিরাট আকর্ষণ, চরিত্রের এক মধুর বৈশিষ্ট্য।

এক স্বর্গীয় মধুর আনন্দ লাভ করা যেতো তাঁর পেছনে নামায পড়ে। চাপা মধুর স্বরে ধীরে ধীরে স্পষ্ট করে যখন তিনি নামাযের ক্বিরাত পড়তেন, তখন একদিকে যেমন কানে মধু বর্ষণ হতে থাকতো, অপরদিকে নামাযের প্রতি পরিপূর্ণ একাগ্রতা মনের মধ্যে সঞ্চার করে দিত আল্লাহ্ তায়ালার সান্নিধ্যের এক অভূতপূর্ব অনুভূতি।

মাওলানার চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁর আদর্শ ও চিন্তাধারার বাস্তব প্রতিফলন তাঁর সারাজীবন। শুধু নিজেকেই তিনি এ আদর্শের ছাঁচে তৈরী করেননি, বরং সারা বিশ্বের বিভিন্ন ভাষাভাষী অসংখ্য পথহারা মানব সন্তানের জীবনের কায়ার পরিবর্তন হয়েছে।

মাওলানা তাঁর ব্যক্তিগত জীবনেও ছিলেন অত্যন্ত নিয়মতান্ত্রিক। তাঁর খানাপিনা, পড়াশুনা, লোকের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ এবং নিদ্রার সময় নির্দিষ্ট করা থাকত। তার ব্যতিক্রম সহজে হতে দিতেন না। অবশ্য একমাত্র সফরে বেরুলে কোথাও কোথাও এর ব্যতিক্রম হয়ে পড়তো।

মাওলানা বলেন, অতীতে তিনি তাঁর শরীরের উপর ভয়ানক জুলুম করেছেন। আহার-নিদ্রার অবসর থাকত না। বহু বছর ধরে তিনি এশার নামাযের পর থেকে ফযর পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন। তার ফলেই তাঁর স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙে পড়ে। তিনি বলেন, পরবর্তীকালে তাঁকে বাধ্য হয়ে আহার-নিদ্রা নিয়ন্ত্রিত ও নিয়মানুবর্তী করতে হয়।

একবার পূর্ব-পাকিস্তানের একস্থানে বৈকালিক চায়ের সাথে বহু কিছু খাবারের আয়োজন করা হয়েছিল। মাওলানা বলেন, সকালে চায়ের সাথে তিনি টোস্ট, আন্ডা ফ্রাই এবং কিছু ফলমূল খান। বিকেলে শুধু এক পেয়ালা চা।

মাওলানার অভ্যাস ছিল এই যে, আসরের নামাযের পরে বাড়ির বাইরে ছোট্ট বাগানটিতে তিনি গিয়ে বসতেন। দেশ-বিদেশের সাক্ষাৎকারীগণ সেখানে জমায়েত হতো, বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন করতো, মাওলানা তার জবাব দিতেন। বিকেল বেলার এ আসরে আসত আরব দেশের লোক, জাপান ও নরওয়ের লোক, মালয়েশিয়া-ইন্দোনেশিয়ার লোক, তুরস্ক এবং ইউরোপ-আমেরিকার লোক। এ

ছিল যেন একটা আন্তর্জাতিক মধুচক্র। জ্ঞানপিপাসু লোকেরা ছুটে আসত জ্ঞানের সন্ধানে। মাওলানা সবার প্রশ্নের জবাব দিতেন। এভাবে তিনি সবার জ্ঞান পিপাসা মেটাতেন।

মাওলানা আলাপ-আলোচনায় বড় রসিকতা করতেন। তিনি একবার রংপুর জেলার সৈয়দপুর শহরে আসেন। বিকেল বেলা শহরের ব্যবসায়ী ও গণ্যমান্য লোক মাওলানার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেন। আলাপ প্রসঙ্গে জনৈক ভদ্রলোককে মাওলানা জিজ্ঞেস করেন যে তিনি কি করেন।

ভদ্রলোক– আমি চামড়ার ব্যবসা করি।

মাওলানা– কিসের চামড়া, মুরগীর না কি?

ভদ্রলোক একটুখানি অপ্রস্তুত হয়ে তড়িঘড়ি বলে ফেললেন– জি না হুজুর, গরু-ছাগলের চামড়া।

মাওলানা– ও তাই নাকি? ঢাকা থেকে শুরু করে যেখানেই গিয়েছি সব জায়গায় খেয়েছি মুরগী আর মুরগী। কোথাও খাসীর গোশতের সাথে দেখা হয়নি। তাই মনে করেছিলাম এ দেশে বুঝি মুরগীর চামড়ারও ব্যবসা চলে।

বুদ্ধিমান মেজবানের আর বুঝতে বাকী রইল না যে, মাওলানাকে খাসীর গোশত অবশ্যই খাওয়াতে হবে।

উনিশ শ' তেষট্টির মাঝামাঝি একবার মাওলানা রাওয়ালপিন্ডি যান। আমরা চাকলালা বিমান বন্দরে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে যাই।

বিপুল সম্বর্ধনার পর গাড়িতে উঠবার আগে ডিব্বা থেকে পান বের করে মাওলানা মুখে পুরলেন। আমি একজন পানখোর, এটা মাওলানার জানা ছিল। তাই তিনি আমাকেও একটা দিলেন। আমি জর্দার জন্যে হাত বাড়ালে তিনি রসিকতা করে বললেন

– ওহো আপ্‌তো পানকো হালাল কর ছোড়া হ্যায়।

বললাম– মাওলানা! পান তো হর ওয়াক্ত হালাল হ্যায়।

মাওলানা– বেগায়র জর্দা পান কব হালাল হোতা?

মাওলানা বিদায় নিয়েছেন দুনিয়া থেকে। তিনি পরিপূর্ণ করে গেছেন তাঁর কাজ, পূর্ণ হয়েছে তাঁর জীবনের সাধনা। তাঁর সাধনা, তাঁর বিশ্বজনীন দাওয়াত, রেখে যাওয়া তাঁর জ্ঞানের ফসল তাঁকে অমর করে রাখবে চিরদিনের জন্যে। তিনি চলে গেছেন রেখে গেছেন তাঁর অমূল্য সাহিত্য ভাণ্ডার এবং অগণিত রূহানী আওলাদ– যারা ছড়িয়ে আছেন সারা বিশ্বব্যাপী। তাঁর ফেলে যাওয়া কাজ চলতে থাকবে যুগ যুগ ধরে, শতাব্দীর পর শতাব্দীর ধরে।

পরিশিষ্ট – ১

আল্লামা ইকবাল মওলানা মওদূদীকে পাঞ্জাবে হিজরত করার আহ্বান জানান। এ ব্যাপারে তাঁর পক্ষ থেকে সাইয়েদ নাযীর নিয়াযী মাওলানার সাথে যে পত্র বিনিময় করেন, তার কয়েকটি নিম্নে দেয়া হলো ঃ

(সাইয়েদ নাযীর নিয়াযীর নিকটে মাওলনার লিখিত পত্রের অনুলিপি)

তর্জুমানুল কোরআন

হায়দারাবাদ দাক্ষিণাত্য

১৭ই জমাদিউল উলা ১৩৫৬ হিঃ ২৬শে জুলাই ১৯৩৭।

মুহতারামী ও মুকাররামী আসসালামু আলায়কুম।

ইনায়েতনামা পেয়েছি। আমি কৃতজ্ঞ যে, আপনি স্পষ্ট ভাষায় আপনার মনোভাব ব্যক্ত করেছেন। আমিও খোলা মন নিয়ে কিছু কথা বলতে চাই। আমার জীবনের জন্যে আমি একটা লক্ষ্য ও কিছু মূলনীতি নির্ধারিত করে রেখেছি। খোদার ফযলে আমার মধ্যে এতটা দৃঢ়তা রয়েছে যে, যত বড় অসুবিধাই হোক না কেন, আমি আমার লক্ষ্য থেকে সরে পড়া এবং আমার মূলনীতির কোন রদবদল করা কিছুতেই পছন্দ করি না। এখন আমি যে সব অসুবিধার সম্মুখীন তার সবটুকুই আমার নিজস্ব আরোপ করা বাধ্যবাধকতার কারণেই। নতুবা এ বিপদের তুফান দূর হতে পারে। আমি যে বাধ্যবাধকতা আমার উপরে চাপিয়ে দিয়েছি তার মধ্যে এই যে, আমার নিজের জন্যে কারো কাছ থেকে কোন অর্থ সাহায্য চাইব না। দ্বিতীয় একটি এই যে, জাতীয় ও ধর্মীয় কোন খেদমতের পারিশ্রমিক নেয়ারও কোন চিন্তা করব না। তৃতীয় এই যে, এমন কোন মুনাফার লোভে নিজেকে জড়িত হতে দেব না, যা আমাকে দ্বীন ও মিল্লাতের স্বার্থে আপন বিবেচনা অনুযায়ী স্বাধীনভাবে কাজ করতে বাধা দেয়। (কিছু বাধ্যবাধকতা আরও আছে কিন্তু আলোচ্য বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়।) এখন আপনি নিজেই বুঝতে পারেন যে, যে কথা আপনি বলেছেন তা গ্রহণ করা আমার জন্যে কত কঠিন। আমি আমার নিজের জন্যে একশ' টাকা কেন একটি পয়সার সাহায্যও চাই না। আমার নিজস্ব খরচপত্রের জন্যে আমি একটি ব্যবসার কাজ শুরু করেছি। এটা

আমি লাহোরেও করতে পারি। শাহী মসজিদে ইমামতি আমার জন্যে এক অপ্রত্যাশিত নিয়ামত। কাজ করার এর চেয়ে অধিকতর সুযোগ আর কি হতে পারে? কিন্তু পারিশ্রমিক নিয়ে ইমামতি করা আমার নিকট নাজায়েয না হলেও কঠিন মাকরূহ অবশ্যই। মুসলমানদের মধ্যে চারশ' বছর যাবত এ বিষয়টি সর্বসম্মত ছিল যে, নামাযের ইমামতি করে এবং কোরআন শিক্ষা দিয়ে পারিশ্রমিক নেয়া জায়েয নয়। পরবর্তীকালে অবস্থার অবনতি তাকে জায়েয করে দিয়েছে। তখন থেকে এ উভয় পদমর্যাদা হেয় ও প্রাণহীন হয়ে পড়েছে। এ সত্যকে আমি ভালভাবে উপলব্ধি করি। এ জন্যে পারিশ্রমিক নিয়ে ইমামতি করা তো চিন্তাই করতে পারি না। তবে যদি বিনা পারিশ্রমিকে এ খেদমত আমার উপরে সুপর্দ করা হয়, তো মন-প্রাণ দিয়ে গ্রহণ করতে তৈরি আছি।

এখন রইল রাজনীতি থেকে দূরে থাকার কথা। এর জন্যে আমি মোটেই প্রস্তুত নই। আমি কোন তাৎক্ষণিক ভাবাবেগে চালিত হয়ে রাজনৈতিক চর্চার দিকে অগ্রসর হই নি। বরঞ্চ চিন্তা-ভাবনা করেই এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, এখন আমাকে নির্জন কোণ থেকে বেরিয়ে এসে কিছু করতে হবে। মুসলমান এখন চরম সঙ্কটে লিপ্ত রয়েছে। যাদের কাছ থেকে সঠিক পথ নির্দেশনা পাওয়ার আশা ছিল না তাদের কথা ছেড়ে দিন। যাদের থেকে সকল প্রকার আশা করা হয়েছিল আজ তারাও ভুল নেতৃত্ব দিচ্ছেন। কংগ্রেসের আন্দোলনের প্রসার লাভ করার ফলে মুসলমানদের মহলে ভাঙ্গন ধরেছে। দৈনিক দল ত্যাগের খবর আসছে। জওয়াহেরলালের জাতি জনগণের মধ্যে দ্রুত তাদের প্রভাব বিস্তার করছে। ঝাঁসির নির্বাচন এ কথা সুস্পষ্ট করে দিয়েছে যে, মুসলিম জনমত কতখানি প্রভাবিত হয়েছে। এখন কংগ্রেস ও অকংগ্রেসের মধ্যে কত কম Margin রয়ে গেছে। মুসলিম নেতৃবৃন্দের বিবৃতি ও মুসলিম পত্র-পত্রিকার প্রবন্ধাদি পাঠে আন্দাজ করা যায় যে, কত কম লোক রয়েছে যারা মুসলিম ভারতের সঠিক পজিশন বুঝতে পারেন এবং যাদের সামনে সঠিক পথ একেবারে সুস্পষ্ট। এমন অবস্থায় আপনি চিন্তা করুন, হাতে গণা যায় এমন কিছু লোক যারা রয়ে গেছে তাদের মধ্যে আবার একজনের নিজের উপর চাকরির বাধ্যবাধকতা চাপিয়ে নেয়া, এবং তাও দেড়-দু'শ টাকার, কি করে সঙ্গত হতে পারে? যদি আমি তাকে সঙ্গত মনে করি তাহলে আমার লাহোর যাওয়ার কি প্রয়োজন? উসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার জন্যে চারশ' টাকার পদ পাওয়া

যাচ্ছে। তা কেন গ্রহণ করি না? আমি যে জন্যে লাহোরমুখী হতে চাই তা শুধু এই যে, আমার দৃষ্টিতে মুসলিম ভারতের সিদ্ধান্ত (যা এখন অতি আসন্ন) উত্তরাঞ্চলের তিনটি প্রদেশের শক্তির উপর নির্ভরশীল। আমি চাই যে, ঐ দারুল ইসলামের মধ্যে গিয়ে বসি এবং দেখি যে, ওখানে ইসলামের শক্তি বর্ধিত করার এবং তার থেকে কাজ নেয়ার কি কি সুযোগ লাভ করা যায়। এখান থেকে আন্দাজ করতে পারি না। ওখানে পৌঁছেই সুযোগের সন্ধানে থাকব। যে সুযোগই পাই, তার থেকে ফায়দা হাসিল করব। আমি এ ধরনের উপকার লাভের জন্যে আপন মন-মস্তিষ্ক ও হাত-পা-কে একেবারে মুক্ত ও স্বাধীন রাখতে চাই। কোন মূল্যেও এমন কোন বাধ্যবাধকতা গ্রহণ করতে পারি না, যা দ্বীন ও মিল্লাতের খেদমতের কোন সুযোগ থেকে উপকৃত হওয়ার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

আশা করি আপনি আমার দৃষ্টিকোণ ভালোভাবে বুঝতে পেরেছেন। আমি যে সব অসুবিধার উল্লেখ আমার বিগত পত্রে করেছিলাম তার বিবরণ এই যে, তর্জুমানুল কোরআনের মাসিক খরচ প্রায় তিনশ' টাকা। জনগণের মধ্যে এমন সংখ্যক এর গ্রাহক নেই যে, পত্রিকার ব্যয় তাদের চাঁদা দিয়ে চালানো যাবে। নিযাম সরকার ২৭৫ খানা করে খরিদ করেন। তার বদৌলতেই পত্রিকা চলছে। যদি আমি লাহোরে যাই তাহলে খুব সম্ভব ব্যক্তিগত খরচপত্র বহন করার সাথে সাথে পত্রিকাটির আর্থিক ক্ষতির বোঝাও আমাকে বহন করতে হবে। তা সামাল দেয়া আমার পক্ষে এক রকম অসম্ভব হয়ে পড়বে। এ সমস্যার সমাধান এভাবে হতে পারে যে, পাঞ্জাবে আপনার-আপনাদের মাধ্যমগুলো ব্যবহার করে তর্জুমানুল কোরআনের প্রচার ও প্রসারের চেষ্টা করবেন। যদি আমি আশা করতে পারি যে, পাঁচশ গ্রাহক হয়ে যাবে, তাহলে আমি পত্রিকা সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হয়ে যাব। আমি পত্রিকা থেকে কিছু নিতে চাই না, কিন্তু আমার এতটুকুও সামর্থ্য নেই যে, তাকে আমি কিছু দিই।

আল্লামা ইকবালের সাথে নতুন ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা গঠনের কাজে অংশ গ্রহণ করা আমার জন্যে সৌভাগ্যের বিষয়। সকল সম্ভাব্য খেদমতের জন্যে তৈরি আছি। কিন্তু এ ব্যাপারে কোন আর্থিক ভাতার আমার প্রয়োজন নেই।

খাকসার

আবুল আ'লা।

(দ্বিতীয় পত্র)

তর্জুমানুল কোরআন, হায়দারাবাদ
১৩ই আগস্ট, ১৯৩৭

মুহতারামী ও মুকাররামী আসসালামু আলায়কুম।

আপনার পত্র ২রা আগস্ট পেয়েছি। আপনার পত্র অনুযায়ী দৃঢ় সংকল্প ও খোদার উপর ভরসা করেই হিজরত করব। লাহোরকে আমার শেষ বাসস্থান বানাবার সিদ্ধান্ত করেছি। কিছু অসুবিধা আছে, তার সমাধান করতে কিছু সময় অতিবাহিত হবে। এখান থেকে সমস্ত লটবহর স্থানান্তরিত করতে এবং আমার কিছু আর্থিক দেনা মিটিয়ে দিতে আমার যথেষ্ট অর্থের প্রয়োজন হবে। তর্জুমানুল কোরআনের কর্জ এক হাজার টাকার বেশী আছে। তা পরিশোধ করতে হবে। লটবহর নিয়ে যেতে এবং ব্যবসা-বাণিজ্য এখানে গুটিয়ে লাহোরে নতুন করে শুরু করতেও প্রায় এক হাজার টাকার প্রয়োজন হবে। এ উদ্দেশ্যে আমার এক খণ্ড জমি এবং কিছু স্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করতে চাই। আশা করি তিন চার মাসের মধ্যে এসব কাজ হয়ে যাবে। ইত্যবসরে আমি একবার লাহোর গিয়ে দেখব লাহোরে থাকতে হলে আমার কি ব্যবস্থা করা দরকার। আগামী রজব মাসের শেষ নাগাদ সফর করার ইচ্ছা আছে। চার-পাঁচ দিন দিল্লী অবস্থান করে রজবের শেষে অথবা শাবানের প্রারম্ভে লাহোর পৌঁছব। এ সুযোগে ইনশাআল্লাহ এটাও ঠিক হবে যে, কাদিয়ানীদের সম্পর্কে আমার কি লেখা উচিত। এ পর্যন্ত প্রকৃতপক্ষে এ বিষয়ে আমি বেশী পড়াশুনা করিনি। যা কিছু এ বিষয়ে জানতে পেরেছি তার উৎস নিছক বানী সাহেবের গ্রন্থ। কিন্তু গবেষণামূলক কিছু লেখার জন্যে তা যথেষ্ট নয়। লাহোরে যারা কাদিয়ানীবাদের উপর যথেষ্ট অভিজ্ঞতা রাখেন, তাদের সাথে পরামর্শ করে লেখার উপকরণ সংগ্রহ করব।

বিশেষ ঃ নাযীর নিয়াযী সাহেবের পত্রের অনুলিপি সংগ্রহ করা যায়নি।

খাকসার
আবুল আ'লা।

পরিশিষ্ট – ২

আল্লামা ইকবালের প্রাইভেট সেক্রেটারী জনাব নাযীর নিয়াযীর পক্ষ থেকে মাওলানা মওদূদীর নিকট লিখিত পত্র ঃ

২৫ ম্যাকলোড রোড, লাহোর
১৮ই এপ্রিল, ১৯৩৮ সাল।

মুকাররমী আসসালামু আলায়কুম,

আশা করি আপনি আল্লাহ তায়ালার ফযলে ভালো আছেন। কিছুদিন আগে সাইয়েদ মুহম্মদ শাহ সাহেবের কাছ থেকে জানতে পারলাম যে, আপনি জামালপুর এসে গেছেন এবং শিগগির লাহোরও আসবেন। তখন থেকে ক্রমাগত আপনার প্রতীক্ষায় রয়েছি। ডঃ সাহেব বলেন যে, সত্যই যদি আপনার লাহোরে আসার ইচ্ছা থাকে, তাহলে সত্বর এসে পড়ুন যাতে সাক্ষাত হতে পারে।

আমার কথা এই যে, ডক্টর সাহেব কেবলার অবস্থা খুবই আশঙ্কাজনক। এক মুহূর্তেরও ভরসা নেই। কিন্তু এ কথা শুধু আপনি আপনার মধ্যেই সীমিত রাখবেন, কাউকে বলবেন না।

অতএব ভালো হয় যদি আপনি যত সত্বর পারেন চলে আসেন। ড. সাহেবের স্বাস্থ্যের জন্যে দোয়া করবেন।

আপনার অকপট
নিয়াযী

মাওলানা মওদূদীর জবাব

তর্জুমানুল কোরআন
দারুল ইসলাম, পাঠানকোট
২৩শে এপ্রিল, ১৯৩৮

মুহতারামী আসসালামু আলায়কুম

আমার ওয়াদা মত যাবার প্রস্তুতি করছিলাম, এমন সময় হঠাৎ আল্লামার ইন্তিকালের খবর পেলাম। মন একেবারে ভেঙ্গে পড়ল। সবচেয়ে বড় দুঃখ আমার জন্যে এ হলো যে, কত বড় সুবর্ণ সুযোগ আমি হারিয়ে ফেললাম। যদি জানতাম, তাহলে সব কাজ ফেলে সঙ্গে সঙ্গেই পৌঁছে যেতাম। এ আমার নেহায়েত দুর্ভাগ্য মনে করি যে, তাঁর শেষ সাক্ষাৎ থেকে বঞ্চিত হলাম, যাঁর সমকক্ষ সম্ভবত আর কোথাও দেখতে পাব না।

মুহাম্মদ আলীর (মাওলানা) পর এ হলো মুসলমানদের জন্যে দ্বিতীয় বৃহত্তম ক্ষতি এবং আমার মতে প্রথম ক্ষতি অপেক্ষা এ বৃহত্তর। আল্লাহর কি ইচ্ছা জানি না। দৃশ্যত তো আমরা এটাই মনে করছি যে, মুসলমান জাতিকে তাদের অকৃতজ্ঞতা ও অযোগ্যতার শাস্তি দেয়া হচ্ছে এভাবে যে, তাদের সর্বোত্তম ব্যক্তিকে এমন সময় তুলে নেয়া হচ্ছে যখন তাঁর প্রয়োজন ছিল সবচেয়ে বেশী। এখন গোটা হিন্দুস্তানের দিকে তাকিয়ে দেখলে তাঁর মত এমন কোন লোক নযরে পড়ছে না সাহায্যের জন্যে যার শরণাপন্ন হওয়া যেতে পারে। চারদিকেই অন্ধকার ছেয়ে আছে। একটা প্রদীপ টিমটিম করে জ্বলছিল তাও উঠিয়ে নেয়া হলো।

আমাকে যে জিনিস পাঞ্জাবে টেনে এনেছিল তা হচ্ছে ইকবালের সত্তা। আমি এ আশায় এখানে এসেছিলাম যে, তাঁর নিকট থেকে পথ নির্দেশনা লাভ করব। তাঁর নেতৃত্বে আমার পক্ষে যতটুকু সম্ভব ইসলাম ও মুসলমানদের জন্যে তা করব। এখন আমি এরূপ অনুভব করছি যে, এ ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ সমুদ্রে আমি একেবারে একাকী রয়ে গেছি। মনের জীর্ণ অবস্থা চরমে পৌঁছেছে। শুধু এটা চিন্তা করে মনকে সান্ত্বনা দিচ্ছি যে, "ইকবাল মৃত্যুবরণ করেছেন তো কি হয়েছে, আল্লাহ তো আছেন? সকলেই তো মরণশীল। চিরঞ্জীব শুধু সেই 'হাইয়ুন

ও কাইয়ুম'। তিনি যদি তোমার কাছ থেকে কোন কাজ নিতে চান তো তোমার সাহায্যের জন্যে অন্য কোন উপায়-উপকরণ করে দেবেন।"

প্রিয় ভাই আমার! আপনি শেষ পর্যন্ত আল্লামার নিকটে ছিলেন। আমার জন্যে যদি তিনি কোন কথা বলে গিয়ে থাকেন, তাহলে অবশ্যই তা আমাকে জানাবেন।

খাকসার

আবুল আ'লা

পুনঃ ভাবছিলাম যে, তাঁর উত্তরজীবীদের কাছে শোকবাণী পাঠাব। পরে মনে হলো তাঁর উত্তরজীবী (Survivors) তো আমরা সকলেই। আর আমরা সকলেই এ শোকে সান্ত্বনা পাওয়ার অধিকারী।

মাওলানা মওদূদী (রহ.) এর জীবনপঞ্জী

১৯০৩ ২৫শে সেপ্টেম্বর। হায়দারাবাদ দাক্ষিণাত্যের আওরংগাবাদ শহরে জন্ম।

১৯০৬-১৩ গৃহে প্রাথমিক শিক্ষা।

১৯১৪ এগারো বছর বয়সে মৌলভী পরীক্ষা পাশ।

১৯১৬ দারুল উলুম হায়দারাবাদে উচ্চ শিক্ষালাভের জন্যে ভর্তি।

১৯১৭ ভূপালে অবস্থান, অসুস্থ পিতার পরিচর্যা।

১৯১৮ পনেরো বছর বয়সে সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে প্রবেশ। বিজনৌর থেকে প্রকাশিত 'মদীনা' পত্রিকার সম্পাদনা-ভার গ্রহণ। খিলাফত আন্দোলনে যোগদান।

১৯১৯ 'আঞ্জুমানে ইয়ানতে নযরবন্দানে ইসলাম' সংস্থার সক্রিয় সদস্য।

১৯২০ পিতার ইন্তিকাল। জব্বলপুরে দৈনিক 'তাজ' পত্রিকার সম্পাদনা-ভার গ্রহণ।

১৯২১ দিল্লী গমন এবং হাদীস-তাফসীর-ফিকাহসহ অন্যান্য ইসলামী বিষয়ে জ্ঞান অর্জন এবং ইংরেজী ভাষা শিক্ষা।

১৯২২ জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের মুখপত্র 'মুসলিম'-এর সম্পাদনা-ভার গ্রহণ।

১৯২৩ 'মুসলিম' বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর ভূপাল গমন এবং গভীর জ্ঞানার্জনে আত্মনিয়োগ।

১৯২৪ বছরের প্রারম্ভে দিল্লী গমন। মাওলানা মুহাম্মদ আলী এবং জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের মাওলানা আহমদ সাঈদের পক্ষ থেকে যথাক্রমে

'হামদর্দ' এবং 'আল জমিয়ত' পত্রিকার সম্পাদনা-ভার গ্রহণের আহ্বান।

১৯২৫ 'আল জমিয়ত' পত্রিকার সম্পাদনা-ভার গ্রহণ।

১৯২৭ চব্বিশ বছর বয়সে সর্বজন প্রশংসিত 'আল জিহাদু ফিল ইসলাম' গ্রন্থ প্রণয়ন।

১৯২৮ ভারতীয় কংগ্রেসকে সমর্থন করার প্রশ্নে জমিয়ত কর্তৃপক্ষের সাথে মতানৈক্য হওয়ায় 'আল জমিয়ত' পত্রিকা থেকে ইস্তফা দান।

১৯৩০ হায়দারাবাদ প্রত্যাবর্তন। দীনিয়াত (ইসলাম পরিচিতি) গ্রন্থ প্রণয়ন।

১৯৩১ সারা বছর গ্রন্থ প্রণয়নের কাজে আত্মনিয়োগ।

১৯৩২ হায়দারাবাদ থেকে মাসিক 'তর্জুমানুল কোরআন' এর প্রকাশ।

১৯৩৩ 'ইসলামী তহযীব আওর উসকে ওসূল ও মুবাদী' নামক গ্রন্থ প্রণয়ন।

ইসলামী সংস্কৃতির মর্মকথা ও তাকদীরের হাকীকত গ্রন্থ প্রণয়ন।

১৯৩৩-৩৮ ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দ্ব ও তাফহীমাত ১ম খণ্ড, ২য় খণ্ড গ্রন্থ প্রণয়ন।

১৯৩৪-৩৫ গ্রন্থ প্রণয়ন এবং ইসলামী দাওয়াত জনসমক্ষে তুলে ধরার সূচনা।

১৯৩৫ স্বামী-স্ত্রীর অধিকার ও ইসলামের দৃষ্টিতে জন্ম নিয়ন্ত্রণ গ্রন্থ প্রণয়ন।

১৯৩৬ আল্লামা ইকবালের সাথে পত্র বিনিময়ের সূচনা। আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুরোধে একটি সার্বিক শিক্ষা খসড়া প্রণয়ন।

১৯৩৬-৩৭ ইসলাম পরিচিতি,সূদ ও পর্দা গ্রন্থ প্রণয়ন।

১৯৩৭-৩৯ লাহোরে আল্লামা ইকবালের সাথে সাক্ষাৎ। হায়দারাবাদ থেকে পাঞ্জাবে মাওলানার স্থানান্তরের জন্যে আল্লামা ইকবালের আহ্বান। 'মুসলমান আওর মওজুদা সিয়াসী কাশ্মকাশ' শীর্ষক প্রবন্ধাদির প্রকাশ।

১৯৩৭-৩৯ 'তরজামুল কোরআন' পত্রিকা প্রকাশ।

১৯৩৮ ১৬ই মার্চ। হায়দারাবাদ থেকে পাঞ্জাবে স্থানান্তর। 'দারুল ইসলাম' পাঠানকোট- এর প্রতিষ্ঠা। 'ইসলাম ও জাতীয়তাবাদ' ('মাসয়ালায়ে কওমিয়াত') শীর্ষক বিপ্লবী ও আলোড়ন সৃষ্টিকারী প্রবন্ধাদির প্রকাশ।

খুতবাত (হাকীকত সিরিজ) গ্রন্থ প্রকাশ।

১৯৩৯ 'তাজদীদ ও এহইয়ায়ে দীন', 'ইসলামী ইবাদত পর তহকীকী নযর' এবং অন্যান্য মৌলিক গ্রন্থাবলীর প্রকাশ।

ইসলামের রাজনৈতিক মতবাদ ও ইসলামী ইবাদতের মর্মকথা গ্রন্থ প্রণয়ন।

১৯৪০ ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার খসড়া প্রণয়নের জন্যে মুসলিম লীগ কর্তৃক কমিটি গঠন এবং মাওলানাকে তার সদস্য মনোনয়ন। আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ইসলামী হুকুমত কিস তরাহ্ কায়েম হুতি হ্যায়'- বিষয়ের উপর এক জ্ঞানগর্ভ ভাষণ দান যা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় এবং যা ইংরেজী ও বাংলা ভাষায় যথাক্রমে 'The Process of Islamic Revolution' এবং 'ইসলামী বিপ্লবের পথ' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত।

ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলন, ইসলামী বিপ্লবের পথ ও

এক আহম এস্তেফতা গ্রন্থ প্রকাশ।

১৯৪১ ২৬শে আগস্ট। পঁচাত্তর জন লোক নিয়ে 'জামায়াতে ইসলামী'র প্রতিষ্ঠা এবং মাওলানাকে তার আমীর নির্বাচিত।

কুরআনের চারটি মৌলিক পরিভাষা, ইসলাম ও জাহিলিয়াত, নয়া নেযামে তা'লিম, অর্থনৈতিক সমস্যার ইসলামী সমাধান ও একটি সত্যনিষ্ঠ দলের প্রয়োজন গ্রন্থ প্রণয়ন।

১৯৪২ ১৫ই জুন। জামায়াতের কেন্দ্রীয় অফিস লাহোর থেকে দারুল ইসলাম পাঠানকোট-এ স্থানান্তরিত।

১৯৪২-৪৭ রাসায়েল ও মাসায়েল ও শান্তিপথ গ্রন্থ প্রকাশ।

১৯৪৩ বিশ্ববিখ্যাত তাফসীর 'তাফহীমুল কোরআনের' সূচনা।

একমাত্র ধর্ম ও

ইসলামী আইনে মুরতাদের শাস্তি গ্রন্থ প্রণয়ন।

১৯৪৪ ইসলামের নৈতিক দৃষ্টিকোণ ও শিরকের হাকীকত গ্রন্থ প্রণয়ন।

১৯৪৪-৪৬ ইসলামী আন্দোলনকে সুসংগঠিত ও সুদৃঢ়করণ এবং তার প্রভাব বিস্তারের প্রাণপণ প্রচেষ্টা। বিভিন্ন গ্রন্থ ও সাময়িকীর প্রকাশ।

১৯৪৫ তাওহীদের হাকীকত

সমাজতন্ত্র ও ইসলাম।

১৯৪৬ সত্যের সাক্ষ্য ও ইসলামী দাওয়াত ও কর্মনীতি গ্রন্থ প্রকাশ।

১৯৪৭ ৩০শে আগস্ট। চতুর্দিকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামার ফলে এবং পাঠানকোট হিন্দুদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হওয়ার পর পাঠানকোটের মুষ্টিমেয় মুসলমান অধিবাসী লাহোর হিজরত করতে বাধ্য হয় এবং জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় অফিস লাহোরে স্থানান্তরিত হয়। রিক্তহস্ত ও ছিন্নমূল মুহাজিরীনের পুনর্বাসনের জন্যে জামায়াত কর্তৃক বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ। রেডিও পাকিস্তান থেকে 'কুরবানী' সম্পর্কে মাওলানার প্রথম বেতার ভাষণ।

১৯৪৭ জামায়াতে ইসলামীর দাওয়াত, ভাঙ্গা গড়া ও তাকওয়ার হাকীকত গ্রন্থ প্রকাশ।

১৯৪৮ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পাঁচ মাস পর থেকে পাকিস্তানে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম শুরু। ৬ই জানুয়ারী লাহোরে আইন কলেজে ভাষণ দিতে গিয়ে ইসলামী আইনের ভিত্তিতে রাষ্ট্র ব্যবস্থা কায়েমের দাবি পেশ। ৬ই মার্চ করাচী জাহাঙ্গীর পার্কে অনুষ্ঠিত জনসভায় ইসলামী শাসন ব্যবস্থার জন্যে ৪ দফা দাবি পেশ।

(এপ্রিল-সেপ্টেম্বরে) সারা দেশে ইসলামী শাসনের দাবিতে সভা-সমিতি এবং জনমত গঠনের অভিযান। সরকারের পক্ষ থেকে মাওলানার প্রতি মিথ্যা অভিযোগ আরোপ যে, 'মাওলানা কাশ্মীরের জিহাদ হারাম বলেছেন'।

১২ই অক্টোবর মাওলানাকে কয়েকজন সহকর্মীসহ গ্রেফতার করে কারাগারে প্রেরণ।

ইসলামের জীবন পদ্ধতি, ইসলামী আইন, ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমদের অধিকার, আযাদী কে ইসলামী তাকাযে ও মোতালেবায়ে নেযামে ইসলামী গ্রন্থ প্রকাশ।

১৯৪৯ ১২ই মার্চ। জামায়াতের আন্দোলনের ফলশ্রুতিস্বরূপ সরকার আদর্শ প্রস্তাব পাস করেন। দ্বিতীয় দিন মজলিসে শূরায় তার জন্যে সন্তোষ প্রকাশ। ৬ই থেকে ৮ই মে লাহোর তিনদিন ব্যাপী জামায়াতে ইসলামীর প্রথম নিখিল পাকিস্তান সম্মেলন অনুষ্ঠিত।

১৯৪৯-৫০ সুদ-২য় খণ্ড, ভূমি মালিকানার বিধান, জাতীয় মালিকানা ও পাকিস্তানী আওরাত দু-রাহে পর গ্রন্থ প্রণয়ন।

১৯৫০ ২৮শে মে মাওলানার কারামুক্তি।

সারাদেশে জনসভায় বক্তৃতা দান। সরকার পক্ষ থেকে প্রস্তাবিত খসড়া শাসনতন্ত্র ইসলামসম্মত না হওয়ায় তার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ উত্থাপন এবং প্রত্যাখানের দাবি।

১৯৫১ করাচীতে ঐতিহাসিক সর্বদলীয় উলামা সম্মেলন। সর্বসম্মতিক্রমে ২২ দফা শাসনতান্ত্রিক সুপারিশ গৃহীত। এ বছর নভেম্বর মাসে করাচীতে দ্বিতীয় নিখিল পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত।

১৯৫২ শাসনতন্ত্র প্রণয়নকারী গণপরিষদের কাছে ৮ দফা দাবি পেশ। ইসলামী শাসনতন্ত্রের জন্যে দেশব্যাপী আন্দোলন। কাদিয়ানীদেরকে

সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ঘোষণা করার দাবিতে করাচীতে সর্বদলীয় সম্মেলনে মাওলানার অংশগ্রহণ।

১৯৫৩ ফেব্রুয়ারী– সর্বদলীয় সম্মেলনের পক্ষ থেকে 'ডাইরেক্ট অ্যাকশন' ঘোষণা। মাওলানার প্রতিনিধির পক্ষ থেকে ডাইরেক্ট অ্যাকশনের বিরোধিতা ও সম্মেলন বর্জন। মাওলানা কর্তৃক 'কাদিয়ানী সমস্যা' শীর্ষক পুস্তিকা প্রণয়ন।

২৮শে মার্চ সামরিক আইনের অধীনে মাওলানার গ্রেফতার, মে মাসে সামরিক আদালতে মাওলানার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের। ১১ই মে সামরিক আদালত কর্তৃক মাওলানার মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা। সারা বিশ্বে প্রচণ্ড বিক্ষোভ-প্রতিবাদের ফলে মৃত্যুদণ্ড মওকুফ করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দান। পরে তা হ্রাস করে সাড়ে তিন বছর করা হয়।

১৯৫৫ নিছক আইনগত কারণে ২৯শে এপ্রিল মাওলানার মুক্তি। নভেম্বর মাসে করাচীতে জামায়াতের তৃতীয় নিখিল পাকিস্তান সম্মেলন অনুষ্ঠিত।

১৯৫৬ ইসলামী শাসনতন্ত্রের জন্যে দেশব্যাপী আন্দোলন। দু'মাসব্যাপী মাওলানার পূর্ব পাকিস্তান সফর। পূর্ব পাকিস্তানের সমস্যাবলীর প্রতি আলোকপাত।

১৯৫৭ মাছিগোটে জামায়াতের নিখিল পাকিস্তান সদস্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত।

মাওলানার ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান।

১৯৫৮ ৭ই অক্টোবর লাহোরে মুচী দরজার এক জনসভায় ভাষণ দানকালে সরকারের প্রতি মাওলানার সাবধানবাণী ঘোষণা। পরদিন সারা দেশে সামরিক শাসন জারি।

১৯৫৯ তাফহীমুল কোরআনের জন্যে কোরআনে বর্ণিত স্থানগুলো (আরদুল কোরআন) স্বচক্ষে দেখার উদ্দেশ্যে মধ্যপ্রাচ্য ভ্রমণ এবং হজ্জব্রত

পালন। ভ্রমণে মুসলিম বিশ্বের ঐক্যের উপর বিশেষ জোর দিয়ে সর্বত্র ভাষণ দান।

১৯৬০ ডিসেম্বর। শাহ সউদের আমন্ত্রণে পুনরায় সউদী আরব গমন এবং মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের খসড়া পরিকল্পনা পেশ।

১৯৬১ আইয়ুব খান কর্তৃক প্রবর্তিত পারিবারিক আইন অর্ডিন্যান্সের বিরুদ্ধে শক্তিশালী আন্দোলন। আফ্রিকার মুসলমানদের আমন্ত্রণে ভ্রমণের উদ্যোগ নেয়ার পর অন্যায়ভাবে তা সরকারের পক্ষ থেকে বন্ধ করে দেয়া হয়। হাদীস অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম।

১৯৬২ মক্কা মুয়াযযমায় অনুষ্ঠিত বিশ্ব ইসলামী সম্মেলনে যোগদান। রাবেতায়ে আলমে ইসলামী সংস্থার প্রতিষ্ঠা। মাওলানা প্রতিষ্ঠা কমিটির আজীবন সদস্য নির্বাচিত।

১৯৬৩ লাহোরে নিখিল পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামী সম্মেলনে উদ্বোধনী ভাষণ দানকালে মাওলানাকে লক্ষ্য করে গুলীবর্ষণ। জনৈক জামায়াত কর্মীর শাহাদাত বরণ। সম্মেলন পণ্ড করার সকল সরকারী প্রচেষ্টা ব্যর্থ।

১৯৬৪ ৪ঠা জানুয়ারী। জামায়াত বেআইনী ঘোষিত। কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার সদস্যগণসহ মাওলানা গ্রেফতার।

১৯শে জানুয়ারী। জামায়াতের সকল রেকর্ডপত্র বাজেয়াফ্‌তকরণ। জামায়াতের বিরুদ্ধে সরকারী প্রচারণা তীব্রতরকরণ। ২৫শে সেপ্টেম্বর– সুপ্রীম কোর্টের রায়ে সরকারের পদক্ষেপকে আইন-বিরুদ্ধ ঘোষণা।

১৯৬৫ মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈঠকে মাওলানার অংশগ্রহণের পূর্ব মুহূর্তে মাওলানার পাসপোর্ট বাজেয়াফ্‌তকরণ। ৬ই সেপ্টেম্বর ভারত কর্তৃক পাকিস্তান আক্রমণ। রেডিও পাকিস্তান থেকে 'জিহাদের' উপরে মাওলানার ক্রমাগত ছয়টি ভাষণ দান। জামায়াতের পক্ষ থেকে উদ্বাস্তুদের মধ্যে লক্ষ লক্ষ টাকার ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ।

১৯৬৬ লাহোরে সর্বদলীয় জাতীয় সম্মেলনে তাশখন্দ চুক্তির সমালোচনা। পূর্ব পাকিস্তান ভ্রমণ। রাবেতায়ে আলমে ইসলামীর বৈঠকে কাশ্মীর সম্পর্কে বহু তত্ত্ব ও তথ্যপূর্ণ আরবী ও ইংরেজী ভাষায় মাওলানার প্রণীত পুস্তিকা বিতরণ।

১৯৬৭ ঈদের চাঁদ দেখা নিয়ে মাওলানাসহ অন্য চারজন খ্যাতনামা আলেম গ্রেফতার।

১৯৬৮ চিকিৎসার উদ্দেশ্যে লন্ডন ভ্রমণ। ইংল্যান্ডে বসবাসকারী মুসলমানদের পক্ষ থেকে হিল্টন হোটেল লন্ডনে আয়োজিত সম্বর্ধনা সভায় মাওলানার ভাষণ।

১৯৬৯ রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে আইয়ুব খান কর্তৃক আহূত গোল টেবিল বৈঠকে যোগদান। মরক্কো ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা সম্মেলনে যোগদান।

১৯৭০ মাওলানার ঘোষণা অনুযায়ী সারা পাকিস্তানে "শওকতে ইসলাম দিবস" পালিত।

১৯৭২ 'তাফহীমুল কোরআনের' সমাপ্তি ও ষষ্ঠ খণ্ডের প্রকাশ। অবিরাম অসুস্থতার কারণে জামায়াতে ইসলামীর আমীরের দায়িত্ব থেকে ইস্তফা দান।

১৯৭৯ ২১শে মে। চিকিৎসার উদ্দেশ্যে আমেরিকা গমন।

৪ঠা সেপ্টেম্বর মূত্রাশয় অপারেশন।

২২শে সেপ্টেম্বর। পাকিস্তান সময় অনুযায়ী সন্ধ্যা পৌনে ছয়টায় ইন্তিকাল। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)

বিষয়ভিত্তিক মাওলানা মওদূদীর গ্রন্থপঞ্জী

অনূদিত বাংলা বইয়ের নাম	পৃষ্ঠা	মূল উর্দূ বইয়ের নাম	প্রকাশকাল
ক. কুরআন			
১. তরজমায়ে কুরআন মজীদ	১২৪৮	তরজুমায়ে কুরআন মজীদ	১৯৭৩ ঈসায়ী
২. তাফহীমুল কুরআন ১-১৯ খণ্ড	৪১৬৫	তাফহীমুল কুরআন ৬ জিল্দ	১৯৪৩-১৯৭২
৩. তাফহীমুল কুরআনের বিষয়সূচি	৫৪০	মাওযুয়াতে কুরআনী	
৪. কুরআনের চারটি মৌলিক পরিভাষা	১১৯	কুরআন কী চার বুনয়াদী ইসতেলাহী	১৯৪১ ঈসায়ী
৫. কুরআনের মর্মকথা	৪৮	মুকাদ্দামায়ে তাফহীমুল কুরআন	
খ. হাদীস/সুন্নাহ			
৬. সুন্নাতে রাসূলের আইনগত মর্যাদা	৩৩৬	সুন্নাত কী আইনী হাইসিয়ত	১৯৬৩ ঈসায়ী
৭. কুরআনের মহত্ব ও মর্যাদা	১৩৩	ফাযায়েলে কুরআন (হাদীস কী রোশনী মেঁ)	১৯৭৭ ,,
গ. ইসলামী জীবন দর্শন			
৮. ইসলাম পরিচিতি	১১২	রিসালায়ে দ্বীনীয়াত	১৯৩৬ ,,
৯. তাওহীদ রিসালাত আখিরাত	৪৪	তাওহীদ রিসালাত আওর যিন্দেগী বা'দ মওতকা আকলী সুবুত	
১০. ইসলামের জীবন পদ্ধতি	৫৫	ইসলাম কা নেযামে হায়াত	১৯৪৮ ,,
১১. একমাত্র ধর্ম	৪৫	দ্বীনে হক	১৯৪৩ ,,
১২. শান্তি পথ	২৭	সালামতী কা রাস্তা	১৯৪২ ,,
১৩. ইসলামী সংস্কৃতির মর্মকথা	২৭৯	ইসলামী তাহযীব আওর উসকে উসূল ওয়া মুবাদী	১৯৩৩ ,,
১৪. নির্বাচিত রচনাবলী ১-৩ খণ্ড	১৩৪৪	তাফহীমাত ১- ৩ জিল্দ	১৯৩৩- ৩৮ ,,
১৫. আল জিহাদ	৫৯২	আল জিহাদু ফিল ইসলাম	১৯২৭ ,,
১৬. ইসলাম ও জাহেলিয়াত	৪৮	ইসলাম আওর জাহেলিয়াত	১৯৪১ ,,
১৭. ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দ্ব	২২৮	তানকীহাত	১৯৩৩- ৩৮ ,,
১৮. ইসলামী জীবন ব্যবস্থার মৌলিক রূপরেখা	৩৮৪	ইসলামী নেযামে যিন্দেগী আওর উসকে বুনয়াদী তাসবিরাত	
১৯. ইসলামী দাওয়াতের দার্শনিক ভিত্তি	৩২	ইসলাম আওর মাগরিবী লা দ্বীনী জমহুরিয়ত	
২০. ইসলামের নৈতিক দৃষ্টিকোণ	৩২	ইসলাম কা আখলাকী নোকতায়ে নযর	১৯৪৪ ,,
২১. ইসলাম ও জাতীয়তাবাদ	১১৯	মাসয়ালায়ে কাওমিয়াত	১৯৩৯ ,,
২২. ইসলাম ও সমাজতন্ত্র			১৯৪৫ ,,
২৩. ইসলাম ও সামাজিক সুবিচার	২৪	ইসলাম আওর আদলে ইজতেমায়ী	
২৪. ইসলামে শক্তির উৎস	৬৭	ইসলাম কা ছের চশমায়ে কুওত	
২৫. কুরবানীর শিক্ষা	৪৮	ইসবাতে কুরবানী বিআয়াতে কুরআনী	
২৬. ঈমানের হাকীকত	৪৮	হাকীকতে ঈমান	১৯৩৮ ,,
২৭. ইসলামের হাকীকত	৪৪	হাকীকতে ইসলাম	১৯৩৮ ,,

২৮. নামায রোযার হাকীকত	৬৫	হাকীকতে সাওম আওর সালাত	১৯৩৮	,,
২৯. হজ্জের হাকীকত	৪৮	হাকীকতে হজ্জ	১৯৩৮	,,
৩০. যাকাতের হাকীকত	৫৮	হাকীকতে যাকাত	১৯৩৮	,,
৩১. জিহাদের হাকীকত	২৮	হাকীকতে জিহাদ	১৯৩৮	,,
৩২. তাকদীরের হাকীকত	১০২	মাসয়ালায়ে জবর ওয়া কদর	১৯৩৩	,,
৩৩. তাকওয়ার হাকীকত		হাকীকতে তাকওয়া	১৯৪৭	,,
৩৪. শিক্ষা ব্যবস্থা ঃ ইসলামী দৃষ্টিকোণ	১৩৩	তা'লীমাত	১৯৪১	,,
৩৫. শিরকের হাকীকত		হাকীকতে শিরক	১৯৪৪	,,
৩৬. তাওহীদের হাকীকত		হাকীকতে তাওহীদ	১৯৪৫	,,

ঘ. আইন, রাজনীতি ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা

৩৭. ইসলামী আইন	৬৩	ইসলামী কানুন	১৯৪৮	,,
৩৮. ইসলামী রাষ্ট্র	৭০০	ইসলামী রিয়াসত	১৯৪৮	,,
৩৯. খেলাফত ও রাজতন্ত্র	২৯৪	খিলাফত ওয়া মুলুকিয়াত		
৪০. ইসলামের রাজনৈতিক মতবাদ	৬৩	ইসলাম কা নযরিয়ায়ে সিয়াসী	১৯৩৯	,,
৪১. উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন ও মুসলমান ১-২ খণ্ড	৮৭৭	তাহরীকে আযাদী হিন্দ আওর মুসলমান ১-২ জিল্দ	১৯৩৭	,,
৪২. ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রণয়ন	৮৬	ইসলামী দস্তুর কি তাদবীন		
৪৩. ইসলামী শাসনতন্ত্রের মূলনীতি	৮৬	ইসলামী দসতুর কি বুনয়াদীঁ		
৪৪. মৌলিক মানবাধিকার	৩২	ইনসান কে বুনয়াদী হুকুম		
৪৫. ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমদের অধিকার	৫০	ইসলামী রিয়াসত মে জিম্মীয়োঁ কী হুকুক	১৯৪৮	,,
৪৬. দাক্ষিণাত্যের রাজনৈতিক ইতিহাস	২৮৬	দাককিন কী সিয়াসী তারীখ		
৪৭. কুরআনের রাজনৈতিক শিক্ষা	৫৭	কুরআন কী সিয়াসী তা'লীমাত		
৪৮. জাতীয় ঐক্য ও স্থিতিশীল গণতন্ত্র	২১	কাওমী ওয়াহ্দাত		
৪৯. ইসলামী আইনে মুরতাদের শাস্তি	৬৮	মুরতাদ কী সাযা	১৯৪৩	,,

ঙ. ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠন

৫০. ইসলামী দাওয়াত ও কর্মনীতি	৪৭	দাওয়াতে ইসলামী আওর উসকা তারীক কার	১৯৪৬	,,
৫১. জামায়াতে ইসলামীর দাওয়াত		জামায়াতে ইসলামী কা দাওয়াত	১৯৪৭	,,
৫২. ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলন	১২২	তাজদীদ ওয়া ইহ্ইয়ায়ে দ্বীন	১৯৪০	,,
৫৩. জামায়াতে ইসলামীর উদ্দেশ্য- ইতিহাস কর্মসূচী	৮০	জামায়াতে ইসলামী কা মাকসাদে তারীখ আওর লায়েহায়ে আ'মল	১৯৫১	,,
৫৪. আল্লাহর পথে জিহাদ	৩২	জিহাদুন ফী সাবীলিল্লাহ		
৫৫. ইসলামী আন্দোলনের নৈতিক ভিত্তি	৬২	তাহরীকে ইসলামী কী আখলাকী বুনিয়াদীঁ		
৫৬. ইসলামী আন্দোলন ঃ সাফল্যের শর্তাবলী	৬৪	তাহরীকে ইসলামী কামিয়াবী কা শারায়েত		
৫৭. মুসলমানদের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের কর্মসূচী	৭৮	মুসলমানোঁ কা মাযী হাল মুসতাকবেল কে লিয়ে লায়েহায়ে আমল		
৫৮. ইসলামী বিপ্লবের পথ	৫৬	ইসলামী হুকুমাত কিস্তরাহ কায়েম হুতী হ্যায়	১৯৪০	,,

৫৯. ইসলামী আন্দোলনের ভবিষ্যৎ কর্মসূচী	১৩৪	তাহরীকে ইসলামী কা আয়েন্দাহ লায়েহায়ে আমল	১৯৪৭	,,
৬০. আন্দোলন সংগঠন কর্মী	২২৪	তাহরীক আওর কারে কুন		
৬১. দায়ী ইলাল্লাহ দাওয়াত ইলাল্লাহ	৪২	দায়ী ইলাল্লাহ দাওয়াত ইলাল্লাহ্		
৬২. ভাঙ্গা ও গড়া	৩২	বানাও আওর বেগাড়	১৯৪৭	,,
৬৩. একটি সত্যনিষ্ঠ দলের প্রয়োজন	২৩	এক সালেহ জামায়াত কী জরুরত	১৯৪১	,,
৬৪. শাহাদাতে হুসাইন (রাঃ)	১৬	শাহাদাতে ইমাম হোসাইন (রা.)		
৬৫. বিশ্ব মুসলিম ঐক্যজোট আন্দোলন	৪৩	ইত্তেহাদে আলমে ইসলামী		
৬৬. সত্যের সাক্ষ্য	৮০	শাহাদাতে হক	১৯৪৬	,,
৬৭. আজকের দুনিয়ায় ইসলাম	৪২	ইসলাম আসরে হাযের মেঁ		
৬৮. জামায়াতে ইসলামীর উনত্রিশ বছর	৫৪	জামায়াতে ইসলামী কা উনত্রিশ সাল		

চ. অর্থনীতি ও ব্যাংক ব্যবস্থা

৬৯. ইসলামী অর্থনীতি	৩২৮	মায়াশিয়াতে ইসলাম		
৭০. অর্থনৈতিক সমস্যার ইসলামী সমাধান	৩৮	ইনসান কা মায়া'শী মাসয়ালা আওর উসকা ইসলামী হল	১৯৪১	,,
৭১. কুরআনের অর্থনৈতিক নির্দেশিকা	৫০	কুরআন কী মায়া'শী তা'লীমাত		
৭২. ইসলাম ও আধুনিক অর্থনৈতিক মতবাদ	১২৬	ইসলাম আওর জাদীদে মায়া'শী নযরিয়াত		
৭৩. ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার মূলনীতি	৩১	ইসলামী মায়া'শিয়াত কে উসুল		
৭৪. সুদ ও আধুনিক ব্যাংকিং	৩০২	সূদ	১৯৩৬	,,
৭৫. ভূমির মালিকানা বিধান	৯৬	মাসয়ালায়ে মিলকিয়তে যমীন		
৭৬. জাতীয় মালিকানা		কওমী মিলকিয়ত	১৯৫০	,,

ছ. দাম্পত্য জীবন ও নারী

৭৭. পর্দা ও ইসলাম	২৮০	পর্দা	১৯৩৭	,,
৭৮. স্বামী স্ত্রীর অধিকার	১৫১	হুকুকুয যাওজাইন	১৯৩৫	,,
৭৯. ইসলামের দৃষ্টিতে জন্মনিয়ন্ত্রণ	১৩১	ইসলাম আওর যবতে বেলাদাত	১৯৩৫	,,
৮০. মুসলিম নারীর নিকট ইসলামের দাবী	২৪	মুসলিম খাওয়াতীন সে ইসলাম কে মুতালিবাত		

জ. তাযকিয়ায়ে নফস

৮১. হিদায়াত	৫৫	হিদায়াত		
৮২. ইসলামের বুনিয়াদী শিক্ষা	২৭৪	খুতবাত	১৯৩৮	,,
৮৩. ইসলামী ইবাদতের মর্মকথা	৮৮	ইসলামী ইবাদাত পর তাহকীকী নযর	১৯৩৯	,,
৮৪. আত্মশুদ্ধির ইসলামী পদ্ধতি	৪৮	তাযকিয়ায়ে নফস		

ঝ. সীরাত

৮৫. সীরাতে সারওয়ারে আলম ১-৫ খণ্ড	১২১৬	সীরাতে সরওয়ারে আলম ১-২ জিল্দ্		
৮৬. খতমে নবুয়্যত	৭৫	খতমে নবুওয়াত		
৮৭. নবীর কুরআনী পরিচয়	৪০	কুরআন আপনে লায়ে ওয়ালে কো কেসরং মেঁ পেশ করতা হায়		
৮৮. আদর্শ মানব	৩২	সরওয়ারে আলম কা আসলী কারনামা		

৮৯. সাহাবায়ে কিরামের মর্যাদা	৪০	মাকামে সাহাবা	

এ. সামগ্রিক

৯০. রাসায়েল ও মাসায়েল ১-৫ খণ্ড		রাসায়েল ওয়া মাসায়েল ১-৫ জিল্দ্	১৯৪২-১৯৪৭ ,,
৯১. যুব সমাজের মুখোমুখি মাওলানা মওদূদী	৪৫০	তাসরীহাত	
৯২. যুগ জিজ্ঞাসার জবাব ১-২ খণ্ড	৪৪৮	ইসতিফসারাত ১-২ জিল্দ্	
৯৩. বিকেলের আসর ১-২ খণ্ড	২৫০	আসরী মাজালিস ১-২ জিল্দ্	
৯৪. পত্রাবলী ১-২ খণ্ড	৪৫৫	মাকাতীব মাওলানা মওদূদী (র.) ১-২ জিল্দ	
৯৫. বেতার বক্তৃতা	৮৭	নশরী তাকরীরী	
৯৬. খুতবাতুল হারাম		খুতবাতুল হারাম	
৯৭. পত্রালাপ মাওলানা মওদূদী ও মরিয়ম জামিলা		মাওলানা মওদূদী আওর মরিয়ম জামিলা কে দরমিয়ান খত	
৯৮. কাদিয়ানী সমস্যা		কাদিয়ানী মাসয়ালাহ্	১৯৫৩ ,,

মাওলানা মওদূদী সম্পর্কে বাংলাভাষায় কয়েকটি বই

বইয়ের নাম	লেখকের নাম
১. বিশ্বের মনীষীদের দৃষ্টিতে মাওলানা মওদূদী	আব্বাস আলী খান সম্পাদিত
২. মাওলানা মওদূদী	আব্বাস আলী খান
৩. আলেমে দ্বীন মাওলানা মওদূদী	আব্বাস আলী খান
৪. ইসলামের পুনরুজ্জীবনে মাওলানা মওদূদীর অবদান	অধ্যাপক গোলাম আযম
৫. জামায়াতে ইসলামীর ইতিহাস	আব্বাস আলী খান
৬. জামায়াতে ইসলামীর কার্যবিবরণী- ১ম খণ্ড	
৭. জামায়াতে ইসলামীর কার্যবিবরণী- ২য় খণ্ড	
৮. সত্যের আলো	মাওলানা বশীরুজ্জামান
৯. কুরআনের দেশে মাওলানা মওদূদী	মুহাম্মদ আসেম
১০. মাওলানা মওদূদীর বহুমুখী অবদান	আব্বাস আলী খান
১১. জামায়াতে ইসলামীর বিরোধিতার অন্তরালে	আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসুফ
১২. আজাদী আন্দোলনে আলেম সমাজের ভূমিকা	জুলফিকার আহমদ কিসমতী
১৩. ছোটদের মওদূদী	শেখ আনসার আলী
১৪. মাওলানা মওদূদীর বিরুদ্ধে অভিযোগের জবাব	মাওলানা আবদুল হাকীম
১৫. মাওলানা মওদূদীর বিরুদ্ধে অভিযোগের তাত্ত্বিক পর্যালোচনা	মুফতী মুহাম্মদ ইউসুফ
১৬. খেলাফত ও রাজতন্ত্র গ্রন্থ সম্পর্কে অভিযোগের জবাব	বিচারপতি মালিক গোলাম আলী
১৭. মাওলানা মওদূদীকে যেমন দেখেছি	অধ্যাপক গোলাম আযম